আয়ুর্ব্বেদ

আর্য্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক
মাসিক পত্র ও সমালোচক

—:০:—

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ,এল-এম-এস
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি
কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ
কবিরাজ শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র কবিরত্ন
মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে

কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৭ মবর্ষ
(১৩২৯ আশ্বিন হইতে ১৩৩০ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত)

কলিকাতা
১৭।১৯ শ্যামবাজার ব্রীজরোড
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

[বার্ষিক মূল্য ৩।/০
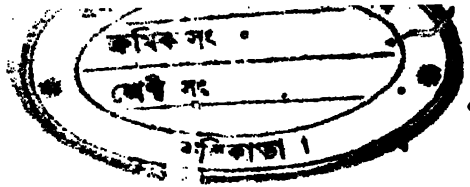
৭ম বর্ষের বর্ষ সূচী।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

৭ম বর্ষ | ১৩২৯ সাল আশ্বিন | ১ম সংখ্যা

শিশুচর্য্যা।

[কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

স্তন্য-বৃদ্ধিকর যোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:০:—

প্রসূতির অল্পকারণে অসন্তুষ্ট হওয়া, অথবা সর্ব্বদা রাগ করা উচিত নয়। উহাতে স্তনের দুগ্ধ অল্প হইয়া যায়। তা ছাড়া অনবরত শোক, দুঃখ, চিন্তা বা অন্য কোনপ্রকার মানসিক অশান্তিতে দিন কাটাইলেও প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা ঘটিয়া থাকে। এজন্য সন্তানের জননীকে সর্ব্বদা প্রসন্ন ও প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করা উচিত এবং সন্তানের প্রতি, যাহাতে দিন দিন স্নেহ-মমতার বৃদ্ধি হয়, এরূপ ভাবে সন্তানের লালনপালন করা কর্ত্তব্য। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহমমতার অভাব হইলেও স্তনদুগ্ধ অল্প হইয়া যায়।

আজকাল প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অল্পতা বা অভাব ঘটিলে তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান বা প্রতীকারের কোনপ্রকার ব্যবস্থা না করিয়াই শিশুর জন্য গরু, ছাগল বা গাধার দুগ্ধের অথবা বিলাতী টিনের দুগ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সকল অবৈধ অতুষ্টিকর ব্যবস্থায় শিশুর স্বাস্থ্য বৃদ্ধি বা স্বাস্থ্যের হানি ঘটিয়া থাকে কি না সে বিষয়ে কেহ লক্ষ্য করেন না। এই যে শৈশবাবস্থায় যকৃতের অতিবৃদ্ধি ও জ্বর প্রভৃতি অভিনব রোগ-সকলের উৎপত্তি হইতেছে, সে সকল যে শিশুখাদ্যের কৃত্রিমতার জন্য নহে—ইহা কি কেহ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন? যেখানে খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিমতা যত অধিক,

সেখানে রোগেরও তত বাড়াবাড়ি। পল্লীগ্রামে শিশুর অকালমৃত্যু সহরের অপেক্ষা অনেক কম। সেখানে অর্থের অভাবেই হউক, অভিজ্ঞতার অভাবেই হউক, কৃত্রিম খাদ্যের বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না। প্রসূতির স্তনদুগ্ধের অভাব হইলে, কি প্রকারে স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে, এই চিন্তাই গৃহস্থগণের মধ্যে জাগিয়া থাকে। তখন তাহারা বিলাতী টিনের দুগ্ধের জন্য ব্যস্ত না হইয়া স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের সে চেষ্টা প্রায়ই ফলবতী হইয়া থাকে, শিশুগণ আকণ্ঠ মাতৃস্তন্য পান করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যলাভ করিতে থাকে। চেষ্টার দ্বারা একান্ত যখন স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না, তখনই তাহারা গোদুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

১। স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি করিতে হইলে,—বনকাপাস ও আকের মূল,—প্রত্যেকটী চারি আনা পরিমাণে বাঁটিয়া কাঁজির সহিত গুলিয়া প্রসূতিকে প্রত্যহ একবার অথবা দুইবার খাইতে দিবে। অথবা—

২। ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ আধতোলা মদ্যের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ একবার খাওয়াইবে। অথবা—

৩। শালিতণ্ডুল চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিবে। কিংবা—

৪। প্রসূতিকে প্রত্যহ কিছু অধিক পরিমাণে দুগ্ধ পান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল সেবন করিলে নিশ্চয়ই প্রসূতির স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে। অথবা—

৫। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু—ইহাদের প্রত্যেটী ছয় আনা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিবে এবং আধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। ইহাতে যে কেবল স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে এমন নয়, ঐ দুগ্ধ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী হইবে। অথবা—

৬। বচ, মুথা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল—ইহাদের প্রত্যেকটী সওয়া চারিআনা পরিমাণে লইয়া পূর্ব্ববৎ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করাইবে। ইহা দ্বারাও নির্দ্দোষ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইবে। অথবা—

৭। বেণার মূল, শালিধান্য, আকের কোঁরা, উলুখড়ের মূল, কাশের মূল, গুলঞ্চ, ইকড়া ও গন্ধতৃণ,—ইহাদের প্রত্যেকটী দুইআনা পরিমাণ,—আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া প্রসূতিকে পান করিতে দিবে। ইহাও নির্দ্দোষ স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধির একটি মহৌষধ।

৮। এতদ্ভিন্ন যবের পালো, যব, গমের ময়দার রুটী, শালি বা ষষ্টিক চাউলের অন্ন, মাংসরস, সুরা, রসুন, মৎস্য, লাউ, কলমীশাক, কেশুর, পানিফল, মৃণাল প্রভৃতি ভোজন করিলে অথবা—

৯। ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ বা যষ্টিমধু চূর্ণ কিম্বা শতমূলীর রস অথবা শতমূলী চূর্ণ দুগ্ধের

সহিত পান করিলেও স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শিশুর স্নান।

যতদিন শিশুর নাভি শুকাইয়া না পড়িয়া যায়, ততদিন তাহাকে তৈল মাখাইয়া একটু গরম জলে 'গামছা' দিয়া গা মুছাইয়া দিবে। তা'র পর নাভি পড়িয়া গেলে ও নাভির ঘা শুকাইয়া গেলে প্রত্যহ একটু গরম জল দিয়া শিশুকে স্নান করাইয়া দিবে। কিন্তু স্নানটা ফাঁকা বা খোলা জায়গায় না করাইয়া ঘরের মধ্যে করানই ভাল। তাহাতে কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুখ হইবার ভয় থাকে না। স্নান প্রত্যহ অভ্যাস করান ভাল। স্নানের পর বেশ করিয়া গা মুছাইয়া দিবে এবং বগল ও কুঁচকী প্রভৃতি স্থানে যাহাতে জল না থাকে—সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। স্নানের পর একটা পাতলা জামা গায়ে জড়াইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়।

শিশুর প্রতি যত্ন।

শিশুকে কোলে লইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। বিছানা হইতে শিশুকে কোলে লইতে হইলে কদাচ হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবে না। ঘাড় ও মাথার বীটে একটা হাত, আর একটা হাত পাছা ও পায়ের নীচে দিয়া ধীরে ধীরে শিশুটাকে তুলিয়া কোলে লইবে এবং এরূপ ভাবে কোলের ভিতর রাখিবে—যাহাতে তাহার কোন রকম অসুবিধা বা কষ্ট না হয়। তা' ছাড়া কখনও তাহাকে তর্জ্জন করিবে না, বা ভয় দেখাইবে না।

অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় শিশুদিগের বেশী বেশী ঘুম হওয়াই স্বাভাবিক। যাহাতে বালক নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাইতে পারে, পিপীলিকা বা মশা-মাছিতে কোনরূপ বিরক্ত করিতে না পায়, সেদিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। শিশু ঘুমাইলে হঠাৎ তাহাকে জাগাইয়া কোলে লইবে না, যেখানে সেখানে শোয়াইয়া বা বসাইয়া রাখিবে না এবং কাহারও নিকট হইতে জোর করিয়া টানিয়া লইবে না, অথবা হঠাৎ শোয়াইয়া দিবে না। বিনা প্রয়োজনে কাঁদাইবে না। অনেকেরই অভ্যাস,—শিশুকে অনর্থক কাঁদাইয়া আনন্দ অনুভব করা; সেরূপ করা কদাচ উচিত নয়। বালক যদি কোন জিনিস লইতে জেদ করে, এবং ঐ জিনিসে যদি তাহার কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, তবে তাহা তখনই তাহাকে দিবে, নচেৎ অন্য কোন জিনিস দিয়া ভুলাইবে। বালকের মন যাহাতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবে এবং বালক যাহাতে উঁচু জায়গায় না উঠে বা বসে, সে বিষয়েও সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। বালকের নিজের হিতাহিত জ্ঞান নাই, সেজন্য উহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখিবে, কখন কি বিপদ ঘটিতে পারে, তাহা কে বলিবে?

বালকদিগকে যে সকল খেলনা দিবে, সে সকল যেন ছেলেদের মনভুলান হয়, শব্দ করে ও হালকা হয়। যে সকল খেলনার মুখ খুব সরু, সে সকল বালকদিগকে দিতে নাই; কখন কোথায় খোঁচা লাগাইতে পারে। বালক কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, খাইতে না চাহিলে অথবা কথা না শুনিলে,

তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্য ভূত, ও প্রেত রাক্ষস প্রভৃতির অদ্ভুত গল্প বলিয়া অথবা বিকট বীভৎস মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া বালকগণের বিভীষিকা উৎপাদন করিবে না।

শিশু যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, খোলা পরিষ্কার হাওয়ায় আপনার ইচ্ছামত হাত পা ছুড়িয়া খেলা করিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে, এবং ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, বিদ্যুতের আলো, গাছের তলা, শূন্য গৃহ প্রভৃতি হইতে শিশুকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। তদ্ভিন্ন অপবিত্র স্থানে, উন্মুক্ত আকাশের তলে, বর্ষার সময় অনাবৃত দেহে ধূলিসমাকীর্ণ স্থানে, ধূমাচ্ছন্ন গৃহে ও জলসিক্ত গৃহে বালককে কদাচ রাখিবেনা।

শিশু হাঁটিতে শিখিলে, তাহাকে আপন মনে হাঁটিতে দিবে। হাঁটিবার শক্তি না হইতেই তাহাকে কখনও হাত ধরিয়া হাঁটাইয়া লইয়া বেড়াইবে না, অথবা হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, উহার হাত ধরিয়া জোড় করিয়া হাঁটাইতে চেষ্টা করিবে না এবং কখনও বালকের হাত ধরিয়া টানিয়া উচ্চে উঠাইবে না।

বাল্যকাল হইতেই শিশুকে সময় মত খাওয়া, স্নান করা, ঘুমান ও ঘুম হইতে উঠা, মলমূত্র ত্যাগ করা, প্রভৃতি অভ্যাস করান উচিত। বয়োবৃদ্ধির সহিত যাহাতে ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি কুবৃত্তি সকল না জাগিতে পারে ও সর্ব্বদা খেলা করিয়া না বেড়ায়, অন্যায় আব্দার না করে, রাগ করিয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া না বসিয়া থাকে,—এই সকল অনিষ্টকর বিষয় হইতে বালককে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে। কোন কুঅভ্যাস ছাড়াইতে, হইলে তাহাকে সদয়ভাবে ও মিষ্ট কথায় শাসন করিবে।

শিশুর রোগ-বিজ্ঞানোপায়।

যে সকল বালক কথা কহিতে পারে না, তাহাদের অসুখ হইলে, রোগের লক্ষণ সকল বিশেষ অনুধাবন করিয়া রোগ নির্ণয় করিতে হয়। বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যদি কোন প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, অথবা পেট কামড়ায়, তাহা হইলে বালক সেইসকল স্থানে বারংবার হাত দেয় ও কাঁদিতে থাকে, এবং ঐ সকল স্থানে বা পেটে হাত বুলাইয়া দিলে বালক সুস্থ হয়, আর কাঁদে না। মাথার অসুখে, শিশু মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠে ও ভয় পাওয়ার মত চীৎকার করিতে থাকে, অথবা ঘুমানর মত চোখ বুজিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে এবং মাথা তুলিতে পারে না। তলপেটে কোনপ্রকার রোগ-যন্ত্রণা অনুভব করিলে শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। কিছুই খাইতে চাহে না, ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না। শিশুর মলমূত্র রোধ হইলে, পেটের মধ্যে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সর্ব্বদা ছট্‌ফট্ করে ও কাঁদে, তদ্ভিন্ন বমি, পেটফাঁপা, পেটে শব্দ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন শিশু সমস্ত শরীরটা অসুস্থ বিবেচনা করিলে কেবলই কাঁদিতে থাকে।

বালকের চিকিৎসা।

যে সকল শিশু জননী বা ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের অসুখ হইলে, স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হয়। আবশ্যক

হইলে শিশুর আরোগ্যের জন্য ধাত্রী বা জননীকেই ঔষধ ও পথ্য সেবন করিতে হয় এবং উপবাসও দিতে হয়। যে সকল শিশু কেবল স্তনদুগ্ধে জীবিত থাকে, অতি বড় অসুখ হইলেও কদাচ তাহাদিগকে স্তন্যপান করান বন্ধ করিবে না।

যে সকল শিশু দুগ্ধান্ন অর্থাৎ দুধসাগু বা দুধ বার্লি খাইয়া থাকে, তাহাদের অসুখে, শিশু ও জননী, উভয়কেই ঔষধ খাওয়াইতে পারা যায়। যে সকল শিশু কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া অন্নাদি ভোজন করিতে অভ্যাস করিয়াছে; তাহাদের অসুখ হইলে কেবল সেই রুগ্ন শিশুকেই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে যেমন চিকিৎসকের উপর শিশুর চিকিৎসার ভার দিয়া জননী নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী হইয়া থাকেন, সেরূপ করা কখনই উচিত নয়। শিশুর আরোগ্যের জন্য জননীকেও রোগিণী সাজিয়া সন্তানের জন্য যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয়; তাহা না করিতে পারিলে, অক্ষুণ্ণ সন্তান-সুখ-লাভ ভাগ্যে ঘটে না।

(ক্রমশঃ)

হিন্দু-স্বাস্থ্যনীতি।

[ডাঃ শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—•:০:•—

স্নানবিধি।

১। সুস্থ শরীরে বেলা ৯ ঘটিকার মধ্যেই স্নান করিতে হয়। দুর্ব্বল এবং পীড়িত ব্যক্তি নিজ হইতে অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ লইয়া স্নানের নিয়ম প্রতিপালন করিবে। অবগাহন স্নানই প্রকৃত স্নান। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শীতল জলে স্নান করা প্রশস্ত। স্রোতের জলে স্নান করিলে শরীরের ক্লেদ এবং দেহস্থিত উষ্ণ তড়িত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া শরীরে স্ফূর্ত্তি এবং তেজ বৃদ্ধি করে। আর্য্যশাস্ত্রে স্নান পাঁচ প্রকার (ক) অবগাহন (খ) গাত্রমার্জ্জন এবং মস্তক ধৌতকরণ, (গ) হাত পা ধুইয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করণ (ঘ) শুধু তৈল মর্দ্দন করিয়া বস্ত্র ত্যাগ করণ (ঙ) গঙ্গা বা তুলসী জল স্পর্শ করণ। ইহার মধ্যে ১ম এবং ২য় স্নানই প্রশস্ত। বস্তুতঃ স্নানের উদ্দেশ্য শরীর পরিষ্কার রাখা আর বায়ুপিত্তের সমতা সংস্থাপন রাখা। এতদর্থে শীতল জল এবং শ্লেষ্মাধিক্যে লবণ মিশ্রিত অল্প উষ্ণ জল ব্যবহার করা ভাল। প্রত্যহ উষ্ণ জলে স্নান করিলে শরীরের মাংসপিণ্ড অর্থাৎ পেশী সূত্র অতি কোমল এবং ঢিলা হইয়া কার্য্য শক্তি কমিয়া যায়। যাহারা

তাড়াতাড়ি একটুকু জল দিয়া স্নানকার্য্য সমাধা করে, তাহারা স্নান কার্য্যে উপকারের ফল অপেক্ষা অত্যধিক অপকারই লাভ করিয়া থাকে।

হিন্দু শাস্ত্রে অস্নাত ব্যক্তি অশুচি এবং দৈব বা পারত্রিক কার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া কথিত। ইহার অর্থ এই যে, নানাবিধ কার্য্য দ্বারা এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শরীর ও মন উষ্ণ, বিরক্ত, চঞ্চল এবং অপরিষ্কৃত থাকে। ইহাতে দৈব ও পারত্রিক কোন কার্য্যই সুন্দর ভাবে হইতে পারে না। হিন্দু স্বাস্থ্য তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন যে,শ্বাস ক্রিয়া বাম নাসিকায় প্রবাহিত হইবার সময় স্নান করিলে শীতলতা জনিত অপচয় অর্থাৎ সর্দ্দি হইতে পারে না। শ্বাস ক্রিয়ার অতি সূক্ষ্ম বিচার শীল প্রাণায়ামপরায়ণ যোগিগণ এই বাক্যের সম্পূর্ণ পরীক্ষা পাইয়া শ্বাস গতির বহুবিধ ক্রিয়া, ভঙ্গী এবং ব্যবহার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের স্নান বিধি সাধারণ লোকের উপযুক্ত নহে।

২। স্নান করিবার পূর্ব্বে পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের মাথায় তৈল দিবে। ইহার পর অনামিকা দ্বারা নাভিতে তৈল লাগাইবে কিন্তু নাভিদেশ নাড়া চাড়া করিবে না। ইহার পর কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা কর্ণে এবং নাসিকায় তৈল প্রদান করিবে। ইহার পর অন্যান্য অঙ্গে ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিয়া তৈল লাগাইবে। বলা বাহুল্য তৈল বলিতে তিল তৈলই বুঝায়। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সরিষা, নারিকেল, রেড়ি, তিসি ইত্যাদিকে তৈল সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া লইয়াছি।

এখনকার দিনের অনেক পেটেণ্ট তৈল ব্যবহারে আজকাল অনেকের মস্তকের কেশ নষ্ট আর নানা রূপ চর্ম্ম রোগ ও স্নায়ু দুর্ব্বল প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইতেছে। বিজ্ঞাপনের চটকে মুগ্ধ হইয়া নব্য বঙ্গ সুগন্ধ মিশ্রিত তৈল মাখিয়া বিলাসিতা বৃদ্ধির সহ অর্থ আর দেহ বিনষ্ট করিতেছে। পূর্ব্বকালের ব্যবস্থিত তিল তৈল অভাবে নারিকেল বা সরিষা তৈল মাখিলে স্বাস্থ্যের অপচয় আর অর্থের অপব্যয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী জাতি একমাত্র সরিষার তৈল ব্যবহার করিলেও শরীরের স্নিগ্ধতা পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন।

পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে তৈল মাখিলে দৃষ্টি শক্তি আর চক্ষুর তেজ পূর্ণরূপে রক্ষা হইয়া থাকে। এখনো ৮০।৯০ বর্ষের বহু বৃদ্ধ বিজ্ঞাপনের তৈল ব্যবহার না করিয়া তিল, নারিকেল বা সরিষার তৈল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মাখিয়া যুবক গণের অপেক্ষা অধিক দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। বলা বাহুল্য, এই নিয়মে তৈল মাখিলে চক্ষু উঠা পীড়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নাভিতে তৈল দেওয়ায় জঠরাগ্নি সতেজ ও চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা ব্যান বায়ুর গতিবিধি অর্থাৎ শরীরের নিম্ন ভাগের বায়ু প্রবাহ সরল ও সহজ রাখা যায়। নাভিমূলে সমান বায়ু (নাইট্রোজেন) থাকে। ইহাকে অধিক নাড়া চাড়া করিলে উদর ভগ্ন এবং অজীর্ণ রোগ জন্মিতে পারে। এই জন্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদগণের আদেশ যে, প্রত্যেক ব্যক্তি পরিধেয় বস্ত্র নাভির চারি অঙ্গুল নিম্নে বা উপরে পরিধান করিবে। নাভি

বা কোন ইন্দ্রিয়াদি অধিক মৰ্দ্দন করিবে না।

৪। স্নান সময়ে জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে গিয়া অন্য কোন পাত্র অথবা গামছা দ্বারা মাথার ঊর্দ্ধ হইতে জল দিলে মাথা অধিক শীতল হয়। যাহাদের মস্তকের উপরাংশ সর্ব্বদা উষ্ণ এবং চক্ষু অধিকাংশ সময় পিচুটি যুক্ত—তাহারা চক্ষু মেলিয়া জলে ডুব দিবে। ইহাতে মস্তক শীতল এবং চক্ষুর উষ্ণতা নিবারিত হইবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে অথবা মাথা ঘুরিলে কিম্বা ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা জন্য চক্ষুর কোন রোগ জন্মিলে বা শিরঃশূলাদি কোন বিকৃতি লক্ষণ ঘটিলে নিম্নলিখিত নিয়মে প্রতিদিন স্নান করা উচিত। স্নান করিতে গিয়া প্রথমে এক অঞ্জলি জল মাথায় দিবে। পরে ডুব দিয়া মুখে যত জল ধরে—তত জল নিয়া চক্ষু চাহিয়া অন্ততঃ ৫।৬টি ডুব দিবে। ইহার পর শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিবে। দেহে অধিক জল শোষণ করিবে না।

৫। অপরের পরিধেয় অথবা গামছা ব্যবহার করা কদাপি কৰ্ত্তব্য নহে। ইহাতে একের ছোঁয়াচে ব্যাধি অপরের শরীরে সংক্রমিত হইতে পারে।

বিগত শ্রাবণ মাসে আমি মতিহারীতে এইরূপে বিপদস্থ হইয়াছিলাম। সঙ্গে গামছা ছিলনা, তাই একটি পণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট গামছা চাহিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার ফলে রাত্রিতেই চক্ষুর পীড়ায় আক্রান্ত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, পণ্ডিত মহাশয় ইতিপূর্ব্বে 'চক্ষুউঠা' পীড়ায় ভুগিয়াছিলেন। তিনি রোগমুক্ত হইয়া গামছা পরিষ্কৃত করিলেও উহা হইতে চক্ষুউঠা পীড়ার বিষ পরিত্যক্ত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদে দক্র, পীড়াকে স্বল্পকুষ্ঠ শ্রেণী মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। দক্র পীড়াগ্রস্থ ব্যক্তির বস্ত্র পরিয়া আমারএক পরিচিত ব্যক্তি উৎকট "মহিষা দাদ" রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ পীড়ায় তাহাকে "ক্র্যাইসোফ্যানিক্ সালসার এমেটিক এসিড" প্রভৃতি ঔষধ দ্বারাও আরোগ্য করিতে পারি নাই শেষে গোমূত্র আর তুলসী পত্র এবং লিভারপুলি লবণ প্রত্যহ খাওয়াইয়া আর মাখাইয়া অনেক আরোগ্য করিয়াছি।

৬। স্নান কালে অল্প সাঁতার কাটা মন্দ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া বাজী রাখিয়া সাঁতার কাটা অতীব অন্যায়। কেননা ইহাতে প্রধানতঃ শ্বাস গতি দীর্ঘ হয়, দ্বিতীয়তঃ ফুসফুসে রক্তাধিক্য জন্মে, তৃতীয়তঃ মস্তিষ্কের ক্রিয়া অধিক হইয়া পরিশেষে "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম" হইয়া সন্যাস প্রভৃতি উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে।

৭। স্নান সময়ে সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিলে চর্ম্ম পরিষ্কার হয় এবং বর্ণ সংস্কার আর মাংসপেশী সতেজ হয়। যাঁহারা তৈল মাখিয়া থাকেন তাঁহাদের তো গামছায় অঙ্গ মুছা নিতান্ত আবশ্যক—তৈল ধুইয়া ফেলিলে বস্ত্র পরিস্কার আর চর্ম্ম মসৃণ হয়। আর যাঁহারা তৈলের পরিবর্ত্তে সাবান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষেও একটুকু জোরে অঙ্গ মার্জ্জন নিতান্ত আবশ্যক। সাবানের চুণ বা পটাস অংশ লোমকূপে আবদ্ধ থাকিলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। প্রত্যেক লোমকুপ পরিষ্কার এবং স্বচ্ছিদ্র না থাকিলে শরীরের ক্লেদ ঘর্ম্ম

সহ বাহির হইতে পারে না, প্রত্যুত: উহাতে চুণ কিম্বা পটাস ভাগ লাগিয়া থাকিলে ক্ষত এবং একজিমা নামক উৎকট চর্ম্মপীড়া হইবার অতি সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য প্রথার সাবান ব্যবহার অপেক্ষা ভারতের সরিষা তৈল ব্যবহার শরীর রক্ষার পক্ষে শতগুণে উৎকৃষ্ট। অবশ্য সর্ব্বাঙ্গ ভালরূপ ধৌত করা চাই।

৮। স্নান কালে অন্যমনস্ক হইয়া বা গল্প করিতে করিতে কিম্বা হাস্য, ক্রন্দন এবং সঙ্গীত করিতে করিতে স্নান কার্য্য নিষিদ্ধ। ইহাতে শরীর মন উভয়েরই অনিষ্ট হয়। অন্যমনস্ক স্নানার্থি জলে ডুবিয়া কিম্বা জলজন্তু কর্ত্তৃক আক্রান্তও হইতে পারে।

৯। স্নানকালে একগলা জলে দাঁড়াইয়া ৭ বার মুখে জল লইলে বায়ুর উর্দ্ধগতি নিবারিত হয়।

১০। প্রাতঃস্নানে শরীর রুক্ষ হয়। সন্ধ্যাস্নানে শ্লেষ্মা জন্মে, বেলা ৯টা ১০টায় স্নানই প্রশস্ত কাল।

১১। শীতকালে এবং বর্ষাকালে প্রত্যহ স্নান না করিলে তত হানি নাই। আবার অল্প জলে ভিজিয়া শরীর ঠাণ্ডা হওয়া অপেক্ষা অবগাহন স্নান করিয়া পদদ্বয় শুষ্ক করতঃ গরম সরিষার তৈল পায়ের তালুতে মাখিলে এক দিনেই সর্দ্দি আরোগ্য হয়। অতি বৃদ্ধ, অতি শিশু এবং সদ্যঃ প্রসূতা নারী এবং পীড়িত ব্যক্তি প্রত্যহ স্নান করিবেনা। পক্ষান্তরে পরিশ্রমী, কেরাণী, উকিল, মোক্তার লেখক, চিত্রকর, প্রভৃতি ব্যক্তির পক্ষে স্নানের সময় পরিবর্ত্তন কখনই কর্ত্তব্য নহে।

শয়ন ও নিদ্রা।

১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শয্যা ব্যবহার করিবে। উপাধান অর্থাৎ বালিস যেন অধিক উচ্চ, অধিক নীচু এবং কঠিন না হয়। কিন্তু অতি কোমল বালিশও ভাল নয়। বালিশ হীন শয়নে রক্ত গতি পরিচালনের বহু বিঘ্ন জন্মে। ইহার ফলে প্রায়ই মস্তিষ্ক পীড়া আর ফুসফুস জনিত বহু রোগ উপস্থিত হইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে—হিন্দুস্থানের সাধারণ গৃহস্থগণের অধিকাংশই মাথার পীড়া, কর্ণের পীড়া এবং শ্লেষ্মা ঘটিত পীড়ায় আক্রান্ত হয়। ইহারা একে কঠিন কর্ম্মী, তাহার উপর বালিশ ব্যবহার ইহারা প্রায়ই করেনা, হয় এক খানা বস্ত্র পাতিয়া খাটিয়ার ডাঁসায় মাথা রাখিয়া না হয় হাতের উপর মাথা দিয়া মাটিতে শয়ন করে। আমি দীর্ঘ ১৫।১৬ বর্ষ হিন্দু স্থানের বহু প্রদেশে থাকিয়া ডাক্তারি করিয়াছি, এই সকল স্থানে বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা মাথার ব্যাধি, কর্ণের রোগ আর দুর্ব্বল ফুসফুস প্রবণ রোগী বহু পাওয়া যায়। অতি বড়লোক ভিন্ন—"গ্যারদা" (বালিশ) সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে। বাঙ্গালা দেশের মজুরেরাও বিনা বালিশে শয়ন করে না। বালিশ প্রস্তুত করিতে কিন্তু কার্পাস তুলা ভাল নহে। শিমুল তুলা আর আটার ভুষিচিনার (একপ্রকার শস্য) বালিশই প্রশস্ত। আকন্দ তুলা নির্ম্মিত উপাধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দুই ব্যক্তির পক্ষে এক বালিশে শয়ন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। ইহাতে একের নিঃশ্বাস অপরের টানিয়া লওয়ায় উভয়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে পারে। বঙ্গসমাজে পতি-পত্নী একই বালিশে শয়ন করিয়া

করিয়া থাকেন। এ ব্যবস্থা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে ঠিক নহে। এক সময়ে এই কারণে স্ত্রীর শুষ্ক নাসিকার ব্যাধি স্বামীর—হইয়াছিল ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বস্তুতঃ এক উপাধানে দুই জনের শয়ন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

২। শয়নের পূর্ব্বে পাদদ্বয় সিক্ত করা অনুচিত। আবার কোন কোন ঋষি শয়নকালে গামছা দ্বারা উভয় পদ মুছিয়া—শুইতে বলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এ ব্যবস্থা অসঙ্গত নহে, কারণ পা ধুইয়া এবং মুছিয়া শয়ন করিলে সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ হইয়া সুনিদ্রা হয়। যে সকল ব্যক্তি অত্যধিক দুর্ব্বল, তাহারা শয়নকালে পায়ে একটু তৈল মাখিয়া শয়ন করিলে যথেষ্ট সুস্থতা অনুভব করিতে পারেন।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে মাথা রাখিয়া শয়নই প্রশস্ত। কখনো উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবে না—কারণ এই দিকে চুম্বকের আকর্ষণ অধিক। রক্তে লৌহের ভাগ অধিক আছে বলিয়া উত্তর দিকে মাথা রাখিলে অনেক প্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। এই তত্ত্বের মীমাংসার উদ্দেশ্যে পুরাণে একটী চমৎকার গল্প বর্ণিত আছে, যথা—পার্ব্বতীর পুত্র গণেশ উত্তর শিয়রে শয়ন করিয়াছিল বলিয়া শনির দৃষ্টিতে তাহার মাথা উড়িয়া যায়। তাহার পর উত্তরশিয়রী ঐরাবতের মাথা আনিয়া উহাতে সংযোগ করা হয় বলিয়া গণেশ গজমুণ্ড হইয়া যান। যাহা হউক সর্ব্বদা পূর্ব্ব শিয়রে শয়ন করিবে। দক্ষিণে যমের অধিকার, এদিকেও মস্তক রাখিবেনা। স্বাস্থ্যতত্ত্বের এই নিয়ম প্রতি-পালন জন্য ধর্ম্মমূলক এতগুলি উপদেশ আছে। কৌশলী হিন্দুস্বাস্থ্যবিদ্গণ ধর্ম্মের সহিত শরীর রক্ষার নিয়মগুলি পালন করাইবার জন্য পৌরাণিক গ্রন্থনিচয়ে এই সকল উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

৪। নিদ্রিতাবস্থায় বাহিরের শীতল বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিবে না। করিলে সাধারণতঃ সর্দ্দি, হাঁচি, কাশী এবং বাতব্যাধি জন্মিতে পারে। কারণ শ্বাস গতিই জীবনযন্ত্রের মূলকেন্দ্র।

৫। নিদ্রা যাইবার সময় বালিশ বা হস্তাদির চাপ যেন বুকে না লাগে—এরূপ ভাবে সতর্ক হইয়া শয়ন করিবে। ফলকথা এই যে, ফুসফুসের কার্য্য যেন নিয়মিত-ভাবে চলিতে পারে। আবার নাসিকা আবৃত করিয়া শয়ন করিতে নাই। যাহাতে নিদ্রিতাবস্থায় পরিষ্কৃত বায়ু নাসিকা-সাহায্যে গ্রহণ করা যায়—তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পরের পরিত্যক্ত প্রশ্বাস যেন নাসিকা পথে কদাচ না যায়।

৬। প্রত্যহ নিদ্রা, শয়ন, আহার ও স্নানের নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির রাখা সুসঙ্গত। রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটায় নিদ্রা যাওয়া উচিত।

৭। রাত্রিতে শয়ন করিবার কিছু পূর্ব্বে দুগ্ধ পান করা পরম উপকারী এবং স্বাস্থ্যকর। দুগ্ধের অভাবে শীতল জল পান করাও চলিতে পারে। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের সমস্ত যন্ত্রের বিশেষতঃ স্নায়ু কেন্দ্রের কার্য্য সামান্য ভাবে পরিচালিত হয়। এই জন্য উহার বলবৃদ্ধিকল্পে দুগ্ধ—অভাবে জলপান করিবার বিধি। পাকস্থলী খাদ্যে পূর্ণ

থাকিলে অন্ততঃ অর্দ্ধ ছটাক দুগ্ধ খাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়।

৮। শয়ন জন্য মৃত্তিকায় শয্যা পাতিয়া শয়নই প্রশস্ত, তবে দেশকাল-পাত্রভেদে অবস্থা ভিন্নরূপ হয়। খাট্-পালঙ্গ-খাটিয়া প্রভৃতিতে শয়ন করিলে কোন ক্ষতি নাই। তবে শয়ন করিয়া যাহাতে ভূমিতল স্পর্শ করা যায়—এরূপ ভাবে উহা নির্ম্মিত হওয়া উচিত।

৯। রাত্রিতে আহারান্তে আচমন করিয়া মুখ জলপূর্ণ করতঃ প্রস্রাব অন্তে ধর্ম্ম-মূলক সদগ্রন্থ অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পড়িয়া বা বন্ধুসহ মিষ্ট আলাপ করিয়া আবার প্রস্রাব হইলে শয়ন করিবে। আহারান্তে নিয়মিত জলপান করিলে প্রস্রাব পরিষ্কৃত হয়। ইহাতে সুনিদ্রা এবং পরিপাক শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

১০। শয়নকালে দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করিতে হয়। তবে ঋতুভেদে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে হানি নাই। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত ও বসন্তে শরীরের উত্তাপ সহজে বাহির হইতে পারে। এজন্য সূক্ষ্ম চাদর ব্যবহার করিতে হয়। অত্যধিক গরমে মশারী ব্যবহার করিলে চলিতে পারে। শীত ঋতুতে লেপ-কম্বলই যথেষ্ট। শয়নকালে অঙ্গে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিতে শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহার অর্থ সুগন্ধি চন্দনাদি দ্বারা মনের প্রফুল্লতা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দু-বৈজ্ঞানিকেরা চন্দনাদির এই ভাবে ব্যবহার কেবল মাত্র শীত এবং বসন্ত ঋতুতেই করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে অক্ষম। যাহা হউক দুর্গন্ধময় স্থানে নিদ্রা যাইবে না ইহা আমরা আর্য্যঋষির কথায় স্থির করিয়া লইলাম। শয়ন গৃহে, বিড়াল, কুক্কুর, ভেক—চামচিকা, গো, অশ্ব, কপোত ইত্যাদি তির্য্যক প্রাণী (পক্ষী জাতি) মুক্ত বা আবদ্ধ অবস্থায় কখনো রাখিবে না। যেহেতু ইহাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা আছে। আবার উহাদের জন্য অন্যরূপ হিংস্র জীব গৃহে উপস্থিত হইতে পারে।

ইউরোপীয় জাতি কুক্কুর লইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। এ অবস্থা আর্য্য ঋষির উপদেশ বহির্ভূত। আর্য্য ঋষি এইরূপ নিকৃষ্ট জীব গৃহে থাকায় সর্পাদি জীবের দ্বারা মানুষের অনিষ্ট হইতে পারে। বিবেচনা করিয়াই এরূপ কার্য্য করিতে নাই বলিয়া গিয়াছেন। এরূপ নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিয়া এক সময় আমারই এক ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। আমার শয়ন গৃহের জানালার পার্শ্বে একটী হংস ডিম 'তা' দিতেছিল। সহসা সর্প আসিয়া আমার নিকটস্থ দুইটি শিশুর শয্যায় উপস্থিত হইল। অতি কষ্টে কার্ব্বলিক এসিড সাহায্যে সর্প তাড়াইয়া বিপদ মুক্ত হই। নিকৃষ্ট জীব শয়ন গৃহে থাকিলে কুষ্ঠ-যক্ষ্মাদি পীড়াক্রান্ত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১১। রন্ধন গৃহে শয়ন করিতে নাই। কেননা তথায় কার্ব্বনের অংশ অধিক থাকিতে পারে। কার্ব্বনিক বায়ু নর শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। নাসিকাগ্র হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত তিন হস্ত পরিমিত স্থান শয্যার চারিদিকে মুক্ত রাখা উচিত। মোটের

উপর কথা এই যে; শয়ন গৃহে অধিক দ্রব্যাদি রাখিতে নাই, কেননা নিদ্রাকালে প্রশ্বাসের গতি ১২ অঙ্গুলি স্থান বিস্তৃত হয়। বাক্স, ডেকস্, তোরঙ্গ এবং তৈজসাদি বেশী করিয়া রাখিলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ হইতে পারে। ইহাতে দেহে তাপাধিক্য হইলে প্রাণবাহী শুক্র তরল হইয়া জ্ঞাতাজ্ঞাত ভাবে নির্গত হইয়া যায়।

১২। অধিক রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় কেহ ডাকিলে সহসা উত্তর দেওয়া উচিত নহে। ভালরূপ জানিয়া শুনিয়া তবে গৃহ হইতে বাহির হইতে হয়।

১৩। সুস্থ শরীরে দ্বাদশ দণ্ডের অধিক নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। সাড়ে সাত দণ্ডে ১ প্রহর হয়। সুতরাং ১২ দণ্ডে প্রায় দুই প্রহর। ১২ ঘণ্টা নিদ্রার পক্ষে যথেষ্ট সময়। রাত্রি ১০টায় নিদ্রা গিয়া অতি প্রত্যূষে উঠিলে নিদ্রার সময় এবং বিশ্রাম যথেষ্ট হয়। ইহার অধিক সময় নিদ্রা যাওয়া আর সূর্য্য উদয় পর্য্যন্ত শয্যায় থাকা দেহ নষ্টের মূল।

১৪। রাত্রি-জাগরণ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। যে কোন কারণেই হউক আদৌ রাত্রি জাগরণ করিবে না। জীব নিদ্রিতাবস্থায় জীবনীশক্তি—মহাশক্তি হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই মহা কার্য্যের বিঘ্ন হইলে অল্পায়ু হইতে হয়। বিলাসিতা আর থিয়েটার বা যাত্রা শুনিয়া যাহারা রাত্রি জাগরণ করে, তাহারা অধিকাংশই রুগ্ন ও অল্পায়ু। বিশেষতঃ কোন কারণে যদি রাত্রি জাগরণ করিতে হয়, তবে প্রাতে উঠিয়াই স্নান করা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৫। শয়ন গৃহে প্রত্যহ প্রাতে আর সন্ধ্যায় ধুপ ধুনা দেওয়া উচিত। ধুনায় প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) প্রবাহিত হয়। হিন্দু দার্শনিকগণ ধুনা আর গোময়কে ফেনাইল প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। যেস্থানে কার্ব্বনিক গ্যাস উৎপত্তির কথা, সেই স্থানেই গোময় ও ধুনার ধুম দিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। গোময় আর পূজার ধুনা এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১৬। চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু এই সময় সমীরণ "নামে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ুই জীবের নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং জীবকে আরোগ্য পথে উপস্থিত করে। আবার এই বায়ুর গতিই চিত্তের স্থৈর্য্য রক্ষাকারী। এইজন্য ঋষিগণ এবং গুণ-কর্ম্মশালী প্রকৃত ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে ভগবদারাধনা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সময়েকে "ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত" কহে। ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তর বায়ু সেবন উদ্দেশ্যে মুক্ত স্থানে, উদ্যানে, নদীতীরে, রাজপথে ভ্রমণ করিয়া—পবিত্র আসনে বসিয়া অভ্যাস এবং প্রবৃত্তিমূলক ইষ্টনাম স্মরণ ও পূজন করিবে। পরে পুষ্টি-কারক অল্প খাদ্য খাইয়া তবে সংসার কার্য্যে মন দিবে।

১৭। নিদ্রা হইতে উঠিয়া সহসা অনাবৃত দেহে বাহিরের বায়ু শরীরে লাগাইবে না। খালিপায়ে পায়খানায় যাইবে। এই সময় কিন্তু গাত্র বস্ত্রাচ্ছাদিত করা উচিত। কারণ বিষ্ঠাদির দূষিত বায়ু শরীরে লাগিলে ব্যাধি হইবার আশঙ্কা

আছে। নিদ্রাকালে শরীর উষ্ণ হয়। এই উষ্ণাবস্থায় শীতল বায়ু সহসা শরীরে লাগিলে শ্লেষ্মাব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। তাহা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাধিও হইতে পারে।

১৮। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই কথা বলিবে না, শৌচ কার্য্য করিয়া তবে কথা বলিবে। বহুভাষী ব্যক্তি বহু রোগের আধার। স্বাস্থ্যকামী মাত্রেরই ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

১৯। দিবানিদ্রা আয়ুক্ষয়কর। কেবল গ্রহণী, অজীর্ণ এবং বায়ু পীড়িত লোকের পক্ষে ইহা নিষিদ্ধ নহে। আর্য্যশাস্ত্রে উপবীত হইবার সময় একটী বৈদিকসূক্ত পড়িতে হয়। উহার একস্থলে আছে, "মাদিবা সাপ্সি"। এই মন্ত্রের উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করা সকলের উচিত।

২০। শয়ন গৃহে আলো জ্বালিয়া নিদ্রা যাইবেনা। কারণ অগ্নি হইতে যে অঙ্গারক বায়ু (কার্ব্বনিক গ্যাস) উৎপন্ন হয়, উহাতে গৃহস্থিত প্রাণ বায়ু (অকসিজন বা অম্লজান) জ্বলিয়া সমস্ত গৃহকে এবং শায়িত ব্যক্তিকে বিপন্ন করে।

২১। রাত্রিতে মশারী ব্যবহার করায় দোষ, গুণ—দুই-ই আছে। যে স্থানে মশকাদি জীবের অধিক অত্যাচার, তথায় বাধ্য হইয়া মশারি ব্যবহার করিবে। আবার অল্প মশা আছে—অথচ সেই প্রদেশ ম্যালেরিয়া-প্রবণ—তথায় মশারীই একমাত্র শরীর রক্ষার উপায়। কিন্তু যে স্থানে মশা নাই, ম্যালেরিয়াও নাই—তথায় মশারী ব্যবস্থা ঠিক নহে। এই সমস্ত স্থানে মাত্র বর্ষা ঋতুতে মশারী ব্যবহার করিলে হানি নাই। অনেক সুস্থ ব্যক্তি আছেন—যাঁহারা জীবনেও মশারী ব্যবহার করেন নাই। মোটের উপর মশারী ব্যবহার অনুচিত নহে।

অতঃপর প্রাত্যহিক বিহার এবং আহার আদি বিষয়ে লিখিত হইতেছে।

প্রাতরুত্থান ও শৌচ ক্রিয়া।

পূর্ব্ব গগনে সূর্য্যালোক প্রকাশিত হইবা-মাত্র শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। আর্য্য শাস্ত্রে এই সময়কে "ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত বলে। এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সাধারণ বায়ু যে পাঁচভাগে বিভক্ত,তাহার প্রধান ভাগের নাম "সমীরণ", ইহা এই সময় প্রবাহিত হয়। এই বায়ুর অপর নাম প্রাণবায়ু। জীবের জীবনী শক্তি রক্ষা করিতে আর স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এই বায়ুই সর্ব্ব প্রধান। রাত্রির নিদ্রা জনিত ক্লান্তি এই বায়ুদ্বারা নষ্ট হয়। এইজন্য ঋষিগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা-ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্যগণ এই সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি পালন করিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন।

১। কখনো মল মূত্রের বেগ ধারণ করিবে না—কেননা উহাতে উদরাগ্নি কুপিত হইয়া দেহের সমস্ত শ্লেষ্মাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বক্ষ গহ্বরে প্রবেশ করে, উহাতে পেট এত গরম হয় যে শুক্রকে তরল করিয়া যক্ষ্ম পীড়া পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারে। আবার আবদ্ধ মলরাশি "এলিমেণ্টরী কেনাল" নামক উদরের স্থান বিশেষে গমন করিয়া একরূপ উৎকট পীড়া জন্মাইয়া থাকে। কখনো বা অন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করতঃ

মুখ দ্বারা বাহির হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে শরীরে অশান্তি এবং ক্ষুধাহীনতা, মাথাধরা, মূত্ররোধ, জ্বর, বমি প্রভৃতি হইয়া থাকে। একটী কেরাণী সাহেবকে ক্যাস বুঝাইতে বসিয়া দুইবার প্রস্রাবের বেগ সামলাইয়া "লেজার-বুক" দেখানার সময় শরীর উষ্ণ হইয়া সহসা টেবিলের উপর পড়িয়া যান। তাহার পর ডাক্তার মুকিন গিয়া কারণ অনুসন্ধানে ক্যাথিটার যোগে ৩ পাউণ্ড প্রস্রাব বাহির করেন—কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক পরে কেরাণীর ইহ লীলা সমাপ্ত হয়।

২। অনাবৃত দেহে কখনো মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। দেহ আবৃত না থাকিলে মলমূত্র ত্যাগের স্থান হইতে দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয়। উহা গাত্রে লাগিলে চর্ম্ম-পীড়া—এমন কি কুষ্ঠ রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। ঐ সময় দেহে শীতল বাতাস লাগিলে মল-মূত্র সুন্দর রূপে হয় না। এই সময় দন্তে দন্তে সজোরে চাপিয়া কার্য্য করিলে দন্ত পীড়া জন্মিতে পারে না। তৈল মাখিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিও না। কেন যে এই বিধি তাহার কোন বিশেষ হেতু আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। মাত্র চিন্তা শক্তিদ্বারা ইহাই জানিয়াছি যে, সজোরে মলবেগ ও প্রস্রাব বেগ দিবার সময় শরীরের অপান বায়ুর যে নিক্রমণ হয়, উহা তৈল দ্বারা আবদ্ধ লোম কূপের মুখ্য দিয়া সহজে আসিতে বাধা পায়। দেখিয়াছি বহু প্রাচীন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ স্নান সময়ে তৈল মাখিয়াই পায়খানায় গিয়া থাকেন। ইঁহাদের কখনো চর্ম্মপীড়া বা চুলকানি পর্য্যন্ত হয় নাই। তাঁহারা বলেন তৈল মাখিয়া পায়খানায় গেলে বরং ব্যান-বায়ুর ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যাহা হউক আমাদের মতে শাস্ত্রউপদেশ মান্য করিয়া চলাই সুসঙ্গত।

৩। শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া—স্বাস্থ্য-তত্ত্বের অনেক কথাই ঋষিপ্রণীত স্বাস্থ্য-তত্ত্বে আছে। নাসিকার নিঃশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ লইয়া শরীর রক্ষার অনেক কথা শাস্ত্রে লিখিত। আমরা যোগী নহি বা প্রাণায়াম পরায়ণ নহি। এই তত্ত্বের সূক্ষ্ম ক্রিয়া বুঝিতে অক্ষম। তথাপি শরীর রক্ষা ব্যপদেশে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া দুই চারিটি কথার যাহা আলোচনা করিলাম ইহা অতি সাধারণ। ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি মর্ম্ম বুঝিয়া লইবেন। দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস প্রবাহকালে মলত্যাগ আর বাম নাসিকার প্রবাহকালে মূত্র ত্যাগ করিবে।

৪। মলভাণ্ড পরিষ্কার রাখা পরমায়ু বৃদ্ধির একটি প্রধান ক্রিয়া - এইজন্য যোগিগণ প্রাণায়াম ক্রিয়া দ্বারা—আর বৈদ্যগণ ভেষজ ক্রিয়া দ্বারা উদর পরিষ্কার অর্থাৎ কোষ্টশুদ্ধি করিতেন। মল মূত্র, নিষ্টিবন বা থুথু, শুক্র, রজঃ, ঘর্ম্ম, কফ, পিত্ত এই আটটীর নাম মল। ইহা জীবশরীর হইতে সর্ব্বদা পরিত্যক্ত হয়। ইহার একটীর বিকৃতি ঘটিলে দেহ রোগ-প্রবণ হইয়া থাকে। ভুক্ত অন্নাদির পরিপাকাবশিষ্ট বস্তুই মল বা বিষ্ঠা—পানীয় বস্তুর পরিপাকাবশিষ্ট জলীয়াংশের নাম মূত্র। খাদ্য পরিপাকের পাঁচ প্রকারে রসের মূল রসটির নাম নিষ্টিবন বা থুথু। মেদধাতুর অসার অংশের নাম ঘর্ম্ম। শুক্রের অসার অংশ কফ আর রক্ত, রস, মেদ, মজ্জা হইতে

উৎপন্ন অষ্ট ধাতুময় পরিশুদ্ধ প্রধান রসের নাম শুক্র। রক্তের অসার অংশ পিত্ত। আট প্রকার ধাতুময় শোণিত জাত অংশের নাম আর্ত্তব বা রজঃ। এই আট প্রকার মলকে প্রাণ, অপান (অক্সিজেন, হাই ড্রোজেন বা অম্লজান উদজান) স্বশক্তিতে দেহরক্ষাকারী অংশ রাখিয়া অতিরিক্ত ভাগকে স্রাবন গ্রন্থিদ্বারা শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই সকল মনের চালক, পালক, ধ্বংস ও প্রস্তুতকারক মহাবস্তুই প্রাণবায়ু বা অক্সিজেন। সুতরাং প্রাণবায়ুর সাম্যভাব রক্ষা করাই স্বাস্থ্যরক্ষা নামে অভিহিত। সুতরাং মলমূত্রের বেগ ধারণ আর অন্যবিধ অনিয়ম করাই স্বাস্থ্য-হীনতার প্রধান কারণ।

৫। মলত্যাগকালে মাটি খুঁড়িয়া তাহার পর মাটি চাপা দেওয়া অভিজ্ঞ জীবহিতকারী ব্যক্তির পক্ষে অতি সুনিয়ম। ভগবান এই নিয়মটিকে জীব্ বিশেষ দ্বারা মানুষকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। মলের উপর জলধৌত না করিয়া ধুলা বা ভস্মাচ্ছাদিত রাখা সঙ্গত। কেননা মলমূত্র ত্যাগে যে দূষিত গ্যাস উৎপন্ন হয়, উহাতে সাধারণ ভূ-বায়ু দূষিত হইয়া নিজের ও পরের অনিষ্ট করিতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী সর্ব্বজীবে দয়াশীল ঋষিগণ এইজন্যই এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অধিক কি, তিনবার হাতে তালি দিয়া গ্রীবা হেলাইয়া আকাশ দৃষ্টিতে মল-ত্যাগ করিতেও ঋষি পরামর্শ দিয়াছেন। ইহাতে শব্দ হইতে হিংস্র জীবের আশঙ্কা এবং বায়ুর গতি প্রবর্ত্তনের সুবিধা হয়।

৬। মলত্যাগের বেগ হউক, আর না হউক প্রত্যহ দুইবেলা পায়খানায় গিয়া অন্ততঃ জলদ্বারা মলদ্বার ধৌত করা আবশ্যক। প্রবাদ আছে যে, "হয় না হয় দুইবার যায়, তার কড়ি না বৈদ্যে পায়।" দুইবার দাস্ত হউক আর না হউক সামান্য বায়ু নিঃসরণ হইলেও উপকার আছে। এই স্থানে তন্ত্র শাস্ত্রের একটী আদেশ প্রতিপালন করিলে অর্শ, ভগন্দর, গুহ্য কণ্ডূয়ন প্রভৃতি নিবারিত হয়। তন্ত্রকার ঋষি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে অন্ততঃ বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলী তৈলসিক্ত করিয়া ২।৩ বার মলদ্বার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া জলাশয়ে ধৌত করে, তাহার জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত থাকে এবং সে উপ-রোক্ত ব্যাধিগুলিতে আক্রান্ত হইতে পারে না, এই ব্যবস্থা দ্বারা কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে তাহা নিরাময় হয়। আবার এই সময় থুথু ফেলিবে না—কেননা থুথুই গুপ্ত শুক্রের রূপান্তর বস্তু।

মলত্যাগ হইলে "হাতে মাটি" দেওয়া স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে উৎকৃষ্ট নিয়ম। অন্ততঃ তিনবার মৃত্তিকা দ্বারা বাম হস্ত ধৌত করিবে। এই কার্য্যটি দ্বারা দুইটি মহাকার্য্য সম্পন্ন হয়। দুর্গন্ধ দূরীকরণ আর হস্ত তলের লোমকূপ দ্বারা দূষিত বস্তুর—প্রবেশ নিবারণ। বহুল নব্য ব্যক্তি জলদ্বারা হাত ধুইয়া চলিয়া আসেন, —মাটি ব্যবহার অতি নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। যাঁহাদের অনুকরণে এইরূপ কার্য্য শিক্ষা, তাঁহারা সাবান ব্যবহার না করিয়া "কমট্" বা পায়খানা পরিত্যাগ করেন না। হিন্দুর নিকট প্রস্রাব অন্তে জল না লওয়া আর হাতে মাটি না করা —অতীব ঘৃণাজনক, আবার তাই বলিয়া বহু "শুচিবাই"

গ্রস্থ ব্যক্তির স্থায় কেবলই বাহু পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন আর ধৌত করণ গোঁড়ামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। মোটের উপর কথা এই যে, হস্তে মাটি দেওয়া, প্রস্রাব করিয়া জল গ্রহণ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের নিয়ম।

৮। শীতল জলের অভাবে বা সময় গুণে উষ্ণ জলে মুখ ধুইবার নিয়ম আছে। এই সময় দন্ত পরিষ্কার আর জিহ্বা আচড়ান অতি উৎকৃষ্ট। যাহাদের দন্ত অপরিষ্কার এবং জিহ্বা ক্লেদপূর্ণ—অজীর্ণ ব্যাধি তাহাদের চিরসঙ্গিনী। দন্ত পরিষ্কার করিতে পূর্ব্বাপর ভারতবর্ষে এঁঠেল মাটি, অঙ্গার চূর্ণ আর খড়িমাটি চলিয়া আসিতেছে। দাঁতন করিবার জন্য আঁইসসেওড়া, নিম, ভেরেণ্ডা, বকুল, আম, অশ্বত্থ, যজ্ঞডম্বুর, বেল প্রভৃতির শাখা ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ কসযুক্ত তিক্ত অথবা পবিত্র বৃক্ষ শাখাই এরূপ কার্য্যে প্রশস্ত। খুলনা-যশোহর প্রভৃতি জেলায় দাঁত মাজিবার জন্য একরূপ নাতিহ্রস্ব নাতি দীর্ঘ বনজ উদ্ভিদ আছে। উহার নামই "দাঁতনগাছ"। উহাকে আবার আঁসবেলও কহে। ইহার পাতা ছোট আকারের এবং ইহা ক্ষুদ্র ফলযুক্ত হয়। যাহা হউক প্রত্যহ দন্ত পরিষ্কার আর জিব আঁচড়ান স্বাস্থ্য-তত্ত্বের একান্ত পালনীয় বিধি। কিন্তু তাই বলিয়া শক্ত জিনিস চিবান বা অতি জোরে দাঁতন করিবেনা। যেহেতু দন্ত শিরা অতি কোমল এবং ক্ষুদ্র। উহা হইতে রক্তপাত হইলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। একরূপ দন্ত শিশু দিগের আছে উহাকে "পানছে দাঁত" কহে। এইরূপ দন্ত হইতে সহজে রক্তপাত হয়। নিয়মিত দাঁত না মাজিলে দন্ত হইতে পাথুরি নামক দন্তাংশ পতিত হয়। উহাতে জিহ্বার অসুখ, স্নায়ুশূল এবং আরও নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হয়। আহারান্তে "খ'ড়কে খাওয়া" আর দাঁতন করার একাই উদ্দেশ্য। খাদ্যাংশ দন্ত ফাঁকে থাকিয়া দুগ্ধ ক্ষত প্রভৃতি পীড়া হইয়া থাকে। আবার তাই বলিয়া সর্ব্বদা বা অনাবশ্যক স্থানে দন্তে আঘাত করিতে নাই। যে সময়ই মুখ ধুইবে, সমগ্র মুখ অর্থাৎ নাসিকা, চক্ষু, কপাল, থুঁতু এবং কর্ণের পার্শ্ব সহ কর্ণ ধুইয়া ফেলিবে।

দিবসের দুই সন্ধি সময় অর্থাৎ প্রাতে ও সায়াহ্নে মাথা গরম বোধ হইলে অথবা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (অজীর্ণ) বোধ হইলে গ্রীবাদেশ, কর্ণদ্বয়ের চতুর্দ্দিক, মুখ মণ্ডল, ধৌত করিবে। নাসারন্ধ্র, কর্ণবিধর, চক্ষুদ্বয়, মেরুদণ্ড অঙ্গুলী দ্বারা অল্প ভাবে ধৌত করিবে। মুসলমান সমাজে ইহাকে "অজু" কহে। হিন্দুগণ ইহার সংক্ষেপ বিধিকে "মার্জ্জন ও আচমন কহেন। ইসলাম ধর্ম্মগুরু মহামতি হজরত মহম্মদ এইরূপ ক্রিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে দিনে রাত্রে পাঁচবার করিতে বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা শরীরের শীতলতা হইয়া শারীরিক শক্তির উন্নতি হয়, সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে এই নিয়ম অতি উৎকৃষ্ট।

শৌচ শুদ্ধি বলিয়া হিন্দু সমাজে যতগুলি বিধি ব্যবস্থা আছে, সমস্তই শরীর রক্ষা কার্য্যের প্রধান সহায়। বস্তুতঃ হিন্দু জানেন "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং"।

জঠরানল।

(ডাঃ শ্রীশরৎ কুমার দত্ত এল, এম, এস)

"ভৃগু কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমি অগ্রে অগ্নির বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলবান অনিল প্রাণীগণের দেহে যেরূপে বিচরণ করিতেছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্নি প্রাণীগণের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক শরীর রক্ষা এবং প্রাণবায়ু সেই মস্তকস্থিত অগ্নি সমভিব্যাহারে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। প্রাণ—ভূতগণের আত্মা, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয় স্বরূপ। প্রাণ দেহমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিকে সর্ব্বত্র পরিচালিত করিতেছে এবং সমান বায়ু উহাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। অপানবায়ু, বস্তিমূল ও গুহ্যদেশে বহ্নিকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও পুরীষকে বহন করিতেছে। যাহা একমাত্র হইয়া লোকে প্রযত্ন কর্ম্ম ও বল এই তিন বিষয়ে অবস্থিত আছে—অধ্যাত্মবিদ্ পণ্ডিতেরা তাহাকে উদান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ব্যানবায়ু মনুষ্যের শরীর-সন্ধিতে অবস্থিত রহিয়াছে। অগ্নি শরীরমধ্যে বিস্তীর্ণ ও সমানবায়ু দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া লোকের রস, ত্বগাদি ও পিত্তাদি দোষ পরিপাক এবং নাভির অধোভাগে অবস্থিত অপান ও উর্দ্ধগত প্রাণের মধ্যস্থলে নাভিমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া উহাদের সাহায্যে অন্নাদি পরিপাক করিতেছে। আস্য দেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত একটী স্রোত আছে, ঐ স্রোতের অন্তর্ভাগেই গুহ্য। সেই স্রোতের চতুর্দ্দিক হইতে দেহমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। জঠরানল শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর সাহায্যে ঐ সমুদায় শিরার দ্বারা সমুদায় শরীরে বিস্তীর্ণ হইতেছে। ঐ অনলের নাম উষ্মা। উহাই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন পরিপাক করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু অগ্নিবেগ প্রভাবে গুহ্য দেশ পর্য্যন্ত গমন করে এবং তথা হইতে প্রতিহত হইয়া পুনরায় মস্তকে আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। নাভির অধোভাগে পক্বাশয়, উর্দ্ধভাগে আমাশয় আছে এবং জঠরানলে সমুদায় ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে। প্রাণিগণের ভুক্ত অন্নের রস প্রাণাদি পাচ ও নাগকূর্ম্মাদি পাচ—এই দশবিধ বায়ু প্রভাবে নাড়ী সমুদায় দ্বারা শরীর মধ্যে উর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যগ ভাবে পরিচালিত হয়। আস্যদেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগিগণের যোগ সাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ পথ দ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মণ! এইরূপে অগ্নি—প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুর সহযোগে শরীর মধ্যে প্রদীপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে।" মহাভারত শান্তি পর্ব্ব, মোক্ষধামপর্ব্ব, মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

"ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রিয়ে! আত্মা প্রথমতঃ বিপক্ক হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে মন—জঠরানলকে সংক্ষুব্ধিত করে। জঠরানল সংক্ষুব্ধিত হইলেই তাহার প্রভাবে প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে গমন করে। তৎপরে ঐ বায়ু

উদান বায়ুর প্রভাবে উর্দ্ধে নীত ও মস্তকে প্রতিহত এবং ব্যানপ্রভাবে কণ্ঠতাম্বাদি স্থানে অভিহিত হইয়া বেগ বশতঃ বর্ণোৎপাদন পূর্ব্বক বৈখরীরূপে লোকের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর যখন উহার বেগ এককালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহা পুনরায় সমানভাবে পরিণত হয়।" মহাভারত আশ্বমেধিকপর্ব্ব, অনুগীতাপর্ব্ব, মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

আমি "আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ" ও "বায়ু, পিত্ত ও কফ" নামক প্রবন্ধদ্বয়ে জঠরানল সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় বলিয়াছি, সম্প্রতি আরও কয়েকটী কথা আলোচনা করিবার উদ্দেশে মহাভারত হইতে ২।১ অংশ উদ্ধৃত করিলাম। উক্ত ২টী উদ্ধৃত অংশে আমাদের শরীরে অগ্নি ও বায়ু কি প্রকারে অবস্থান করিতেছে এবং বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে আমাদের শরীরে কি কি ক্রিয়া হয় তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নি (Animal Heat) মস্তকে (Heat centre) উৎপত্তি হইয়া প্রাণবায়ু দ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে। এই জঠরানল (যাহা নাভিমণ্ডলে অবস্থিত আছেন) তাহা Pituitary centre দ্বারা পরিচালিত হন এবং এই Pituitary Adreval centre দ্বারা adrenal হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়, তাহা দ্বারা নিশ্বাস হইতে রক্তে oxygen শোষণ করে এবং এই cantre রই শ্বাসপ্রশ্বাসের কারণ বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। আমাদের শরীরে যে কোন ব্যাধি আক্রমণ করুক না কেন, এই শক্তি সেই বিঘনাশ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে, কিন্তু এই শক্তি নিজে বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ বাতরক্ত (Gaut) বলিয়া উল্লেখ করেন। এই জঠরানলের বিকার ঘটিলে অনেক প্রকার চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয় এবং এই চর্ম্ম রোগের শেষ পরিণতি বাতরক্ত ব্যারামে। এই জন্যই সমস্ত চর্ম্মরোগকে আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠরোগের পর্য্যায়ে ন্যস্ত করিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে এই কুষ্ঠ অষ্টাদশ প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। Gout ব্যারামে এই সমস্ত প্রকার চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে।

এই সকল চর্ম্মরোগ আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সূর্য্য কিরণ দ্বারা (x rays) আরোগ্য হইতেছে। আর্য্যঋষিগণ ইহা বহুপূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যোপাসনা যে কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক—তাহা বহুস্থলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই চর্ম্মরোগ শরীরের দুর্ব্বলতা আনয়ন করে এবং সূর্য্যদেব যে দুর্ব্বলতা নাশের মূলীভূত কারণ ও অনন্ত শক্তির আধার - তাহা মহাভারতকার অনেক স্থলেই উল্লেখ করিয়াছেন।

এই প্রবন্ধে আমি বাতরক্ত রোগের লক্ষণ সমূহ দ্বারা মহাভারতোক্ত বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিব। বাতরক্ত ব্যারামে এই জঠরানল স্থানচ্যুত হয় এবং pituitary body র ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে। জঠরানল স্থানচ্যুত হইলে ইহার সহিত সমান বায়ুরও স্থানচ্যুতি ঘটে এবং শরীরের সর্ব্বাঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে জ্বালা অনুভূত হয়; কারণ সমান বায়ু অগ্নিকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া যাইতেছে। এই ব্যাধি উপযুক্ত সময়ে সুচিকিৎসিত হইলে প্রশমিত হয়। সমান বায়ু

স্থানচ্যুত হইলে প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ সমান বায়ু প্রাণ ও অপানের সমতা রক্ষা করিতেছে। প্রাণ ও অপানের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে এই ব্যারামে শ্বাস প্রশ্বাসের কৃচ্ছ্রতা অনুভব হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধ হয়। প্রাণবায়ুর বিকৃতি ঘটিলে উদান ও ব্যান বায়ুর ও বিকৃতি ঘটে, এই জন্য এই ব্যারামে বাক্যোচ্চারণ ও অধিক কথা বলিলে কষ্ট অনুভব ও শারীর সন্ধি সমূহে (ব্যানবায়ুর স্থানে) বেদনা অনুভূত হয়। সুচিকিৎসিত হইলে শরীরের দাহ ক্রমশঃ সর্ব্বশরীর হইতে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগের চর্ম্মে আসে; তৎপরে নাভিমণ্ডলের উপরিভাগের চর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ ঐ স্থানের নিম্নের মাংসপেশীর ভিতরে জ্বালা অনুভব হয় এবং জঠরানল স্বস্থানে প্রবেশ করিলে মনের এবং শ্বাসবায়ুর অত্যধিক উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে। জঠরানল স্থানচ্যুত হয় বলিয়া এই ব্যাধিতে ক্ষুধা একবারেই থাকে না। উদান বায়ুর বিকার ঘটে বলিয়া এই ব্যারামে রোগীর কর্ম্মে অনিচ্ছা হইয়া থাকে। শরীরে শক্তিহীনতা অনুভব হয়, কারণ উদান বায়ুতে প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই তিনটী অবস্থান করিতেছে। জঠরানলে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবস্থান করিতেছে বলিয়া এই ব্যারামে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিকার লক্ষিত হয়। ছয়টী ইন্দ্রিয়বিকার এই :— চর্ম্মে প্রদাহ হয়। চক্ষু হইতে জল পড়ে ও দৃষ্টিশক্তির হীনতা হয়, কর্ণ ও নাসিকার স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হয়, জিহ্বার অগ্রভাগ অসাড় ও চিনচিন করে। মনের চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। মুখ-বিবরের সমান্তরালে মেরুদণ্ড হইতে গুহ্যদেশ (মূলাধার) পর্য্যন্ত মেরুদণ্ডের সম্মুখভাগে sympathetic system রহিয়াছে, ইহাই যোগিগণের যোগ সাধনের পথ। এই বাতরক্ত ব্যাধিতে উক্ত sympathetic-এর বিকার ঘটে, তাহাতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর প্রভৃতি ষটচক্রের স্থান গুলিতে এবং ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (ইহাও একটী ষটচক্রের স্থান) পাঁচড়ার ন্যায় ক্ষুদ্র বিস্ফোটক জন্মে অথবা ঐ স্থান গুলিতে বেদনা অনুভূত হয় এবং এই sympathetic এর কেন্দ্র pituitary body র বিকার হয় বলিয়া নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত হইবার কালীন হস্ত পদাদির অঙ্গুলীর বক্রতা এবং ভ্রূযুগল, ওষ্ঠদ্বয় ও হস্তপদাদির স্নায়ু সমূহের চিনচিনানি অনুভূত হয় কারণ, pituitary body তে নিদ্রার কেন্দ্র অবস্থিত আছে। এই ব্যাধি উপশমের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়।

আশ্বমেধিক পর্ব্বের উদ্ধৃত অংশ হইতে বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে আমাদের শরীরে কি কি ক্রিয়া হয়—তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে বাক্য তেজোময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাক্য উচ্চারণ করিলে শরীরে শক্তির হীনতা লক্ষিত হয়। এই জন্য মহাভারতকার অনেক স্থলে মৌনীব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বাক্যোচ্চারণে শরীরে শক্তির হীনতা হয় বলিয়া, "আত্মা বিপক্ষ হইয়া মনকে বাক্যোচ্চারণের নিমিত্ত প্রেরণ করেন"—ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন। মন তৎপরে জঠরানলকে সন্ধুক্ষিত করে। বাক্যোচ্চা-

রণের পূর্ব্বে জঠরানল সঞ্চালিত হয় বলিয়া আহারের সময় কথা বলা হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন যে, যে সময়ে অগ্নি স্থির ভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন তাহাতে দাহ্য বস্তু নিক্ষেপ করিলে তাহা শীঘ্র এবং সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যায়। যদি অগ্নি বিচলিত হয়, তাহাতে দাহ্য পদার্থ দিলে তাহা শীঘ্র পুড়িয়া যায় না। প্রধানতঃ এই জন্যই বাক্যোচ্চারণ কালীন অগ্নি সঞ্চালিত হয় বলিয়া আহারের সময় বাক্যোচ্চারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আর একটী কথা এই যে, যত অধিক জোরে বাক্যোচ্চারণ করা যায়, জঠরাগ্নিও তত অধিক মাত্রায় সঞ্চালিত হয়। এই জন্যই উচ্চভাষণ আয়ুর্ব্বেদে অনেক ব্যারামের নিদানরূপে উক্ত হইয়াছে এবং অনুচ্চস্বরে কথা বলা অত্যন্ত হিতকর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

জঠরানল সঞ্চালিত হইলে তদ্দারা প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইয়া অপানে (মূলাধারে—In Front of last coccy geal vetebra ও লিঙ্গমূলের সমসূত্রপাত স্থানে) গমন করে। মূলাধার হইতে প্রতিহত হইয়া ঐ বেগ (vibration) পুনরায় নাভিমণ্ডলে আসে এবং নাভিমণ্ডল হইতে উদান বায়ু দ্বারা (Afferent sensation of vagus) মস্তকে নীত হয় এবং তাহা পুনরায় vagus এর Recurrent Laryngeal অংশ (ব্যান বায়ু) দ্বারা কণ্ঠ তাল্বাদি স্থানে অভিহিত হইয়া বেগবশতঃ বাক্যরূপে উচ্চারিত হয়। বাতরক্ত ব্যারামে জঠরানল স্থানচ্যুত হয় এবং উদান বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবায়ুর বিকৃতি ঘটে বলিয়া ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই বাতরক্ত ব্যারামে (Gout) উদান বায়ু বিকৃত হইয়া বাক্যোচ্চারণে বাধা প্রদান করে এবং তজ্জন্য রোগী বাক্যোচ্চারণ করিতে গেলে নাভিপ্রদেশ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উদান বায়ু বাক্যোচ্চারণে বাধা প্রদান করিতেছে বলিয়া অনুভব করিতে পারে। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে Splanclinic area হইতে vagus দিয়া একটী Afferent Sensation মস্তকে যায়— এই টুকু মাত্র অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বাক্যোচ্চারণের পূর্ব্বে যে বেগ উৎপত্তি হয় তাহা অপানে মূলাধার হইতে প্রতিহত হইয়া আসে বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রের অনেক স্থলে মূলাধার শক্তিই বাক্যোচ্চারণের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

আমি এক্ষণে বাতরক্ত ব্যারামের চিকিৎসার বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গন্ধক, Sulphar জঠরানলের ক্রিয়াকে প্রকৃতিস্থ করে, তজ্জন্য গন্ধকই এই ব্যাধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ, তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসকগণ এই ব্যারামে হরিতাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও Sulphar গন্ধক gout এর একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ এবং রোগিগণ যে সকল স্থানের জলে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক (Sulphar) থাকে তথায় কিছুকাল বাস করেন। গন্ধকও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পাশ্চাত্য জগতে বহু মনীষি জঠরানল (Splanclinic area) আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু

আর্য্যঋষিগণ এবিষয়ে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মনীষিগণ তাহার অতি অল্পমাত্রই অনুধাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে বিখ্যাত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এলোপ্যাথিক ঔষধ সমূহের ক্রিয়ার বিভিন্নতা দিন দিন যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা যে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন তদ্রূপ আশা করা দুরাশা মনে করিনা।

আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ বাতরক্ত ব্যারাম সুখী ও ভোগী ব্যক্তির হইয়া থাকে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রেও gout is a rich man's disease ঠিক এই কথায় প্রচলন দেখা যায়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল পাকবিধি।

(সমালোচনা)

—•:০:•—

(কবিরাজ শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কবিরঞ্জন)

জাতীয় উন্নতি অবনতির সহিত জাতীয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতি ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তাই মধ্যযুগের অবনতির ফলে আজ আমরা বহু আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি লাভে বঞ্চিত। বর্ত্তমানে যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আধুনিক গ্রন্থাদি দেখা যায়, তাহাতে বহুগ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ সে সমস্ত গ্রন্থের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যে সমস্ত ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, বটীকা, মোদকাদির উল্লেখ ছিল, তন্মধ্যে যে সকল যোগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া মহামতি চক্রপাণি দত্ত "চক্রদত্ত" নামে এক উপাদেয় সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রন্থই বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজকে ঘৃত-তৈলাদি ঔষধার্থ ব্যবহারে অন্ধের যষ্টির ন্যায় সাহায্য করিতেছে। শ্রীমিশ্রভাব বিরচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থখানিও বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসক সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। চক্রদত্ত ও ভাবপ্রকাশ উভয়ই বর্ত্তমানে দায়িত্বপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে বিরাজমান।

যাঁহারা চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, বাগ্‌ভট্টাচার্য্যের অষ্টাঙ্গ হৃদয় প্রভৃতি প্রাচীন মূল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে বহু ঘৃত-তৈল ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার উপদেশ থাকা সত্বেও ঘৃত-তৈলের মূর্চ্ছাবিধির কোথাও উল্লেখ নাই এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও অপরাপর লুপ্ত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত

চক্রদত্ত নামক সংগ্রহ গ্রন্থে প্রয়োজনানুসারে বিক্ষিপ্ত পরিভাষার সহিত বহু ঘৃত-তৈলাদির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদের মূর্চ্ছাবিধির কোথাও উল্লেখ নাই। এমন কি, চক্রদত্ত প্রণীত হওয়ার বহু পরে শিবদাস সেন উক্ত গ্রন্থের বিস্তৃত টীকা করিয়া যেখানে যেখানে পরিভাষার প্রয়োজন—সেই সেই স্থানেই উপযুক্ত পরিভাষার সমাবেশ করেন, কিন্তু শিবদাস সেনের টীকাতেও কোথাও ঘৃত তৈলের মূর্চ্ছার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লিখিত হয় নাই। ভাবপ্রকাশ একখানা আধুনিক গ্রন্থ। পাশ্চাত্য জাতি সমূহ এদেশে আসিতে আরম্ভ করিলে পর তাহাদের সংসর্গে ফিরঙ্গ (বর্ত্তমান সিফিলিজ) নামক সংক্রামক ব্যাধি প্রথমে আমাদের দেশে সংক্রমিত হয়। ফিরঙ্গ রোগ এদেশে সংক্রমণের কথা ও তাহার চিকিৎসা একমাত্র "ভাবপ্রকাশ" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং ভাবপ্রকাশ যে কোন্ সময়ের রচিত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। এই গ্রন্থেও বর্ত্তমানে ব্যবহৃত বহু ঘৃত তৈলাদির উল্লেখ আছে এবং পরিভাষা অধ্যায়ে তাহাদের পাকবিধির সরলভাবে উল্লেখ আছে, অথচ মূর্চ্ছা পাক সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। এতদ্দারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছা বিধি চরক-সুশ্রুতাদি ও বাগভট্টাচার্য্যের সময়ে তো ছিলই না, এমন কি ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত প্রণীত হওয়ার সময়ে এবং চক্রদত্তের টীকা করার সময়েও উহা প্রচলিত ছিল না। উপরোক্ত যুক্তিতে যদি কেহ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, এমন অনেক বিধি থাকিতে পারে—যাহা অতি প্রাচীন লুপ্ত গ্রন্থে ছিল এবং উহা আধুনিক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ভাব প্রকাশ, চক্রদত্ত প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিয়া যে পূর্ব্বে মূর্চ্ছা বিধি ছিল না তাহার প্রমাণ কি? প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই "ভাব প্রকাশে" পরিভাষার জন্য পৃথক ভাবে একটা অধ্যায় করিয়া ঘৃত-তৈলাদির পাক বিধি সরলভাবে লিখিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় মূর্চ্ছাবিধি রূপ একটা স্থূল বিষয় প্রচলিত থাকিলে তাহার পরিহার কি সম্ভব? আবার পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চক্রদত্ত বর্ত্তমানে ঘৃত তৈল ঔষধার্থ ব্যবহারের উপদেশ পূর্ণ একমাত্র উৎকৃষ্ট সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে চক্রপাণি দত্ত প্রয়োজন বোধে বহু পরিভাষার সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছাবিধি তাঁহার সময় প্রচলিত থাকিলে তাহা তিনি স্থান দিতেন না কি? গ্রন্থে এত পরিভাষার স্থান দিয়া এমন একটা গুরুতর বিষয় তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন - একথা কি বিশ্বাস যোগ্য এবং শিবদাস সেন মহাশয় চক্রদত্তের টীকা করিতে যাইয়া পুস্তকের প্রায় প্রতি পাতায় পাতায় বহু পারিভাষিক বিধির উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি, প্রয়োজন বোধে এক পরিভাষার পুনঃ পুনঃ উল্লেখেরও ত্রুটী করেন নাই। এমতাবস্থায় ঘৃত ও তৈল মূর্চ্ছাবিধি রূপ একটা প্রকাণ্ড বিষয়ে উল্লেখে তিনি অবহেলা করিয়াছেন একথা কে বিশ্বাস করিবে? আরও এক কথা, যাঁহারা চরক-সুশ্রুতাদি প্রাচীন গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারা যদি পরিভাষা প্রদীপোক্ত মূর্চ্ছাবিধির ভাষার দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য

করেন, তবে উক্ত প্রাচীন গ্রন্থাদির ভাষার সহিত উহার ভাষাগত বহু পার্থক্য লক্ষ্য করিবেন এবং ভাষাতেই যেন উহার আধুনিকত্ব ফুটিয়া রহিয়াছে বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করিবেন। সমালোচনার কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কার মূল শ্লোক তোলা হইল না। মূর্চ্ছা বিধির আধুনিকত্ব সম্বন্ধে এতগুলি অকাট্য যুক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি আমরা কল্পনা করিয়া লই যে, প্রাচীন কোন লুপ্ত গ্রন্থে ইহা ছিল, তবে বিচারে কি দাঁড়ায় দেখা যা'ক। মূর্চ্ছা বিধি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উক্ত থাকিলে ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত অথবা চক্রদত্তের টীকায় উল্লেখ না থাকার কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? শ্রীমিশ্রভাব, চক্রপাণি দত্ত এবং শিব দাস সেন মূর্চ্ছাবিধিকে অযৌক্তিক ভিত্তিহীন এবং সমর্থনের অযোগ্য মনে করায় উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন আপন গ্রন্থে স্থান দেন নাই,—ইহাই কি একমাত্র অনুল্লেখের কারণ বলিয়া এক্ষেত্রে নির্দ্দেশ করা যায় না? যাহা মিশ্রভাব, চক্রপাণি প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণ সমর্থন করেন নাই, তাহার সমর্থন ও প্রচারের আমাদের কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? যাহা হউক মূর্চ্ছাবিধির প্রাচীনত্বের কল্পনা নিতান্ত কষ্টকল্পনা মাত্র।

এই সমস্ত কারণ হইতে ঘৃত তৈলের মূর্চ্ছাবিধি যে আধুনিক ও মধ্যযুগে কোন বৈদ্য কর্ত্তৃক আয়ুর্ব্বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে বিচার্য্য, আমাদের বর্ত্তমানে ব্যবহৃত আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদি চক্রদত্তে উক্ত আছে। কাজেই প্রাচীন এবং মূর্চ্ছা বিধি আধুনিক, এমন অবস্থায় মূর্চ্ছা বিধির অনুসরণ যুক্তিযুক্ত কি না? অনেকেই হয়তো বলিতে পারেন মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক হইলেও বৃদ্ধ বৈদ্যব্যবহারসম্মত বলিয়া চিকিৎসক সমাজে আদৃত হইতেছে এবং পরিভাষা প্রদীপেও সাদরে স্থান পাইয়াছে। সে ক্ষেত্রে বক্তব্য, বৃদ্ধবৈদ্য-ব্যবহারসম্মত বলিয়াই যে বিনা বিচারে যে কোন বিষয় অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে—তাহার অর্থ কি? "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম", কেহই বলিতে পারেন না যে আমি অভ্রান্ত, যদি মূর্চ্ছাবিধি সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত না হয়, তবে কেবল বৃদ্ধ বৈদ্য ব্যবহারের দোহাই দিয়া "দাদা বলেছেন ভানুতে ধান, ভানতে আছি ওরা ধান"—এই মতের সমর্থন করা কতদূর সঙ্গত তাহা বিবেচ্য। প্রথমে দেখা যাক্ কি কারণ প্রদর্শন করিয়া ঘৃত ও তৈলের মূর্চ্ছার প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। ঘৃত সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "তস্মাদামোপ দোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি"। অর্থাৎ ইহাতে ঘৃতের আমদোষ নষ্ট হয় এবং উহা বীর্য্যশালী ও সুখদায়ক হয়। সর্ষপ তৈল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "কটু তৈলং পচেৎ তেন আমদোষ হরং পরম্"। এখানে কেবল আমদোষ নাশের জন্ম মূর্চ্ছার উল্লেখ দেখা যায়। এড়ণ্ড তৈল সম্বন্ধে কিছু উক্ত না থাকিলেও উহার সম্বন্ধে আমদোষ নাশ ও উত্তম গন্ধ বর্ণের জন্ম মূর্চ্ছা পাক বুঝিতে হইবে। আর তিল তৈল সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, "দুর্গন্ধং বিনিহন্তি তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ব্বতে" অর্থাৎ মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়।

প্রথমে দেখা যাক, আমদোষটা কি।

ঘৃত সম্বন্ধে আমদোষ কল্পনা একটা কথার কথা বলিয়া মনে হয়। বিশুদ্ধ গব্যঘৃত অনেকে কাঁচাই গরম ভাতের সঙ্গে খান, অথবা ডাল, তরকারী, মাংস, পোলাও প্রভৃতিতে প্রক্ষেপ রূপে দিয়া খাইয়া থাকেন। মিঠাইওয়ালাদের বহু মিঠাই ঘৃতে পক্ক হয় এবং তাহা অতি উপাদেয় জলখাবার বলিয়া সাধারণ্যে বাহুল্য রূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ সকল ঘৃত কিন্তু মূর্চ্ছাপক্ক নহে। উহার এবম্বিধ ব্যবহারে আমদোষ প্রযুক্ত কোনরূপ অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা করেন কি? পারদের অষ্টমহাদোষ ও সপ্তকঞ্চুকাদি অথবা তাম্রের ভ্রান্তি বাণ্ডাদি দোষের ন্যায় ঘৃতে কোনরূপ অনিষ্টকারী বা মারাত্মক দোষ আছে কি, যে দোষ দূর করিতে হরিদ্রা লেবুর রস, ত্রিফলা প্রভৃতির সহিত ঘৃত সংস্কৃত হওয়ায় দরকার? আম শব্দের অর্থ অপক্ক, ঘৃত অগ্নিজ্বালে নিক্ষেন হইলে অথবা ক্বাথ ও কল্কাদির সহিত পক্ক হইলে ঘৃতের অপক্কত্ব কোথায় যাইবে? অগ্নিজ্বালে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে উক্ত জলীয় অংশ বাষ্পাকারে চলিয়া যায় এবং তৈলের আমত্ব দূর হয়। এড়ণ্ড তৈল অত্যন্ত বিরেচক ও খাদ্যরূপে ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া উহা রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু সর্ষপ তৈল বা তিল তৈল রন্ধনাদি কার্য্যে প্রত্যহ প্রতি গৃহে বিনা অনিষ্টপাতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রন্ধনাদি কার্য্যে নিপুণ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে কটাহে তৈল দিয়া উহা নিক্ষেন না হইতে যদি উহাতে বেগুণ প্রভৃতি ভাজা হয় অথবা ডাল প্রভৃতির সম্ভার দেওয়া হয়, তবে উক্ত খাদ্যদ্রব্যে কাঁচা তৈলের গন্ধ অনুভূত হয়, কিন্তু তৈল নিক্ষেপ হইলে খাদ্য দ্রব্যে উক্ত দোষ দাঁদায় না। তৈলে উক্ত জলীয় ভাগের বিদ্যমানতাকেই একমাত্র আমদোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ইহা ভিন্ন অন্য কোনরূপ দোষ তৈলে নাই। যদি আমদোষ বলিয়া অনিষ্টকারী বা মারাত্মক কোন দোষ তৈলে থাকিত তবে উক্ত তৈলাদি খাদ্যদ্রব্যে যথেচ্ছাভাবে আবহমান কাল হইতে ব্যবহৃত হইত কি? আরও এক কথা, পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক, কাজেই মূর্চ্ছাবিধি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে চক্রপানিদত্ত, শ্রীভাব মিশ্র, বাগভটাচার্য্য প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতেন আমদোগ প্রযুক্ত তাঁহাদের ঔষধ কোনরূপ অনিষ্টকারী হইত কি? আমদোষ শব্দের উল্লেখ করিয়া বিশুদ্ধ ঘৃত তৈলাদির দোষারোপ করা হইয়াছে, কিন্তু তৎপ্রযুক্ত যে কি অনিষ্টপাত হইতে পারে তাহার কিছু উল্লেখ নাই কেন? স্থূল কথা মধ্যযুগে উপযুক্ত চর্চ্চা ও প্রচারের অভাবে আয়ুর্ব্বেদ এত অল্প সংখ্যক চিকিৎসকের গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে তখন যে কোন বিষয় বিনা আপত্তিতে আয়ুর্ব্বেদে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়ায় বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। তাই আমার বিশ্বাস কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী চিকিৎসক মধ্যযুগে বাহাদুরী লুঠিবার জন্য ঘৃত ও তৈলে আমদোষের আরোপ করিয়া বহু মাথা ঘামাইয়া মূর্চ্ছাবিধির সৃষ্টি করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে উপকার দিয়াছেন। এই গেল আমদোষ সম্বন্ধে কথা।

অতঃপর তিল তৈল মূর্চ্ছাবিধিতে যে উক্ত হইয়াছে, "মূর্চ্ছাদ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া

তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়” যে সম্বন্ধে সমালোচনার প্রয়োজন। তিল তৈলে কাঁচা তিলের গন্ধ বিদ্যমান। ইহা ভিন্ন এমন কোন অপ্রীতিকর বা পূতিগন্ধ ইহাতে নাই যাহাতে উহার গন্ধে রোগীর বমন অরুচি অথবা অন্য কোন উপদ্রব উৎপাদন করিতে পারে। অবশ্যই বর্ত্তমানে বাজারের ঘৃত তৈলাদি নানাপ্রকার ভেজালে পরিপূর্ণ কাজেই নানাপ্রকার অপ্রীতিকর গন্ধযুক্ত ও ঔষধার্থ অযোগ সুতরাং উহা আমাদের সমালোচনায় স্থান পায় না। যাহা হউক তৈলে কাঁচা তৈলের গন্ধ অগ্নিজ্বালে নিফেণ হইলেই অনেকাংশে দূর হয়। শাস্ত্রোক্ত বিশেষ তৈলের কল্কদ্রব্যে অল্পাধিক ক্রমে গন্ধদ্রব্যের এবং অরুণ বর্ণোৎপাদক মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা, কুঙ্কুম প্রভৃতির বিদ্যমানতা দেখা যায় উহা দ্বারাই তৈলের সুন্দর গন্ধ ও বর্ণ সম্পাদিত হয়। (গন্ধপাকবিধি সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়ে পরে আরও দ্রষ্টব্য)। স্থূল কথা আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলাদি বিলাসের বস্তু নহে গন্ধবর্ণের প্রতি বিশেষ ঝোক না দিয়া যাহাতে তৈলাদি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হয় তাহারই চেষ্টা চিকিৎসক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অতঃপর আমাদের বিচার্য্য, মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা ঘৃত তৈলাদির গুণহানি বা গুণ বিপর্য্যায় হইতেছে কিনা। গুণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সমালোচনা হইতে “মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা ঘৃত বীর্য্যশালী ও সুখদায়ক হয়” এই উক্তি কতদূর অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। ঘৃত এবং তৈলের দ্রব্যবিশেষের সহিত সংস্কৃত হইয়া প্রায় সর্ব্ববিধ ব্যাধি নাশের শক্তি অর্জ্জনের ক্ষমতা আছে বলিয়াই উহারা ঔষধার্থ বহুলভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ঘৃত ও তৈল যে জিনিষের সহিত সংস্কৃত হইবে তাহারই গুণ গ্রহণ করিবে ইহাই তাহাদের স্বভাব। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদির স্নাবের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে উহাদের ক্বাথ্যদ্রব্যের এবং কল্ক দ্রব্যের উপাদান নির্ব্বাচনে এবং তাহাদের মাত্রা নির্দ্ধারণে বহু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, কল্ক ও ক্বাথ্য দ্রব্যে উপাদান নির্ব্বাচন বিষয়ে লক্ষ্য করিলে এমন অনেক দ্রব্যের ব্যবহার দেখা যায় যাহা ব্যাধি বিপরিত বলিয়া সাধারণের চক্ষে প্রতিভাত হয় অথবা ঐ সমস্ত দ্রব্য কেন দেওয়া হইল তাহা নিরুপণই করা যায় না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাবলী আর্য্যঋষিদিগের যোগ দৃষ্টিপ্রসূত। দশদিক ঠিক রাখিয়া উপাদান এবং তাহাদের মাত্রা নির্দ্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র তাহাদেরই ছিল। তাহারা কোথাও এক দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা অন্য দ্রব্য প্রয়োগে নষ্ট করিয়া, কোথাও প্রকৃতিসম সমবারা দ্বারা, আবার কোথাও বিকৃতি বিষম সমবার দ্বারা অভিষ্ট গুণ লাভ করিতেন। এমতাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলাদির উপাদান সমূহের ও তাহাদের মাত্রার পরিবর্ত্তন করা চলে না। উহাদের পরিবর্ত্তন ঘটাইলে ক্ষেত্র বিশেষে উপাদান বিপর্য্যয়জনিত দোষ এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রা বিপর্য্যয়জনিত দোষ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ঔষধের গুণের পরিবর্ত্তও অপরিহার্য্য।

পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈলাদি প্রাচীন এবং মূর্চ্ছাবিধি আধুনিক; আধুনিক মূর্চ্ছা যে ঘটিতেছে না, একথা অস্বীকার করার উপায়

নাই। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন, সমান গুণ সমান গুণের বৃদ্ধি করে এবং বিপরীত গুণ বিপরীত গুণের হ্রাস করিয়া থাকে। কাজেই মূর্চ্ছা ক্রিয়ায় মূর্চ্ছা দ্রব্য হইতে যে গুণ স্নেহে দাঁড়ায়, সেই গুণ স্নেহের কাথ ও কল্ক পাকজনিত গুণের সহিত পরস্পর উপহত হইয়া কাথ ও কল্ক পাক জনিত গুণের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকে। মনে করুন প্লীহা-যকৃদাধিকারোক্ত 'পিপ্পলীঘৃত" পাক করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মূর্চ্ছা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া ৪ সের ঘৃত ১ সের পিপ্পলী ১৬ সের দুগ্ধের সহিত যথা নিয়মে পাক করিলে উক্ত ঘৃতে পিপ্পলীর উষ্ণবীর্য্য কটুরসের প্রাধান্য এবং প্লীহা, যকৃৎ ক্ষয় কাস প্রভৃতি রোগ নাশের শক্তি দাঁড়াইল, কিন্তু যদি ঐ পিপ্পলী ঘৃত পাক করিতে পূর্ব্বে হরিদ্রা, লেবুর রস, ত্রিফলা, মুথা প্রভৃতির সহিত মূর্চ্ছা পাক করিয়া পরে উপরোক্ত ঘৃত পাক করা হয়, তবে মূর্চ্ছা দ্রব্যের তিক্ত-মধুর-কষায়-অম্ল রসাদি দ্বারা ঘৃতের কটু রসের প্রাধান্য অনেকটা নষ্ট হইবে, এইরূপ প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, মূর্চ্ছাপক্ব ঘৃত দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ ও মূর্চ্ছা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহা এক জিনিস নয় এবং তাহাদের গুণও এক হইতে পারে না। ফলতঃ মূর্চ্ছা ক্রিয়া দ্বারা ঘৃতের রস, বীর্য্য, বিপাকাদির পরিবর্ত্তনই গুণ-বিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। ঘৃত সম্বন্ধে যেরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তৈল সম্বন্ধেও সেই কথা। অনেকে হয় তো কোন কোন ঘৃত বা তৈলের মূলোক্ত জায়ে মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির বিদ্যমানতা দেখাইয়া মূর্চ্ছা পাকের অপকারিতার অস্বীকার এবং পক্ষান্তরে স্নেহের গুণোৎকর্ষ দেখাইতে প্রয়াসী হইতে পারেন; কিন্তু সে ক্ষেত্রে মূল ঔষধের উপাদান ও মাত্রাবিপর্য্যয়জনিত দোষ ঘটে। মনে করুন, কোন তৈলের কল্ক দ্রব্যে ২ তোলা মঞ্জিষ্ঠা দেওয়ার বিধান আছে, কিন্তু মূর্চ্ছা পাকে সেই তৈল ১৬ তোলা মঞ্জিষ্ঠার সহিত পক্ক হইয়াছে; তবেই মোটের উপর সেই তৈল ২ তোলা মঞ্জিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত হওয়ার পরিবর্ত্তে ১৮ তোলা মঞ্জিষ্ঠার সহিত সংস্কৃত হওয়ায় মঞ্জিষ্ঠার আধিক্যে তৈলের শাস্ত্রোক্ত গুণের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। আবার মনে করুন, কোন তৈলে মঞ্জিষ্ঠা উপাদান রূপে বর্ত্তমান নাই, এক্ষেত্রে মূর্চ্ছা ক্রিয়াতে ১৬ তোলা মঞ্জিষ্ঠার গুণ বর্ত্তাইয়া তৈলের শাস্ত্রোক্তগুণের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। স্থূল কথা মূর্চ্ছাবিধি মানিয়া চলিলে ঘৃত-তৈলাদির জায়ে মূর্চ্ছা দ্রব্যাদির উল্লেখ থাকিলে মাত্রা-বিপর্য্যয়জনিত দোষ আর জায়ে উক্ত দ্রব্যাদির উল্লেখ না থাকিলে উপাদান-বিপর্য্যয়জনিত দোষ অপরিহার্য্য। সুতরাং যদি ক্ষেত্রবিশেষে মূর্চ্ছিত ঘৃত ও তৈল দ্বারা প্রস্তুত কোন কোন ঔষধের গুণোৎকর্ষও হয়, তবুও উহাকে আমরা প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, কারণ উহারা ঠিক শাস্ত্রোক্ত ফল প্রদান করিবে কিনা সন্দেহ।

অতঃপর মূর্চ্ছাপাকে এই বলিয়া আপত্তি চলিতে পারে যে, মূর্চ্ছা ক্রিয়াতে স্নেহের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হয়, কাজেই মোটের উপর প্রত্যেক ঘৃত ও তৈলেই একটা কল্ক পাকের তুল্য অগ্নিজ্বাল বেশী

পড়ে, সুতরাং উহাতেও গুণের কিছু পরিবর্ত্তন আশঙ্কা করা যায়।

মূর্চ্ছাবিধি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত আপত্তির উল্লেখ করিয়া প্রয়োজন বোধে তৈলের গন্ধপাক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য। মূর্চ্ছা বিধির ন্যায় গন্ধপাক বিধিও আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত, কারণ উহাও কোন মূল প্রাচীন গ্রন্থে অথবা দায়িত্ব পূর্ণ প্রামাণ্য আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। চক্রদত্তে মহারাজ প্রসারণী, মহাসুগন্ধি লক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি তৈলে যে গন্ধপাক বিধি দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল তত্তৎ তৈল সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সমস্ত তৈলের জন্য সাধারণ গন্ধপাক বিধির কুত্রাপি উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈল সমূহ বিলাসের সামগ্রী নহে, কাজেই উহার গন্ধবর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।* বর্ণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। প্রকৃত শাস্ত্রোক্ত তৈল প্রস্তুত করিতে যাইয়া যে বর্ণ হউক না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে গন্ধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, অপ্রীতিকর গন্ধ হইলে রোগীর বমন, অরুচি অথবা অন্য কোনরূপ উদ্বেগ জন্মাইতে পারে। যাঁহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহাদিগকে আমি চক্রদত্তোক্ত তৈল সমূহের কল্ক দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি। তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে প্রত্যেক অধিকারোক্ত প্রায় প্রত্যেক তৈলেই কল্ক দ্রব্যে অল্পাধিক ক্রমে গন্ধ দ্রব্য বিদ্যমান। বাতব্যাধি অধিকারোক্ত তৈল গুলিতে গন্ধদ্রব্য বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয়। আর যাঁহারা তৈলকে অরুণবর্ণ করিতে ব্যগ্র, তাঁহারাও দেখিবেন যে, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লাক্ষা, কুঙ্কুম প্রভৃতি অরুণবর্ণোৎপাদক উপাদানও অল্পাধিক ক্রমে প্রায় অধিকাংশ তৈলেই বিদ্যমান। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদের আর্য্যঋষিগণ তৈলাদিতে গন্ধবর্ণ উৎপাদন বিষয়েও উদাসীন ছিলেন না। দশদিক বিচার করিয়া, তৈলের প্রকৃত গুণ ষোল আনা বজায় রাখিয়া যে যে তৈলে গন্ধবর্ণ উৎপাদনের প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন, সেই সেই তৈলেই তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে ত্রুটী করেন নাই! এমতাবস্থায় পরিভাষা প্রদীপোক্ত প্রক্ষিপ্ত গন্ধপাক বিধির অনুসরণ করিয়া পুনরায় গন্ধপাক দ্বারা মাত্রা বিপর্য্যয় জনিত অথবা উপাদানবিপর্য্যয় জনিত দোষ ঘটাইয়া তৈলের শাস্ত্রোক্ত গুণের হানি করা অথবা গুণের পরিবর্ত্তন ঘটান যুক্তি সঙ্গত কি?

ঘৃত ও তৈল পশ্চিম দেশে কিরূপে পাক করা হয়, সে দেশেও মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি প্রচলিত আছে কিনা, গোবিন্দ সেনের পরিভাষা প্রদীপের মত কোন পরিভাষা গ্রন্থ বাঙ্গালার বাহিরে আছে কিনা—সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের কোনই সুযোগ অদৃষ্টে ঘটে নাই।

অতঃপর ঘৃত ও তৈল পাকের পাত্র সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ সমালোচনার প্রয়োজন। পরিভাষায় উক্ত আছে, "পাত্রেঽযুক্তেতু মৃন্ময়ম্"—অর্থাৎ যেখানে পাত্র বিশেষের

---

* একথা ঠিক কি? বর্ণ গন্ধ ও রসোৎপত্তি যে স্নেহপাক সিদ্ধির প্রধান লক্ষণ। স্নেহপাক ঠিক হইয়াছে কিনা জানিতে হইলে গন্ধ ও বর্ণের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথা—
"যদা কেশোদ্গম তৈলে কেশাগ্নিশ্চ সর্পিষি।
বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা।" আঃ সং

এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ বা ইহার সমর্থন সূচক প্রবন্ধ পাইলে আমরা সাদরে প্রকাশ করিব। আঃ সং

উল্লেখ না থাকিবে"-সেখানে মৃৎপাত্র বুঝিতে হইবে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রায় ষোল আনা কবিরাজই বর্ত্তমান সময়ে লৌহ-কটাহ অথবা রাঙ্গ দ্বারা কলাই করা তাম্র পাত্র তৈল-ঘৃতাদির পাকে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ শাস্ত্রবিধি মানিলে কতিপয় উল্লিখিত স্থান ব্যতীত সমুদয় ঘৃত ও তৈলই মৃৎপাত্রে পাক করা উচিত। প্রথমে লৌহ পাত্র সম্বন্ধে বিচার করা দরকার। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কবিরাজমাত্রেই অবগত আছেন যে, পাশ্চাত্য রসায়নে যাহাকে এসিড (Acid) বলে, তাহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত অম্লরস। প্রায় সমস্ত ধাতুই অম্লরস (Acid) সংযোগে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়, এমতাবস্থায় যে তৈল বা ঘৃত আমরা লৌহ পাত্রে পাক করিতে যাইতেছি, তাহাতে ত্রিফলা, কাঞ্জি, দধি, লেবুর রস অথবা অন্য কোন অম্লরসান্বিত দ্রব্য উপাদান রূপে আছে কিনা—তাহা বিচার্য্য। যদি না থাকে, তবে লৌহ পাত্রে উক্ত স্নেহ পাকে বিশেষ ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি অম্লরস বিদ্যমান থাকে, তবে উহা লৌহ-কটাহের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা লৌহের দ্রাবণ করিয়া ঔষধের গুণহানি করিবে। যদি কেহ বলেন যে, এত জিনিসের ভিতর ২।১ তোলা ত্রিফলার অম্লরসে ঔষধের কি হানি করিতে পারে? কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, জল মিশ্রিত এসিড্ (diluted acid) হীনশক্তি হইলেও উত্তপ্ত করিলে উহার শক্তি বাড়ে এবং তখন ধাতু সমূহের দ্রাবণ করিতে পারে; আর স্নেহ পাকে কাথ বা জল যতই কমিতে থাকিবে, অম্লরস ততই শক্তিশালী হইবে, কাজেই তখন উহা যথাশক্তি লৌহ পাত্রের দ্রাবণ করিবে।

লৌহ পাত্র সম্বন্ধে যেরূপ আপত্তি প্রদর্শিত হইল—তাম্র পাত্র সম্বন্ধে সে আপত্তি তো আছেই, ইহা ভিন্ন আরও গুরুতর আপত্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। "ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রঞ্চ বিষমুচ্যতে"। বিষকেই কেবল বিষ বলে না, তাম্রও একটা ভয়ঙ্কর বিষ। অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, মূর্চ্ছা, বিদাহ, বমনবেগ, শোষ, বমন অরুচি ও চিত্তসন্তাপ এই আটটী বিষোপম দোষ দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় কেবল রাং দ্বারা কলাই করা তাম্র পাত্রে ঘৃত তৈলাদি পাক করা কতদূর নিরাপদ—অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা বিবেচ্য। তাম্র আয়ুর্ব্বেদে অম্ল-মধুর-কষায়-তিক্ত রস বলিয়া উক্ত আছে। কাজেই অম্লরস—স্নেহ পাকের তাম্রপাত্রেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাম্র পাত্রে পক্ক অন্ন আহার করিলে বমন উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাম্র পাত্রে ঔষধাদি পক্ক হইলে কতদূর অনিষ্টকারী হইতে পারে। রাং দ্বারা কলাই করা তাম্র পাত্রে পক্ক স্নেহে যে কোন রূপ দোষ দাঁড়ায় না—একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না; কারণ অম্লরস রাঙ্গেরও দ্রাবক। কলাই যতদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে, ততদিন তাম্র পাত্রে পাকজনিত দোষ স্নেহে সাধারণ ভাবে উপলব্ধি হয় না, কিন্তু কলাই কতক উঠিয়া গেলে সে পাত্রে পক্ক স্নেহ বহুবিধ অনিষ্টকারী হইতে পারে।

অনেকে মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া গেলে ক্ষতিগ্রস্থ

হইতে হইবে এই, ভয়েও মৃৎপাত্র ব্যবহার করেন না, কিন্তু সাবধানতার সহিত কার্য্য করিলে, ভয়ের কি কারণ থাকিতে পারে? আর ভয় কোন কাজেই বা না আছে? সকল কাজেই অকৃতকার্য্যতার ভয় থাকিবেই; তাই বলিয়া কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে চলে না।

আমাদের দেশে মাটির হাঁড়িতেই প্রায় প্রত্যেক পরিবার ভাত পাক করেন এবং এই সকল হাঁড়ির এক একটিতে একমাস, দুইমাস অথবা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত রন্ধনাদি কার্য্য চলে। যাহা হউক সকল কাজেই সাহসের উপর নির্ভর না করিলে সুসিদ্ধ হয় না, ইংরাজীতে প্রবাদ আছে "cowards die many times before their death!"

উপসংহারে বক্তব্য, এই বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ রোগ শান্তির জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত মুখ্যভাবে ঘৃত তৈলাদির প্রায়ই ব্যবস্থা দেন না, ঘৃত ও তৈলাদি প্রয়োগের চিকিৎসা যেন ক্রমেই উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। আমার মনে হয়, তাহার একমাত্র কারণ ঘৃত, তৈলাদির ব্যবস্থা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্র আশানুরূপ আশু সুফল লাভ হয় না। পূর্ব্বোক্ত কারণাদি হইতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঘৃত-তৈলাদি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ না হওয়ার প্রধান কারণ মূর্চ্ছাপাক এবং (তিল তৈলে) গন্ধপাক বিধির অনুসরণ এবং মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহ বা তাম্র পাত্রে উহাদের পাক সমাধান। উপরোক্ত সমালোচনা দৃষ্টে আমার কোন বন্ধু বলিয়াছেন যে; মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিলে ঔষধে কতদূর ফল লাভ হইবে—তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ এবং বহু-প্রয়োগ দ্বারা তাহা নির্ণেয়। তদুত্তরে আমার বক্তব্য, মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি পরিত্যাগ করিতে যাইয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদে একটা নূতন কিছু করিতে যাইতেছি বলিয়া মনে করা ভ্রম। যাহা বাগভটাচার্য্য, শ্রীমিশ্রভাব এবং চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি ঋষিকল্প চিকিৎসকগণের সময় প্রচলিত ছিল না, মধ্যযুগে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, সে বিধি উঠাইয়া দিতে ঘৃত তৈলাদির গুণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উক্ত বিধিদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া বাগভটাচার্য্য, মিশ্রভাব, চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ঘৃত তৈলা দতে সুফল লাভ করিলে আমরা কেন তাহাতে বঞ্চিত হইব? ঘৃত-তৈলাদির গুণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ উক্তি দেখা যায়, মূর্চ্ছা বিধির অনুসরণ করিয়া ঐ ঘৃত তৈলাদি পাক করিয়া প্রয়োগে তদনুযায়ী ফল লাভ অধিকাংশ কবিরাজের অদৃষ্টেই ঘটিয়া উঠিতেছে না কেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, রোগী বহুকাল ঘৃত-তৈলাদি ব্যবহারেও আশানুযায়ী বিশেষ কোন ফল লাভ না করায় চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলে, কবিরাজ মহাশয় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলেন, "হাঁ, কবিরাজী ঘৃত-তৈলাদিতে একটু বিলম্বেই ফল লাভ হয়।" কি লজ্জার কথা! কি পরিতাপের বিষয়! আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত-তৈলাদির গুণশ্রুতি কি মিথ্যা ও অসার, না আমরা নানারূপ অনাচারে উক্ত ফল লাভে বঞ্চিত?

অতঃপর আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাস্য, ঘৃত ও তৈল সম্বন্ধে

সমালোচনার অবতারণা করিয়া আমি যে অভিমত ব্যক্ত করিলাম—তাহা যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণ যোগ্য কি না এবং এমন কোন প্রবল যুক্তি বিদ্যমান আছে কিনা—যদ্বারা মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি সমর্পণ করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশই আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা ও প্রচার সম্বন্ধে ভারতের শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া আমার সাম্নুনয় নিবেদন এই, তাঁহারা যদি স্বীয় স্বাধীন চিন্তা দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া আমার মতের পক্ষপাতী হন, তবে আয়ুর্ব্বেদের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য উক্ত প্রক্ষিপ্ত মূর্চ্ছা ও গন্ধপাক বিধি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে অপসারিত করিয়া ঘৃত-তৈলাদিকে মেঘ মুক্ত সূর্য্যবৎ প্রতিভাত করিবার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে—তাহা যেন সত্বর নির্দ্ধারণ করেন। সর্ব্বশেষে আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট আমার সাম্নুনয় নিবেদন—তাঁহারা যদি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ জন্য বঙ্গীয় কৃতবিদ্য কবিরাজ মণ্ডলীর সহিত এক সভা আহ্বান করিয়া সভার সিদ্ধান্ত পত্র দেশময় প্রচার করিয়া দেন, তবে আয়ুর্ব্বেদের এবং তৎসঙ্গে দেশের একটা মহান্ কল্যাণ সাধিত হয়।

বনৌষধি।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরত্ন]

বকুল বৃক্ষ—হিং—মৌলসিরি।

চলিত দন্তে বকুল- যে দন্ত অকালে নড়িয়া শিথিল হইয়াছে, বকুল ফল চর্ব্বণ করিলে ঐ শিথিল দন্তমূল দৃঢ় হয়। বকুল ছালের চূর্ণ অথবা কাথ দ্বারা দন্ত ধাবন করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়।

দন্ত রোগে।—বকুল ছাল ও বকুল ফল বিশেষ হিতকারী। বকুল ছালের কাথের সহিত কিঞ্চিৎ পিপুল চূর্ণ করিয়া ও মধু মিশ্রিত করিয়া মুখে কবল ধারণ করিলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়। এবং মুখের ক্ষত ও দুর্গন্ধ দূর হইয়া থাকে। দন্তমূল হইতে রক্তস্রাবেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

বালকের কোষ্ঠ বদ্ধে বকুল—শিশুদিগের কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে বকুল বীজ জলে পেষণ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পানের বোঁটা দ্বারা মলদ্বারে বর্ত্তি প্রদান করিলে সহজে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের মল নিঃসরণ প্রশস্ত।

শিরোরোগে বকুল—শুষ্ক বকুল পত্রের ও বকুল ফলের নস্য টানিলে শিরোরোগের উপশম হয়। ইহা শ্লেষ্মা নিবারক। শুষ্ক বকুল পুষ্প চূর্ণ করিয়া নস্য টানিলে নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

অশ্বগন্ধা—হিং অশ্বগন্ধা।

অশ্বগন্ধা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মুঙ্গের অঞ্চলে অশ্বগন্ধার বহুল উৎপত্তি

দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী ইহা বেণের দোকানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অশ্বগন্ধা বলকারী, রসায়ন। ইহার সহিত দ্রব্যান্তরযোগে পুষ্টিকারক ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র অশ্বগন্ধার মূল চূর্ণ ও নাগর মুথা চূর্ণ—যথাক্রমে চারি আনা ও দুই আনা মাত্রায় সংমিশ্রণ করিয়া গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শরীর বলিষ্ঠ ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্বাসরোগে অশ্বগন্ধা।—অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া অশ্বগন্ধার মূলের ক্ষার ২ তোলা, গব্য দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া, একত্র জাল দিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইবে ঐ দুগ্ধ বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিলে শ্বাস রোগে উপকার হয়।

বাতব্যাধি রোগে অশ্বগন্ধা।—অশ্বগন্ধার কাথ ও কল্কে গব্য ঘৃতের চতুর্গুণ দুগ্ধসহ যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া ঐ ঘৃত সেবনে বাতব্যাধি আরোগ্য হয়। ইহা বাতঘ্ন, বৃষ্য মাংস বৰ্দ্ধক।

শোথ রোগে অশ্বগন্ধা।—অশ্বগন্ধা ২ তোলা, গব্য দুগ্ধ অৰ্দ্ধ পোয়া, জল দেড় পোয়া, একত্র জাল দিয়া দুগ্ধ শেষ রাখিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিবে।

হৃদ্‌গত বায়ু রোগে ও হৃদ রোগে অশ্বগন্ধা ১ তোলা গরম জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে হৃদরোগের উপশম হয়।

অনিদ্রায় অশ্বগন্ধা।—অৰ্দ্ধ তোলা অশ্বগন্ধা চূর্ণ কিঞ্চিৎ চিনি ও গব্য ঘৃত সহ প্রত্যহ সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন। অশ্বগন্ধার মূল কাঁচা ব্যবহার প্রশস্ত।

পুষ্টিবৰ্দ্ধনে অশ্বগন্ধা।—প্রত্যহ চারি আনা পরিমাণ অশ্বগন্ধা মূলচূর্ণ, উষ্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে দেহ পুষ্টি ও শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দেশের কথা।—আমাদের দেশে রোগ-প্রাচুর্য্যের পরিচয় দেশে চিকিৎসকের আধিক্য দেখিলেই অনুমান করা যাইতে পারে। কলিকাতার তো কথাই নাই, কলিকাতার অলিতে গলিতে ডাক্তার কবি-রাজের ছড়াছড়ি! মফঃস্বলেও ইহাদের সংখ্যা কম নহে। আগে এত চিকিৎসকও ছিল না, এত রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটিত না। সুতরাং এখন যে এত চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহা দেশের সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের পরি-পরিচয়, তাহা ভাবিবার কথা।

রোগের বাহুল্য। রোগের বৃদ্ধিতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি আশার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে রোগের আধিক্য কমিতেছে কই? ম্যালেরিয়া-কলেরা-বসন্ত তো বাঙ্গালায় নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছে, প্লেগ-ইনফ্লুয়েঞ্জা-বেরিবেরিও আধিপত্য বিস্তার কম করে নাই। মহিলা-সমাজে হিষ্টিরিয়ার বিস্তৃতিও অল্প নহে। হার্টফেল নর-নারীর মধ্যে তো কথায় কথায়। ডিস্‌পেপ্-সিয়া বা আমাদের অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য—ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম হইতে না হইতেই বাঙ্গা-

লীর এক চেষ্টা। দেশে চিকিৎসক বাড়িতেছে, অথচ আধিব্যাধির কেন এরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, দেশের চিন্তাশীলগণের ইহা ভাবিবার বিষয়।

রোগের কারণ।—কিন্তু চিকিৎসক করিবেন কি? আর্য্য জাতি যে সদাচারভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার নিবারণ করিবার উপায় কোথায়? আর্য্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সদবৃত্তি পরায়ণ হইবার বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে উপদেশ এখন পালন করে কে? যুগ বিপর্য্যয়ে অনাচার-পরায়ণ আর্য্য জাতির এই জন্যই তো দুর্গতি হইতেছে। দেহ ধারণ করিলে রোগভোগ করিতে হইবে, মরিতে হইবে—ইহা সত্য কথা, কিন্তু সেই রোগ ভোগেরও একটা সীমা আছে। পাপের ফল তথা অমিত আহার বিহারাদির ফল রোগোৎপত্তির কারণ- এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। আগেকার লোকে এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতেন,এখনকার মানুষ ইহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না, ইহাই তো দেশে রোগ-বাহুল্যের কারণ। যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে এ কারণের অপনয়ন না ঘটিবে, সে পর্য্যন্ত যে আমাদের দেশ হইতে রোগের হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

ব্রহ্মচর্য্য।—যোগ শাস্ত্রের সার কথা, "চিত্তবৃত্তির নিরোধ কর।" আগে যে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্যবস্থা ছিল তাহা হইতেই এই উপদেশ পালন করা হইত। স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন একান্তই প্রয়োজনীয়। প্রাচীন কালে রাজ পুত্র হইতে পর্ণ কুটীর বাসীর পুত্রকেও গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত। এই অবস্থায় তাঁহারা শিক্ষা করিতেন—

"মরণং বিন্দুপাতেন।
জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

কিন্তু এ শিক্ষা এখন দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। যে ব্রহ্মচর্য্য আমাদের সকল শিক্ষার ভিত্তিরূপে গৃহীত হওয়া উচিত সে শিক্ষা আমাদের বালকগণকে আর প্রদান করা হয় না। স্কুল কলেজে সে শিক্ষা প্রদানের তো ব্যবস্থাই নাই, গৃহেও ইহার একান্ত অভাব। ইহার ফলে ছাত্র জীবনে কুক্রমে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। বাঙ্গালীর অজীর্ণ—বাঙ্গালীর অম্লপিত্ত সৃষ্টি এবং তাহার ভীষণ ফল বাঙ্গালীর শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি এবং তাহার শেষ পরিণতি বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যভঙ্গ ইহারই ফলসম্ভূত। বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে কে?

বাঙ্গালীর অবস্থা। বাস্তবিক পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা অধিক শোচনীয়। বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায়ের অধিকাংশের দিকে চাহিয়া দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁহাদের অভিভাবকগণ যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার ফলে তাঁহারা শিক্ষালাভেও অমনোযোগী নহেন, কিন্তু তাঁহাদিগের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের

স্বাস্থ্যোন্নতির পরিচয় তো পাওয়া যায় না। সত্য কথা বলিতে গেলে অনেকেরই দেহে বল নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই, স্বাস্থ্যহীনতার জন্ম অনেকেরই যেন হৃদয়ে শান্তি নাই। এই অবস্থায় কোন একটী প্রবল রোগের আক্রমণ হইলে ইহারা আর সহ্য করিতে পারেন না। সকল জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির অকাল মৃত্যু এইরূপেই বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই জন্যই তো বলিতেছিলাম চিকিৎসকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও বাঙ্গালা দেশে রোগের আক্রমণ কম না হইয়া বরং বাড়িয়াই যাইতেছে।

মরণের কারণ।—বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়া-পীড়িত রোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালীর মৃত্যুর হারও কম নহে। ইহার কারণও আমরা বাঙ্গালীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বলিয়া মনে করি। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে বাঙ্গালী যে অন্তঃসার শূন্য হইতেছে, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি তাহারই জন্য কমিয়া আসিতেছে। ম্যালেরিয়াই বলুন আর কালাজরই বলুন, অথবা অন্য কোনো রোগের কথাই উল্লেখ করুন, সেই রোগের আক্রমণ অন্নপ্রাণ-বাঙ্গালী সহ্য করিতে পারিতেছে না। বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু এমনই করিয়াই ঘটিতেছে। এক কথায় দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে ভীষণ রোগের সঙ্গে যুঝিবার ক্ষমতার অভাব হইয়াছে। দেশের চিন্তাশীলগণ সকল বিষয় অপেক্ষা এই বিষয়ের চিন্তা করুন—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

"ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণা—
মারোগ্যমূলমুত্তমম্"।

"ধর্ম্ম বলুন, অর্থ বলুন, কাম বলুন, মোক্ষ বলুন—আরোগ্যই সকল বিষয়ের মূল"। সুতরাং সেই আরোগ্য লাভের ব্যবস্থা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। সেই ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট পন্থা ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা প্রাপ্তি। বাঙ্গালী বালক যে পর্য্যন্ত সেই শিক্ষা লাভ না করিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে মৃত্যু-বাহুল্য যে কমিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ২৯ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
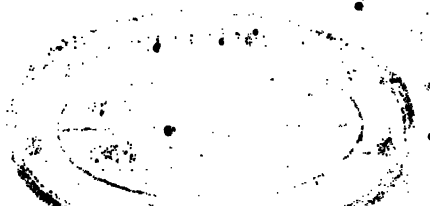
৭ম বর্ষ	কার্ত্তিক, ১৩২৯ সাল।	২য় সংখ্যা।

চরকের চিকিৎসা।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যে শাস্ত্রে আয়ুর কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। আয়ু শব্দের অর্থ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগ। আয়ুর অন্য নাম—ধারি, জীবিত, নিত্য ও অনুবন্ধ। মন, আত্মা ও শরীর—তিন খানি যেন ভিন্ন ভিন্ন যষ্টি; এই তিনের সংযোগেই পুরুষের উৎপত্তির কারণ। পুরুষই পুমান. পুরুষই চেতন এবং পুরুষই আয়ুর্ব্বেদের অধিকরণ। যে গুণ সর্ব্বদাই পুরুষের অনুবর্ত্তী তাহারই নাম মন। ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্ত্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। মনের অতিযোগ, হীন-যোগ ও মিথ্যা যোগ—প্রকৃতি ও বিকৃতির কারণ। ইন্দ্রিয় ও মন অনুপহত রাখিতে না পারিলেই রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে। দেহীগণ যখন ইন্দ্রিয় ও মন অনুপহত রাখিতে সমর্থ হইল না, তখনই বিশ্বসংসারে রোগ-রাক্ষসগণ প্রাদুর্ভূত হইল। ইহার ফলে মানবদিগের তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও আয়ুর বিঘ্ন উপস্থিত হইল, তখন জীবদিগের প্রতি দয়াবশতঃ পুণ্যকর্ম্মা মহর্ষিগণ হিমালয় পার্শ্বে সমবেত হইলেন। তাঁহারা ধ্যান-নিরত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ইন্দ্রই এ বিপদের উদ্ধার কর্ত্তা, অমংনাথই ইহার উপায় স্থির করিয়াছেন. মহর্ষি ভরদ্বাজ এই জন্য ইন্দ্র সমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিলেন এবং তাহা অন্যান্য ঋষিদিগকে শিক্ষা দিলেন; ইহাই হইল আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের এক অধ্যায় মাত্র।

বিশ্ব সংসারে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের অন্য

অধ্যায়ে আমরা জানিতে পারি, যে, ধন্বন্তরিও এই পরম কল্যাণকর লোক হিতৈষিণী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া পুণ্যভূমি বারাণসী ধামে দিবোদাস রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং এই বিদ্যা জনসমাজে প্রচার করিয়া বিখ্যাছিলেন। তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মহর্ষি মিত্রের পুত্র মহর্ষি সুশ্রুত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিঞ্চিদধিক আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল নিরূপণ করিতে পারা যায়। ভরদ্বাজ প্রবর্ত্তিত চিকিৎসায় দ্রব্য বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রকটিত, কিন্তু সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা কেবল দ্রব্য বিজ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া শারীর স্থানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শস্ত্র কর্ম্মের উপদেশ লইয়া বর্ণিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নামকরণ হইল চরক সংহিতা এবং মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নামকরণ হইল সুশ্রুত সংহিতা। চরকের চিকিৎসা এক কথায় বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লিখিত। অস্ত্র চিকিৎসা সাপেক্ষ রোগদিগের সম্বন্ধে তিনি কোনো কথাই বলিব না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উঁহাদিগকেও বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া অতি সহজে তাহাদিগের চিকিৎসার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

চরক সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায় তিন শ্রেণীর জন্য লিখিত। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, মধ্যম বুদ্ধি ও অধম বুদ্ধি। কোনও রোগের স্বভাব উক্ত, উহার চিকিৎসা এমন্ত তদনুরূপ হওয়া উচিত— উৎকৃষ্ট বুদ্ধিদিগের জন্য এই পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে। মধ্যম বুদ্ধিদিগকে বুঝাইবার জন্য আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে—ঐ রোগের চিকিৎসায় তিক্তকগণ আবশ্যক, কারণ তিক্তকগণ শীতল। তাহার পর অধম বুদ্ধিদিগের জন্য প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে—ঐ রোগের চিকিৎসায় নিমছাল,বাসক ও গুলঞ্চ প্রভৃতির পাচন প্রয়োগ করিতে হয়, এ স্থলে এই তিন প্রকার কথার অর্থই যে এক, ইহা বুঝিতে অধিক কষ্ট হইবার কথা নহে, কিন্তু যে স্থানে লিখিত আছে যে, শুক্র রোগ, প্রদর, রক্ত পিত্ত ও ক্লৈব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক, কিম্বা যে স্থলে লিখিত আছে যে,পিত্তের ক্ষয় হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত শ্লেষ্মা যৎকালে প্রকৃতিস্থ বায়ুকে রোধ করে, তৎকালে শীতক, গৌরব ও জ্বর হয়—এরূপ সাঙ্কেতিক কথা মধ্যম বুদ্ধি বা অধম বুদ্ধির বোধগম্য হয় না ; এ সকল সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ উত্তম বুদ্ধির জন্য লিখিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চরকের চিকিৎসা বায়ু, পিত্ত ও কফের শ্রেণীবিভাগ করিয়া লিখিত, এজন্য শুক্র রোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত, ক্লৈব্য প্রভৃতির চিকিৎসা এক—এরূপ সাঙ্কেতিক কথায় শুক্ররোগ, প্রদর, রক্তপিত্ত ও ক্লৈব্য প্রভৃতি রোগে মানবের শারীরিক অবস্থা একই প্রকার হয়-এরূপ অর্থ করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না, উত্তম বুদ্ধি ব্যক্তি ইহাই বিবেচনা করিয়া ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিবেন —ইহাই চরক সংহিতার সঙ্কেত।

চরকের চিকিৎসায় শস্ত্র-চিকিৎসার উল্লেখ না থাকিলেও ফল মূলাশি আর্য্য ঋষি উহাতে রোগের নির্ণয়ের বিচার যেরূপ ভাবে করিয়া গিয়াছেন, এমন আর কোনো শাস্ত্রে

নাই। আর্য্য ঋষি ঐ সনাতন গ্রন্থে জোর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, যদি তোমার যকৃতে বিদ্রধি (abcess) হইয়া থাকে, তবে তোমার শ্বাস হইতে থাকিবে, যদি তুমি তেজস্বী পুরুষ না হও, তবে তোমার প্রস্রাবে রাশীকৃত চিনি থাকিলেও উহা তোমার মধুমেহ নহে, যদি তোমার জলোদর হইবার উপক্রম হইয়া থাকে, তবে জলপান পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ঐ রোগ জলোদর রূপে পরিণত হইবে না, এরূপ নিশ্চয়াত্মক কথা পৃথিবীর আর কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই। চরক বলিয়াছেন, ক্ষয়রোগ অষ্টাদশ প্রকার, আয়ুর্ব্বেদের সকল গ্রন্থ ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিয়াছেন। ক্ষয় রোগ সপ্তদশ প্রকার বা ক্ষয় রোগ উনবিংশ প্রকার—সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত আর কেহই এ কথা বলিতে পারিলেন না। ঋষি বলিয়াছেন, যদি তোমার রাজযক্ষ্মা হইয়া থাকে, তবে তোমার স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে কখন কখন বেদনা থাকিবে, হস্ত ও পদে দাহ থাকিবে এবং অষ্ট প্রহরই জ্বর থাকিবে। যদি এই তিনটি লক্ষণের একটি লক্ষণ না থাকে; তবে তোমার মুখ দিয়া রাশীকৃত কফ ও রক্ত পূয উঠিলেও তোমার রাজযক্ষ্মা হয় নাই ইহা নিশ্চিত। হাঁচির বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, বমির রোগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়, নিশ্বাসের বেগ ধারণ করিলে অমুক অমুক রোগ হয়—এ সকল কথার ব্যাখ্যা করিতে হইলে শারীর তত্ত্বের জ্ঞান অপেক্ষা করে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা-দর্শন অন্যদিকে অগ্রসর হইলেও এ সকল কথার ব্যাখ্যার অভিমুখে তত দূর অগ্রসর হয় নাই। হাঁচি কিরূপে হয়, বমি কিরূপে হয়, নিশ্বাস-ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, শ্লেষ্মবহ স্রোত সকলের ক্রিয়া কি—এ সকল কথা ডাক্তারি শারীর তত্ত্বে সুন্দর রূপে লিখিত আছে। কিন্তু ঐ সকল ব্যাখ্যার সহিত চরকীয় ব্যাখ্যার সমাধান হইতেই পারে না।

কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ হইতে পারে ইহাই চরক সংহিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট এই জন্যই মহাতপা ঋষি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—

"দীর্ঘজীবিতমন্বিচ্ছন ভরদ্বাজ উপাগমৎ।
ইন্দ্রমুগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্।"

কারণ ও কার্য্যের পরিভাষা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধাতুর সাম্য বা অরোগিতার বিচার করিয়া চরক সংহিতা রচিত। চরকের মতে ইহাই চিকিৎসার প্রধান সূত্র। এই সূত্র বুঝিতে হইলে দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার থাকা চাই, চরকের সূত্র স্থান সেই "ষড় দর্শনের" মীমাংসায় প্রকটিত।

চরক বলিয়াছেন, যে গুণ সর্ব্বদাই পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাকেই মন বলে। ইন্দ্রিয় সকল মনের অনুবর্ত্তী হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপকরণ দ্রব্য যথাক্রমে জ্যোতিঃ, আকাশ, ক্ষিতি, জল ও বায়ু। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান যথাক্রমে অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, জিহ্বা ও ত্বক। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বুদ্ধি বা বোধ যথাক্রমে দর্শনবোধ, শ্রবণবোধ,

ঘ্রাণবোধ, স্বাদবোধ ও স্পর্শবোধ। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা এক যোগ হইলেই তত্তৎ বোধের উদয় হয়। সেই বুদ্ধি ক্ষণিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ। মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মা —এই কয়টিই শুভাশুভ প্রবৃত্তির হেতু। পুরুষের ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত, এজন্য ইন্দ্রিয় সকল পঞ্চ মহাভূতের বিকার। তেজ চক্ষুতে, আকাশ কর্ণে, ক্ষিতি ঘ্রাণে, জল রসনে ও বায়ু স্পর্শনে বিশেষরূপে বিদ্যমান। যে ইন্দ্রিয় যে মহা ভূতে নির্ম্মিত, সেই ইন্দ্রিয় তদভাবাপন্ন বলিয়া সেই মহাভূতোকরণ বিষয়েরই অনুসরণ করে। সেই বিষয়ের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগ হইলেই মন ও ইন্দ্রিয় বিকৃত হয়। এক কথায় রোগ ইহারই নামান্তর। দেহীদিগের শরীরে এইরূপ ভাবে যাহাতে রোগাক্রমণ না ঘটিতে পারে—মহর্ষি চরক গ্রন্থারম্ভে তাহারই জন্য উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—

"অসাত্ম্য বিষয় পরিহারপূর্ব্বক সাত্ম্য বিষয়ের অনুসরণ করিবে, সমীক্ষ্যকারিতা সহকারে দেশ,কাল ও আত্মার অবিরুদ্ধ ব্যবহার করিবে, সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে মন স্থির রাখিয়া সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এই সকল কার্য্য করিলেই যুগপৎ আরোগ্য লাভ ও ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ হইবে। চরকীয় চিকিৎসার ইহাই হইল মুখ্য অভিপ্রায়। চরকের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া যিনি চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহারই চিকিৎসা বৃত্তি সার্থক। রোগ হইলে রোগ প্রতিকারক উপায় করিবে—ইহা তো সকল দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণীজগতে যাহাতে রোগের আক্রমণ না হইতে পারে—চরক সংহিতার প্রারম্ভ ভাগে তাহাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত। জগদ্বাসী সে ঘোষণা শুনিয়া যখন স্বস্থবিধি পালন করিতে জানিত, তখনই মানবের পরমায়ু কাল সম্পূর্ণ হইত এক শত বৎসরে। এখনকার লোকের গড়ে পরমায়ুর সংখ্যা দাঁড়াইছে ৫০। চরক বলেন, প্রতি এক শত বৎসরে মানুষের জীবন এক বৎসর করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই হিসাবে এক শত বৎসর পরমায়ু ৫।৬০ বৎসরে কমিয়া আসিতে কত বৎসর লাগে—ত্রৈরাশিকের নিয়মে তাহা স্থির করিলে চরকের প্রাদুর্ভাব কালের সময়-নির্দ্দেশ সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধি সময়ে অনুমান করিতে পারা যায়। চরকে সত্য ও ত্রেতা যুগের উল্লেখও আছে। যাহা হউক তাঁহার প্রাদুর্ভাবকালের নির্দ্দেশ করণ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং সে কথা লইয়া এখন মাথা ঘামাইবারও আবশ্যকা বিবেচনা করিতেছি না।

চরক স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নির্দ্দেশে যে সকল সদবৃত্তের কথা বলিয়া গিয়াছেন, মানুষ যদি তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে যে রোগযন্ত্রণা পাইতে হয় না, নীরোগ ও সুস্থ দেহে তাহার যে দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিয়া থাকে—তাহা সুনিশ্চিত। তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলীর সারমর্ম্ম—"দেব, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু বৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য দিগকে অর্চ্চন করিবে। পূর্ব্বাহ্ন ও সায়াহ্ন—দুইকালে জল দ্বারা আচমন করিবে। সর্ব্বদা মলায়ন ও পাদদ্বয়ের নির্ম্মলতা রক্ষা করিবে। এক পক্ষের মধ্যে তিন বার কেশ, শ্মশ্রু, লোম,

ও নখ ছেদন করিবে। সর্ব্বদা অচ্ছিন্ন বস্ত্র ধারী, প্রসন্ন মনাঃ ও সুগন্ধ ধারী হইবে। সাধু বেশ ও শোভিতকেশ হইবে। মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদ নিত্য তৈল দ্বারা ম্রক্ষণ করিবে। শাস্ত্রোক্ত ধূমপান করিবে। আগন্তুককে তুমিই অগ্রে সম্ভাষণ করিবে, মিষ্টমুখ হইবে। বিপন্নকে আশ্বাস দিবে। অতিথিদিগের পূজা করিবে। পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে। সময় বুঝিয়া হিতকর অথচ পরিমিত ও মধুরার্থ যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিবে। সংযতাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা হইবে। যে কারণে যাহার উন্নতি হইয়াছে, সেই কারণের প্রতি ঈর্ষা করিবে। কিন্তু সেই কারণের ফলের প্রতি ঈর্ষা করিবে না। নিশ্চিন্ত নির্ভীক, লজ্জাশীল, বিমৃষ্যকারী, উৎসাহী, দক্ষ, ক্ষমাবান, ধার্ম্মিক ও আস্তিক হইবে। বিনয়, বুদ্ধি ও বিদ্যা সম্বন্ধে যাঁহাদের উৎকর্ষ আছে, যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, সিদ্ধ ও আচার্য্য— তাঁহাদের উপাসনা করিবে। ছত্র, দণ্ড, উষ্ণীষ ও উপানহ ধারণ করিবে। চলিবার সময় সম্মুখে অন্ততঃ চতুর্হস্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা মঙ্গলাচরণ করিবে। কুৎসিত বস্ত্র, অস্থি, কণ্টক, অপবিত্র কেশ, তুষ, জঞ্জাল, ভস্ম ও কপাল সমূহের নিকট দিয়া যাইবে না। বাসস্থান সকল পরিষ্কার করিবে। শ্রান্তি বোধ না হইবার পূর্ব্বেই শ্রম পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করিবে। ক্রুদ্ধদিগকে অনুনয়ও ও ভীতদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবে। দরিদ্রদিগকে অনুগ্রহ করিবে। সত্যসন্ধ হইবে এবং চতুর্গুণের মধ্যে সামগুণ প্রধানরূপে অবলম্বন করিবে। পরের পরুষ বাক্যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবে, কিন্তু নিজে পরুষ হইবে না। প্রশস্ত গুণসমূহের উৎসাহ দাতা হইবে। রাগ ও দ্বেষের যাহা কারণ— তাহা পরিহার করিবে। অসত্য কহিবে না। পরস্ব গ্রহণ করিবে না। অন্য স্ত্রী অভিলাষ করিবে না। পরশ্রী কাতর হইবে না। বৈরীভাবের কল্পনা করিবে না। পাপ করিবে না। অপকারীরও অপকার করিবে না। পরদোষ কহিবে না। পরের রহস্য প্রকাশ করিবে না। অধার্ম্মিক বা রাজ-বিদ্বিষ্টদিগের সহিত বাস করিবে না। উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণহন্তা, ক্ষুদ্র ও দুষ্ট লোকদিগের সহিত বাস করিবে না। দুষ্টযানে আরোহণ করিবে না। কষ্টকর আসনে বসিবে না। অনাস্তীর্ণ, উপাধানহীন, অপ্রশস্ত বা অসম শয়নে শয়ন করিবে না। গিরি গহনে বা গিরি শিরে বিচরণ করিবে না। বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। উগ্রস্রোতঃ জলে অবগাহন করিবে না। কুলগাছের ছায়া সেবন করিবে না। অগ্ন্যুৎপাতের সন্নিধানে বিচরণ করিবে না। উচ্চহাস্য করিবে না। লোকের সম্মুখে সশব্দ বায়ু নিঃসরণ করিবে না। মুখ না ঢাকিয়া, জৃম্ভন, ক্ষবথু কিম্বা হাস্য করিবে না। নাক খুঁটিবে না। দন্ত বিঘট্টিত করিবে না। নখ বাজাইবে না। অস্থিতে অভিঘাত করিবে না। ভূমি বিখিলন করিবে না। বৃক্ষ বা তৃণ ছিঁড়িবে না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কুৎসিতভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। উজ্জ্বল জ্যোতিঃ পদার্থের প্রতি বা অপবিত্র অপ্রশস্ত অগ্নির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। রাত্রিতে দেবালয়, চৈত্য, চত্বর, চতুষ্পথ, উপবন,

শ্মশান ও বধ্যভূমি সেবা করিবে না। শূন্য গৃহে বা অটবীতে একাকী প্রবেশ করিবে না। পাপাচার স্ত্রী, মিত্র ও ভৃত্যদিগকে ভজনা করিবে না। উত্তমদিগের সহিত বিরোধ করিবে না। নিকৃষ্টদিগের উপাসনা করিবে না। বক্র রুচির অনুসরণ করিবে না। অতি সাহস, অতি নিদ্রা, অতি জাগরণ, অতি স্নান, অতি পান ও অতি ভোজন করিবে না। উর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। সর্প, দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী জন্তুর নিকট থাকিবে না। পূর্ব্ব বায়ু, সম্মুখ রৌদ্র. হিম ও অতি বায়ু পরিহার করিবে। কলহ করিবে না। শ্রান্তি ও ঘর্ম্মের নিবৃত্তি না হইলে স্নান করিবে না। অকাচা কাপড়ে মাথা মুছিবে না। অকাচা কাপড় পরিধান করিবে না। রত্ন, ঘৃত, পূজা দ্রব্য, মাঙ্গল্য দ্রব্য ও পুষ্প স্পর্শ না করিয়া বাহির হইবে না। হস্তে রত্ন ধারণ না করিয়া, অস্নাত হইয়া,বস্ত্রত্যাগ না করিয়া, জপ না করিয়া, হোম না করিয়া, দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া, পিতৃ, গুরু ও উপাসিতদিগকে দান না করিয়া, পবিত্র গন্ধ দ্রব্য ও মাল্য পরিধান না করিয়া, পাণি, পাদ ও বদন প্রক্ষালন না করিয়া, শুদ্ধ মুখ ও উত্তর মুখ না হইয়া ভক্ষণ করিবে না। অপমানিত, অভক্ত, অশিষ্ট, অশুচি ও ক্ষুধিত পরিচরের সমীপস্থ হইয়া, অমেধ্য ভোজন পাত্রে, অকালে, অস্থানে, আপন প্রভৃতি জনপূর্ণ স্থানে ভোজন করিবে না। অগ্নিকে ভোজনাগ্রভাগ না দিয়া, অন্নকে প্রোক্ষণ জলদ্বারা প্রোক্ষিত ও মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত না করিয়া ভোজন করিবে না। শত্রুর আনীত অন্ন ভোজন করিবে না। শুষ্ক বা বাসি অন্ন ভোজন করিবে না। রাত্রে দধি ভোজন করিবে না। দিবসে কেবল ছাতু খাইয়া থাকিবে না। রাত্রে ছাতু খাইবে না। ভোজনের পর ছাতু খাইবে না। দন্তদ্বারা চর্ব্বণ না করিয়া ভোজন করিবে না। শরীর বক্র ভাবে রাখিয়া হাঁচিবে না, ভোজন করিবে না বা শয়ন করিবে না। মল মূত্রের বেগ হইলে উহা পরিত্যাগ না করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। পথে প্রস্রাব করিবে না। রজস্বলা, আতুরা, অপবিত্রা ও অন্যকামা স্ত্রীতে গমন করিবে না। পরস্ত্রীতে গমন করিবে না। প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে স্ত্রীগমন করিবে না। ইন্দ্রিয়ের বশ হইবে না। চঞ্চল মনকে অধিক চঞ্চল করিবে না। বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দিগকে অধিক ভারগ্রস্ত করিবে না। অত্যন্ত দীর্ঘ সূত্রী হইবে না। ক্রোধ ও হর্ষ হইলেই তদনুসারে কার্য্য করিবে না। ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান, দান, মৈত্রী, কারুণ্য ও হর্ষোৎপাদন দ্বারা শান্তিপরায়ণ হইবে।" ইহা ভিন্ন চরকে সদবৃত্ত অধ্যায়ে আরও অনেক উপদেশ বর্ণিত আছে, আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে যে গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়— তাহাই সংক্ষেপ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

এই উপদেশের পরে ত্রিবিধ এষণার উপদেশ। এষণা শব্দের অর্থ চেষ্টা বা অন্বেষণ। পুরুষের উচিত যে, মন, বুদ্ধি, পৌরুষ ও পরাক্রম অব্যাহত রাখেন এবং ইহ-পরলোকে মঙ্গলার্থী হইয়া তিনটি এষণার অনুসরণ করেন। ঐ তিনটি এষণার নাম প্রাণৈষণা, ধনৈষণা ও পারলৌকৈষণা। ইহার মধ্যে প্রাণৈষণা বা প্রাণ রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে অনুসরণীয়। এই জন্য সুস্থ ব্যক্তির

উচিত স্বাস্থ্যের অনুপালন করা এবং পীড়িতের উচিত পীড়ার শান্তিবিধান করা। ইহার পরই দ্বিতীয় এষণা বা ধনৈষণার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কারণ ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয় ও দীর্ঘায়ুলাভ ঘটে না। তাহার পর তৃতীয় এষণা বা পারলোকৈষণার অনুসরণ করিতে হয়। ইহলোক হইতে চ্যুত হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে উৎপন্ন হইব কিম্বা উৎপন্ন হইব কিনা এ সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্তির দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোম ও আত্মার সমবায় হইতেই গর্ভের উৎপত্তি হয়, এবং আত্মার সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে। কর্ত্তা ও কারণ—এই উভয়ের যোগেই ক্রিয়া হয়। কৃতকর্ম্মের ফল আছে, অকৃত কর্ম্মের ফল নাই। বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। এজন্য পরজন্ম স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। পরজন্ম স্বীকার করিতে হইলে ধর্ম্মবুদ্ধি পরায়ণ হইতেই হইবে। পারলোকৈষণা তাহারই জন্য অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। চরকের এই তিনটি এষণা যিনি অনুসরণ করিতে পারেন, তিনি ইহলোকে নীরোগ ও সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারেন।

চরক বলিয়াছেন,—আহার, সুনিদ্রা ও ইন্দ্রিয় দমন - এই তিনটি শরীরের উপস্তম্ভ বা ধারক। এই তিনটি উপস্তম্ভ যুক্তি পূর্ব্বক ব্যবহৃত হইলে আয়ু শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে বল-বর্ণের উপচয় হয়। এই কারণের অহিত ব্যবহারই রোগ। এই রোগ আবার সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, নিজ, আগন্তু ও মানস। যে সকল রোগ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহারা নিজ রোগ মধ্যে গণ্য। ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদি হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহারা আগন্তু রোগ। আর প্রিয় বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর সমাগম হইতে মানস রোগ উৎপন্ন হয়। রোগস্থান বা রোগ মার্গ তিন প্রকার, শাখা, মর্ম্মাস্থি সন্ধি ও কোষ্ঠ। শাখা শব্দের অর্থ রক্তাদি সপ্তধাতু ও ত্বক। ইহারাই রোগের বাহ্য মার্গ। বস্তি, হৃদয় ও মস্তক প্রভৃতি মর্ম্মস্থান সকল এবং অস্থি সন্ধি, অস্থি সংযোগ সমূহ মধ্যম রোগ মার্গ। কোষ্ঠের অন্যান্য নাম মহা স্রোতঃ, শরীর মধ্য, মহা নিম্ন ও আম পক্কাশয়। ইহাই হইল আভ্যন্তরিক রোগমার্গ। গলগণ্ড, পীড়কা, অপচী, চর্ম্মকীল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, অলসক, কুষ্ঠ রোগ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি বাহ্য রোগ—বাহ্য মার্গজাত। বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগ শাখানুসারী। পক্ষাঘাত, অঙ্গগ্রহ, অপতানক, অর্দ্দিত, শোথ, রাজযক্ষ্মা অস্থি শূল, সন্ধি শূল, গুদ ভ্রংশাদি রোগ এবং শিরোগত, হৃদগত ও বস্তিগত রোগাদি মধ্যম মার্গানুসারী। জ্বরাতিসার, বমি, অলসক, বিসূচিকা, শ্বাস কাস, হিক্কা, আনাহ, উদর, ও প্লীহাদি রোগ এবং অন্তর্মার্গজাত বীসর্প, শোথ, গুল্ম, অর্শ ও বিদ্রধি প্রভৃতিকেও কোষ্ঠ মার্গানুসারী রোগ বলা যায়। ইহাদের চিকিৎসার জন্য চরক ৩ প্রকার ঔষধের উল্লেখ করিয়াছেন—দৈব ব্যপাশ্রয়, যুক্তি ব্যপাশ্রয় ও সত্ত্ববিজয়। মন্ত্র, ওষধিধারণ; রত্ন ধারণ, মঙ্গলাচরণ এবং বলিপূজা—হোম-নিয়ম-প্রায়শ্চিত্ত উপবা

স্বস্ত্যয়ন প্রণিপাত-তীর্থ যাত্রাদিকে দৈব ব্যপাশ্রয়, যুক্তি পূর্ব্বক পথ্য ও ঔষধ যোজনার নাম যুক্তি ব্যাপাশ্রয়, আর অহিত বিষয় হইতে মনকে সংযত করায় নাম বা শান্তির নাম সত্ত্ব বিজয়। বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইলে শরীরে যে সকল রোগ হয়, তাহাদের প্রতিকারার্থ যে সকল ঔষধের প্রয়োজন তাহাও ত্রিবিধ। অন্তর্ম্মার্জ্জন, বহির্ম্মার্জ্জন ও শস্ত্র প্রণিধান। যে সকল ঔষধ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আহারজাত ব্যাধি সকলকে নষ্ট করে, তাহাদের নাম অন্তর্ম্মার্জ্জন, যে সকল ঔষধ স্পর্শনেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া অভ্যঙ্গ; স্বেদ, প্রলেপ, পরিষেক ও উদ্বর্ত্তন প্রভৃতি সহ রোগ নষ্ট করে—তাহাদের নাম বহিঃ পরিমার্ম্মার্জ্জন। আর শস্ত্র দ্বারা ছেদন, ভেদন, বন্ধন, বিদারণ, লেখন, উৎপাটন, পৃচ্ছন, সীবন, এষণ এবং ক্ষার ও জলৌকাদিগকে শস্ত্র প্রণিধান কহে। চিকিৎসা কার্য্যে এই তিন প্রকার চিকিৎসাই প্রয়োজনীয়। চরকে শস্ত্রদ্বারা চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত না হইলেও ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষির গবেষণা এই সকল কথায় কিরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়। ধীমান, বৈরাগ্যপরায়ণ কৃষ্ণাত্রেয় এষণা, উপস্তম্ভ, বল, কারণ, রোগ, রোগমার্গ, বৈদ্য এবং ঔষধ এই আটটি বিষয়ের প্রত্যেকটিকে তিন তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই উপর চিকিৎসায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

বায়ু, পিত্ত, কফের বিচার নির্ণয়ই চরকের প্রধান চিকিৎসা। ইহাদিগের পরিচয়ে এক কথায় যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্র সমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়, তাহারই নাম বায়ু। পিত্ত অল্প স্নেহযুক্ত, উষ্ণ, দাহকত্ব প্রভৃতি তীক্ষ্ণ গুণ যুক্ত, দ্রব, অম্ল সারক স্বভাব এবং কটু। শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, ও পিচ্ছিল। এই তিনটির বিকৃতি-বৈষম্যই সকল রোগের নিদান। ইহাদিগের মধ্যে আবার বায়ুই প্রধান, কারণ বায়ুর বিকৃতি ভিন্ন কোনো প্রকার ব্যাধিরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এক কথায় সকল প্রকার রোগকেই বাতব্যাধির মধ্যে ধরা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে হৃদয়, নাভি, পার্শ্ব, উদরে শূল, তৃষ্ণা, উদগার বিসূচিকা, কাস, কণ্ঠ শোষ ও শ্বাস উপস্থিত হয়। এই সকল রোগের চিকিৎসা প্রথমতঃ রুক্ষ স্বেদ ও পরে স্নিগ্ধ স্বেদ। কারণ আমাশয় কফের স্থান, বায়ু উহাতে আগন্তু মাত্র। পক্কাশয়স্থ বায়ু কুপিত হইলে অন্ত্র কুজন, শূল, আটোপ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পুরীষকৃচ্ছ্র, আনাহ, ত্রিক বেদনা এবং কণ প্রভৃতির শক্তি লোপ হইয়া থাকে। কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে মূত্র-বিষ্ঠার বিবন্ধ, ব্রধ্ন, হৃদ্রোগ গুল্ম, অর্শ ও পার্শ্বশূল, হইয়া থাকে। আমাশয় গ্রহণী, অন্ত্র, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয় উন্দুক ও ফুসফুস ইহাদিগের নাম কোষ্ঠ। ত্বকস্থ বায়ু কুপিত হইলে ত্বক, রুক্ষ, স্ফুটিত, সুপ্ত, কৃশ, কৃষ্ণ ও তোদ যুক্ত এবং আতৃত ও রক্তবর্ণ হয়। বায়ু রক্তগত হইলে তীব্র বেদনা, সন্তাপ, বৈবর্ণ, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে অরুংষি নামক ব্রণ সমূহের উদয় এবং ভোজনের পর শরীরের স্তব্ধতা হইয়া থাকে।

মাংস মেদোগত বায়ু কুপিত হইলে অঙ্গ সমূহের গুরুতা এবং দণ্ডাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাতের বেদনার ন্যায় বেদনা উপস্থিত হয়, ইহা ভিন্ন অত্যন্ত শূল ও শ্রমবোধ হইয়া থাকে। মজ্জাগত ও অস্থিগত বায়ু কুপিত হইলে অস্থি ও পর্ব্ব সমূহের ভেদ, সন্ধিশূল, মাংস ও ক্ষয়, অনিদ্রা ও সতত বেদনা হয়। শুক্র সহ বায়ু কুপিত হইলে শুক্র ও গর্ভ শীঘ্র শীঘ্র মুক্ত হয় বা বদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা শুক্র ও গর্ভ—উভয়েরই বিকার উপস্থিত করে। স্নায়ুগত বায়ুর প্রকোপে পক্ষাঘাত রোগ উৎপন্ন হয়। ধনুষ্টঙ্কারও এইরূপ বায়ুর বিকৃতির ফল। শিরাগত বায়ুর প্রকোপে শরীরে অল্প বেদনাযুক্ত শোথ, শরীর শুষ্ক ও স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং শিরা সকল সুপ্ত ও তনু বা স্থূল হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলে বাত পূর্ণদৃতির ন্যায় স্পর্শ বিশিষ্ট শোথের উৎপত্তি সন্ধিগত বায়ুর প্রকোপের পরিণাম। আমবাত রোগ এইরূপ বায়ু বিকৃতির ফলে হইয়া থাকে। ফল কথা দেহে সকল প্রকার রোগের উৎপত্তির কারণই বায়ুর বিকৃতি। ধাতুক্ষয় হেতু বা মার্গরোধ হেতু বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহের সর্ব্ব স্রোতেরই অনুসরণ করিয়া দেহকে রক্ষা করিতেছে। বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তকে বহন করিয়া স্রোতঃ সমূহের মধ্যে যখন আক্ষিপ্ত করে, তৎকালে বায়ুর সঞ্চারণ পথ পিত্ত ও কফ কর্ত্তৃক আবৃত হওয়াতে রসাদি ধাতু সকল শুষ্ক হইয়া রোগ সকল উৎপন্ন করে। যেমন ইহ জগতে বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র বিকৃত হইলে জগৎ পীড়িত ও অবিকৃত থাকিলে জগৎ ধারণ করে, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইলে দেহকে পীড়ন ও অবিকৃত থাকিলে দেহকে ধারণ করে। এই বায়ু, পিত্ত, কফের প্রধান আশ্রয় মানুষের বস্তি, হৃদয় ও মূর্দ্ধা। অতএব চরকের মতে চিকিৎসা করিতে হইলে স্থান সম্বন্ধ অগ্রে বুঝিতে হইবে। এই স্থান সম্বন্ধ বুঝিয়া সাত্ম্য ও অসাত্ম্য বিচারপূর্ব্বক যিনি চিকিৎসা করিতে সক্ষম তিনিই চিকিৎসা ক্ষেত্রে যশস্বী হইয়া থাকেন। সাত্ম্য ও অসাত্ম্যের বিচার বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও চিকিৎসা করা যায় না। বায়ু, পিত্ত ও কফ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরস্পরকে সাত্ম্য বলিয়া পরস্পরকে নষ্ট করে না। এ কথার প্রমাণ, সর্পবিষ অন্যের শরীরে প্রাণঘাতী হইলেও উহা সর্পের সাত্ম্য বলিয়া সর্পকে নষ্ট করে না। ফল কথা ধাতুর বৈষম্যই রোগ এবং সমধাতু দিগের স্থিরতা সম্পাদনের জন্যই চিকিৎসার প্রয়োজন। চিকিৎসা কুশল বৈদ্য ইহা বিবেচনা করিয়া রোগীর রোগ-যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিবেন—ইহাই মহর্ষি পুনর্ব্বসুর সার উপদেশ।

চরকে সকল রোগের নাম ও লক্ষণ বলিয়া সকল রোগের বিশেষ বিবরণ বিশদ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। যে সমস্ত রোগের কথা বিশদভাবে উল্লিখিত হয় নাই—চিকিৎসক বায়ু, পিত্ত, কফের লক্ষণ দেখিয়া যুক্তি পূর্ব্বক সেই সকল রোগের চিকিৎসা করিবেন, ইহাও পুনর্ব্বসুর উপদেশ। যথা

রোগা যে হপ্যত্র নোদিষ্টা বহুত্বান্নাম রূপতঃ।
তেষামপ্যেতদেব স্যাদ্দোষাদীন বীক্ষ্য ভেষজম॥

চরক চিকিঃস্থাঃ ১৯৬ শ্লোঃ

এই কথা বলিয়া চরক চিকিৎসার ইঙ্গিত করিয়াছেন,—"মুখ হইতে আমাশয় পর্য্যন্ত, নাসিকা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং মলদ্বার হইতে উর্দ্ধসীমা পর্য্যন্ত যে সকল রোগ আশ্রয় করে, সেই সকল আভ্যন্তর রোগকে ঔষধের আভ্যন্তর প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র অথচ উত্তমরূপে হরণ করা যায়। শরীরের বাহ্য প্রদেশে যে সকল বীসর্প ও পিড়কাদি হয়, স্থান বুঝিয়া প্রলেপাদির প্রয়োগে তাহাদের বিশেষরূপ প্রশমন হইয়া থাকে, ইত্যাদি। চরকের চিকিৎসা স্থানে সকল রোগের উল্লেখ না থাকিলেও চরকের আদ্যন্ত পাঠ করিলে কোনো রোগের চিকিৎসাই চরকে বাদ পড়ে নাই বুঝিতে পারা যায়। ক্রিমি, বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের নিদান ও ঔষধ বিমান স্থানের অষ্টমাধ্যায়ে, ভগন্দর, গণ্ডমালা, স্ফোটক, প্রভৃতি শোথোঽধ্যায়ে, শূল রোগের সংখ্যা প্রভৃতির নির্দ্দেশ গ্রহণী রোগাধিকারে এবং বাত ব্যাধির পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অম্লপিত্ত—চরকে গ্রহণীরোগের অন্তর্নিবিষ্ট। গর্ভিণী, বালক, প্রসূতি ও ধাত্রীর চিকিৎসা—শারীর স্থানের অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত। হৃদ্রোগ মূত্রাঘাত এবং যে সকল শিরোরোগের কথা যথাস্থানে বিবৃত হয় নাই—তাহা বায়ু রোগ ও সিদ্ধি স্থানের নবম অধ্যায়ে উপদিষ্ট। সুতরাং চরকে সকল রোগের চিকিৎসাই যে বিবৃত হইয়াছে, তাহা উত্তম বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের বুঝিতে কষ্ট হয় না। চরক বলিয়াছেন, বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ভেদে সকল রোগের চিকিৎসাই তিন প্রকার, অতএব চিকিৎসা স্থানে কোনো রোগের চিকিৎসা বিবৃত না থাকিলেও লক্ষণ দৃষ্টে তাহার চিকিৎসা হইতে পারে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ ডাক্তারি এসিয়াটিক কলেরার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এসিয়াটিক কলেরার আয়ুর্ব্বেদীয় নাম বিসূচিকা। এই বিসূচিকার চিকিৎসা চরকে বর্ণিত হয় নাই—কিন্তু ইহার লক্ষণগুলি যদি মিলাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চরকের মতে ইহার চিকিৎসা অতি সহজে করিতে পারা যায়। এসিয়াটিক কলেরায়—

১। বিষ্ঠার বর্ণ আমানির ন্যায় সাদা। চরকের মতে ইহা শ্লেষ্মার লক্ষণ।

২। হঠাৎ বলক্ষয়। চরকে ইহা বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৩। সর্ব্বাঙ্গ শীতল। চরকে ইহা বাত শ্লেষ্মা ও পিত্তের লক্ষণ।

৪। খালধরা। ইহা বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৫। নাড়ী দমিয়া যাওয়া। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৬। অনবরত ও অসহ্য তৃষ্ণা। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৭। অন্তর্দ্দাহ ও অঙ্গ বিক্ষেপ। বাত শ্লেষ্মা প্রকোপের লক্ষণ।

৮। শ্যাব বর্ণ।—বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

৯। সর্ব্বাঙ্গে সূচীভেদবৎ বেদনা। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

১০। শিরঃশূল। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মা প্রকোপের লক্ষণ।

১১। চক্ষু মগ্ন। বায়ু প্রকোপের লক্ষণ।

১২। স্বরভঙ্গ। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মার প্রকোপ।

করা উচিত। যাহাতে তাঁহাদেরও রীতিমত কোষ্ঠ সরল থাকে, এরূপ আহারাদি করিতে হইবে, এবং গোদুগ্ধ পান করিতে থাকিলে, ঐ দুগ্ধের সহিত একটু সরও বেশ করিয়া গুলিয়া খাওয়ান আবশ্যক। তদ্ভিন্ন সদ্যঃ মল পরিষ্কারের আবশ্যক হইলে পানের বোঁটা অথবা এক টুক্‌রা নরম সাবান সরু বাতির মত করিয়া কাটিয়া শিশুর মলদ্বারেপ্রবেশ করাইয়া দিলে অল্পক্ষণ মধ্যেই মল পরিষ্কার হইয়া থাকে।

যে সকল শিশুর যকৃতের ক্রিয়ার দোষে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে দশ পনের ফোঁটা করিয়া 'কালমেঘের' রস অথবা শিউলী পাতার রস, ফোঁটা কত মধুর সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শিশুর পেট-কামড়ান।

অনিয়মিত আহার বা অতিভোজন কিম্বা অধিক পরিমাণে দুগ্ধ বা দূষিত মাতৃস্তন্য পান করিলে, অথবা পেটের মধ্যে কৃমি জন্মিলে কিম্বা রীতিমত মল পরিষ্কার না হইলে শিশুদিগের পেটে শূল বেদনা অর্থাৎ পেট কামড়াইতে থাকে। পেটে ব্যথা আরম্ভ হইলে শিশু পেটটাকে শক্ত করে ও হাঁটু গুটাইয়া পেটের উপর চাপ দিতে চেষ্টা করে, কখনও বা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে থাকে।

আহারের অনিয়মে পেটব্যথা আরম্ভ হইলে গোটাকত যোয়ান, একটা গোলমরিচ ও অতি সামান্য একটু সৈন্ধব লবণ বেশ করিয়া বাঁটিয়া জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে অথবা ফোঁটা চার পাঁচ যোয়ানের আরক জল মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিলে তখনই পেটের ব্যথা ভাল হইয়া যায়, হজমও বেশ হয়।

আর যদি শিশুর ভাল দাস্ত না হওয়ার জন্য, অথবা একেবারে মল বদ্ধ থাকার জন্য পেট কামড়াইতে থাকে, তবে পেটে একটু গরম সর্ষপতৈল বা তারপিন তৈল মালিস করিয়া দিবে এবং একটু গরম ন্যাক্‌ড়া খুব গরম জলে ভিজাইয়া বেশ করিয়া নিঙ্‌ড়াইয়া গরম গরম স্বেদ দিতে থাকিবে। এইরূপ করিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে।

অচিরজাত শিশুর মলবদ্ধের জন্য পেট কামড়াইতে থাকিলে, একটা "মুক্তাবর্ষীর" পাতা রগড়াইয়া বালকের মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে, অথবা পানের বোঁটায় একটু রেড়ির তৈল লাগাইয়া শিশুর মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে—তখনই দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে; পেট ব্যথাও ভাল হইয়া যাইবে। সাবানের সরু বাতি দিয়া দাস্ত পরিষ্কারের কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ডাক্তারেরা এরূপ স্থলে গ্লিসিরিনের পিচকারী দিয়া 'বাহ্যে' করাইয়া থাকেন।

আর যদি পেটফাঁপার জন্য পেট কামড়াইতে থাকে, তবে শিশুর নাভির গর্ত্তটুকু বাদ দিয়া উহার চারিদিকে একটু চূণ লাগাইয়া দিবে; দেখিবে অল্প সময়ের মধ্যেই শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পেটের ফাঁপ চলিয়া গিয়াছে।

শিশুর উদরাময়।

শিশু সকল জন্মাবার পর হইতেই দুই হইতে পাঁচ ছয় বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে, উহা তাহাদের স্বাভাবিক। বেশী বেশী দাস্ত হইতে থাকিলে অসুখ বলিয়া জানিবে।

সকল শিশুরই ছেলেবেলায় পেটের অসুখ হইয়া থাকে। পেটের অসুখ হইলে স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীকে বিশেষ নিয়মে থাকিতে হয়। পেটের অসুখে যে সকল আহারাদি নিষিদ্ধ, সে সকল দ্রব্য জননীকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহাতে মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেন না জননীর মানসিক উত্তেজনা বা অবসাদ ও অনেক সময় শিশুর উদরাময়ের কারণ হইয়া থাকে।

সুস্থ শিশুগণ যে মলত্যাগ করে, তাহার রং হলদে এবং তাহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। যদি মল খুব তরল ও মলের বর্ণ সাদা, কাল, সবুজ বা ছানা ছানা মত, কিম্বা ডিম ডিম মত হয়, তবে তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে, পেট ফাঁপে, বমি করে ও শিশু খুব ছটফট্ করে বা ম্লান হইয়া যায়, তবে তাহার পেটের অসুখ বলিয়া জানিবে এবং শীঘ্রই তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে।

স্তন্যপায়ী শিশুর পেটের অসুখ হইলেই স্তন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিবে ও স্তনদুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে তাহাতে কোন প্রকার দোষ আছে কি না। যদি কিছু দোষ থাকে, তবে (১) পূর্ব্বকথিত উপায় দ্বারা তাহার প্রতীকার করিবে এবং শিশুর আহারের জন্য পরিশুদ্ধ শটীচূর্ণ (২) অথব খুব ভাল একতোলা বার্লি একসের আন্দাজ জলে গুলিয়া সিদ্ধ করিতে থাকিবে; যখন আধপোয়া আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া একটু একটু করিয়া শিশুকে খাওয়াইতে থাকিবে এবং প্রতিবারে দু'চার ফোঁটা করিয়া চূণের জল তাহার সহিত মিশাইয়া দিবে; কিম্বা বার্লি সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য দু'টী যোয়ান একটু পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া, যখন বার্লি সিদ্ধ করিবে, তখন উহাতে ছাড়িয়া দিবে এবং বার্লি হইয়া গেলে ঐ যোয়ানের পুঁটুলীটী উঠাইয়া লইবে। ইহাতে বালকের খাদ্য শীঘ্র পরিপাক হইবে এবং পেটের অসুখেরও বিশেষ উপকার হইবে।

যেসকল শিশু বিলাতি উপায়ে বোতলের দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, তাহাদের প্রায়ই পেটের অসুখ হইতে দেখা যায়। কেন না বোতল ভাল করিয়া না ধুইয়া সেই বোতলে পুনরায় গরম দুধ পুরিলেই দুধ নষ্ট হইয়া যায়। ঐ বিকৃত দুগ্ধ পানে অচিরে বালকের পেট ফাঁপা, বমি ও অজীর্ণদোষ প্রভৃতি দেখা যায়। সুতরাং বালককে প্রথম হইতেই বোতলের দুগ্ধ পান করাইতে অভ্যাস করান উচিত নয়। তদ্ভিন্ন শিশুদিগের জন্য যে সকল বিলাতী দুগ্ধ বা খাদ্য এদেশে বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে, সে সকল যে অবিকৃত অবস্থায় থাকে, একথাও দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না। ঐ সকল কৃত্রিম শিশুখাদ্য বিকৃত বা নষ্ট হইয়াছে কি না, তাহাও সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। যখন সচরাচর দেখা যায় যে, আহারের দোষেই শিশুদিগের উদরাময় ঘটিয়া থাকে, তখন ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া বিলাতী খাদ্য বা দুগ্ধ শিশুদিগের আহারের জন্য

(১) স্তন্যদুষ্টি-প্রতীকার প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

(২) 'শটীফুড' বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম প্রদেশে পরিশুদ্ধ শটীচূর্ণ 'তীখুর' নামে পরিচিত।

প্রদান করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। অনেকেই 'বিলাতি ফুড' নাম শুনিলেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়েন এবং ভালমন্দ বিচার না করিয়াই শিশুদের ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন। আমাদের মতে ঐ সকল কৃত্রিম শিশুখাদ্য শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রায়ই অনুকূল হয় না। সেজন্য বিলাতী খাদ্যভোজী শিশুগণের যকৃতের দোষ, উদরাময় ও অকাল মৃত্যু পর্য্যন্ত যত অধিক দেখা যায়, তত রোগের বাহুল্য বা অকালমৃত্যু এদেশীয় গোদুগ্ধপায়ী শিশুগণের দেখা যায় না। খাদ্যের কৃত্রিমতার জন্য সহরের শিশুর মৃত্যুসংখ্যাও পল্লীশিশুর মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক বলিয়া আমাদের ধারণা। এখনও পল্লীগ্রামে মাতৃস্তনে দুগ্ধের অল্পতা হইলে গৃহস্থগণ স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু সহরে মাতৃস্তনে প্রভূত দুগ্ধ থাকিলেও যখন সে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বিলাতী বিশুদ্ধ কৃত্রিম দুগ্ধ ভূমিষ্ট হইবামাত্রই শিশুকে পান করান হইয়া থাকে, তখন দুগ্ধের অভাব হইলে তো কথাই নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—আহারের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। সুতরাং শিশুদিগের আহার সম্বন্ধে জননী বা ধাত্রীকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তান স্তনদুগ্ধ পান করিবে, ততদিন জননী বা ধাত্রীর অনুচিত আহার প্রভৃতি পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং স্তনপায়ী শিশুর অজীর্ণ বা উদরাময় দেখা দিলে জননীকেও আহারাদি সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। যে সকল শিশু গোদুগ্ধ পান করে, তাহাদের গোদুগ্ধ বন্ধ করিয়া শটী বা বালি প্রভৃতি দিতে হইবে, এবং শিশুকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বিবেচনা করিলে বালি বা শটীর সহিত অল্প পরিমাণে দুধ মিশাইয়া দিতে পারা যায়।

অতঃপর আমরা উদরাময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অব্যর্থ মুষ্টিযোগ সকল প্রকাশ করিতেছি।

উদরাময়।

সদ্যোজাত শিশু প্রথমে মায়ের স্তনদুগ্ধ খাইয়া যে দিনে চার পাঁচ বার কি ছয়বার পর্য্যন্ত মলত্যাগ করে তাহাকে সাধারণতঃ পেটের অসুখ বলা হয় না। কেন না তখন পাঁচ ছয় বার মলত্যাগই স্বাভাবিক। যদি তাহার বেশী মল হয়, পেট কামড়ায়, সে জন্য শিশু প্রায়ই কাঁদিতে থাকে অথবা পেট ফাঁপে, কখন কখন বা দুধ খাইয়াই ছানা ছানা বমি করিয়া ফেলে। শাদা শাদা কিংবা সবুজ সবুজ অথবা নানা রঙের বহুবার মলত্যাগ করে ও শিশুর মুখ চোক বসিয়া যায় বা ম্লান হয়, তবেই শিশুর উদরাময় হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

উদরাময় হইলেই শিশুর আহারের দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। যেহেতু আহারের দোষেই সাধারণতঃ শিশুদিগের পেটের অসুখ হইয়া থাকে। এজন্য স্তন্যপায়ী শিশুর পেটের অসুখ হইলেই স্তন্যদাত্রী জননী অথবা ধাত্রীর আহার সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম পালন করিতে বলিবে, এবং যাহাতে তাঁহাদের মানসিক কোনও প্রকার অশান্তি বা চিন্তা প্রভৃতি না জাগে, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখিবে।

চিন্তা, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শোক, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইতেই পুনরায় ভোজন প্রভৃতি নানাবিধ অহিতকর আচরণের দ্বারা জননীগণের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে এবং সেজন্য তাঁহাদের স্তনদুগ্ধও বিকৃত হইয়া থাকে। সেই বিকৃত দুগ্ধপান করিলে শিশুরও উদরাময় প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সুতরাং শিশুর স্বাস্থ্যভগ্ন হইলেও সর্ব্বপ্রথমে স্তন্যদাত্রী জননী বা ধাত্রীর স্বাস্থ্য কিরূপ আছে দেখিতে হইবে এবং আবশ্যক মত তাঁহাদের আহারাদির বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে।

যে সকল সন্তান বেশীর ভাগ গোদুগ্ধ অথবা বিলাতী খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদের যদি পেটের অসুখ দেখা যায়, তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ গোদুগ্ধ বা বিলাতী দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। অনেক সময়ে বিলাতী খাদ্য বা টিনের দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিতেই শিশুর উদরাময়ের নিবৃত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। বিলাতী খাদ্য বা দুগ্ধ সব সময়েই যে অবিকৃত অবস্থায় এদেশে আসিয়া থাকে, এমন তো মনে হয় না।

যে সকল বালকের গোদুগ্ধ ব্যতিরেকে অন্য প্রকার খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগের পেটের অসুখ হইলে, গোদুগ্ধের দ্বিগুণ জল ও দুগ্ধ এবং তাহাতে একটুকরা বেলশুঁঠ (কচিবেল খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া লইলেই বেলশুঁঠ হয়) আর গোটাকত যোয়ান ন্যাকড়াতে বাঁধিয়া সবগুলি সিদ্ধ করিতে দিবে এবং খানিকটা জল থাকিতেই দুগ্ধটা নামাইয়া লইয়া বেলশুঁঠ ও যোয়ান তাহা হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দিবে। সেই দুধ একটু বার্লি, সাগু বা শটীর পালোর সহিত মিশাইয়া বারে বেশী ও মাত্রায় কম করিয়া খাইতে দিলেই আহারের জন্য আর শিশুর কোন প্রকার পেটের অসুখ হইবার ভয় থাকিবে না।

উদরাময়ের চিকিৎসা।

বিকৃত মাতৃদুগ্ধ পান করাতে যে সকল শিশুর পেটের অসুখ দেখা দেয় এবং শরীরও একটু জর জর বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকে,—

১। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটী ৵০ দুই আনা পরিমাণে লইয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া শীলে ছেঁচিবে এবং একটী মাটির পাত্রে আধপোয়া জল দিয়া কাঠের জ্বালে সিদ্ধ করিবে। যখন জল মরিয়া আধছটাক আন্দাজ অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া একবারে অথবা দুই তিন বারে শিশুকে পান করাইয়া দিবে। অথবা,—

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপুল বৃহতী, কণ্টকারী চাকুলে ও শুলফা এই সকলের চূর্ণ সমান পরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে মিশাইবে এবং তিন রতি হইতে ছয় রতি মাত্রায় দিনে তিন বার মধু দিয়া বালককে খাওয়াইবে। যে সকল শিশু বহুদিন হইতে পেটের অসুখে কষ্ট পাইতেছে, শরীর খুব দুর্ব্বল ও কিছুই খাইতে চায় না, তাহাদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

১৩। শ্বাস। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মার প্রকোপ।

১৪। মূত্রাঘাত। বায়ু জন্য।

১৫। আধ্মান। বায়ু জন্য।

১৬। তন্দ্রা। বায়ু বা বাত শ্লেষ্মা জন্য।

এজন্য স্থির করা যাইতে পারে, এই রোগ বাত শ্লেষ্মোল্বণ ও ক্ষীণ পিত্ত সন্নিপাত। অতএব তাপ ও স্বেদাদি এবং দশমূলাদি উহার ঔষধ। সকল রোগের চিকিৎসাই এই রূপ লক্ষণ মিলাইয়া করা যাইতে পারে। ফল কথা চরকের চিকিৎসা অপূর্ব্ব চিকিৎসা। এ চিকিৎসার তুলনা নাই। জগতের কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রই চরকের সমকক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু দুঃখের, বিষয় এ হেন অমূল্য চিকিৎসা এখন লুপ্তপ্রায়। ভারতবাসীর দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়,অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু চরকের চিকিৎসারই লুপ্ত ভাবের জন্য,—ডাক্তার ওয়াইজ এবং আমেরিকাবাসী ইংরাজেরা পর্য্যন্ত এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই আমরা এ কথা বুঝিতেছি না, তাই আমরা মহামূল্য রত্ন ভ্রমে আজ কাচের আদর করিতে শিখিয়াছি। এক কথায় আমাদের দুর্গতি—আমাদের মরণের পথ আমরাই যে পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছি—ইহাই খাঁটি সত্য কথা। ইহার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

শিশু-চর্য্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ]

চোক উঠা।

প্রসবের পরেই অথবা কিছুদিন পরে ঠাণ্ডা বা ধোঁয়া প্রভৃতি লাগিয়া অনেক শিশুর চোক উঠিতে দেখা যায়। চোক উঠিলে, চোক ফোলে,লাল হয়, পিচুটী কাটে, জল পড়ে, চোক জুড়িয়া যায়, সেজন্য শিশুর অত্যন্ত কষ্ট হয়, চোকের যন্ত্রণায় সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে ও আলোর দিকে তাকাইতে পারে না।

অনেক স্থলে রমণীর কুচরিত্র স্বামীসহবাসে বিষমেহ (গণোরিয়া) প্রভৃতি, দুষ্টরোগ হইতে দেখা যায়। যদি ঐ দুষ্ট রোগের জন্য প্রসবকালে শোণিত-পূযাদি স্রাব বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে ঐ দূষিত দ্রব্য সংযোগে চোক উঠার মত হইয়া থাকে। তাহাতে বিশেষ যত্ন করিয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা না করাইলে বালকের চোক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন,—

সাধারণ চোক উঠা হইলে,—আমলা, হরীতকী ও বহেড়া খানিকটা জলে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে উহা বেশ করিয়া দুই তিন পুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই জল দ্বারা বালকের চোক দু'টী ভাল করিয়া আস্তে আস্তে ধুইয়া দিবে এবং ঐ ত্রিফলার জল এক ছটাক আন্দাজ লইয়া তাহাতে একরতি আন্দাজ ফিট্‌কিরি মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখিবে, এবং মাঝে মাঝে ঐ জল তিন চা'র ফোঁটা বালকের চোকের ভিতর দিবে। আর মনসাসিজের পাতায় কাজল করিয়া বালককে কাজল পরাইয়া দিবে, এবং রক্তচন্দন ঘষিয়া বালকের চোকের উপর চারিদিকে প্রলেপ দিবে। অথবা,—দারুহরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটি ছাগলের দুধে বেশ চন্দনের মত করিয়া ঘষিয়া চোকের উপর প্রলেপ দিবে। আর যদি চোক বেশী বেশী ফোলা বলিয়া মনে হয়, তবে একখানা আল্‌তা স্তনের দুধে ভিজাইয়া প্রদীপের শিখায় গরম করিয়া ধীরে ধীরে চোকের উপরে স্বেদ দিবে। এইরূপ দিনকতক করিলেই চোক উঠা সারিয়া যাইবে। আর যদি এই সকল ব্যবস্থায় বিশেষ কোন ফল না হয়, দিন দিন চোকের অবস্থা খারাপ হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত চিকিৎসক দিয়া চিকিৎসা করাইবে; নচেৎ পরিণামে বালকের চক্ষু দুইটী জন্মের মত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

শিশুর মূত্রকৃচ্ছ্রতা।

সদ্যোজাত শিশুর ঘন ঘন প্রস্রাব করা স্বাভাবিক। অতএব শিশু একেবারে প্রস্রাব না করিলে অথবা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করিতে থাকিলে, তাহাকে রোগ বলিয়া জানিবে।

যদি শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে পেট ফুলিয়া উঠে এবং তলপেটে মূত্রাশয়ে চাপ দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ করে। তা' ছাড়া, প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যাওয়াতে শিশু অত্যন্ত অস্থির হয়, পা দুইটা গুটাইয়া পেটের কাছে রাখে ও সর্ব্বদা কাঁদিতে থাকে, ঘুমাইতে পারে না, কেবল কোঁথায় এবং সেজন্য কখন কখনও শিশুর জ্বরভাব হইতেও দেখা যায়।

যদি দেখা যায় বালকের মূত্রাশয়ে মূত্র জমিয়া রহিয়াছে অথচ প্রস্রাব হইতেছে না, তাহা হইলে, এক টুক্‌রা কাপড় (গরম কাপড়ের হইলেই ভাল হয়) গরম জলে ভিজাইয়া নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া তলপেটে মূত্রাশয়ের উপর সেক দিতে থাকিবে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলেই প্রস্রাব হইয়া যাইবে। অথবা,—একটা গাম্‌লায় বালকের সহমত অল্প গরম জলে বালকের কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইয়া দিবে তাহাতে প্রস্রাব হইবে।

শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য।

সদ্যোজাত শিশুর দিনে পাঁচ ছয়বার দাস্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি শিশু দিনান্তে একবার কি দুইবার অথবা একদিন অন্তর শক্ত শক্ত বাহ্যে যায়, তাহা হইলে উহার প্রতিকার করা উচিত। নচেৎ নানাবিধ রোগ জন্মিয়া শিশুর স্বাস্থ্য হানি করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ শিশুর জননী বা ধাত্রীর আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন

২। ধাইফল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমান্ ভাগে লইয়া মিশাইবে এবং আধ আনা হইতে এক আনা,—অথবা বালকের একটু বয়স হইলে দুই আনা পর্য্যন্ত মাত্রায় দিনে তিন বার মধু দিয়া চাটাইয়া খাওয়াইয়া দিবে। ইহাতেও বালকের পেটের অসুখ, বমি ও জ্বর প্রভৃতির বিশেষ উপকার হয়। শিশুর জ্বর না থাকিলেও এই ঔষধ দিতে পারা যায়। অথবা,—

৩। মুথা, পিপুল, আতইচ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশাইবে এবং এক আনা মাত্রায়, দিনে তিন বার মধুর সহিত মিশাইয়া শিশুকে লেহন করাইবে। ইহাতে জ্বরাতিসার অর্থাৎ জ্বরের সহিত পেটের অসুখ বমি ও কাসি প্রভৃতি অচিরে আরোগ্য হয়। অথবা—

৪। আমড়ার ছাল, আমছাল ও জামছাল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া এক আনা মাত্রায় দিনে তিনবার অথবা দুইবার মধু দিয়া বালককে সেবন করাইলে শিশুদের পেটের অসুখ ভাল হইয়া থাকে। অথবা—

৫। যে সকল শিশু অনবরত ভেদ ও বমিতে বিশেষ কাতর হইয়া থাকে, তাহাদিগকে,—

কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল,—ইহাদের পাতা বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া থাক।

শিশুর উদরাময়ের জননীর পথ্যাপথ্য।

যে সকল জননীর সন্তানের পেটের অসুখ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যদি ঐ পীড়িত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিম্নলিখিত পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন—

পথ্য—প্রাতে দেড় প্রহরের মধ্যে অর্থাৎ দশটা আন্দাজ সময়ের মধ্যে,—পুরাতন চালের বেশ সুসিদ্ধ ভাত, মশুরীরদাল অথবা কৈ-মাগুর মাছের ঝোল এবং পটোল কচি-বেগুন, কাঁচকলা, ডুমুর ও মোচা প্রভৃতির তরকারী খাইতে পারিবেন। মাছের ঝোলের সঙ্গে গোটাকতক গন্ধভাদুলের পাতা বাটিয়া দিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইচ্ছা করিলে ভাতের সঙ্গে ঘোলও খাইতে পারেন। আর রাত্রিতে,—শটীর পালো, বার্লি, যবের মণ্ড কিংবা পানিফলের পালো খাইবেন। জলখাবারের মধ্যে,—সকালে মিছরীর গুঁড়া দিয়া বেলপোড়া অথবা দাড়িম, কেশুর ও পানিফল এবং বৈকালে বেলের মোরব্বা।

অপথ্য—ঘৃতপক্ব ও গুরুপাকদ্রব্য, লঙ্কার ঝাল অধিক জলপান, গম, মাষকলায়, শাক, আকের গুড়, নারিকেল অধিক লবণাক্তদ্রব্য, গায়ে বেশী করিয়া তেল মাখা, রাত্রিজাগরণ 'পিটে' ও ভাজা পোড়া দ্রব্য, দুই বেলা স্নান বা গা ধোয়া প্রভৃতি।

যাঁহারা সন্তানের সুদীর্ঘজীবন ও অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য কামনা করেন, তাঁহারা ছেলের অসুখে নিজেদের কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। কেহ যেন চিকিৎসক ও ধাত্রীর উপর শিশুর ভার দিয়া মাতৃকর্ত্তব্য হইতে নিশ্চিন্ত না হয়েন।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবনীয়গণ।

[ডাঃ শ্রীশরৎকুমার দত্ত এল, এম, এস]

মেদা ও মহামেদা।

"মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতা-জাতঃ সুপা-ভুবঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদা লক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দোনখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদিতি বিজ্ঞেয়া জিজ্ঞাসা তৎ পরৈর্জনৈঃ
স্বল্পপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতা-মণিঃ॥
মেদাযুগং গুরুস্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম্।
বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্ত বাতজ্বর প্রণুৎ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। মেদা ও মহামেদা গুরু স্বাদু, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধ-বর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল এবং রক্ত-পিত্ত ও বাতজ্বর বিনাশক।

মেদা (Intestines) শব্দের অর্থ (Fat) ও মহামেদা শব্দও প্রায় একার্থ বোধক। আমাদের শরীরে Intestines হইতে চর্ব্বি রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে। Intestines এ যে সকল Villi আছে, তদ্বারা চর্ব্বি প্রথমতঃ মর্দ্দিত (Enulsification) ও পরে Saponification হইয়া Portal System এ প্রবেশ করে ও তথা হইতে রক্তে মিশ্রিত হয়। Intestinal glands হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয় (Succus) Entericus) আমরা খাদ্য দ্রব্যের সহিত যে সকল দূষিত দ্রব্য ভক্ষণ করি, সেই রস তৎসমুদায় বিনষ্ট করে।

মহামেদা (Liver)। আমাদের শরীরে যকৃৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। তদ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। আমরা যে সমস্ত দ্রব্য আহার করি, তাহার সারাংশ প্রথমতঃ রসরূপে শরীরে প্রবেশ করে। সেই রস যকৃতের ভিতর দিয়া প্রবাহিত রক্তরূপে হৃৎপিণ্ডে যায়। এই যন্ত্রই রক্তের লাল কণিকা প্রস্তুতের সাহায্যকারী। এই যন্ত্র হইতে Urea প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই ureaই বাতজ্বরের প্রধান কারণ। পক্কাশয়ে (Intestines) আমাদের ভুক্ত দ্রব্যের উপরি যে ক্রিয়া আরম্ভ হয়, সেই ক্রিয়া যকৃতে শেষ হয়। সুতরাং Intestines ও Liver উভয়েই অনেকটা এক প্রকার ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। পক্কাশয়ের রস (Succus Entericus) যেরূপ অনেক বিষাক্ত দ্রব্য নষ্ট করে, পিত্ত ও তদ্রূপ অনেক দূষিত জিনিস নষ্ট করিয়া থাকে।

কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী।

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভব স্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীর কাকলী কাকোলী তত্র জায়তে
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্।
সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে

যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিৎ ভবেৎ কৃষ্ণা তেদোঽয়-মুভয়োরপি॥
কাকোলী বায়সোলী চ বীরা কায়স্থিকা তথা।
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়স্থা ক্ষীরবল্লিকা।
কথিতা ক্ষীরিণীধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
কাকোলী যুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্র পিত্তশোষ জ্বরাপহম্॥"

দ্রব্যগুণম্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। ইহারা শীত-বীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর রস, গুরু ও পুষ্টি-কারক এবং বাত, দাহ, রক্তপিত্ত শোষ ও জ্বর নাশক।

ক্ষীরকাকোলী ছেদন করিলে এক প্রকার আটা নির্গত হয় এবং ইহা এক প্রকার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট।

ক্ষীরকাকোলী (Pancreas) পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে Pancreas ঔষধ ও খাদ্য রূপে উভয় প্রকারেই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা হইতে সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য Sweet bread প্রস্তুত হয়। এই রসের অভাব মধুমেহ (Diabetes) ব্যারামের কারণ বলিয়া অনেক পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যারামে ইহার রস (Trypsogen) ব্যবহারে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

কাকোলী (Spleen) ফিজিওলজী পাঠে জানা যায় যে, Splenic Internal Secretion Pancreatic Secretion এর সহিত মিলিত হইয়া একত্রে লিভারে যায় এবং এই Splenic Secretion Albu-minoid জিনিসের বিষ হইতে শরীরকে রক্ষা করে। ইহা রক্তের শ্বেত কণিকা প্রস্তুতের সাহায্য করে। রক্তের এই শ্বেত কণিকাগুলি (white corpuscles) আমাদিগকে যে অনেক ব্যারামের হাত হইতে নিস্তার করে—ইহা ধ্রুব সত্য।

দ্রব্যগুণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেদা ও মহামেদা ক্ষেত্রে কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলীর উৎপত্তি। Spleen এবং Pancreas উভয়েই মেদা ও মহামেদা (Intestines ও Liver) ক্ষেত্রে প্রকৃতই উৎপত্তি হইয়াছে কারণ Spleeno-Pancreatic Duct Portal System গিয়া মিলিত হইয়াছে।

জীবন্তী।

আয়ুর্ব্বেদে জীবন্তী নামে কতকগুলি বস্তু বুঝায়। জীবন্তী এক প্রকার শাক বিশেষ। হরীতকী ও গুড়ূচী এই দুইটী দ্রব্যের জীবন্তী আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রব্য গুণে ইহার নিম্নলিখিত বর্ণনা আছে।

"জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যনামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা।
চক্ষুষ্যা গ্রাহিকা বল্যা লঘ্বী ধাতুবিবর্দ্ধিনী॥
বৃষ্যা কফকরী শুক্রবর্দ্ধিনী রক্ত-পিত্তহা।
বাতং ক্ষয়ং জ্বরংদাহং নেত্র রোগং ত্রিদোষকম্॥
রক্তদোষং ভূত বাধং পিত্তঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।
ফলং চাস্যা ধাতু-বৃদ্ধিকারকং মধুরং গুরু॥"

দ্রব্যগুণ

"গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। ইহা শীতবীর্য্য, মধুর রস মধুর বিপাক, স্নিগ্ধ, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, বলকারক, লঘু,

ধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, কফজনক,ও পারদবর্দ্ধক এবং ইহা দ্বারা, পিত্ত, বাতজরোগ, ক্ষয়, জর, দাহ, নেত্ররোগ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভূতবাধা ও পিত্ত দোষ নিবারিত হয়।"

জীবন্তী (kidney) যেরূপ জীবন্তী রক্তের দূষিত জিনিস নষ্ট করে, তদ্রূপ kindney Extract মূর্চ্ছা ও Urwmia প্রভৃতি রক্তদুষ্টি জনিত ব্যাধির উপশম করে। শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গত করিবার জন্য মূত্রযন্ত্রের অত্যধিক চালনা জনিত Chronic Brights Disease প্রভৃতি যে সব ব্যাধির উৎপত্তি হয়, ইহার ব্যবহারে সেই সকলের উপশম হইয়া থাকে। ইহার (kidney) আস্বাদ সুস্বাদু, ইহাই জীবন্তী।

যষ্ঠীমধু।

"যষ্ঠীমধু তথা যষ্টিংমধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকং তত্তু ভবেৎ তোয়ে মধূলিকা
যষ্টির্হিমা গুরুঃস্বাদী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দি তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা॥"
শোষদাহারুচিঘ্নী চ কাসানাঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

যষ্ঠীমধু (Thymus gland) মনুষ্যের বাল্যজীবনে দ্রব্যগুণ Theymus gland এর ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা অস্থিসমূহে Phosphorus প্রদান করিয়া তাহাদের পুষ্টিসাধন করে। ইহার অভাবে Rickets প্রভৃতি ব্যারামের উৎপত্তি হয়, Thyroid gland এর কার্য্যের অভাব উপস্থিত হইলে ইহা তাহার কার্য্য অনেক অংশে পূরণ করে। Rickets ব্যারামে শরীরের পুষ্টি হয় না যষ্টিমধুরও ক্ষয়নাশক গুণ আছে।

জীবনীয়গণের মধ্যে প্রথম আটটীকে অষ্টবর্গ বলে ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যেরূপ এই আটটীর মধ্যে দুইটী জিনিসের ক্রিয়া একরূপ, তদ্রূপ প্রাণীশরীরস্থিত ৮টী জিনিষের মধ্যে Adrenal ও Pituitary body, Thyroid ও owary বা Tesicle, Spleen ও Pancreas, Intestines or Liver ২।২টী জিনিসের ক্রিয়া যে একরূপ ইহা উল্লিখিত হইল। যেরূপ জীবনীয়গণের মধ্যে জীবন্তী ও যষ্টীমধু এই দুইটীর পৃথক পৃথক্ বর্ণনা আছে, সেইরূপ প্রাণীশরীরস্থিত জিনিসগুলির মধ্যে Kidney ও Thymus এই দুইটীর পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনীয়গণের ক্রিয়া প্রধানতঃ ক্ষয় ও রক্তদুষ্টি নিবারক এবং অধিকাংশের ক্রিয়াই প্রায় একরূপ, বর্ণনায় সামান্যতঃ প্রভেদ আছে। প্রাণীশরীরস্থিত পদার্থগুলিরও ক্রিয়া রক্তদুষ্টি ও ক্ষয় নিবারক এবং উহাদের ক্রিয়ার বর্ণনায় ও বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। মনুষ্য শরীর পঞ্চভূত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা যে যে উপাদানে গঠিত, উদ্ভিদ জগতে সেই সেই জিনিস থাকা অসম্ভব নহে। আর্য্য ঋষিগণ প্রধানতঃ হিমালয় ও তন্নিকটবর্ত্তী গহন কাননে বাস করিতেন। তাঁহারা ঔষধ সম্বন্ধে এত উন্নতি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে. মনুষ্য শরীরের যে যে অংশ যে যে উপাদানে নির্ম্মিত,সেই সেই উপাদান তাঁহারা উদ্ভিদ জগতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা সেই সমস্ত মহামূল্য বস্তু হারাইয়া নিশ্চেষ্ট আছি। সোমলতাও এইরূপ একটী অমূল্য

মুখ্য ঔষধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল বাজারে অনেকেই সোমলতারিষ্ট প্রস্তুত করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে হইলে পুনশ্চ আমাদিগকে মহর্ষিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। ইহা দেশের শিক্ষিত মহোদয়গণের উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।*

[কবিরাজ শ্রীইন্দু ভূষণ সেনগুপ্ত, এচ্, এম্, বি]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্বরে—

১৯। কটকী, মুথা, যবতণ্ডুল, আকনাদি ও কটফল ইহাদের কাথ পিত্তজ্বরনাশক। এই ঔষধ আমরা বহুস্থলে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

২০। গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া ও সেফালিকা পত্র—এই সমস্ত দ্রব্য একত্র থেঁতো করিয়া কলার পত্রে জড়াইয়া, তাহার উপর অল্প মাটির লেপ দিয়া, অগ্নিতে পুটদগ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহার রস করিয়া সেবনে বহুকাল জাত জ্বর আরোগ্য হয়।

২১। গুলঞ্চ, হেলেঞ্চা, পটোলপত্র, থানকুনি ও ক্ষেৎপাঁপড়া উপরি লিখিত প্রণালীতে সেবনে দুরারোগ্য যে বিষম জ্বর তাহাও ৭।৮ দিনে আরোগ্য হয়। এই ঔষধ দুইটী আমাদের বহু পরীক্ষিত। এই যোগ দুইটী বিষম জ্বরের অমোঘ ঔষধ।

২২। ভৃঙ্গরাজ মূলের সাতটী খণ্ড করিয়া, এক একটী খণ্ড এক টুকরা আদার সহিত সেবন বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

২৩। পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ ইহাদের কাথ—বাতশ্লেষ্ম জ্বরনাশক।

২৪। মুথা, বাসক, গুলঞ্চ, শুঁঠ, বালা, ক্ষেৎপাঁপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী ও দুরালভা ইহাদের কাথ বাতশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট করিতে অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন।

২৫। বেলছালের কাথ—বাতশ্লেষ্মা জ্বরে হিতকর।

২৬। বাকসছাল, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ—ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবনে কফজ্বর নষ্ট হয়। কাসেও ইহা সেবনে উপকার হয়।

২৭। ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ পান করিলে পিত্ত জ্বর নষ্ট হয়। পিত্তজ্বরে আমরা দুই তোলা ক্ষেৎপাঁপড়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ তোলা থাকিতে নামাইয়া সেবন

---

* আমার পিতামহ ইটালির স্বনামখ্যত কবিকল্প কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণ পুঁথি হইতে সংগৃহীত।—লেখক।

করাইতে উপদেশ দিয়া বেশ ফল পাইয়াছি।

হিক্কায়—

২৮। কুলের আঁটীর শাঁস, সৌবীরাঞ্জন, খৈচূর্ণ একত্রে মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা উপশমিত হয়।

২৯। শুঁঠ ও হরীতকী বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়।

৩০। যবক্ষার ও মরিচ বাটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

৩১। কাঁচা হরিদ্রার পত্র তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া অগ্নি সংযোগে তামাকের ন্যায় ধূম পান করিলে প্রবল হিক্কায় উপকার দর্শে।

৩২। অর্জ্জুনছালের কাথ পান করিলে হৃদ্রোগের শান্তি হয়। ছালের পরিমাণ দুই তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

৩৩। শালপাণি ও বেড়েলার কাথ কিঞ্চিৎ মিছরির সহিত সেবনে হৃদ্রোগের উপকার হয়। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

রক্তগুল্মে—

৩৪। দুইতোলা আমলকীর রস এক-আনা মরিচ চূর্ণ সহ সেবনে রক্তগুল্ম ভাল হয়।

বমন রোগে—

৩৫। শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, বালা, শুঁঠ ও বাসক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত ও সিদ্ধির সহিত পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়।

৩৬। হরীতকী চূর্ণ মধুর দ্বারা লেহন করিলে বমন নিবারিত হয়।

স্বরভেদে—

৩৭। দারুচিনি, মুথা, এলাইচ ও ধনে ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়।

৩৮। ব্রাহ্মীশাকের রস কিঞ্চিৎ মধুসহ এবং বচ, হরীতকী, বাসক, পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবনে স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়। সাত আট দিন সেবনে কণ্ঠস্বর পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমরা অনেক রোগীকে এই যোগ সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

৩৯। কৃষ্ণ তিল বাটা ২ তোলা পরিমাণ, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে অর্শে উপকার হয়।

৪০। হরিদ্রা ও ঘোষালতা চূর্ণ সর্ষপ তৈল দ্বারা লেপন করিলে গুদাঙ্কুর নষ্ট হয়।

৪১। পিপুল, সৈন্ধব, কুড় ও শিরীষ ফল এই সকল মনসা পাতার রস ও আকন্দের ক্ষীর দ্বারা গুদাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। এই ঔষধ আমরা ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাইয়াছি।

রক্তপিত্তে—

৪২। বাসক পাতার রস অর্দ্ধছটাক কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবনে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

৪৩। বাসক, কিস্‌মিস্‌ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চিনি ও মধু সহ পান করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ইহা আমরা কাসে, শ্বাসে ও রক্তপিত্তে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে—

৪৪। আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে

নাসিকা হইতে রক্ত আর বিনষ্ট হয়। ইহাও আমাদের বহু পরীক্ষিত।

যক্ষ্মায়—

৪৫। ত্রিকটু (শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ,) চূর্ণ সমভাগে দুই আনা মাত্রায় লইয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে যক্ষ্মা ভাল হয়। এই ঔষধ দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিতে হয়।

৪৬। গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া, শুঁঠ, পল্‌তা ও বেল ছাল ইহাদের কাথ সেবনে যক্ষ্মা রোগীর জ্বর ভাল হয়।

কাসে—

৪৭। কণ্টকারীর কাথ, পিঁপুল চূর্ণ সহ পান করিলে কাস নষ্ট হয়।

৪৮। পিঁপুল, পদ্মকাষ্ঠ, কিস্‌মিস্‌, বৃহতী ফল ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে কাস নিবারিত হয়।

পাঁচড়ায়—

৪৯। তিল উত্তমরূপে বাটিয়া পাঁচড়ার মুখে প্রলেপ দিলে অল্পদিনের মধ্যে পাঁচড়া ভাল হয়।

৫০। থুল কুড়ির পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অতি সত্বর পাঁচড়া নষ্ট হয়।

চুলকণায়—

৫১। চালমুগরার তৈল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন গায়ে মর্দ্দন করিলে চুলকণা ভাল হয়।

ক্রিমিরোগে—

৫২। নিমপাতার রস কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

৫৩। পলাশবীজ ১ তোলা, ৷৷৹ পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ৵৹ ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবনে ক্রিমি নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

পরমায়ু প্রসঙ্গ

বা

মানুষ মরে কেন ?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয় কুমার বিদ্যাবিনোদ, ধন্বন্তরি]

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

আয়ুর্ব্বৃদ্ধির উপায়।

দীর্ঘ জীবন লাভ সম্বন্ধে বিজ্ঞ চাণক্য কি লিখিয়াছেন, দেখুন,—

সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্
ঘৃত মুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্।

ইহার অর্থ এই—টাটকা মাংস। নূতন চাউলের অন্ন, তরুণী নারী, দুগ্ধ পান, ঘৃত ভোজন এবং উষ্ণোদক ব্যবহার, এই ছয়টিতে সন্তঃই আয়ুবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মহানুভব চরক লিখিয়াছেনঃ—

গোরসানিক্ষু বিকৃতীর্বসাং তৈলং নবোদনম্।
হেমন্তেঽভ্যস্যতাস্তায় মুষ্ণকায়ুর্নহীয়তে॥

ইহার অর্থ এইঃ—শীতকালে অধিক পরিমাণে গব্যদুগ্ধ, গুড়, মিছরি, বাতাসা, চিনি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য, নূতন চাউলের অন্ন, এবং উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে কখনই আয়ু ক্ষয় হয় না।

তবেই আহার বিহারাদির নিয়ম পালনে আয়ুর বৃদ্ধি এবং আয়ু ক্ষতিকর আহার বিহারাদিতে আয়ুর ক্ষয়,—ইহা তো সুনিশ্চিত প্রতিপন্ন হইল।

পূর্ব্বশ্লোকে মনীষি চাণক্য ঘৃত ভোজনকে সন্তঃ প্রাণকর বলিয়াছেন। বাস্তবিক ঘৃতের তুল্য পরমায়ু বর্দ্ধক খাদ্য আর জগতে নাই। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" অর্থাৎ, যদি অর্থ না থাকে, তবু ঋণ করিয়াও ঘৃত খাইবে। কারণ ঘৃত ভোজন দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হইলে দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

ঘৃত অমৃত তুল্য উপকারী। উহা দেবগণেরও পরম আদরের সামগ্রী। ঘৃত ভিন্ন কোন দ্রব্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা যায় না। সুস্থ শরীরের আহারকালে নিত্য ঘৃত, দুগ্ধ না খাইলে, সেই আহার আহারই নহে। এই জন্য সুধী চাণক্য বলিয়াছেনঃ—

বস্ত্র না থাকিলে অর্থাৎ উলঙ্গ অবস্থায় অলঙ্কার পরিধান হাস্যজনক। ঘৃত বিহীন ভোজন নিষ্ফল। স্তনহীনা নারী কদাকার এবং বিদ্যাহীন জীবন মরুভূমিসদৃশ।

অতএব দেশীয়গণের খাদ্য দ্রব্য মধ্যে ঘৃত দুগ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে হবির অশেষ প্রকার গুণ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। মহাত্মা চরক লিখিয়াছেনঃ—

স্মৃতিবুদ্ধ্যগ্নিশুক্রৌজঃ কফমেদো বিবর্দ্ধনম্।
বাতপিত্তবিষোন্মাদ শোষালক্ষ্মীজ্বরাপহম্॥
সর্ব্বস্নেহোত্তম্ শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিবদ্ ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ॥

ইহার অর্থ এই—ঘৃত স্মৃতিশক্তির ও বুদ্ধির বৃদ্ধি কারক। নিজে গুরুপাক হইলেও বৃদ্ধি কর। অতিশয় শুক্র বর্দ্ধক, ওজঃ পদার্থের বৃদ্ধিকারী। ইহা কফ ও মেদকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ঘৃত বায়ু ও পিত্ত নাশক। অধিকন্তু বিষ, উন্মাদ, ক্ষয় ও জ্বররোগের শান্তিকারক। ইহাতে অলক্ষ্মী দোষও নষ্ট হয়। সকল প্রকার স্নেহ দ্রব্যের মধ্যে ঘৃতই শ্রেষ্ঠ। ইহা শীতবীর্য্য, মধুর রস ও মধুর বিপাক। বিবিধ প্রকার দ্রব্যের সহিত সংস্কৃত ঘৃত সহস্রবীর্য্য ও সহস্র কর্ম্মকারক হইয়া থাকে।

তবেই দেখুন, ঘৃত কিরূপ আয়ুষ্কর খাদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ হেন পবিত্র খাদ্য আজকাল আমাদের দেশে কিরূপ অপবিত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অত্যধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাবৎ ইহার প্রতিকার না হইবে, তাবৎ মানবের দীর্ঘ জীবনের পথ রুদ্ধ

ব্রহ্মচর্য্য আয়ুর্ব্বর্দ্ধনের একটি প্রশস্ত উপায়। ব্রহ্মচর্য্যের নামান্তর শুক্র সংরক্ষণ।

পূর্ব্বকালে আশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের সন্তানগণ উপবীত হইয়া গুরু গৃহে বাস করিয়া স্বাধ্যায়নিরত থাকিতেন। তৎকালে তাঁহাদের মদ্য, মাংস ভোজন, কর্পূর চন্দনাদি বিলেপন, মাল্য ধারণ, স্ত্রী জাতির অঙ্গ স্পর্শন এবং প্রাণি হিংসা নিষিদ্ধ ছিল। উপনয়নের পর হইতে বিদ্যা সমাপ্তি পর্য্যন্ত যাবৎ চতুর্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইত, তাবৎ তাঁহাদিগকে কঠোর নিয়মে আবদ্ধ থাকিতে হইত। ইহার ফলে দীর্ঘকাল শুক্রধাতুকে অবিকৃত ও অবিচলিত রাখায় তাঁহারা মনোহর কান্তি ও অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া দীর্ঘজীবী হইতেন এবং সংসারাশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক দারগ্রহণান্তে তদুপযুক্ত সন্তান সন্ততিগণকেও হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘজীবী করিতেন। কিন্তু হায়! সে দিন এখন গত হইয়াছে। সে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা আর নাই। এখন কৌমার কাল হইতেই কদভ্যাসে শুক্র ব্যয় হয়। যৌবনের প্রারম্ভ কালে অসময়ে এখন অনেকে শুক্রব্যয়ে স্বীয় শরীরকে অন্তঃসার শূন্য করেন। যাঁহারা দীর্ঘজীবিতাকাঙ্খী তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য্যের আভাষ যৎকিঞ্চিৎ প্রকটিত হইল। এইবার দীর্ঘায়ু লাভ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাইতেছে। একটি কথা জানা আছে,—

ইহার অর্থ এই—সত্যসংরক্ষণ, গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য সলিলা নদীর জল পান এবং প্রভাতে ভ্রমণ, এই সকল দ্বারা মানব শত বর্ষ জীবী হইয়া থাকে। প্রত্যেক আয়ুষ্কামী ব্যক্তির উপরোক্ত তিনটি বাক্যই দেখা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া রাখা যে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন, তাহা আর সবিশেষ বলিবার আবশ্যক হয় না।

এ পর্য্যন্ত আমরা আহার বিহারাদি ব্রহ্মচর্য্য সদাচার প্রভৃতির দ্বারা পরমায়ুর হ্রাস বৃদ্ধির সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা তো পাঠকগণ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর উক্ত বিষয়ে আরও কিছু বলিয়া আমাদের মন্তব্যের উপসংহার করিব।

শ্বাস প্রশ্বাসও আয়ুর স্থায়িত্বের অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। সাধারণতঃ অহোরাত্রের মধ্যে মনুষ্যগণের ২১,৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা কম হইলে মানবের দীর্ঘায়ু এবং উহা অপেক্ষা অধিক হইলে মনুষ্যের অল্পায়ু হইবার কথা।

যোগ শাস্ত্রে লিখিত যাহা আছে—

ইহার অর্থ এই ;—

উঠিতে, বসিতে, খাইতে বেড়াইতে, ধ্যান করিতে, দেখিতে শুনিতে, সর্ব্ব বিষয়েই শ্বাস প্রশ্বাস সংযত রাখিতে পারিলেই মর্ত্ত্যগণ সহস্রায়ুঃ হইতে পারে।

যোগাভ্যাস দ্বারা যোগিগণ যে সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়া থাকেন, শ্বাস সংযম তাহার প্রধান কারণ। যোগের প্রথম শিক্ষা প্রাণায়াম। প্রাণায়াম পাদের অর্থ—প্রাণের আয়াম। উহার দ্বারা প্রাণবায়ুকে স্থির করিয়া জীবিত কালের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারা যায়, এই জন্য ইহারই নাম প্রাণায়াম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে লিখিত আছে ; —

অপান বায়ুর বিরোধ করাকে প্রাণায়াম বলে।

প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগমনশীল, এবং অপানবায়ু অধোগামী। বায়ুকে উপরে উঠিতে বা নীচে নামিতে না দেওয়াকেই, অর্থাৎ এক স্থানে স্থিত করাকেই প্রাণায়াম বলে।

প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে হইলে, শ্বাস বায়ুর নিরোধ করিতে হয়। বায়ু নির্ব্বন্ধ হইলে প্রাণের স্থৈর্য্য সাধনাদি হইয়া থাকে। প্রাণ স্থির হইলে মনও সুস্থির হইয়া উঠে। তখন ধ্যেয় বস্তু সহজেই চিত্তপটে সমারূঢ় হইতে থাকে। তন্নিমিত্ত যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, অগ্রেই প্রাণায়াম অভ্যাস করা আবশ্যক। দীর্ঘ কাল প্রাণায়াম সাধন করিতে পারিলে জরা-মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে।

যোগশাস্ত্র বলেন, মানব শরীর আমমৃত্তি-কাময় কলস তুল্য। জীবন জলের ন্যায় এবং যোগ অগ্নির স্বরূপ। সম্পূর্ণ আম কলস যেমন জলপূর্ণ হইয়া অচিরে লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অগ্নি সংযোগ দ্বারা উহাকে দগ্ধ করিয়া লইলে, উহা যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জীবনযুক্ত কায়ও অনুক্ষণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; যোগ সাধন দ্বারা উহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে উহার নশ্বরত্ব নষ্ট হয় সুতরাং বহুকাল বজায় থাকিতে পারে।

যোগাদি দ্বারা শ্বাসসংযোগের ফলে আয়ুর বৃদ্ধি সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখিত হইল, এই বার রাত্রিকালীন প্রবহমান শ্বাস প্রশ্বাস বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রে আছে,—"মনুষ্য স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে, তাহার নিশ্বাস বায়ু স্বভা-বতঃ নাসিকাগ্র হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি দূর পর্য্যন্ত আইসে। কিন্তু পরিশ্রমের ন্যূন-তায় বা আধিক্যে উহা আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। যেমন শয়ন করিলে ষোড়শাঙ্গুলি, ভোজনে বিংশতি পর্য্যন্ত, নিদ্রায় ত্রিংশৎ, মৈথুনে এবং ব্যায়ামে আরও অধিক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছে। স্বাভাবিক দ্বাদশাঙ্গুলি অপেক্ষা কম হইলে, পরমায়ু বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হইলে পরমায়ু ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে, যে, রতি ক্রিয়ায় এবং ব্যায়াম কার্য্যে পরিশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। সুতরাং উক্ত উভয় কর্ম্মই নিরতিশয় আয়ু ক্ষতিকারক। অত্যধিক শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ যে জীবিত কালের খর্ব্বতা সম্পাদক, তাহা নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারাও কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইতেছে।

নরা গজা বিশে শয়;
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়।
বাইশ বলদা তের ছাগ্‌লা
ধুঁকে মরে বরা পাগ্‌লা॥

ইহার অর্থ এই—মনুষ্য এবং হস্তী এক শত কুড়ি বৎসর বাঁচিয়া থাকে। ঘোটক প্রায় প্রায় ষাইট বৎসর বাঁচে। বলদ অর্থাৎ মেষ মহিষ প্রভৃতি জন্তু কুড়ি, বাইশ বৎসর এবং ছাগল বার তের বৎসর জীবন ধারণ করে। কিন্তু শূকর সর্ব্বদাই ধুঁকিতে থাকে, এই নিমিত্ত অধিক কাল-জীবিত থাকে না। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়।

শশকগণও প্রায়ই শূকরের ন্যায় স্বল্পায়ুঃ।

যেহেতু উহারা সর্ব্বদাই দ্রুতগামী। এই নিমিত্ত উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসও সমধিক বেগে নির্গত হইতে থাকে। এই কারণে উহারা সচরাচর ৭।৮ বৎসরের মধ্যেই জীবন ত্যাগ করে।

বানর সকল সর্ব্বদাই লম্প ঝম্প করিয়া বেড়ায়। তজ্জন্য উহাদের শ্বাস প্রশ্বাসও অধিক হয়। উহাদেরও জীবিতকাল দীর্ঘ হয় না।

কূর্ম্মনিচয়ের শ্বাস প্রশ্বাস নিতান্ত অল্প। প্রতি মিনিটে ৪।৫ বারের অধিক নহে। উহাদের আয়ুষ্কাল অধিক, ইহারা দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

মানবগণের মধ্যে যাহারা স্থূলকায়, তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সংখ্যা সমধিক হইয়া থাকে। এই জন্য পীন বপুঃ মানব প্রায়ই ক্ষীণায়ু।

এক্ষণে পাঠকবর্গ অবিসংবাদিত ভাবে অবগত হইয়াছেন,যে অত্যধিক শ্বাস নির্গমনে অবশ্যই জীবিতকালের ক্ষীণতা সংঘটিত হয়। সুতরাং যদ্যপি সুদীর্ঘ জীবন লাভে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে যে সমুদয় করণীয় ব্যাপারে সমধিক শ্বাস সঞ্চালিত হয়, তাদৃশ কার্য্যে ক্ষান্ত থাকাই সৎপরামর্শ।

আয়ু ক্ষয়ের আর একটি বিশিষ্ট কারণ অতিশয় স্ত্রীসঙ্গ। আমরা সে বিষয়ে পরে অভিমত পরিব্যক্ত করিব।

কয়েকটি বনৌষধি।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

অনংনাস-আনারস, হিং—আনানস্।

আনারস পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্রই সহজ প্রাপ্য। ইহার পত্রের মূলভাগ (সাদা অংশ) কৃমি রোগে বিশেষ হিতকর। বালক অথবা বয়ঃপ্রাপ্ত সকলের ক্রিমিতেই ইহা প্রযুজ্য।

"আনারস পত্রের সাদা অংশ শিলায় কুট্টিত করিয়া রস নির্গত করিবে, তৎ সহ কিঞ্চিৎ মিছরি মিশ্রিত করিয়া প্রাতে সেবন করাইলে কৃমি নষ্ট হয়।

আনারসের মূল চূর্ণ মূত্র কারক ও ক্রিমি দোষ নাশক।

গর্ভবতীকে কখনও আনারস সেবন করাইবে না। আনারস গর্ভস্রাবক। পল্লীগ্রামে প্রবীনা গৃহিণীগণ আনারসের এই গুণ অবগত আছেন, এজন্য তাঁহারা গর্ভবতীকে আনারস সেবন করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

পক্ব আনারস চুণের জলে ধৌত করিয়া সেবন করিলে কৃমি ও বমন রোগে বিশেষ

উপকার হইয়া থাকে। হিক্কা রোগে আনারসের রস উপকারী, পক্ক আনারস মুখ রোচক ও অগ্নি দীপক।

নিগুণ্ডী—, নির্সিন্দা, হিং, ইশ্ণুর।

নিসিন্দা বঙ্গের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ইহার প্রধান গুণ কফ নাশক।

কর্ণ রোগে নিসিন্দা—কর্ণ মূল ফুলিলে কিম্বা কর্ণাভ্যন্তরে বেদনা হইলে, কর্ণ মূলে নিসিন্দা পত্র বাসী হুঁকার জলে পেষণ করতঃ সামান্য উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে।

বাত বেদনায় নিসিন্দা—১ তোলা নিসিন্দা পত্র ওঅর্দ্ধ তোলা আদা, অর্দ্ধ তোলা সজ্জিনার ছাল একত্রে পেষণ করিয়া সামান্য উত্তপ্ত করিবে। বেদনা স্থানে দিবসে ২।৩ বার প্রলেপ দিলে বাতের বেদনার উপকার হয়। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

রক্ত পিত্তে নিসিন্দা।—নিসিন্দা পত্র গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে রক্ত পিত্তের উপশম হয়।

কর্ণ পাকে নিসিন্দা।—নিসিন্দা পত্রের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার ২।১ ফোঁটা কর্ণাভ্যন্তরে প্রদান করিলে কর্ণের পূয স্রাব নিবৃত্তি হয়।

গণ্ডমালায় নিসিন্দা।—নিসিন্দা বৃক্ষের মূলের ছাল জলে পেষণ করিয়া নস্য টানিলে গণ্ড মালা বিনষ্ট হয়।

শিরোরোগে নিসিন্দা।—মাথা ধরায় কপালে নিসিন্দা পত্রের প্রলেপ দিলে মাথা ধরা নিবৃত্তি হয়।

আঘাতে নিসিন্দা।—আঘাত প্রাপ্ত জন্য দেহের কোন স্থান ফুলিলে নিসিন্দা পত্র বস্ত্র খণ্ডে বাঁধিয়া উত্তপ্ত করিবে, পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করতঃ ঐ পুট্টলি দ্বারা সেক দিলে ফুলা নিবৃত্তি হয়।

স্নুহী; মনসা গাছ; হিং—থুহর,

মনসা গাছ সর্ব্বত্রই পরিচিত, ইহাকে বাঙ্গলার কোন কোন স্থলে সেঁজির গাছ বলিয়া থাকে,—ইহা বহু জাতীয় আছে। অনেকে ফণি মনসাকে মনসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হন। মনসা গাছের পত্র চওড়া, ডাল গুলি সুগোল ও গাত্রে কণ্টক আছে। ইহার পত্র ও গাত্র কর্ত্তন করিলে তরল আঠা বহির্গত হয়। মনসা গাছের আঠা এবং পত্র ঔষধে ব্যবহৃত হয়। মজ্জা ক্ষত রোগ নাশক, আঠা তীক্ষ্ণ বিরেচক, পত্র বেদনা নিবারক।

জলোদরে স্নুহী ক্ষীর।—আতপ চাউল, মনসার আঠায় ভিজাইয়া রাখিয়া তদ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে, অত্যল্প কাল মধ্যে উদর রোগ উপশমিত হয়। ইহাতে রোগের উপযুক্ত বিরেচনের কার্য্য করে। মনসার ক্ষীর (আঠা) দ্বারা প্রস্তুতীয় বিন্দুঘৃত উদর রোগের বিখ্যাত ঔষধ।

২ রতি পরিমাণ মনসার আঠা একটী ময়দার গুলির মধ্যে পুরিয়া জলের সহিত গিলিয়া খাইলে উত্তম বিরেচনের কার্য্য সাধিত হয়। মনসার আঠা কখনও অতি মাত্রায় ব্যবহার করিবেনা। অতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে অত্যধিক বিরেচনে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

উদর রোগে মনসার পাতা।—মনসার পাতা সাধারণ শাক প্রস্তুতের ন্যায় রন্ধন

করিয়া সেবন করিলে উদর রোগ উপশমিত হয়।

জ্বর কালীন প্রদাহে মনসা পাতা।—জ্বরে অত্যন্ত দাহ হইলে, তৎকালীন যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য মনসা পাতা অতি শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। কয়েকটী মনসা পাতা অগ্নি সন্তাপে উত্তপ্ত করিয়া নিঙড়াইয়া রস বাহির করিবে, কিছু ধনে চূর্ণ ঐ রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে, তৎপর কতকগুলি লম্বা দুর্ব্বা দ্বারা একটী গুচ্ছ বাধিয়া ঐ দুর্ব্বাগুচ্ছ,মনসা পাতার রসে ভিজাইয়া ঐ রস রোগীর সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ ছিটাইয়া দিবে, ইহাতে প্রবল দাহ ক্ষণকাল মধ্যে নিবৃত্ত হইবে। এরূপ দাহ নিবারক ঔষধ অল্পই দৃষ্ট হয়।

বেদনা নিবারণে মনসা পাতা।—কোন স্থান ফুলিলে অথবা বেদনা হইলে মনসা পাতা, সৈন্ধব লবণ ও ধুতুরা পাতা একত্রে পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করতঃ প্রলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা নিবৃত্তি হয়।

দন্তপোকায় মনসা পাতা।—দাঁতে চর্ব্বন করিলে দন্ত পোকা পতিত হয়।

সর্প দংশিত ব্যক্তিকে মনসার মূল সেবন করাইলে বিষ নিবৃত্তি হয়।

বাত গুল্মে মনসা আঠা।—মনসার আঠায় তেউড়ী মূল চূর্ণ ভাবিত করিয়া মধু ও গব্য ঘৃত সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে উৎকৃষ্ট বিরেচন হয়। রোগীর বল অনুযায়ী এই বিরেচন প্রয়োগ করিবে। অতি বিরেচনে রোগী নিস্তেজ হইয়া থাকে।

মনসার আঠা অতি সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। ইহা দেহের কোন স্থানে লাগিলে অগ্নি দগ্ধের ন্যায় ফোস্কা পড়ে।

মনসার মজ্জা গব্য ঘৃতে তীক্ষ্নরূপে ভাজিয়া লইবে, ঐ ভর্জ্জিত মজ্জা সামান্য তুঁতে ভস্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে। এই রূপে যে মলম প্রস্তুত হইবে তাহা দূষিত ক্ষতাদি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরমির দূষিত ক্ষত পর্য্যন্ত ইহাতে আরোগ্য হইয়া থাকে।

পরিভাষা।

ভিষবর স্বর্গীয় শ্রীকণ্ঠ দাস বিরচিত "পরিভাষা সংগ্রহ" নামক পুস্তক খানি কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন গুপ্ত কবীন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংপ্রতি বাহির হইয়াছে। আমরা এই পুস্তক খানি অবলম্বন করিয়াই আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষার কথা বলিব।

আয়ুর্ব্বেদের প্রায় অর্দ্ধাংশই পরিভাষা। পরিভাষা না জানিলে ঔষধ, তৈল ও ঘৃতাদির পাকবিধি, ঔষধ সেবনের কাল ও মাত্রা নির্ণয়, অনুপান বিধি, ভাবনা বিধি, এ সকল সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায় না। এই পরিভাষা গ্রন্থ সম্বন্ধে সংগ্রহকার বলিয়াছেন,—

ধ্বান্তে পথি চরিষ্ণূনাং যথা দীপঃ প্রদর্শকঃ।
নানা শাস্ত্রজ্ঞ ভিষজাং সংগ্রহোঽয়ং
তথা ভবেৎ॥

অর্থাৎ যেরূপ অন্ধকারে ভ্রমণ কালে প্রদীপ দ্বারা পথ প্রদর্শিত হয়, সেইরূপ নানা শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যদিগের পক্ষে এই "পরিভাষা সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে প্রবেশের পথ প্রদর্শক হইবে।

এই গ্রন্থের পরিচয়ে সংগ্রহকারের আরও পরিচয়—

অনুক্তাব্যক্ত লেশোক্ত সন্দিগ্ধার্থ প্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ॥

অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল বিধি অব্যক্ত, অনুক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত অথবা সন্দেহযুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে।

শুধু সংগ্রহকারের কথা নহে, প্রকৃত পক্ষে পরিভাষা যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ—পরিভাষায় জ্ঞান না থাকিলে ঔষধাদি প্রস্তুত যে করিতে পারা যায় না—ইহা সুনিশ্চিত। তবে যাঁহাদের আয়ুর্ব্বেদীয় মূল গ্রন্থ গুলি ভাল করিয়া পড়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে পরিভাষার বিষয় গুলি সেই সকল গ্রন্থেই শিক্ষা হইতে পারে। কারণ আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতা গ্রন্থ গুলি হইতেই ইহা সংগৃহীত,—সংহিতাগুলির কথা ভিন্ন ইহাতে নূতন কথা অল্পই আছে।

শ্রীকণ্ঠ দাসের "পরিভাষা সংগ্রহ" ভিন্ন গোবিন্দ দাসের একখানি "পরিভাষা প্রদীপ" বৈদ্য সমাজে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থে সংগ্রহকার বলিয়াছেন,—

পূর্ব্বৈ র্মুনিভিরাদিষ্টা স্বে স্বে তন্ত্রে ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
পরিভাষা ময়া সা সা সমাহৃত্য বিলিখ্যতে॥

অর্থাৎ প্রাচীন মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যে সকল পরিভাষা বিক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীকণ্ঠ দাসও এই শ্লোকের অনুরূপ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

প্রাক পারিভাষিক বচো মুনিভিঃ প্রণীতম্
যন্মাধবাদি লিখিত ংস্তুবহু প্রপঞ্চম্।
সংক্ষিপ্যতে নবক বৈদ্যহিতায় যস্মাৎ
শ্রীকণ্ঠদাস ভিষজা তদনুক্রমেণ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মুনিগণ কর্ত্তৃক যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় পারিভাষিক বাক্য রচিত হইয়াছে, এবং যাহা মাধবাদি গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক বহু বিস্তৃত করা হইয়াছে, তাহাদেরই সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম নবীন বৈদ্যদিগের হিতকল্পে শ্রীকণ্ঠদাস কর্ত্তৃক বহু যত্ন সহকারে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সুচিকিৎসক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে শাস্ত্র জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, রোগনির্ণয় ও যথা শাস্ত্র ব্যবস্থা-বিধান যেরূপ প্রয়োজনীয়, যথা নিখুঁত ভাবে ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষাকরণও সেইরূপ বা ততোধিক প্রয়োজনীয়। পরিভাষায় সম্যক ব্যুৎপন্ন না হইলে দ্রব্য সকলের পরিমাণাদি, ঔষধাদির প্রস্তুতবিধি, তৈল ঘৃতাদির পাক প্রণালী বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না—এজন্য পরিভাষার শিক্ষা লাভ অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

শ্রীকণ্ঠদাসের "পরিভাষা সংগ্রহ" এবং গোবিন্দ দাসের "পরিভাষা প্রদীপ"—এই উভয় গ্রন্থই প্রায় এক ধরণে সংগৃহীত। দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উভয় গ্রন্থেই প্রথমে "মানের" কথা। "মানের" কথা তো লিখিতেই হইবে, কারণ "ন মানেন বিনা যুক্তি দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ।"

অর্থাৎ পরিমাণ ব্যতীত কোনো দ্রব্যের প্রয়োগে ফল লাভ হয় না। কিন্তু এই "মান" পরিভাষায় উভয় গ্রন্থের সংগ্রহকারই যে পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে

বৈদ্য সমাজে তাহার প্রচলন্ নাই। উভয় গ্রন্থেই সুশ্রুত ও চরকের "মান" লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সংশ্রুতের 'মান'কে কালিঙ্গ মান এবং চরকের 'মান'কে মাগধ মান বলিয়া সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত। এই দুইটি 'মানে' অনেক প্রভেদ কালিঙ্গ 'মানে' পাঁচ রতিতে মাষা এবং মাগধ "মানে" দশ রতিতে এক মাষা। এখনকার দিনে কিন্তু এই দুইটির একটিও গ্রহণ না করিয়া ছয় রতিতে আনা এবং বার রতিতে মাষা গণনা করা হয়। সুতরাং কালিঙ্গ এবং মাগধ দুইটি "মানের"ই পরিবর্ত্তিত ভাবে শিক্ষা প্রদানের জন্য নূতন "মানের" ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

গোবিন্দদাসের "পরিভাষা প্রদীপে" একই বিষয় বলিতে গিয়া বহু স্থলে পুনরুক্তি করা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠের "পরিভাষ সংগ্রহে" সে দোষ বড় নাই। কিন্তু গোবিন্দদাসের "পরিভাষা প্রদীপ" যেরূপ চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সাজান, শ্রীকণ্ঠের "পরিভাষা সংগ্রহ" সে ধরণের নহে। অনুক্ত, অব্যক্ত, লেশোক্ত, বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস করিয়া এই পরিভাষা সংগৃহীত। এক হিসাবে এই শ্রেণীবিন্যাস উৎকৃষ্ট হইলেও গোবিন্দদাসের খণ্ড বিন্যাস শিক্ষা কল্পে সুগম হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া গোবিন্দদাসের "পরিভাষ প্রদীপে" লৌহ শোধনাদির কথা যাহা লিখিত আছে, শ্রীকণ্ঠের "পরিভাষা সংগ্রহে" তাহা লিখিত হয় নাই। শ্রীকণ্ঠ শুধু লৌহের পাক লক্ষণই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শোধন ও মারণ—যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় তাহা ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন, এজন্য শিক্ষার্থি দিগের পক্ষে ইহা অসম্পূর্ণ হইয়াছে। স্নেহ পাক সিদ্ধির প্রসঙ্গে গোবিন্দ দাস যেরূপ ক্ষতাদিতে যে সকল ক্ষারসাধ্য জল পাক করিতে হয় তাহার পরিচয়ে—

অশ্মিরবসরে তোয়ং ক্ষার সাধ্যং ক্ষতাদিযু।
ফেনোদয়স্ত নিপত্তিন ষ্টু দুগ্ধ সমাকৃতি ॥

বলিয়া উহা বুঝাইয়া দিয়াছেন, শ্রীকণ্ঠ তাহা করেন নাই, সুতরাং শিক্ষার্থির পক্ষে ইহাও বাদ পড়িয়াছে। তবে এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না, দুইখানি পরিভাষা সংগ্রহই যে সময়ে সংগৃহীত হইয়াছে এখনকার যুগে তাহার কতকগুলি বিষয়ের সংস্কার করিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেইজন্য বর্ত্তমান যুগে এমন একখানি পরিভাষা সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহা প্রথম শিক্ষার্থির পক্ষে সহজ বোধ্য হয়। পঞ্চকর্ম্ম বা বমন, বিরেচন, নিরূহন, অনুবাসন ধূমপান, কবল ও রক্ত মোক্ষন প্রভৃতি বিষয় গুলি পরিভাষা সংগ্রহে সন্নিবেশ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি না, কারণ চিকিৎসার সকল বিষয় শিক্ষা না করিলে এ সকল বিষয়ে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে। এজন্য আমাদের মতে নূতন কোনও সংগ্রহকার পরিভাষা সংগ্রহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহার সংগ্রহ পুস্তকে ঐ বিষয়গুলির সংযোজনা না করিলেই ভাল হয়।

শ্রীকণ্ঠ দাসের "পরিভাষা সংগ্রহ" যাহা কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সংপ্রতি বাহির করিয়াছেন, তাহার কাগজ ও ছাপা অতি উৎকৃষ্ট, বঙ্গানুবাদও উত্তম হইয়াছে কিন্তু ৭ ফর্ম্মা পুস্তকের মূল্য যাহা তিনি ১৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনার তাহা বেশীই হইয়াছে। ৭ ফর্ম্মা পুস্তকের মূল্য

।০ আনা করিলে সুসঙ্গত হইত। যাহা হউক ভিষগ্বর শ্রীকণ্ঠ দাসের সংগৃহীত এই লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কবিরাজ দীনেশচন্দ্র বৈদ্যসমাজে প্রশংসার পাত্র।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের কথা।

আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কল্পে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সংপ্রতি শ্যামবাজার পার্কের সম্মুখে প্রায় দেড় বিঘা জমি দান করিয়াছেন। এই জমীর উপর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে। বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বোর্ডিং—সমস্তই এই জমীতে হইতে পারিবে। ইহার জন্য অন্ততঃ আট লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা এই সদনুষ্ঠানের জন্য দেশের দানশীল-মহাত্মাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যাঁহার যেমন শক্তি, তিনি তদনুসারে সাহায্য প্রদান করিতে পারেন। "দশের লাঠি, একের বোঝা"—এই চলিত কথার অনুসরণ করিয়া যিনি যাহা দান করিবেন, আমরা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব।

কলেজে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল—ফড়িয়া পুকুরের বাটীতে আর ইহার স্থান সংকুলান হইতেছিলনা। এই জন্য সংপ্রতি এই বিদ্যালয় ১৭।১৯ শ্যামবাজার ব্রিজরোডস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির প্রদত্ত নূতন জমীতে বাটী নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই নূতন বাটীতে বিদ্যালয় ও হাসপাতালের কার্য্য চলিবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা যেরূপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, বিদ্যালয় সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়েও প্রত্যহ সেইরূপ রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। আজ কাল প্রায় একশত রোগী ইহার শল্য ও কায় বিভাগে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য এই বাটী পরিবর্ত্তনে সাধারণের পক্ষে সকল দিকেই সুবিধা করা হইয়াছে।

কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন,
এম-এ, এম-বি,
প্রিন্সিপাল।
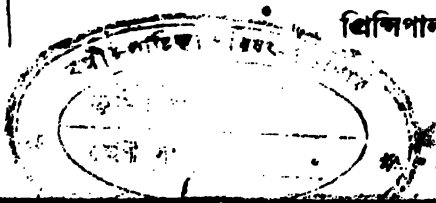
কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
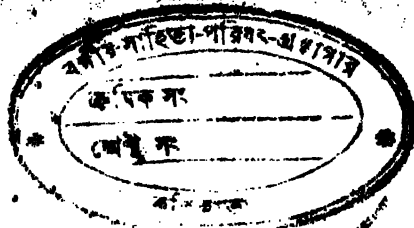
আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদে অ্যানাটমী।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম, বি,]

—:*:—

চরকের বহুকাল পরে সুশ্রুতের আবির্ভাব কাল। চরক প্রণীত হইয়াছিল সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে। সুশ্রুত রচিত হইয়াছিল—এখন হইতে কিঞ্চিদধিক আড়াই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। চরকের উপদেষ্টা দেবরাজ ইন্দ্র এবং সুশ্রুতের উপদেষ্টা প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্র না হইলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত চিকিৎসার মূল উপদেষ্টা ইন্দ্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি দক্ষ, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং অশ্বিনীকুমার দ্বয় হইতে অমর নাথ ইন্দ্র চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যেমন মহর্ষি ভরদ্বাজকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপ ধন্বন্তরিকেও ইহার শিক্ষা দান করেন। ধন্বন্তরি, দিবোদাসরূপে বারাণসী ধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত, ঔপধেনব, ঔরভ্র ও পুষ্কলাবত প্রভৃতিকে এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। ইন্দ্র, ভরদ্বাজকে চিকিৎসার যে অঙ্গের শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা কায় চিকিৎসা প্রধান, সেই জন্য চরক—কায় চিকিৎসা প্রধান শ্রেষ্ঠসংহিতা এবং ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের আট অঙ্গেরই শিক্ষা লাভ করিয়া সুশ্রুত প্রভৃতিকে উঁহার উপদেশ প্রদান করিলেও উহাতে শল্যতন্ত্রের উপদেশই বিশদ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া উহা শল্য প্রধান শ্রেষ্ঠ সংহিতা। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সমাজ হইতে শল্য চিকিৎসা বিলুপ্ত হইলেও উহা যে আর্য্য চিকিৎসার মধ্যে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব তাঁহার হিন্দু সিষ্টেম অব মেডিসিন নামক গ্রন্থে

ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, রীতিমত শবচ্ছেদ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের শারীর স্থান লিখিত। Commentary on the Hindn System of medieine By T. A. wise M. D. New Issue, Landon 1850 Poge XVI. আমরা আজি সুশ্রুতের সেই সকল উপদেশেরই সারাংশ পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিব।

সুশ্রুতের চিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত—

১ম। শল্যতন্ত্র—ইহাতে কোনো কারণ বশতঃ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট বিবিধ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, ধূলি, লৌহ, লোষ্ট্র, অস্থি, কেশ, নখ, আঘাতাদি হেতু দেহগত ভগ্নাস্থি, দ্রব্যাদি হইতে পূযাদি এবং বিকৃত ভাবে গর্ভস্থ শিশু বহিষ্করণ জন্য যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্ম্মবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

২য়। শালাক্য তন্ত্র—জত্রুদেশের অর্থাৎ কণ্ঠ ও হৃদয় সন্ধির উর্দ্ধগত কর্ণ, চক্ষু, মুখ, নাসিকাদির স্থান জাত রোগ সমূহের বিবরণ ও তন্নিবারণোপায় এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে।

৩য়। কায় চিকিৎসা—এই বিভাগে জ্বর, অতীসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার কুষ্ঠ, প্রমেহ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গগত রোগ সমূহের বিবরণ ও তাহার চিকিৎসাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

৪র্থ। ভূতবিদ্যা—এই প্রকরণে দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, পিতৃ, সর্প প্রভৃতি গ্রহ কর্ত্তৃক বিকৃত চিত্ত প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বলি, হোম, উপবাসাদি শান্তি কর্ম্ম সমূহের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৫ম। কৌমারভৃত্য—শিশুপালন, ধাত্রীর স্তন্য সংশোধন, এবং দূষিত স্তন্য জনিত ও দুষ্ট গ্রহাবেশজনিত ব্যাধি সমূহ নিবারণের উপায় এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ। অগদতন্ত্র—সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক, ইঁদুর প্রভৃতি সবিষ প্রাণিগণের দংশন জনিত বিষ নিবারণ এবং অন্যান্য বিবিধ স্থাবর ও জঙ্গম বিষ পান হেতু সঞ্জাত ব্যাধি সমূহ প্রতীকারের বিধান বিবৃত হইয়াছে।

৭ম। রসায়ন তন্ত্র—এই বিভাগে মানবগণের অধিক কাল চির যৌবন থাকিয়া সুস্থ শরীরে অজর ও নীরোগ অবস্থায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিবার উপায় বর্ণিত হইয়াছে।

৮। বাজী করণ তন্ত্র। অল্প শুক্র বৃদ্ধি, দূষিত বীর্য্য সংশোধন বিশুদ্ধ শুক্র সমুদ্ভাবন, ক্ষীণ শুক্র বর্দ্ধন, এবং স্ত্রী সংসর্গে শক্তি প্রাপ্তি বিষয়ক উপদেশ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত আটটি অঙ্গেরই উপদেশ সুশ্রুত সংহিতায় বিশদ ভাবে বর্ণিত হইলেও শল্যতন্ত্রের উপদেশ যেরূপ সুন্দর ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে এখনকার উন্নত এ্যালোপাথিক শল্যতন্ত্রের নিকট কোনো অংশে কম নহে ইহা খুব জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে চরমোন্নতি লাভ করিলেও সুশ্রুতের যুগে ইহা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রণিধান পূর্ব্বক সুশ্রুতের শারীর স্থান অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা মহর্ষি সুশ্রুতকে একজন পাকা সার্জ্জন না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না।

সুশ্রুত এনাটমী বা শারীর স্থানের পরিচয়—প্রথমে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া বুঝাইতেছেন,—গর্ভাশয়স্থ অর্থাৎ জরায়ু কোষস্থ

আত্মা, অষ্টবিধ প্রকৃতি এবং পঞ্চ ভূতাদি ষোড়শ বিকার মিশ্রীকৃত যে শুক্র শোণিত তাহাই গর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গর্ভ— চেতনা দ্বারা অধিষ্ঠিত, বায়ু কর্ত্তৃক বিভাগীকৃত, তেজ দ্বারা পরিপাচিত, জল কর্ত্তৃক রস যুক্ত, পৃথিবী দ্বারা সংহত এবং আকাশ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া যখন হস্ত, পদ, জিহ্বা, নাসিকা, কর্ণ, নিতম্ব প্রভৃতি অঙ্গ সমূহ প্রকাশ পাইয়া তদ্দ্বারা সংযুক্ত হয়, তখন উহা শরীর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শরীর—দুই হস্ত, দুই পদ, মধ্য ভাগ ও মস্তক—এই ছয় ভাগে বিভক্ত। ইহারা আবার সাতটি ত্বক, সাতটি কলা, সাতটি আশয়, সাতটি ধাতু, সাত শত শিরা, পাঁচ শত পেশী, নয় শত স্নায়ু, তিন শত অস্থি, দুই শত দশটি সন্ধি, এক শত সাতটি মর্ম্ম, চব্বিশটি ধমনী, তিনটি দোষ, তিনটি মল এবং নয়টি স্রোতদ্বার দ্বারা আবৃত। ইহাদের পরিচয়ে ঋষি বলিয়াছেন,—প্রথমে যে ত্বক উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অবভাষিনী, এই ত্বক দ্বারা দেহের গৌরাদি সর্ব্ব বর্ণ অবভাষিত এবং পঞ্চ ভূতাত্মিকা ছায়া ও প্রভা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ—একটি ধান্যের অষ্টাদশ ভাগের এক ভাগ। এই ত্বক—সিধ্ম (ছুলি রোগ) ও পদ্ম কণ্টক রোগ উৎপত্তির স্থান।

দ্বিতীয় ত্বকের নাম লোহিতা। ইহার পরিমাণ ধান্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাতে তিল রোগ, ছুলি বিশেষ ও ব্যঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তৃতীয় ত্বকের নাম শ্বেতা। ইহার পরিমাণ ধান্যের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ। ইহা চর্ম্মদল, অজগল্লিকা ও মশক রোগ উৎপত্তির স্থান।

চতুর্থ ত্বকের নাম তাম্রা। ইহার পরিমাণ ধান্যের আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহাতে কিলাস ও কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চম ত্বকের নাম বেদিনী। ইহা ধান্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। কুষ্ঠ ও বীসর্প রোগ এই ত্বকে জন্মিয়া থাকে।

ষষ্ঠ ত্বকের নাম রোহিণী। ইহার পরিমাণ একটি ধান্যের ন্যায়। গ্রন্থি, অপচী অর্ব্বুদ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ এই ত্বকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তম ত্বকের নাম মাংসধরা। ইহার পরিমাণ দুইটি ধান্যের অনুরূপ। ভগন্দর, বিদ্রধি ও অর্শোরোগ এই ত্বকে হইয়া থাকে।

সপ্তম কলার পরিচয়।— প্রথমা মাংস ধরা কলা। এই কলাধিষ্ঠিত স্নায়ু, ধমনী ও স্রোত সমূহের বিস্তারে মাংসে সিরা জন্মিয়া থাকে। দ্বিতীয়া কলার নাম রক্তধরা। এই কলাধিষ্ঠিত মাংসের মধ্যে, বিশেষতঃ যকৃত ও প্লীহাতে রক্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে। তৃতীয়া কলার নাম মেদোধরা। যাবতীয় প্রাণীর উদরে ও সূক্ষ্ম অস্থি সমূহে মেদ অবস্থিত। বৃহৎ অস্থিতে যে মেদ অবস্থান করে, তাহার নাম মজ্জা। অর্থাৎ মেদ—স্থূল অস্থির মধ্যগত হইলে তাহার নাম মজ্জা এবং সেই মজ্জা রক্তযুক্ত হইয়া সূক্ষ্ম অস্থিতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে মেদ বলে। চতুর্থী কলার নাম শ্লেষ্মাধরা কলা। প্রাণিগণের সকল সন্ধি স্থানেই ইহা অবস্থিত। যেমন

শকটে তৈল প্রদান করিলে চক্র সহজে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই প্রকার সন্ধিস্থান—কফ দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকিলে সন্ধিস্থানের সেই কার্য্য সমূহ সহজে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পঞ্চমী কলার নাম পুরীষ কলা। ইহা পক্বাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিতি পূর্ব্বক কোষ্ঠ মধ্য হইতে মলকে বিভাগ করিয়া থাকে। এই কলা যকৃৎ, কোষ্ঠ ও অন্ত্র সমূহকে সমাশ্রয় পূর্ব্বক উণ্ডুকস্থ মলকে পৃথক করিয়া দেয়। ষষ্ঠী কলার নাম পিত্তধরা। আমরা যাহা কিছু ভোজন করি, ভক্ষণ করি, পান করি, তাহার সমস্তই এই কলার সাহায্যে পক্বাশয়ে আনীত হইয়া পিত্ততেজ দ্বারা পরিপাক করাইয়া যথাকালে জীর্ণ করাইয়া থাকে। সপ্তমী কলার নাম শুক্রধরা। ইহার অবস্থিতি স্থান প্রাণীদিগের সর্ব্ব দেহে। ইহার সাহায্যে প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে শুক্র প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আশয়—সাত প্রকার আশয়ের নাম ঋষি বলিয়াছেন, বাতাশয় পিত্তাশয়, কফাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্বাশয় ও মূত্রাশয়।

অন্ত্র—পুরুষ দিগের অন্ত্রের পরিমাণ সার্দ্ধ তিন ব্যাস এবং নারী দিগের অন্ত্রের পরিমাণ তিন ব্যাস।

স্রোত বা দ্বারের বিবরণ—দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, নাসিকাদ্বয়, গুহ্য দেশ ও মেঢ্র—পুরুষদিগের এই নয়টী দ্বার বা স্রোত। স্ত্রীলোকদিগের ইহা ব্যতীত স্তনদ্বয় ও রক্তবহ অধোভাগস্থ আর একটী দ্বার আছে।

কণ্ডুরা—কণ্ডুরা ১৬টী, হস্ত,পদ,গ্রীবা ও পৃষ্ঠদেশ প্রত্যেক স্থানে ৪টী করিয়া ইহারা অবস্থিত। হস্ত ও পদ গত কণ্ডুরা হইতে নখ উৎপন্ন হয়। গ্রীবা ও হৃদয়স্থিত কণ্ডুরা হইতে মেঢ্র জন্মিয়া থাকে। শ্রোণি ও পৃষ্ঠ স্থিত অধোগত কণ্ডুরা হইতে নিতম্ব জন্মিয়া থাকে। গ্রীবাশ্রিত কণ্ডুরা হইতে মস্তক মণ্ডল, বক্ষোমণ্ডল ও স্কন্ধ মণ্ডল এবং ঊর্দ্ধগত পাদাশ্রিত কণ্ডুরা হইতে উক্ত মণ্ডলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জাল—জাল চারি প্রকার। মাংস জাল, শিরা জাল, স্নায়ু জাল ও অস্থিজাল। ইহারা পরস্পর সন্নিবদ্ধ, পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও পরস্পর ছিদ্রে মিলিত হইয়া প্রত্যেক মনিবন্ধে ও গুলফ দেশে এক একটি করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

কূর্চ্চ—কূর্চ্চ ছয়টী। ইহাদের মধ্যে হস্তে দুইটী, পদে দুইটি, গ্রীবা দেশে একটি ও মেঢ্রে একটি অবস্থিত।

মাংসরজ্জু—মাংসরজ্জু চারিটি। পৃষ্ঠ দেশের দুই ধারে পেশী বন্ধনার্থ দুইটি এবং মেরুদণ্ডের বাহিরে একটি ও অভ্যন্তর ভাগে একটি অবস্থিত।

সেবনী—সেবনী সাতটি। মস্তকে পাঁচটি, জিহ্বায় একটি এবং উপস্থে একটি।

অস্থিসংঘাত—অস্থিসংঘাত চৌদ্দটি। গুল্‌ফ, জানু ও বঙ্ক্ষণ দেশে তিনটি, এই প্রকার অপর সকথিতে তিনটি, বাহুদ্বয়ে ছয়টি ও ত্রিক দেশে এবং মস্তকে এক একটি।

সীমন্ত—সীমন্ত চৌদ্দটি। ইহারা অস্থি সংঘাতের স্থলেই অবস্থিত।

অস্থি—আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে সর্ব্ব সমেত তিনশত ছয়টি অস্থি বলিয়া থাকেন. কিন্তু শল্যবিদগণ ইহার সংখ্যা নির্ণয়ে তিনশত বলেন। মোটের উপর

ইহারা আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কপাল অস্থি, রুচক অস্থি, নলক অস্থি, তরুণ অস্থি, বলয় অস্থি। জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু শঙ্খ ও মস্তকে কপাল অস্থির অবস্থিতি স্থান। দন্ত সমূহকে রুচক অস্থি বলে। নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোষস্থ অস্থি সমূহকে তরুণ অস্থি বলে। হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এই সকল স্থানে বলয় নামক অস্থি অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অস্থি গুলির নাম নলকাস্থি।

অস্থিসন্ধি—সন্ধি দুই প্রকার, এক প্রকার চেষ্টাশীল, ইহারা হস্ত, পদ, হনু, কটিদেশ ও গ্রীবাদেশে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন অপর সন্ধি গুলির নাম অচল সন্ধি। সন্ধি সমূহের সংখ্যা নির্ণয় করিলে দুইশত দশটি হইয়া থাকে। ইহাদের প্রকারভেদ করিলে এই সন্ধি আবার আটভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্ন সেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল এবং শঙ্খাবর্ত্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু ও কূর্পর—এই সকল স্থানে কোর নামক সন্ধি সকল অবস্থিতি করে। কক্ষদেশ, বঙ্খন ও দন্ত দেশে উদূখল সন্ধির অবস্থিতি স্থান। স্কন্ধ-দেশ, গুহ্য, যোনি, নিতম্বদেশে সামুদ্গ নামক সন্ধি অবস্থিতি করে। গ্রীবা ও পৃষ্ঠ দেশে প্রতর নামক সন্ধির অবস্থিতি স্থান। মস্তক, কটি ও কপালদেশের সন্ধির নাম তুন্ন-সেবনী। হনুর উভয় দিকের সন্ধির নাম বায়সতুণ্ড। কণ্ঠ, হৃদয়, নেত্র, ক্লোম ও নাড়ী দেশের সন্ধি সমূহকে মণ্ডলসন্ধি বলে এবং কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও নেত্রগত শিরা সমূহের সন্ধি সকলের নাম শঙ্খাবর্ত্ত। যে সন্ধি গুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল—ইহাদের সব গুলিই অস্থিসন্ধি; পেশী, স্নায়ু ও শিরা এই সকলের সন্ধির পরিচয় স্বতন্ত্র।

স্নায়ু। স্নায়ুর সংখ্যা নির্ণয়ে ইহারা নয় শত। প্রকার ভেদে ইহারা চারি প্রকার; যথা—প্রতানবতী, বৃত্ত, পৃথু ও শুষির। হস্ত, পদ ও সমস্ত সন্ধি স্থানে অবস্থিত যে সকল স্নায়ু তাহাদের নাম প্রতানবতী। যে সমস্ত স্নায়ু কণ্ডরা নামে অভিহিত, সেই সকল স্নায়ু বৃত্ত। যে সমস্ত স্নায়ু আমাশয় ও পক্বাশয়েরঅন্তে অবস্থিত—তাহাদিগের নাম শুষির এবং যে সমুদয় স্নায়ু পার্শ্ব, বক্ষঃ, পৃষ্ঠ ও মস্তকে অবস্থিত—সেই সকলকে পৃথুল স্নায়ু বলিয়া থাকে।

পেশী। পেশীর সংখ্যা পাঁচ শত। পায়ের প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া ১৫টি, পায়ের অগ্রভাগে ১০টি, পায়ের উপরি কূর্চ্চদেশে ১০টি, গুলফ ও পদতলে ১০টি, গুলফ ও জানু উভয়ের মধ্যস্থলে ২০টি, জানুদেশে ৫টি, উরুদেশে ২০টি এবং বঙ্খন দেশে ১০টি—সর্ব্ব সমেত এক সকথিতে ১০০টি। এইরূপ অপর সকথিতে ১০০টি এবং বাহুদ্বয়ে ২০০টি, সর্ব্ব সমেত হস্ত ও পদে ৪০০ শত পেশী আছে। ইহা ভিন্ন গুহ্যদেশে ৩, মেঢ্র দেশে ১, লিঙ্গের সেবনী দেশে ১, অণ্ডকোষে ২, দুই নিতম্বে ১০, বস্তির উপরিভাগে ২, উদরে ৫, নাভিতে ১, পৃষ্ঠের উপরিভাগে পাঁচ করিয়া ১০, পার্শ্ব দেশে ৬, বক্ষ দেশে ১০, স্কন্ধসন্ধির চতুর্দ্দিকে ৭, হৃদয় ও আমা-শয়ে ২, যকৃত, প্লীহা ও উণ্ডুকে ৬, গ্রীবাদেশে ৪, হনুদ্বয়ে ৮, কাকলকে ১, গলদেশে ১, তালুদেশে ২, জিহ্বাতে ১, ওষ্ঠদ্বয়ে ২,

নাসিকাপুটে ২, চক্ষুর্দ্বয়ে ২, গণ্ডস্থলে ৪, কর্ণযুগে ২, ললাটে ৪, এবং মস্তকে ১ সর্ব্বসমেত ৫০০টি। স্ত্রীলোকদিগের ইহা ভিন্ন আরও ২০টি অধিক পেশী আছে। তন্মধ্যে স্তনদ্বয়ে ১০, অপত্য পথে ৪, গর্ভছিদ্রে ৩ এবং শুক্রার্ত্তবের প্রবেশ পথে ৩—মোট ২০টিপেশী অতিরিক্ত।

মর্ম্ম। মর্ম্ম স্থান একশত সাতটি। উহাদিগের প্রকারভেদে উহারা পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা, মাংস মর্ম্ম, শিরা মর্ম্ম, স্নায়ু মর্ম্ম, অস্থি মর্ম্ম এবং সন্ধি মর্ম্ম। ইহাদিগের মধ্যে মাংস মর্ম্ম এগারটি, শিরা মর্ম্ম এক চল্লিশটি, স্নায়ু মর্ম্ম সাতাশটী, অস্থি মর্ম্ম আটটি সন্ধি মর্ম্ম কুড়িটি।

শিরা—শিরা সর্ব্বসমেত সাত শত। ইহাদিগের সকলগুলিই—নাভিমূলে সংলগ্ন। প্রাণী সমূহের প্রাণ নাভিতে অর্থাৎ নাভির আবরক শিরাসমূহে অবস্থিত। এই শিরা-গুলির মধ্যে মূল শিরা গুলির সংখ্যা ৪০টি, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ১০টি, পিত্ত বাহিনী ১০টি এবং রক্তবাহিনী ১০টি। ইহাদের মধ্যে আবার বায়ু বাহিনী ১৭৫টি, এই সকল শিরা বায়ুর স্থান—পক্কাশয়ে অবস্থিতি করে। পিত্ত বাহিনী ১৭৫টি, ইহারা পিত্তের স্থান পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করে। কফ বাহিনী শিরা ১৭৫টি, ইহারা কফের স্থান অর্থাৎ আমাশয়ে অবস্থিতি করে এবং রক্ত বাহিনী শিরা ১৭৫টী, ইহারা রক্তাশয়ে যকৃত ও প্লীহাতে অবস্থিত।

শিরা সমূহের স্থাননির্ণয়—বাতবাহিনী শিরা যাহা ১৭৫টী বলা হইল, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক সক্থিতে ও প্রত্যেক বাহুতে ২৫টী করিয়া এক শতটী, শ্রোণিদেশস্থ গুহ্যে ও মেঢ্রে আটটী, দুই পার্শ্বে দুইটী করিয়া চারিটী, পৃষ্টদেশে ছয়টী, উদরে ছয়টী এবং বক্ষ দেশে দশটী, স্কন্ধ-সন্ধির উপরি ভাগে গ্রীবাদেশে চৌদ্দটী, দুই কর্ণে চারিটী, জিহ্বা দেশে নয়টী, নাসিকায় ছয়টী ও চক্ষুদ্বয়ে আটটী—মোট ১৭৫টী বাতবাহিনী নাড়ী জানিবে।

ধমনী—ধমনী ২৪ প্রকার, ইহারা নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ১০টি উর্দ্ধগামিনী, ১০টি অধোগামিনী এবং চারিটি তির্য্যকগামিনী। উর্দ্ধগামিনী দশটী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, প্রশ্বাস উচ্ছ্বাস, জৃম্ভন (হাঁচি) ক্ষুৎ, হাস্য, কথন ও রোদন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই দশটি ধমনী হৃদয় দেশে গমন পূর্ব্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি করিয়া দশটি ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত, ও রস বহন করে। দুইটি করিয়া আটটি দ্বারা, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গৃহীত হয়। দুইটি দ্বারা বাক্য নিঃসরণ হয়। দুইটি দ্বারা অব্যক্ত শব্দ প্রকাশিত হয়। দুইটি দ্বারা নিদ্রা জন্মে। দুইটি দ্বারা জাগরণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। দুইটি দ্বারা অশ্রুজল প্রবাহিত হয়। স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয়ে যে দুইটি ধমনীর সাহায্যে স্তন্য বাহিত হয়, তাহাদিগকে, ক্ষীর বাহিনী বলিয়া থাকে, ঐ দুইটি ধমনীই পুরুষের দেহে স্তনদ্বয় হইতে শুক্র বহন করিয়া থাকে। অধোগামিনী ধমনীদিগের

মধ্যে দশটি মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্ত্তব প্রভৃতিকে শরীরের অধোদেশে বহন করিয়া থাকে। ইহারা আমাশয় ও পক্কাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রত্যেকে তিনটি করিয়া ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি করিয়া ধমনী বাত, পিত্ত, কফ, রক্ত ও রসকে বহন করিতেছে। দুইটি অন্ন বহন করিতেছে। দুইটি অন্নদেশে সংশ্রিত হইয়া জল বহন করিতেছে। দুইটি শুক্র প্রকাশ ও বহন করিতেছে। এবং ইহারাই স্ত্রীজাতির কলেবরে আর্ত্তব বহন করিতেছে। স্থূল অন্ত্রে সংলগ্ন দুইটী ধমনীর দ্বারা মল নিঃসারিত হইতেছে। এই আটটী ধমনী তির্য্যক গামিনী ধমনীগণের মধ্যে স্বেদ অর্থাৎ ঘর্ম্ম অর্পণ করিয়া থাকে। তির্য্যক গামিনী চারিটী ধমনীর প্রত্যেকটী উত্তরোত্তর শত শত সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখা রূপে স্বয়ং বিভক্ত হইয়া শারীরিক রস দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে সন্তর্পিত করিয়া থাকে।

স্রোত—স্রোত বহু সংখ্যক। তন্মধ্যে দুইটী প্রাণবহ, সেই দুইটী স্রোতের মূল—হৃদয় ও রস বাহিনী ধমনী সকল। দুইটী অন্নবহ, সেই দুইটির মূল আমাশয় ও অন্নবহা ধমনী সকল। দুইটী উদকবহ, সেই দুইটীর মূল। তালু দুইটী রক্তবহ, তাহাদের মূল যকৃত, প্লীহা ও রক্তবহা ধমনী সকল। রক্তবহ স্রোত দুইটী, তাহার মূল—হৃদয় ও রসবাহিনী ধমনী সকল। দুইটী মাংসবহ, তাহাদের মূল—স্নায়ু, ত্বক ও রক্ত বাহিনী ধমনী সকল। দুইটী মেদোবহ, তাহাদের মূল কটীদেশ ও বৃক্কদ্বয়। দুইটী মূত্রবাহী, তাহাদের মূল বস্তি ও মেঢ্র। দুইটী পুরীষ বাহী, তাহাদের মূল পক্কাশয় ও গুহ্যদেশ। দুইটী শুক্রবহ, তাহাদের মূল স্তনযুগ ও বৃষণদ্বয়। দুইটী আর্ত্তবহ, তাহাদের মূল গর্ভাশয় ও ধমনী সকল।

ডিসেকসন বা শবচ্ছেদ সম্বন্ধে—সুশ্রুত সংহিতায় এইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে, যে দেহের কোনো অঙ্গ বিষ কর্ত্তৃক উপহত, বহু কালীন স্থায়ী ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ও একশত বৎসরের অধিক বয়সের না হয়, সেই মৃতদেহ সংগ্রহ পূর্ব্বক অন্ত্র অর্থাৎ নাড়ী ভুঁড়ি ও মল নিঃসারিত করিয়া মুঞ্জ, ছাল, শণ, কুশ প্রভৃতির কোনো একটীর দ্বারা সেই দেহ উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া একটী বড় খাঁচায় পুরিয়া স্রোতহীন নদীতে নির্জ্জনে রাখিয়া পচাইবে। সাতরাত্রি এইরূপ ভাবে পচাইয়া বেণার মূল, চুল, বাঁশের চটা, গাছের ছাল ও তুলি—ইহাদের যে কোনো একটীর দ্বারা আস্তে আস্তে ত্বগাদি ঘর্ষণ পূর্ব্বক বাহ্য ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি সকল বিশেষরূপে দর্শন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে। যে ব্যক্তি দেহে ও শাস্ত্রে শারীরিক বিষয় গুলি ঐক্য করিয়া শিক্ষা করেন, তিনিই চিকিৎসা কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারেন। মৃতদেহ ছেদন ও গুরূপদেশ দ্বারা সকল সন্দেহ মীমাংসা পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদে শারীর বিদ্যা বা অ্যানাটমীর পরিচয় আরও বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে, আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতির ভয়ে অতি সংক্ষেপে তাহারই সারাংশ সঙ্কলন করিয়া

দিলাম মাত্র। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অ্যানাটমী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনকারদিনের ডাক্তারি অ্যানাটমী অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদের অ্যানাটমী কম উন্নত ছিল না, এখন চর্চ্চার অভাবে উহা লুপ্ত হইয়াছে এইমাত্র।

রোগ-বিজ্ঞান

[কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, সামাধ্যায়ী]

—:•:—

বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, ধেড়ে ও নেংটী ইঁদুরেরা যক্ষ্মাকাসের দ্বারা প্রায় আক্রান্ত হয় না। ইহাদের খাবারের মধ্যে অসংখ্য যক্ষ্মাজীবাণু মিশাইয়া দিলে বা দেহের ভিতর সূচের সাহায্যে যক্ষ্মা-জীবাণু প্রবেশ করাইলে ইহাদের শরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ ফুটিবে না। তাই বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিলেন যে, পাথুরের ধূলার সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণু মিশাইয়া দেহে প্রবেশ করাইবেন। এই পরীক্ষার ফল হইল আশ্চর্য্য। পাথুরে ধূলার সঙ্গে যক্ষ্মার জীবাণু শরীরে প্রবেশ মাত্র ইন্দুরের শরীরে যক্ষ্মার চরম লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

পাথুরে ধূলা প্রত্যেক সহরের রাজপথে ছড়ান থাকে,সেই জন্যই গ্রাম অপেক্ষা সহরেই যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব বেশী।

রোগ জীবাণুকে নির্ম্মূল করা অসম্ভব ব্যাপার। আমরা প্রত্যহই নিঃশ্বাসের সঙ্গে রোগ-জীবাণু গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের রোগাক্রান্ত না হইবার কারণ এই যে, আমাদের জীবনীশক্তি যেখানে স্বাস্থ্যের বিধি লঙ্ঘিত না হয় সেই খানেই প্রবল থাকে, সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত ধূলিকণারূপী রোগজীবাণুরা দেহে প্রবেশ করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না।

সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রাইট ডিজিজেরও রোগজীবাণু আছে; তাহারাও সর্ব্বাংশে ধূলা। অতএব মানবের স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ধূলার চেয়ে বড় শত্রু খুব কমই আছে। আরও কত রোগের মূল কারণ যে ধূলা তাহা কে বলিতে পারে ?

প্রসিদ্ধ যক্ষ্মা চিকিৎসক ও যক্ষ্মারোগে Vegetabbs Prasin, ইঞ্জেক্সনের আবিষ্কার কর্ত্তা ডাক্তার হারবি বহু প্রকার পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়াছেন যে কচ্ছপ ও ছাগের শরীরে যক্ষ্মাজীবাণু প্রবেশ করাইলে সেই জীবাণুগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা ছাগ বা কচ্ছপের শরীরে রোগ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। এই সত্য যে, ডাক্তার হারবি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা নহে; আদিম যুগের ঋষি সম্প্রদায় ইহার সত্যতা অনুধাবন করিয়াছিলেন, তাই যক্ষ্মা রোগীর আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন—

ছাগমাংসং'পরচ্ছাগং ছাগং সর্পিঃসশর্করম্
ছাগোপসেবাশয়নং ছাগমধ্যেতু যক্ষ্মণুৎ॥

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগদুগ্ধপান, শর্করা সহিত ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা ও ছাগ মধ্যে শয়ন করিলে যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হয়। আরও ছাগঘৃত, ছাগ বিষ্টার রস, ছাগমূত্র, ছাগ দুগ্ধ ও ছাগ দধির দ্বারা প্রস্তুত "অজা-পঞ্চক ঘৃত" যক্ষ্মা রোগে মহোপকারী। ছাগের জীবাণু নাশকত্ব শক্তি আছে তাহা তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শুক্র-শোণিত প্রভৃতি যাবতীয় ধাতুই কতকগুলি অণুগোলক বা call এর সমন্বয়ে গঠিত হয়। এক বিন্দু রক্ত কণিকায় বহু call বা অনুগোলক বিদ্যমান থাকে—তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখা যায়। সেই call গুলি আবার যে প্রটোপ্ল্যাজম্, ক্রমো-প্ল্যাজম্ ও নিউক্লিয়াসের সমন্বয়ে গঠিত হইয়া প্ল্যাজমা নামক জলীয় পদার্থে call রূপে বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। সেই সূক্ষ্ম অণুগোলক বা call এরও জীবন আছে তাহা সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানে ৩য় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

"সৌম্যং শুক্র মার্ত্তব ম্যুগ্নেয়ামতরেষামপ্যত্র
ভূতানাং সান্নিধ্য মস্ত্যনুনা বিশেষেণ
পরস্পরোপকারাৎ পরস্পরানুগ্রহাৎ পরস্পরা-
নুপ্রবেশাচ্চ।"

অর্থাৎ শুক্র সোমগুণ—বিশিষ্ট, রক্ত অগ্নিগুণ বিশিষ্ট; তথাপি এই দুই দ্রব্যে অন্যান্য ভূতদিগের সান্নিধ্য আছে, তাহারা এই সকল দ্রব্যে অণুভাবে আছে এবং অণু-ভাবে পরস্পর পোষিত ও পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়।

পুরুষের শুক্রস্থান যেমন অণ্ডকোষ, স্ত্রীলোকেরও শুক্রস্থান সেইরূপ ডিম্বকোষ (overy)। তথা হইতে শুক্রবাহী নলী (Phalapian tube) দিয়া স্ত্রী শুক্র গর্ভাশয়ে আসিয়া পড়ে। তথায় শুক্র গত কীট পুরুষের শুক্রগত কীটের সহিত অণুপ্রবিষ্ট হয়। স্ত্রী-শুক্রকীটকে ovam বলে।

সকল ধাতুর মধ্যস্থিত অণুগোলক গুলির যে প্রাণ আছে, তাহা পাশ্চাত্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দেখাইতে পারে নাই, কিন্তু মহর্ষি সুশ্রুত তাহা কোন প্রাচীন যুগে দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাতেও সেই অতীতকালে যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সকল ভূত যে দেবযোনী বিশেষ নহে, জীবাণু মাত্র,—তাহা সুশ্রুত অন্যত্র বলিয়াছেন যথা—

নতে মনুষ্যৈঃ সহ সংবিশন্তি
নবা মনুষ্যান্ কচিদ্বা বিশন্তি।
যে বা বিশন্তীতি বদন্তি মোহাৎ
তে ভূত বিদ্যা বিষয়াদপোহ্যাঃ॥
তেষাং গ্রহানাং পরিচারকা যে
কোটী-সহস্রাযুত পদ্ম সংখ্যাঃ।
উত্তর তন্ত্রে ৬০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক।

ভূত অর্থাৎ দেবযোনীগণ কখন মনুষ্যের সহিত সংবিষ্ট হয় না, বা মনুষ্যে আবেশ করে না। যে বৈদ্য মুর্খতাবশতঃ বলেন যে ভূতগণ ঐরূপে সংবিষ্ট হয় অর্থাৎ মনুষ্যকে ভূতে পায় বা আবেশ করে, সেই বৈদ্যকে ভূতবিদ্যার অধিকার হইতে বাহির করিয়া

দেওয়া উচিত। ভূত অর্থাৎ দেবযোনী গণের কোটী-সহস্র অযুত পদ্ম (অর্থাৎ অসংখ্য) পরিচারক আছে, এবং তাহারাই মানব শরীরে আবেশ করে।” ভূতগণের এই পরিচারক গুলিই যে Bacteria (ব্যাক্টেরিয়া) এবং তাহা জীবাণু যুক্ত, তাহা ইহার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। সুশ্রুত বলিয়াছেন—

“কেচিত্তু ভূতাভিষঙ্গোত্থং ব্রুবতে বিষমজ্বরম”

এই পাঠ দ্বারা বুঝা যায় যে, ভূতাভিষঙ্গ হইতে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ভূত অর্থে প্রাণী বা জীবাণু বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে জীবাণু বর্ত্তমান থাকে—তাহা রক্ত পরীক্ষা দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়। আর এই জ্বর বিষমজ্বরেরই অন্তর্গত। পাশ্চাত্যীয়েরা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের জীবাণুকে পৃথক জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ম্যালেরিয়ারই পুরাতন অবস্থা, কালাজ্বরে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পার্থক্য সম্বন্ধে কল্পনা করিতে পারা যায় যে, যেমন বেঙ্গাচী লাঙ্গুল খষিয়া জল হইতে ভূমিতে উঠিলেই বেঙ হয়, সেইরূপ নবজ্বরই তিন সপ্তাহ অতীত হইলে জীর্ণ জ্বরে পরিণত হয় ও জীর্ণ জ্বরই বিষমত্ব প্রাপ্ত হইলে বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং ম্যালেরিয়াই পুরাতন অবস্থায় কালাজ্বরে পরিণত হইয়া থাকে। জ্বরের প্রথম হইতেই জীবাণু সংসৃষ্ট থাকে, তবে ক্রমশঃ “ধাতুমন্ততমং প্রাপ্তঃ কুর্ব্বন্তি বিষমজ্বরান্” রসধাতু হইতে রক্তধাতু প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কালাজ্বরে পরিণত করে। এইরূপ মাত্র গ্রাম্য কুচিকিৎসকের কুচিকিৎসাতেই ঘটিয়া থাকে; নবজ্বরে কুইনাইন প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগই তাহার প্রধান কারণ, যে হেতু আয়ুর্ব্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

“অক্ষি কুক্ষি ভবা রোগা প্রতিশ্যায় ব্রণ জ্বরাঃ পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ”

নেত্রগত, উদরগত রোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর পাঁচদিন লঙ্ঘন প্রদানেই আরোগ্য হয়, এই লঙ্ঘনের লক্ষণ কহিয়াছেন—

“অভূমিজং নিরাকারং পথ্যং ষড়্রস বর্জ্জিতং চরকেণ সমুদ্দিষ্টং লঙ্ঘনং পরমং মহৎ ॥”

নবজ্বরে এইরূপ উপবাস দেওয়াই উচিত, ঔষধ প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তাই আত্রেয়—অগ্নিবেশকে “লালা প্রসেক হৃল্লাস হৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ।”—প্রভৃতি নবজ্বরের লক্ষণ বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

“আমজ্বরস্যলিঙ্গানি ন দদ্যাৎ তত্র ভেষজং”

অগ্নিবেশও ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন “ভেষজংহ্যামদোষস্য” যদি আম দোষের পরিপাক জন্য ঔষধ দেওয়া যায়?—আত্রেয় বলিলেন—“ভূয়োজ্জ্বলয়তি জ্বরম্” পুনর্ব্বার জ্বর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে। অগ্নিবেশ বলিলেন “শোধনং শমনীয়ম্বা?” শোধনীয় বা শমনীয় ঔষধ প্রদানে কি হয়? আত্রেয় বলিলেন—“কুর্ব্বন্তি বিষম জ্বরান্” সন্তত, সতত প্রভৃতি বিষম জ্বরে পরিণত হইবে। জ্বরের লক্ষণে বলিয়াছেন “আসপ্ত রাত্রং তরুণ জ্বরমাহুর্ম্মণিষীনঃ, মধ্যং দ্বাদশ রাত্রন্তু পুরাণ মত উত্তমম্, ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতেতু জ্বরো য স্তনুতাং গতপ্লীহাগ্নিবাদং কুরুতে স জীর্ণ জ্বর মুচ্যতে” এই সাতদিন পর্য্যন্ত তরুণ জ্বরে জ্বরঘ্ন কষায়াদি নিষেধ করিয়াছেন—

কুইনাইন প্রভৃতি জ্বরঘ্ন ঔষধ দেওয়া যাইতেই পারেনা। ঋষি বলিয়াছেন—

"কষায়ং য প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণে জ্বরে
স সুপ্তং কৃষ্ণসর্পন্তু করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥"

তরুণ জ্বরে কষায় প্রয়োগে সুপ্ত কৃষ্ণ সর্পকে করাগ্রের দ্বারা ধরিলে যে ফল হয়, সেই ফল হইয়া থাকে। ঋষি বলিয়াছেন—

"যঃ কষায় কষায়ঃস্যাৎতৎ বর্জ্জ্যাস্তরুণেজ্বরে।
নতু কষায় মুদ্দিশ্য কষায়প্রতিষিধ্যতে।

যাহা কষায় রস বিশিষ্ট, তাহাই তরুণ জ্বরে বর্জ্জনীয়, অতএব দেখা যায় যে, কুচিকিৎসার ফলেই নবজ্বরে জীবাণু সংশ্লিষ্ট থাকিলেও তাই ক্রমশঃ কালাজ্বরে পরিণত হয়, নচেৎ কালা জ্বরে পর্য্যবসিত হইলেই যে, জীবাণুর আবেশ হয় তাহা নহে। রায় বাহাদুর ডাঃ হরি নাথ ঘোষ এম, ডি মহাশয় কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মশক দংশনেও কালাজ্বর হইয়া থাকে। মশক দংশনে কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বর উৎপন্ন হয় ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে নিদান অভিন্ন।

(ক্রমশঃ)

কায় চিকিৎসা ক্রমোপদেশ।

তৃতীয় খণ্ড।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

(বাতব্যাধি)

সাধারণতঃ বায়ু কুপিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহার সংজ্ঞা বাতব্যাধি প্রদান করা যায়। শাস্ত্রে এই বাতব্যাধির প্রকার ভেদ আশী প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শিরোগ্রহ, অল্প কৃশতা, অত্যন্ত জৃম্ভা, হনুগ্রহ, জিহ্বাস্তম্ভ, গদ্‌গদত্ব, মিনমিনত্ব, মূকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভিজ্ঞতাবাধির্য্য কর্ণনাদ, "স্পর্শাজ্ঞত্ব," অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, ঊর্দ্ধবাত, আধ্মান, প্রত্যাধ্মান, বাতাষ্ঠীলা, প্রতিষ্ঠিলা, তূণী, প্রতিতূণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ, পার্শ্বশূল, ত্রিকশূল, মূহুর্মূত্রণ, মূত্রনিগ্রহ, মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি, গৃধ্রসী, কলায় ভঞ্জতা, খঞ্জতা, পঙ্গুতা, ক্রোষ্টুশীর্ষক, খল্লী, বাতকণ্টক, পাদহর্ষ, পাদদাহ, আক্ষেপ ও দণ্ডক, কফপিত্তানুবন্ধ, আক্ষেপ, ও দণ্ডাপতানক রোগ, অভিঘাত জন্য আক্ষেপ, অন্তর আয়াম, ও বহিরায়াম ভেদে দুই প্রকার আয়াম, ধনুস্তম্ভ, কুব্জক, অপতন্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তম্ভ,

ব্যথা, তোদ, ভেদ, স্ফুরণ, রৌক্ষ্য, কার্শ্য, কার্ষ্ণ, শৈত্য, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ্দন, অঙ্গ বিভ্রংশ, শিরা সঙ্কোচ, অঙ্গশোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষয়, রজোনাশ, গর্ভনাশ ও পরিশ্রম। ইহাদিগের মধ্যে যে কয়টি সাধারণতঃ হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামোল্লেখ পূর্ব্বক প্রতীকারোপায় বলা যাইতেছে।

আক্ষেপ, অপতন্ত্রক, অপতানক। আক্ষেপের সাধারণ নাম খিচুনি। যে রোগে বায়ু—হৃদয়, মস্তক ও ললাট দেশের পীড়া জন্মাইয়া দেহকে ধনুকের ন্যায় নত ও আক্ষেপযুক্ত করিয়া থাকে, তাহার নাম অপতন্ত্রক। এই অপতন্ত্রক রোগে রোগী মূর্চ্ছিত, নিমীলিত চক্ষু ও সংজ্ঞাহীন হয়। কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ এবং পারাবতের ন্যায় শব্দোচ্চারণও এই রোগে হইয়া থাকে। অপতানক রোগে যখন বায়ু হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া এই রোগ প্রকাশিত হয় এবং বায়ু হৃদয়ে চলিয়া গেলেই রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে। এই রোগে দৃষ্টিশক্তির নাশ, সংজ্ঞা লোপ এবং কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

দণ্ডাপতানক—রোগে কুপিত বায়ু কফের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত ধমনীকে অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় শরীরকে স্তম্ভিত করিয়া তাহার আকুঞ্চনাদি শক্তি নষ্ট করে।

ধনুঃস্তম্ভ—ইহার চলিত নাম ধনুষ্টঙ্কার। অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে এই ব্যাধি দ্বিবিধ। এই রোগে অতি কুপিত বলবান বায়ু অঙ্গুলি, গুল্ফ জঠর, বক্ষঃস্থল, হৃদয় ও গলদেশের স্নায়ু সমূহকে আকর্ষণ করিলে রোগী ক্রোড়াভিমুখে নত হইয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থার নাম অন্তারায়াম। এই অবস্থায় রোগীর চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ হয়, চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, পার্শ্বদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কফ উদগীর্ণ হইতে থাকে। বহিরায়াম ধনুষ্টঙ্কারে বায়ু পৃষ্ঠের দিকে স্নায়ু সমূহ আকর্ষণ করায় রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বক্ষঃস্থল, কটি ও উরু ভগ্নবৎ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ধনুঃস্তম্ভ অসাধ্য জানিবে। গর্ভপাত, অধিক রক্তস্রাব এবং আঘাতাদির ফলেও এইরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহাও অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।

পক্ষাঘাত বা একাঙ্গ বাত।—এই রোগ দুই প্রকার। কাহার ও বাম-দক্ষিণ বিভাগের, একভাগে কাহারও কটি দেশের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগানুসারে এক ভাগে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগে কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক দেহের অর্দ্ধভাগ আক্রান্ত হওয়ায় শিরা ও স্নায়ু সমূহ সঙ্কুচিত ও বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সম্যক প্রকারে বিশ্লিষ্ট হয়; এজন্য যে ভাগে এইরূপ অবস্থা হয় সেই ভাগ অকর্ম্মণ্য ও অচেতন প্রায় হইয়া উঠে।

অর্দ্দিত—এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া মুখের অর্দ্ধভাগ ও গ্রীবা প্রদেশ বক্র করে এবং শিরঃ কম্প, বাক্য নিরোধ এবং নেত্রাদির বিকৃতি উৎপাদন করে। এই রোগ মুখের যে পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে, সেই

পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক ও দন্তে বেদনা হইয়া থাকে। এই রোগ যদি তিন বৎসর পর্য্যন্ত অচিকিৎসা রাখা যায়—তাহা অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিবে।

হনুগ্রহ—কঠিন দ্রব্য চর্ব্বন বা কোনরূপ আঘাত প্রাপ্তির জন্য হনুমূলস্থ বায়ু কুপিত হইয়া হনুদ্বয় অর্থাৎ চোয়াল শিথিল করিয়া এই রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে মুখ বুজিয়া থাকিলে হাঁ করা যায় না।

মন্যাগ্রহ—এই রোগে কুপিত বায়ু কফাবৃত হইয়া মন্যা অর্থাৎ গ্রীবা দেশস্থ শিরা দ্বয়কে স্তম্ভিত করে, তজ্জন্য গ্রীবা ফিরাইতে পারা যায় না।

জিহ্বাস্তম্ভ এই রোগে কুপিত বায়ু বাগবাহিনী শিরায় অবস্থিত হইয়া, পান, ভোজন এবং বাক্যকথনের শক্তি লোপ করিয়া থাকে।

শিরোগ্রহ—এই রোগে গ্রীবদেশস্থ শিরা সমূহে কুপিত বায়ু অবস্থিত হইয়া শিরা সকল রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণত্ব করিয়া থাকে। এই রোগে আক্রান্ত রোগী মস্তক চালনা করিতে পারে না। এ রোগ অসাধ্য।

গৃধ্রসীবাত—এই রোগে প্রথম স্ফিক (পাছা), তৎপরে যথাক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘা ও পাদদেশে স্তব্ধতা, বেদনা ও সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

বিশ্বাচী—বাহুর পশ্চাদভাগ হইতে যে সকল বড় বড় শিরা অঙ্গুলিতল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, বায়ু কর্ত্তৃক সেই শিরাগুলি দূষিত হইলে বাহু অকর্ম্মণ্য ও আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়াশূন্য হইয়া থাকে। ইহারই নাম বিশ্বাচী। ইহা একটী বা দুইটী বাহুতেও হইতে পারে।

ক্রোষ্টুক শীর্ষ—এই রোগে কুপিত বায়ু ও দূষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া জানুমধ্যে শৃগালের মস্তকের ন্যায় এক প্রকার শোথ উৎপন্ন করে।

খঞ্জতা পঙ্গুতা, কলায় খঞ্জ--কটি দেশস্থ কুপিত বায়ু যদি এক ঊর্দ্ধ জঙ্ঘার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া রাখে তাহা হইলে খঞ্জতা, দুই পায়ের জঙ্ঘা দেশস্থ শিরা আকর্ষণ করিলে পঙ্গুতা এবং যে রোগে পা ফেলিবার সময় পা কাঁপিতে থাকে, তাহার নাম কলায়খঞ্জ বলিয়া জানিবে।

বাত কণ্টক--অসম অর্থাৎ উচু নিচু পাদ বিন্যাস এবং বায়ু প্রকোপের ফলে গুলফদেশে বেদনার উৎপত্তি এই রোগে হইয়া থাকে।

পাদ-দাহ, পাদহর্ষ - অতিরিক্ত ভ্রমণের ফলে পিত্ত, রক্ত, ও বায়ু কুপিত হইয়া পাদদাহ রোগ জন্মাইয়া থাকে। পাদদ্বয় স্পর্শ শক্তি হীন, বারংবার রোমাঞ্চিত এবং ঝিন্ ঝিনি বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে পাদহর্ষ বলা যায়।

অংশশোষ—স্কন্ধ দেশস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া স্কন্ধের বন্ধন স্বরূপ শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করিয়া এই রোগ জন্মাইয়া থাকে।

অববাহুক—স্কন্ধস্থিত কুপিত বায়ু শিরা সমূহকে সঙ্কুচিত করিলে তাহাকে অববাহুক বলে।

গদ গদ ভাষী—কফ সংযুক্ত বায়ু শব্দ বাহিনী ধমনী সমূহকে দূষিত করিয়া

মিন্ মিনে, গদ গদ ভাষী এবং বোবা করিয়া থাকে।

তূণী ও প্রতি তূণী এই রোগে মলাশয় বা মূত্রাশয় হইতে বেদনা উত্থিত হইয়া গুহ্য দেশ, লিঙ্গ বা যোনি দেশে বিদারণবৎ বেদনা জন্মাইয়া থাকে। ঐরূপ বেদনা গুহ্য দেশ, লিঙ্গ বা যোনী প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া প্রবল বেগে পক্কাশয়ে গমন করিলে তাহাকে প্রতিতূণী বলিয়া থাকে।

আধ্মান ও প্রত্যাধ্মান—পক্কাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিয়া উদরকে স্ফীত, বেদনাযুক্ত এবং গুড় গুড় শব্দ বিশিষ্ট করিলে তাহাকে আধ্মান এবং ঐ বেদনা পক্কাশয় হইতে না হইয়া আমাশয় হইতে উত্থিত হইলে এবং উদর বা পার্শ্ব দেশে স্ফীতি না থাকিলে তাহাকে প্রত্যাধ্মান কহিয়া থাকে।

অষ্ঠীলা ও প্রত্যষ্ঠীলা—নাভির অধোভাগে পাষাণখণ্ডের ন্যায় কঠিন, উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রন্থি বিশেষ উৎপন্ন হইলে অষ্ঠীলা ও উহা বক্রভাবে অবস্থিত থাকিলে তাহাকে প্রত্যষ্ঠীলা কহিয়া থাকে। এই উভয় রোগেই মল, মূত্র ও বায়ু নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

বেপথু—সর্ব্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক সর্ব্বদা কাঁপিতে থাকিলে তাহাকে বেপথু বলে।

খল্লী—পদ, জঙ্ঘা, উরু, ও করমূল মোচড়াইলে তাহাকে খল্লী বা খালধরা বলে।

এইবার বিবিধ বায়ু বিকারের চিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে—

অপতন্ত্রক ও অপতানক রোগে—চেতনা সম্পাদন জন্য—মরিচ, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলসী পত্র সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া নস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিবে। হরীতকী, বচ, রাস্না, সৈন্ধব লবণ, থৈকল—এই সকল দ্রব্য সমভাগ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় আদার রসের সহিত সেবনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। দশমূলের ক্বাথে পিঁপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ভোজনের পূর্ব্বে মরিচ চূর্ণের সহিত অম্ল দধি ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই রোগে অপতর্পণ নিরূহবস্তি ও বমন প্রয়োগ কদাপি করিবে না।

পক্ষাঘাত রোগে—মাষ কলাই, আলকুশী মূল, এরণ্ড মূল, ও বেড়েলা—ইহাদের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। পিঁপুল মূল, চিতামূল, পিঁপুল, শুঁঠ, রাস্না ও সৈন্ধব—ইহাদের কল্ক এবং মাষকলাইয়ের ক্বাথের সহিত যথাবিধি তৈলপাক করিয়া মর্দ্দন করাইবে। মাষকলাই, আলকুশী মূল, আতইচ, এরণ্ড মূল, রাস্না, শুলফা, ও সৈন্ধব—এই সকল দ্রব্যের কল্ক তৈলের চতুর্গুণ পরিমিত মাষকলাই ও বেড়েলার পৃথক পৃথক ক্বাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করাইবে।

অর্দ্দিত রোগে—মুখ বিকৃত হইলে অর্থাৎ হাঁ করিয়া থকিলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা হনুস্থান ও তর্জ্জনীর দ্বারা চিবুক ধরিয়া চাপ দিয়া সংবৃত করিয়া দিবে। হনু শিথিল হইয়া পড়িলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিবে। মুখ স্তব্ধ হইয়া থাকিলে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য।

রসোন এই রোগে বিশেষ হিতকর। রসোন ছেঁচিয়া মাখনের সহিত এই রোগে সেবন করা কর্ত্তব্য। বেড়েলা, মাষকলাই, আল-কুশীমূল, গন্ধতৃণ, ও এরণ্ডমূল,—ইহাদের ক্বাথ পান করিলে এবং ঐ ক্বাথের নস্য লইলে অর্দ্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগ নষ্ট হয়। অর্দ্দিত রোগে স্নেহ পান, নস্য, বাতঘ্ন দ্রব্য আহার এবং শিরো-বস্তি উপকারী। দশ-মূলীর ক্বাথ বা ছোলঙ্গ লেবুর রস কিম্বা বেড়েলা অথবা পঞ্চমূলীর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান এই রোগে হিতকর। পিষ্ট মাংস ও ঘৃত ও নবনীতের সহিত ভোজন করিয়া অথবা দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত ভোজন করিয়া দশমূলীর রস পান করিলেও অর্দ্দিত রোগ প্রশমিত হয়। এই রোগ পিত্তজন্য হইলে শীতল দ্রব্য ও স্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ প্রশস্ত। ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বস্তিক্রিয়াও এ অবস্থায় উপ-কারী। কিন্তু এই রোগে যদি মুখ বক্র ও বাক্যোচচারণ শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে, এবং দাহ হইতে থাকে, তাহা হইলে বায়ু পিত্ত-নাশক ক্রিয়া করিবে। যদি অর্দ্দিত রোগ শোথসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা বমনক্রিয়া এই রোগে সুপ্রশস্ত।

মন্যাস্তম্ভ রোগে—দশমূলীর ক্বাথ কিম্বা পঞ্চমূলের ক্বাথ পান এবং রুক্ষ স্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিবে। এই রোগে তৈল বা ঘৃত গ্রীবা দেশে মর্দ্দন করতঃ আকন্দ পত্র বা ভেরেণ্ডার পাতার দ্বারা উহা আবৃত করিয়া বারংবার স্বেদ প্রদান করিবে। কুকুড়ার ডিম ভাজিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ গরম করিয়া গ্রীবা দেশে মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। অশ্বগন্ধা মূলের প্রলেপ এবং খাঁটী সরিষার তৈল মর্দ্দন এই রোগে হিতকর।

গদ গদ ভাষী—রোগে—ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের কবলধারণ হিতকর। এই রোগে নিম্ন লিখিত তৈল সেবনের ব্যবস্থা করিও, বিশেষ উপকার পাইবে।

ঘৃত ⁄৪ সের—
কল্কার্থ—সজিনার ছাল
বচ
সৈন্ধব—
ধাইফুল—
লোধ—
আকনাদি—
প্রত্যেক ৶—অর্দ্ধপোয়া। জল ১৬ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। যথানিয়মে—পাক করিয়া অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য।

(ক্রমশঃ)

কচুরী পানায় ম্যালেরিয়া।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ, এম, আর, এ, এস]

—:০:—

কচুরীপানার অন্য নাম কচরী মান বা জর্ম্মনী পানা ইহাদের অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হয়। একটা পুকুরে ক্ষুদ্র এক টুকরা কচুরী পানার পাতা ফেলিয়া দিলে দু'এক মাসের মধ্যে সে পুকুরে আর কিছু দেখা যায় না। এই পানা যেখানে থাকে। অন্য ঘাস সেখানে জন্মিতে পারে না। ইহার ফুলের কেশর বাতাস সাহায্যে উড়িয়া যেখানে যায়। সেস্থানে পর্য্যন্ত এই ঘাস জন্মায়। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ইহার এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, নদী, খাল, বিলে নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়াছে, শস্যও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার ধ্বংস কারণ বহু চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইয়া আচার্য্য ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসুর নায়কত্বে এক কমিটী গঠন করিয়াছেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত ফলাফল নির্দ্দেশ হয় নাই। রৌদ্রে শুকাইয়া আগুণ দিয়া পোড়াইলেও ইহার ধ্বংস হয় না। পোড়াইয়া দেখা গিয়াছে, ইহার ভস্ম রাশি বায়ু আশ্রয়ে যেখানে গিয়া পড়িয়াছে,সেখানেই ইহার চারা জন্মাইয়াছে। মানবের এমন শত্রু দ্বিতীয় আর হয় নাই। যেখানে কচুরী পানা হয়, সে জলাশয়ের মাছগুলি মরিয়া যায়, ইহার জল মানুষের অপেয় হয়, জল কথঞ্চিৎ নীল ও কালো বর্ণ হয়। কোন ইংরেজ ইহার ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপান হইতে ইহা এদেশে আনিয়াছিলেন।

কচুরীপানা যেখানে জন্মায়, তাহার চতুর্দ্দিকে জ্বর হইতে থাকে, এই জ্বরকে ম্যালেরিয়া বলিয়াই চিকিৎসকগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বোধ হয় ইহার বাতাসে জ্বর উৎপন্ন হয়, ইহার জল পান করিলেও জ্বর হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি অতি মাত্রায় হয়। এই সময়ই জ্বর হইতে আরম্ভ হয়, কার্ত্তিক মাসে জ্বরের প্রাদুর্ভাব প্রবল দেখা যায়। এই সময় জ্বরঘ্ন ঔষধ কিছু কিছু খাইলে এই জ্বরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা যায়। পার্ব্বত্যনদী সমূহ পর্ব্বত হইতেও কচুরী পানা বহন করিয়া স্রোতযোগে নিম্ন প্রদেশে আনিয়া ফেলে। কিরূপে পার্ব্বত্য প্রদেশে কচুরী পানা গিয়া উপস্থিত হইল, তাহার তত্ত্ব মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। ইহার ধ্বংস কিরূপে করা যায় তাহার মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। আমেরিকাতেও কচুরী পানা বিস্তৃত হইয়া বিধ্বস্ত করিতেছে, কিন্তু ধ্বংসের উপায় নিরাকরণ হয় নাই।

সকলেই কচুরী পানা পোড়াইয়া ইহার ধ্বংসের সহায়তা করুন। ইহার ভস্ম জমির

উৎকৃষ্ট সার। ইহার ধ্বংস করিলে স্থানীয় স্বাস্থ্য ভাল হইবে, মৎস্যবংশ বাঁচিবে, ছাই দিয়া জমির সার হইবে। নৌকা চলাচলও হইতে পারিবে। দুষ্ট লোকেরা শত্রুতা করিয়া কোন কোন পুকুরে ইহার পাতা, ফুল বা গাছ ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পুকুরের স্বামী ইহা দেখিবা মাত্রই অবিলম্বে ফেলিয়া না দিলে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। ইহা মানুষের প্রবল শত্রু। গো, মহিষাদি ইহা খায় না, যদি ইহা কোন কোন গো মহিষাদিকে কদাচিৎ খাইতে দেখা যায়—পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সে সকল গবাদি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও তাহাদিগের দুগ্ধ কমিতে থাকে। যে সকল জমীতে কচুরীপানা প্রবেশ করে, তাহা ফসল জন্মাইবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন স্থানের লোক ইহার ফুল তেলে ভাজিয়া খায়, কিন্তু ইহা বেশী খাইলে শরীরে বেদনা হয় ও গা ঝিমঝিম করে ও পরে জ্বর হয়। কচুরীপানা দুই তিন জাতীয় আছে, সকলের একই প্রকার ভাবে বংশ বৃদ্ধি হয় ও সকলগুলিই এক প্রকারে সমভাবে অনিষ্টকারক। আমরা আশা করি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানবলে ইহার ধ্বংশের পথ নিরাকরণ করিয়া দিবেন। এখন গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হাতেই এ বিষয়ের ভার দিয়াছেন।

ম্যালেরিয়া।

[শ্রী—পাইকর—বীরভূম]

—:o:—

শরীরে সামদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ উপস্থিত হইলেই যে শরীরের স্বাভাবিক তাপ তাহাকে নিজের অধিকৃত দেহরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য উত্তেজিত হইয়া জ্বর নামে পরিচিত হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য শারীরিক এবম্বিধ ক্রিয়া চিন্তা করিয়াই আমাদের দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জ্বরের সময় জ্বরের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রথমতঃ যে কারণে জ্বর হইয়াছে তাহার প্রতি অর্থাৎ সাম দোষেরই প্রতি লক্ষ্য রাখেন। তাঁহারা জানেন যে, চক্ষুতে ধূলিকণাদি পতিত হইলে যেমন চক্ষু হইতেই জল নিঃসৃত হইয়া তাহা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে, তেমনই দেহে দোষ উপস্থিত হইলে দেহ হইতেই তাপ ফুটিয়া সেই দোষকে ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করে। অতএব যিনি সুচিকিৎসক, তিনি জ্বর রোগীর চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কখনই জ্বরকে বাধা দেন না। পরন্তু তিনি কেবল জ্বরের কারণ সেই দোষেরই প্রশমন করে

ঔষধাদি প্রয়োগ করিবেন। প্রবীন ও ভূয়োদর্শী চিকিৎসকগণ জানেন,—

"আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামোমার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ॥

অন্বয়ঃ—আমাশয়স্থঃ সামঃ দোষঃ অগ্নিং হত্বা মার্গান্ পিধাপয়ন্ জ্বরং বিদধাতি।
তস্মাৎ লঙ্ঘনং আচরেৎ॥

বঙ্গানুবাদ—আমাশয়ে বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ উপস্থিত হইলে উদরাগ্নি আক্রান্ত হয় এবং তাহার ফলে সেই অগ্নি হীনবল হওয়ায় যে যে পথ দিয়া তাহার তাপ চলাচল করতঃ সমস্ত শরীরকে প্রতপ্ত করে, সেই সেই পথগুলি বাধাপ্রাপ্ত হয়। উদরাগ্নি স্থানচ্যুত হওয়ায় ভুক্ত দ্রব্যেরও পরিপাক হয় না। অতএব জ্বরের সময় উপবাস দেওয়া উচিত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শরীরে সামদোষ উপস্থিত হইলে উদরাগ্নি থাকে কোথায়? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই অগ্নি হীনবল হইয়া শরীর ত্যাগ করে না। তবে রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে তাহার যে দুরবস্থা ঘটে, উদরাগ্নিরও তাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। কেবল প্রাণেই বাঁচিয়া থাকে মাত্র। মহাবীর নেপোলিয়ান যখন সর্ব্ব শক্তিবিচ্যুত হইয়া সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহার অবস্থার সন্ধান লইবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন How do you live now? অর্থাৎ এখন কেমন আছেন? তিনি তাহার উত্তরে বলেন I do not live now, I merely exist. অর্থাৎ কাজ ম এখন নাই বলিলেই হয়, কেবল প্রাণটী ধুক্ ধুক্ করিতেছে। বলাবহুল্য দোষের বর্ত্তমানে জঠরাগ্নিরও এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তবে এই প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে, দেহস্থ এই অগ্নি কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয় না। অর্থাৎ সে সুযোগ পাইলেই তাহার স্বভাব শত্রু সামদোষকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। মহাবীর নেপোলিয়নও প্রথম প্রথম ২।১ বার সুযোগ পাইয়া এইরূপ আত্মপ্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন যে, আমাদের শরীরে বায়ু, পিত্ত বা কফের কোন দোষ উপস্থিত হইলেই আমাদের শরীরে ভার বোধ হয়। এই দোষের মাত্রানুসারে শরীরের এই ভারও ন্যূনাধিক উপলব্ধি হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ উপলব্ধির কাল উপস্থিত হইলেই জঠরাগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই স্বভাব শত্রু দোষকে আক্রমণ করিবার জন্য কেবল সুযোগই অনুসন্ধান করে। যে মুহূর্ত্তে সুযোগ পায়, সেই মুহূর্ত্তেই দোষের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাকে জব্দ করিতে আরম্ভ করে। একবার আক্রমণের ফলেই যদি রোগের পরাজয় ঘটে, তাহা হইলেই অগ্নিরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয় এবং তৎসহ দোষেরও পরাজয় অর্থাৎ পরিপাক হইয়া শরীর সারিতে থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় জ্বর ছাড়িয়া যায়, অথচ শরীর ভারই থাকে। ইহাতে এই ঘটনা ঘটে যে, অগ্নি দোষকে হীনবল করে বটে, কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে অস্তিত্ব থাকিয়া যায়। কাজেই যে পরিমাণে দোষ থাকিয়া যায়, সেই পরিমাণেই তাপ পুনরায় বৃদ্ধি হইয়া তাহাকে নাশ করিতে থাকে। শেষে দোষ নাশ হইলে তাপের বৃদ্ধি অর্থাৎ জ্বরও কমিয়া স্বাভাবিক তাপে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য, ইহারই নাম সবিরাম

জয়। কিন্তু কোন কোন সময় দেখা যায় জর একেবারেই ছাড়ে না। তখন বুঝিতে হইবে যে,জরের আক্রমণে দোষ সম্যক পরাভূত হয় না। চিকিৎসকগণ এই জরকেই অবিরাম জর অর্থাৎ রেমিটেণ্ট জর বলেন। দোষের ক্ষয়ের মাত্রানুসারে এই জর ক্রমশঃ কমিয়া থাকে।

অতএব দোষ ও তাপের যখন এইরূপ সম্বন্ধ, তখন চিকিৎসার সময় যে কিরূপ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক—তাহা কোন সুচিকিৎসক কেন, যে কোন সাধারণ লোকই সহজে বুঝিতে পারেন। মোটের উপর দেখা যায়, জর নিবারণ করিতে হইলে যাহাতে দোষের নিবারণ হয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকেরই সর্ব্বাগ্রে তাহা চিন্তা করা উচিত। তবে ইহা স্থির যে, যাঁহারা ১ম শ্রেণীর বুদ্ধিমান তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়া দোষকেই শরীরে প্রবেশ করিতে দেন না। কারণ তাঁহারা জানেন—Prevention is better than cure. অর্থাৎ রোগ দূর করা অপেক্ষা রোগ হওয়ার মূল কারণ দূর করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মূলতঃ এইরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। পল্লীগ্রাম ও সহরের ম্যালেরিয়ার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামেই ইহার প্রকোপ বেশী। সুচিকিৎসকগণ বলেন,—প্রধানতঃ ইহার কারণ দ্বিবিধ, ১ম কারণ সহরের লোক বেশী জ্ঞানী বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত নিয়ম পালন করেন। আর ২য় কারণ, পল্লী অপেক্ষা সহরে অধিকতর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য এই দ্বিবিধ কারণই উপেক্ষণীয় নহে। তবে আমাদের মনে হয় যে, ২য় কারণটাই পল্লীগ্রামের মারাত্মক ম্যালেরিয়ার প্রধান হেতু।

কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ তাঁহার প্রণীত "জরতত্ত্ব ও কাটামৃতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন —"অজীর্ণ রসের (দোষের) মাত্রা যত অধিক হয়, জরও সেই অনুপাতে বেশী হয়" এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া দেখুন যদি অসময়ে বা অসদুপায়ে (অস্বাভাবিক উপায়ে) ঐ জরকে যাহারা বন্ধ করিবার জন্য প্রবল যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি শিব গড়িতে যাইয়া বানর গড়িয়া বসেন না? আর এই বানরের হুঙ্কারে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্পান্বিত হইয়া স্বর্গ হইতে ও মনোরম জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এবং পল্লীগ্রামে যাইতে শঙ্কাবোধ করেন। তাঁহারা বুঝিয়া দেখেন না যে, পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত ডাক্তারেরা কোন ব্যক্তির জর হইবামাত্র ২।৩ দিনের মধ্যে প্রথমে জোলাপ, পরেই ১০।১৫ গ্রেণ কুইনাইন দিয়া থাকেন। অজীর্ণ রসের আধিক্য বশতঃ কুইনাইন সেবনের পরেও যদি জর আসিল তবে পরদিনে ৪০ গ্রেন কুইনাইন দিয়া বসিলেন। কি জন্য যে জর বন্ধ হইতেছেনা, তাহাও তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে সমস্ত চিকিৎসকেরা এই জর অসময়ে (অর্থাৎ জরকারক অজীর্ণ রস ক্ষয় হইবার পূর্ব্বে) যে ঔষধ দ্বারা বন্ধ করিয়া থাকেন, সে ঔষধের কার্য্য পরিণাম যে দেহের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, সে কথা বলা বাহুল্য। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ অনিষ্ট সাধনে চিকিৎসক বা রোগী কেহই সঙ্কুচিত হয়েনা।"

বলা বাহুল্য কবিরাজ মহাশয় পল্লীগ্রামের জর চিকিৎসার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন,

তাহা সত্য বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ভয়ঙ্করী জ্বর বিস্তার ফলে এখন সকলেই ইহা শিখিয়াছেন যে, জ্বর হইলেই তাহা বন্ধ করিতে হইবে। কেন জ্বর হইল, অকালে জ্বর বন্ধ করিলে কোন কুফল ফলিবে কিনা, অকালে জ্বর বন্ধ করিলে পরিণাম কি? —ইত্যাদি কোন বিষয় চিন্তা না করিয়াই কেবল জ্বর বন্ধ করিবার জন্য পল্লীবাসিগণ উৎকর্ণ ও উদ্বেগ হইয়া এক প্রকার মারাত্মক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকে। একটি পয়সা দিলেই প্রত্যেক ডাকঘরে কুইনাইন মিলে, অপিচ গবর্ণমেণ্টও এখনও পল্লীতে পল্লীতে কুইনাইনের দানসাগর করিতেছেন। কাজেই জ্বরের কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া কেবল পুষ্টিলাভই করিতেছে এবং তৎসহ যে ভাপবারা জ্বরের কারণ নষ্ট হয় তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ফলে দেখা যায়, লোকে এই জ্বরতত্ত্ব অবগত নহে বলিয়া আপনার পদে আপনিই কুঠারাঘাত করিতেছে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কবিরাজের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চন করেন, যাঁহারা আমাদের সনাতন হিন্দুশাস্ত্রের যুগ-যুগান্তর ব্যাপী শাসন মানিতে অনিচ্ছুক, আমরা তাঁহাদিগের জন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ইউষ্টেন্ মাইলস্ প্রণীত Avenues to health" নামক সর্ব্বজন সমাদৃত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—"Disease is a blessing not only as a consequence to teach as our mistakes, but also an active agent as doing the work of nature, as helping to remove our mistakes. Fever is an example. We call it illness, but it is really an effort of nature to burn up the poision within us. And may be some day all disease —may, even all disease germs— will be proved to have a like function, and to be fatal only when wrongly treated."

বঙ্গানুবাদ—"রোগ আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; কারণ আমরা যখন ভ্রান্তিবশে বা সংযমের অভাবে অত্যাচার করিয়া থাকি, সেই অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার জন্যই রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে। জ্বর ইহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জ্বরের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের শরীরস্থ দোষকে নষ্ট করিয়া দেহকে পুনরায় বিশুদ্ধ করিবার জন্য যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা সজ্ঘটিত হইয়া থাকে। * * * এবং এই রোগ চিকিৎসিত হইলে (অর্থাৎ যে উদ্দেশে রোগ হইয়াছে সেই উদ্দেশের বাধা জন্মাইলে) জীবন পর্য্যন্তও নাশ করে।"

আজকাল অকালে জ্বর বন্ধ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি অতিমাত্রায় গজাইয়া উঠায় দেশের যে কিরূপ অপকার হইতেছে—তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এখন জ্বর হইলেই কুইনাইন বা তাহার সমধর্ম্মা অন্য কোন কষায় ঔষধ ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য বৈদ্যশাস্ত্রে জ্বরের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ সামদোষ থাকা কালীন কষায় ঔষধ দিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। কারণ কষায় ঔষধ প্রয়োগের ফলে জ্বর মন্ত্রপূত সর্পের ন্যায় শক্তিহীন হয় এবং তাহার ফলে জ্বরের

কারণ যে আম দোষ তাহা পুষ্টিপ্রাপ্ত করে বটে, কিন্তু তাহার ফলে, পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বৈদ্যশাস্ত্র কষায় ঔষধ কুইনাইন প্রভৃতির প্রয়োগ যে একেবারে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন যে, নবজ্বর যখন নিরামজ্বরে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন সামদোষ পরিপাক হইয়া যায়, তখন কষায় ঔষধ ব্যবহার করিলে সুফলই প্রসূত হয়। এই উক্তির সমর্থন করিয়া সুশ্রুত বলেন,—

"মৃদো জ্বর ল.জ্বা দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্বং দোষং বিজ্ঞানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্॥"

নিরাম জ্বরের লক্ষণ প্রসঙ্গে চরক বলেন :—

"ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রাণাং জ্বরমার্দ্দবম্।
দোষপ্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরামজ্বর লক্ষণম্॥"

এরূপ মূল্যবান্ বচন উপেক্ষা করিয়াও যাঁহারা কুইনাইন প্রভৃতি কষায় ঔষধ নবজ্বরে ব্যবহার করিবার বা করাইবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে একবার মনোযোগসহকারে গবর্ণমেন্টের প্রকাশিত ১৯১২ সনের স্বাস্থ্য বিবরণী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তৎপাঠে জানা যায় বাঙ্গালার প্রত্যেক পল্লীসমূহে অজস্র কুইনাইন দান করিয়া তাহার যে ফল হইয়াছে তাহাতে মহামতি গবর্ণর বাহাদুর সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, এখন যাহারা চিকিৎসা রাজ্যের রাজা তাঁহারাই উক্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। এই বিবরণী পাঠান্তেই গবর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—

The Governor in Council is also disappointed to find that despite the employment of Sub-Assistant Surgeons in the distribution of quinine in the District of Nadia and Murshidabad there has been no diminution in fever mortality but the reverse." The Government Resolution on the Sanitary Reports for the year 1912.

বাবুমহলে হার্টফেল।

"হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।"

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,]

——:০:——

ছেলে বেলায় আমাদের নাম থাকে—নন্দী, মাখন, বিহারী ইত্যাদি ; কারণ কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি ঠাকুরদের নাম এখন নিতান্ত পুরাণ ও সেকেলে বলিয়া পিতামাতার

পছন্দ হয় না। বাল্যকালে যদিও গায়ে একটু জোর থাকে, অনায়াসে দুই মাইল পথ হাঁটিয়া যাই, পাঁচ সের দ্রব্য স্বহস্তে বাজার হইতে গৃহে আনি, এক থাল ভাত ব্যঞ্জন খাইয়া হজম করিতে পারি; কিন্তু বড় হইয়া আপিষে কেরাণী গিরি বা অন্যবিধ চাকুরী করিয়া মাসিক কিছু কিছু নগদ টাকার মুখ দেখিতে আরম্ভ করিলেই আমাদের রংটা বেশ ফরসা হয়, দেহে একটু জোয়ার আসে এবং নামের গায়ে বাঙ্গালীর বড় সাধের 'বাবু' উপাধি সংযুক্ত হয়। তখন আমরা হই—ননী বাবু, মাখন বাবু, মিছরী বাবু ইত্যাদি। যেই বাবু, অমনি কাবু! কি আশ্চর্য্য! আর তখন মোটা, শক্ত, ভারী, ঘন, কাল, পুরু জিনিষ পছন্দ হয় না। মিহি পুরাণ চালের ভাত, সোণা মুগের দাল ক্ষুদ্র মাছের ঝোল পাতলা রুটি, দুধ লঘু জল খাবার, ধবধবে ময়দা, সাদা চিনি, হাওয়ার ধুতি, রেশমী চাদর, ফিন ফিনে কামিজ, হাল্‌কা ছাতা শোলা টুপী, সরু ছড়ি, জড়ির জুতা, নরম বিছানা, হাল্‌কা আমোদ, হাল্‌কা উপন্যাস, গল্প সাহিত্য প্রভৃতি দুর্ব্বল বাবুর ভাল লাগে। কেবল মিহি, কেবল সরু, কেবল সাদা, কেবল পাত্‌লা, কেবল নরম, কেবল হাল্‌কা, লঘু!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত লঘু ও নরম খাওয়া পরাতেও আমাদের মেজাজটা হয় গরম। বিশেষতঃ যাহাই বলুন, সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা হইতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস:—দারিদ্র্যপীড়িত গরম দেশে ঔদ্ধত্য বিকাশিনী গরম শিক্ষা হওয়ায়, ঠাণ্ডা কোমল ধর্ম্মনীতি পূর্ণ পবিত্র উপদেশ না পাওয়ায়, পথে, মাঠে, ঘাটে, রেলগাড়ী, ষ্টীমারে সদা সর্ব্বত্র গরম চা, কাফি, কোকো, পাউরুট, বিস্কুট, পেঁয়াজবড়া, আলুর চপ প্রভৃতি ভারতের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভেজাল অখাদ্য—কুখাদ্য খাওয়ায়, প্রায় অষ্ট প্রহর পান, বিড়ি, তামাক, চুরুট, সিগারেট, জরদার শ্রাদ্ধ করায়, নাকে মুখে চোখে চারটী অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল ভাত গুঁজিয়া ভরাপেটে দুপুর রৌদ্রে আপিষের পোষাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দ্রুত পদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কার্য্যালয়ে যাওয়ায়, সামান্য অর্থের জন্য স্বাধীনতার বিনিময়ে পরের দাসত্ব করিয়া, শত লাঞ্ছনা গঞ্জনার ভিতর দিয়া ছালফাসানে স্ত্রীপুত্র কন্যাদির ভরণ পোষণের আয়ুঃক্ষয় করী দুশ্চিন্তায় এবং সারাদিনের অনিয়মে উত্তপ্ত দেহে অত্যধিক রতি বিলাস করায় আমাদের শরীর মেজাজ ঠাণ্ডা হইতে পায় না,—কামারের হাপরের ন্যায় দেহ মন সর্ব্বদাই গরম আগুন হইয়া থাকে। অবশ্য এ মন্তব্য গুলি সাধারণতঃ গরীব ও মধ্যবিত্ত মসীজিবী গৃহস্থ বিষয়েই সবিশেষ প্রযোজ্য।

সহরে বাবুদিগের খোরাক দেখিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না। মুণকে রঘুনাথ বা আশানন্দ ঢেঁকির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু আধুনিক সময়েও যে পরিমাণ আহার করা উচিত, তাহাই বা করিতে দেখি কই? বাবুর বাড়ীতে খাইতে বসিয়া সম্মুখে থালায় চারিটী ধব ধবে বালাম চালের ভাত দেখিলে মনে হয়—এ নস্যটুকু কোথায় দিব, মুখবিবরে না নাসিকারন্ধ্রে? পল্লীগ্রামে প্রথম প্রথম জামাই—শ্বশুর বাড়ী আসিলে ছোট সম্বন্ধীরা এই মুষ্টিমেয় অন্ন ব্যঞ্জনাদি দিয়া নূতন জামাতাকে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে। কতকগুলি

বেশী খাওয়াও আবার সহরে কায়দাকানুনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এজন্ত সহরে পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোকের বড়ই মুস্কিল হয়; লোকলজ্জা পুনরায় সহিতেও পারেন না, আবার ক্ষুধা শান্ত না হইলে পেটও জ্বলিতে থাকে। দুই-ই বালাই। উঃ! কি কঠোর বাহ্য নিয়মানুশাসিত কেতা-দুরস্ত সুস্তঃসার শূন্য নাগরিক সভ্যতা! পল্লীর কৃষকদের খাওয়া দেখিলে বাবুরা হয়ত গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া যান।

অবাক্ হইবারই ত কথা। রসুনের খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যেমন অতি নিভৃত অন্তরে একটু শাঁস পাওয়া যায়, তেমনি সহরের নবাবিষ্কৃত, গলি গলি ফেরিওয়ালাদের কাছে গরম গরম প্রাপ্তব্য, পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য বস্তু নিচয়ের মধ্যে অন্যতম 'অবাক্ জলপানে'র ঠোঙ্গা খুলিতে খুলিতে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যায়, তখন সহরে পয়সা রোজগারের ফিকির দেখিয়া সত্যসত্যই অবাক্ হইতে হয়। পাড়াগেঁয়ে মান্ধাতার আমলের চালছোলামটর ভাজা সহরে গিয়া বুনো ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া শত তাল কাগজের আবরণের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া মামুলী নাম বদলাইয়া অবাক্ জলপান' হইয়াছেন। বলিহারি আবিষ্কারকের মাথা। তাঁহার চাতুরীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

যাহা হউক যাঁহারা 'অবাক্ জলপানে' কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নির্ব্বাক্ ও নিস্পন্দ হইয়া থাকেন, তাঁহারা গ্রাম্যকৃষকের গুড়মুড় জলখাবার দেখিয়া যে মূর্চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূতলশায়ী হয়েন না, ইহাই তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য। বস্তুতঃ এক একজন কৃষাণ যে পরিমিত গুড়মুড়ি খায় তাহা বোধ হয় চারিজন সহুরে বাবু একবারে চিবাইয়া শেষ করিতে পারেন না। আমন ধানের ভাত ?ছন্দ করে না কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলে—"মশাই, দুপুর রোদে মাঠে লাঙ্গল ঠেলা কাজ যদি করিতেন, তাহা হইলে জানিতেন, ক্ষুধা কি বস্তু। 'পেটে যেন রাক্ষস ঢুকিয়াছে' এই চলিত কথা আমাদের প্রতিই ঠিক খাটে। আমন ধানের ভাত খাইলে দুইবার প্রস্রাবের পরই আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয়। আমরা গরীব শ্রমজীবী, এত ঘন ঘন খাবার পাই কোথা? কাজেই মোটা মোটা আউশ চালের ভাত একপেট খাইয়া মহাজনী নৌকা বোঝাই করিয়া দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া ক্ষেতে-খামারে ভূতের মত পরিশ্রম করি"। কঠোর অঙ্গ চালনায় শ্রমিক পাথর হজম করিয়া ফেলে, আর মাংসপেশীর সমুচিত সঞ্চালন অভাবে আমরা একটু বেশী জলসাগু ও পরিপাক করিতে পারি না। ইহা কি আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয়? ইহা কি দেশের মঙ্গলকামী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরই ভাবিবার কথা নয়? যেরূপ লঘু আহার দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আমরা ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্ম বায়ুভুক হইয়া ভুজঙ্গের ন্যায় বৎসরের কিয়দংশ কাটাইব না কি? 'নবাদলের লঘুগুরু জ্ঞান নাই'—প্রাচীনদিগের এই উক্তির আংশিক সত্যতা স্বীকার করিতে পারি; আমাদের গুরু নাই, গোঁসাই নাই, গুরুজ্ঞান নাই, গুরুভক্তি নাই, গুরুপুরোহিত পদে মতি নাই, আমাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ধর্ম্মে আস্থা নাই, পরকালে বিশ্বাস নাই, তাই আমরা কর্ণহীন অর্ণবপোতের ন্যায় জীবন-

স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছি—এ সব দোষারোপ বিনা আপত্তিতে শিরোধার্য্য। কিন্তু লঘুবোধ আমাদের বিলক্ষণ আছে। গতরুর কাছেও আমরা ঘেঁসি না, কিন্তু লঘু আমাদের বড় প্রিয়। আমাদের লঘুচিত্ত, লঘুবিত্ত, লঘুপথ্য, লঘুব্যায়াম, লঘুসাহিত্য, লঘুব্যাকরণ, লঘু ইতিহাস, লঘু আমোদ প্রভৃতি সবই লঘু। কেবল দুই একটী গুরুতর ব্যতিক্রম দেখিতে পাই, সেটী আমাদের সন্নাচার অভ্যস্ত ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে মধ্যে গুরুভোজন ও গুরুবিহার বা অত্যধিক ইন্দ্রিয় পরায়ণতা।

পূর্ব্বে বহু আহারে অল্পমূত্র হইত, এখন অল্পাহারে বহুমূত্র—ঠিক বিপরীত। অত্যধিক মানসিক ব্যায়াম, স্নায়বিক অবসাদ, রাত্রি জাগরণ, কুভোজন ও অপরিমিত ইন্দ্রিয় সেবায় চাকুরী জীবিদিগের মধ্যে বিশেষতঃ যাঁহারা কেবল এক স্থানে বসিয়া কঠিন মস্তিষ্ক চালনা করেন, অথচ সেই অনুপাতে মুক্ত বায়ুতে অঙ্গচালনা ও পরিমিত বিশুদ্ধ পান ভোজন করেন না, তাঁহাদিগের যৌবনের শেষভাগে রক্তের জোর একটু কমিলেই এই মারাত্মক ব্যাধি দেখা দেয়। ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে যে কত বিচারক, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, যশোলোক শিক্ষক, অধ্যাপক কেরাণী, পোষ্টমাষ্টার, রঙ্গালয়ের অভিনেতা, সুবক্তা, রায় সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি দেশের মুখোজ্জ্বলকর সুসন্তান এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকাল মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা কে নির্ণয় করিবে? গ্রীষ্ম মণ্ডলে ঠিক দুপুর বেলা ভরাপেটে আপিষের পোষাকে চেয়ারে বসিয়া কলম চালান যে কি কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। বাহিরের লোকে মনে করে—বেশ বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বিড়ি চুরুটের ধূম টানিতে টানিতে লেখাপড়ার কাজ করায় এমন কি ক্ষতি হয়? ব্যথার ব্যথী ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে। চাকুরে বাবুর টাকের উপর অনেক সময় জোরে বিজলী বাজনের হাওয়া লাগায় মাথার চাঁদি গরম হইয়া উঠে। তখন সুখ অপেক্ষা স্বস্তি ভাল লাগে। ফল কথা, মূত্ররোগ শিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিয়া যে কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন।

বাবুদের ব্যারাম যেন অঙ্গের আভরণ। 'বাবু' বলিলেই যেন কতকগুলি রোগের ডিপো বুঝিতে হইবে। একটু অর্শ, একটু বহুমূত্র, একটু অন্ত্রবৃদ্ধি, একটু কুরণ্ড, একটু মেহ ও মেহাশ্রিত জ্বর, একটু বাত, একটু কাশ, একটু দৃষ্টিশ্রুতি হীনতা প্রভৃতি রোগ বাবুর দেহকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শরীরটীকে ব্যাধিমন্দির করিয়া তুলিয়াছে। বাবুর রোগ প্রতিষেধক শক্তিও দিন দিন কমিতেছে, তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল চিররোগী হইয়া পড়িতেছেন। যেমন কতক গুলি ভূত ব্যক্তি বিশেষে অধিকার করিতে ভালবাসে সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাধি, ননীর পুতুল বাঙ্গালী বাবুর কুসুমপেলব রমণী মোহন দেহটীকে বড়ই পছন্দ করে।

শ্রমবিমুখ বড় লোকের ব্যারাম শ্রমশীল গরীবলোকের মধ্যে বড় বেশী দেখা যায় না। ইহা ভগবানের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে, যেহেতু কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ হইলে সে

বেচারী আর বাঁচে কিসে? যাহারা মাঠে লাঙ্গল ঠেলিয়া কাঠ কাটিয়া, করাত টানিয়া, বোঝা বহিয়া, ইট গাঁথিয়া, লৌহ পিত্তল পিটাইয়া, কাদা ছানিয়া, নৌকা বাহিয়া, মাছ ধরিয়া, কাপড় কাচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা বুক জ্বালা, পেট ফাঁপা, অম্লোদ্গার ও বদহজমের তোয়াক্কা রাখে না। তাহারা রসের নাগর বা ভাবের সাগর নয়; তাহারা মোটামুটি—সোজাসুজি—সুস্থ সবল লোক,—গায়ের জোরে দক্ষিণহস্তের ব্যাপার যোগাড় করিয়া জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কথার বাণিজ্যে হাজার হাজার শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত করিয়া রাখিতে জানে না; তাহারা গাড়ী গাড়ী কবিতা লিখিয়া ভাবের বন্যায় ডুলিয়া প্লাবিত করিতে শিখে নাই; তাহাদিগের কাব্যসাগরে সুদক্ষ ডুবারী নামাইয়া কবির অতলস্পর্শ নিগূঢ় মনের ভাব বুঝিতে হয় না। তবে কর্ম্মী হিসাবে তাহারাও বড় কম নয়। ঝড়তুফান, বৃষ্টি বাদল, শীতগ্রীষ্ম, ঘৃণা-বিদ্রূপ প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ ক্লেশের পসরা মাথায় লইয়া এই অসভ্য চাষারাই, সুসভ্য দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের অশনবসনাদি সুখসমৃদ্ধির মাল মশলা যোগাইতেছে। ইহারা সখের রোগের ধার ধারেনা। দরিদ্র শ্রমিকদিগের পাক যন্ত্র ঘটিত অজীর্ণ অম্লপিত্ত কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি ব্যারাম খুব কম। তাহারা প্রায়ই মরে ফৌজদারী অসুখে, কারণ তাহাদের শিক্ষা, সংযম ও বিচার শক্তি নাই। গ্রামে হয়ত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিয়াছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। ঠাণ্ডায় গলার বীচি ফুলিয়া উঠিয়াছে, কোন খেয়াল নাই। পূর্ব্ববৎ ঘরের বাহিরে শুইয়া থাকে। পাড়ায় কলেরা আসিয়াছে, তবুও ভয় নাই। প্রকাণ্ড একটা ইলিস মাছ খাইয়া সেই রাত্রিতেই ওলাদেবীর অঙ্ক আরোহণ করে; কিম্বা অস্থানে কুস্থানে গমন করতঃ কুঁচকি, বাধি, মেহ, উপদংশ প্রভৃতি কুৎসিৎ ও দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

ভগবান্ এখনও এত নিষ্ঠুর হন নাই—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া কি পৌরুষ হইবে? পল্লীগ্রাম ত মৃতপ্রায়, কাটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপ করিয়া কি লাভ হইবে? পাড়াগাঁয়ে বিস্তর গরীব লোক দেওয়ানী ম্যালেরিয়ার জর্জ্জরিত হইয়া তিল তিল করিয়া প্রতি নিয়ত মরিতেছে, ইহাদের রোগ প্রতিষেধক শক্তি যথেষ্ট আছে, সেজন্য ম্যালেরিয়া সহজে তাহাদিগকে পাড়িয়া উঠে না। এ যেন রাম-তাড়কার যুদ্ধ—কেহ কাহাকেও সুবিধামত বাগে পাইতেছে না। কিন্তু একবার জ্বর ভাল করিয়া সাপটিয়া ধরিলেই ইহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে; কারণ ইহাদের শিক্ষা নাই, নিয়ম পালন নাই; সুপথ্য নাই, গরম কাপড় চোপড় নাই আর সর্ব্বোপরি ভীষণ দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই আমাদের মাথা খাইয়াছে। যেখানে দুঃখ-দৈন্য অভাব, সেই খানেই রোগ, শোক, কলহ ও অকাল মৃত্যুর বিভীষিকাময়ী করাল মূর্ত্তি যতদিন সুস্থ ও সবল দেহে গতর খাটাইয়া জীবন যাপন করে, ততদিন তাহাদের মাথাটী পর্য্যন্ত ধরেনা। খেও খুঁটি পর্ব্বত; কিন্তু খুঁটি একটু হেলিলেই সর্ব্বনাশ! গতর পড়িয়া গেলেই আর তাহারা উঠিতে পারেনা; কারণ তাহারা যে বড় গরীব, এক আধ মাস বিছানায়

পড়িয়া থাকিলে খাইবে কি? তাহারা একে কাঙ্গাল, তাহার উপর অমিতব্যয়ী—ভবিষ্যতে দুর্দ্দিনের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে জানে না। যে দেহ খাটাইয়া রোজগার করিবে, সেই দেহ রোগাক্রান্ত হইলেই তাহাদের বাঁচা দুর্ঘট। তাহাদের পুঁজি মূলধন মাত্র শরীর, সুতরাং শরীর শয্যাগত হইলেই তাহাদের দফারফা হইল।

অজীর্ণ, অম্লপিত্ত বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ যে মস্তিষ্কপরিচালকের মধ্যে প্রবল ভাবে চলিতেছে একথা কোনমতেই অস্বীকার্য্য নহে। মগজের খাটুনি যাঁহাদিগের ব্যবসায়, কায়িকশ্রমের প্রতি তাঁহাদের প্রবৃত্তিও হয়না, বেশী অবসরও পান না। যাঁহারা মুক্তবায়ুতে দ্রুতপদে ভ্রমণ বা স্বহস্তে কিছু২ গৃহকর্ম্ম সম্পাদনকে মান-হানিকর অতি নীচ ও জঘন্য কাজ বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহাদের মধ্যেই মেদ, মূত্র, মেহাদি রোগের প্রাবল্য। তাঁহাদিগের মাথা ও মাংস আছে—হৃদয় ও স্বাস্থ্য নাই। তাঁহাদের মাথার প্রশংসা অবশ্যই করিতে হয়। তাঁহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্ব্ব বিষয়ে সকল দেশের ছাত্রকে হারাইয়া প্রথমস্থান অধিকার করিতে পারেন; তাঁহারা ঘরে বসিয়া অতিকূট প্রশ্নের মীমাংসা বা মামলামোকদ্দমার চাল বলিয়া দিতে পারেন; কেবল মধ্যে মধ্যে ২চা-হালুয়া-পান-তামাকু-বিড়ি-চুরুট সেবন করিয়া সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমস্তদিনই তাস পাশাদাবা খেলায় অতিবাহিত করিতে পারেন; রেলপথের জটিলসময় ও শুল্ক তালিকা অনায়াসে সুচারুরূপে প্রস্তুত করিতে পারেন; গণপতির ন্যায় কলম চালাইয়া দিস্তাদিস্তা কাগজে সুদীর্ঘ রায় লিখিতে পারেন; বিগত পাঁচিশ বৎসরের সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাব, আবশ্যক হইলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত পুরাতন কাগজপত্র সেরেস্তা হাতড়াইয়া অতি পরিপাটী এক বিবরণী দাখিল করিতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের নিজের দেহ নিজের নয়; গৃহচিকিৎসকের উপর প্রাণ সঁপিয়া পড়িয়া আছেন। একটু আমড়াগোস্ত খাইবার বাসনা হইলেও ডাক্তার বাবুর উপদেশ চাই—কি জানি যদি অসুখ হয়। দেহ যদি স্ববশে থাকিত, তাহা হইলে বাটীর বাহিরে যাইতে হইলেই কি কোন-না কোন যানের প্রয়োজন হইত? তাঁহারা পরের পায়ে হাঁটেন, পরের মুখে খান! জুড়িগাড়ীতে দুইক্রোশ বেড়াইয়া হাওয়া খাইয়া আসিলেন, কিন্তু অঙ্গচালনা হইল কাহার—তাঁহার, না তাঁহার ঘোটকের? সাধের আমবাগানে গাছের গায়ে টিকিট আঁটিয়া কেতাবে ফলের রং, আকার আস্বাদ প্রভৃতি লিখিয়া রাখিয়াছেন (কারণ কায়দার ত্রুটি হইলে ত চলিবেনা) কিন্তু বাবু আর কয়টা আমের সুতার পান? ল্যাংড়া বোম্বাই খাইতেছে তাঁহার সৌভাগ্যশালী-হৃষ্টপুষ্ট আমলা চাকর।

সুখে মানুষকে সুকুমার জড়ভরত করিয়া ফেলে; দুঃখে লোক বলবান্ সাহসী, শ্রমশীল ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়। দুঃখের হাপরে ফেলিয়া ভগবান্ মানুষকে উত্তমরূপে পোড়াইয়া পিটাইয়া জীবনসংগ্রামের উপযোগী করিয়া দেন। পর্ব্বতসমাকীর্ণ শীতপ্রধান দেশের মানুষ কেমন দৃঢ়কায় উদ্যমশীলও কর্ম্মঠ; আর সমতলবাসী মৃদুমন্দমলয়ানিলসেবী আরামপ্রিয় বিলাসী ভাবপ্রবণ নরনারীর দেহও যেমন নবনীতকোমল শিথিল মাংসপিণ্ড, মনও

তেমনি ভীরুকাপুরুষের ন্যায় ক্ষীণ দুর্ব্বল ও দার্ঢ্যহীন। বহুসংখ্যক মূত্ররোগীর অবস্থা হইতে দেখা যায় যে, তাঁহারা দারিদ্র্যদুঃখের সময়ে বেশ শক্তসামর্থ ছিলেন; অনায়াসে দুই ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন; পরিপাকশক্তি প্রবল ছিল—এক থাল ভাত ব্যঞ্জন খাইয়া হজম করিতে পারিতেন; দেহ তখন মাংসমেদ-বহুল স্থূল ছিলনা, কাজেও যখন তখন স্বাধীনও ব্যবহার্য্য ছিল। কিন্তু অত্যধিক মাথার খাটুনি, অমিতাচার ও শারীরিক ব্যায়ামের অভাবের ফলে দেহ যেন বন্যারজলে অল্পে ২ কাঁপিয়া উঠিল। যিনি যৌবনকালে কেমন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও যেন্‌[illegible] বৃদ্ধির সঙ্গে ২ দেহও যেন হঠাৎ বসা াহল স্থূল হইয়া পড়িল। সুখের দশা যেই হইল, অমনি অজীর্ণ, অম্লপিত্ত, অর্শ, কুরণ্ড, বহুমূত্র, বাত, প্রভৃতি রোগের একটা না একটা দেখা দিল। আর্থিক উন্নতির সহিত ধনের নিত্য সহচর মাংস, মেদ ও জড়তা আসিয়া উপস্থিত। আর গাড়ী না হইলে একপোয়া পথও চলিতে পারেননা; দেহের ভারে সর্ব্বদাই হাঁপাইতেছেন ঘাড় ২ ঔষধ চলিতেছে। এককথায়, তিনি এখন সম্পূর্ণ পরাধীন-গোঁপখেজুরে সেবাদাস হইয়া পড়িয়াছেন। আহারে রুচি নাই, অথচ মাংসমেদ কমেনা। জলাশয়ে স্নান করিতে গিয়া হয়ত দেহের খাঁজের মধ্যে কি একটা পদার্থ প্রবেশ করিয়াছে; বাবুর তখন কোন খেয়ালই হয় নাই। পূর্ব্ববৎ কাজ কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু শরীরের সেই দিকে কেমন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হয় ও নাকে অনুক্ষণ একটা দুর্গন্ধ আসিয়া লাগে। ক্রমে যন্ত্রণায় অস্থির হইলে একজন বত্রিশটাকা ভিজিটের নামজাদা ডাক্তার আসিয়া নানাবিধ যন্ত্রদ্বারা সর্ব্বশরীর পরীক্ষাপূর্ব্বক শেষে শিক্ষালব্ধ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে গায়ে হাত দিয়া টিপিতে ২ মাংসের খাঁজ হইতে একটা প্রকাণ্ড পচা গল্লাচিঙ্গড়ি মাছ বাহির করিয়া বাবুর জীবন রক্ষা করিলেন; লোকে ও চারিদিকে 'ধন্য ধন্য' রবে ডাক্তার বাবুর সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। হা ভগবন্! তোমার কি অবিচার!! কেহ একটু মাংসের জন্য লালায়িত—কত অর্থব্যয় করতঃ সালসা খাইতেছে; আবার কেহ মাংসের বোঝায় অস্থির, ব্যতিব্যস্ত -কিসে চর্ব্বি কমে এইজন্য মহা ব্যাকুল। এই সব স্থূলকায় পরবশ মৈনাক পাহাড়ের ন্যায় বিরাট বাবুদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা হয় না --এটা সুখ, না দুঃখ? যে সুখে জীবন অসহনীয় করিয়া তুলে; যে সুখে নিজের দেহভার বহিতে বহিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; যে সুখে মানব, স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া এরূপ শ্রমকুণ্ঠ, পরাধীন, ঔষধ—মাদুলীগত প্রাণ হইয়া পড়ে, সেটা সুখ না দুঃখের পরাকাষ্ঠা? তাই মনে হয় "আগে,জেলে ছিল ভাল জাল দড়ি বুনে, কি কাল করিল সে যে এঁড়ে গোরু কিনে॥" আর একটী উদাহরণ বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সজীব স্ফূর্ত্তিময় চটুল ছাগশিশু ও গোবৎসগণ কেমন আনন্দে নেচে কুঁদে বেড়ায়। বীজ পাঁটা গুলিও সারাদিন চতুর্দ্দিকে চলাফেরা করে। কিন্তু ম্রিয়মান খাসিগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করিবেন কি দুর্ব্বিষহ যাতনায় উহারা জীবন ধারণ করিতেছে! মেদের ভারে বেশী নড়াচড়া করিতে ভালবাসে না। প্রাতঃকালে ছাড়িয়া দিলে

বাটীর বাহিরে আসিয়া দুই চারিটা পাড়ায় মুখ দিয়াই ক্লান্ত দেহে ছায়ায় বা চাঁদনি রোয়াক বারাণ্ডা উঠানের এক কোণে শুইয়া ঝিমাইতেছে। এরূপ মানুষের মধ্যেও যাহারা অত্যন্ত মেদ—বসা বহুল স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে সেই জন্য বোধ হয় চলিত ভাষায় মেদা লোক বলে।

স্বাস্থ্য কেবল মাংসের বস্তা নয়—বল, বিক্রম, তেজ ও উদ্যম। মরাঠাকুলতিলক শিবাজী কি খুব লম্বোদর ছিলেন? অক্লান্ত কর্ম্মী আওরঙ্গজেব শুধু মাংসপিণ্ড হইলে কি শেষ জীবন রণক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে অতিবাহিত করিতে পারিতেন? আত্মসংযম ও মিতাচারে তাঁহার দেহকে সুশিক্ষিত ঘোটকের ন্যায় বাধ্য ও আজ্ঞাবহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মন্‌সওয়ার যখন যাহা বলিবে, যেদিকে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিবে, দেহবাজী দ্বিরুক্তি বা কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে; ইহাই স্বাস্থ্য—ইহাই মানসিক ও দৈহিক বল-বীর্য্য। নিজের দেহকে যদি শাসন করিতে না পারে, তাহা হইলে মানব কেমন করিয়া রাজ্যশাসন করিবে। এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া একদা রুস সম্রাট্ পিটার দি গ্রেট বলিয়াছিলেন—I wish to reform my empire, 'and I cannot reforms myself. মহাত্মা শিবাজীর জীবনে এমন অনেকদিন কাটিয়াছে—যখন তাঁহাকে কেবল শুধু চণক ভক্ষণ করিয়া বিজন কাননে ঊষর মরুভূমে ও দুর্গম গিরিগাত্রে অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। রাজপুত কেশরী মহাবীর রাণাপ্রতাপ যদি ননীগোপাল বা মিছরীবাবুর ন্যায় সুকুমার হইতেন, তাহা হইলে কি প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিতেন? নিজের দেহ 'যাহাদের নিজের বশীভূত নয়', তাহাদের উচ্চাভিলাষের ভিত্তি কোথায় জানিনা। পল্লী উদ্ধার বল, দেশ উদ্ধার বল, জাতীয় উন্নতি বল, সকল প্রকার উন্নতি উৎকর্ষের মূল—আত্মোৎকর্ষ, আত্মোন্নতি আত্মোদ্ধার।

(ক্রমশঃ)

রাবণকৃত নাড়ীপরীক্ষা।

[কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

———:০:———

(বঙ্গানুবাদ)

স্নিগ্ধ রসবতী প্রোক্তা রসোমূর্চ্ছাবিধায়িনী।
ভাবিরোগ প্রবোধায় স্বস্থে নাড়ীপরীক্ষণম্ ॥৩০॥

রসস্থ অবস্থায় নাড়ী যদি রসযুক্তা ও স্নিগ্ধা বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাতে মূর্চ্ছা হইবার সম্ভাবনা আছে জানিবে। ভাবিরোগ পরীক্ষার

জন্য স্বস্থ অবস্থায় নাড়ী পরীক্ষা করিবে। ৩০

ভারপ্রদাহমূর্চ্ছাভয়শোকবিসূচিকাভবানাড়ী।
সং মূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতঃ
ভজতে ॥৩১॥

ভারবহন, অগ্নিদাহ, মূর্চ্ছা, ভয়, শোক অথবা বিসূচিকা রোগে বিশেষরূপে সংমূর্চ্ছিত নাড়ীও পুনরায় জীবিত অবস্থাকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ ভারবহনাদি দ্বারা শরীর শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলে নাড়ী অবসন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবনের কিছু মাত্র হানি হয় না। তত্তৎ অবস্থা জনিত শারীরিক বিকৃতি কাটিয়া গেলেই আবার নাড়ীও দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। এবং বিসূচিকা রোগে নাড়ী অবসন্ন হইয়াও যদি উহা স্বস্থান ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাদৃশ রোগীরও পরিবর্ত্তনের আশা করা যায়। ৩১

মেহেঽর্শসি মন্দাজীর্ণে শীঘ্রং তু স্পন্দতেধরা ॥৩২॥

মেহরোগে, অর্শোরোগে ও অজীর্ণ জন্য মন্দভেদে নাড়ী শীঘ্র শীঘ্র স্পন্দিত হয়। ৩২

গুর্ব্বীং বাতবহাংনাড়ীং গর্ভেণসহ লক্ষয়েৎ।
সেব পিত্তবহা লঘ্বী নষ্টগর্ভাং বদেত্তাম্ ॥৩৩॥

গর্ভিণীর নাড়ী বাতবহা (বায়ুর জন্য চাঞ্চল্যযুক্তা) ও (ভার ভার) বোধ হয়। সেই নাড়ী যদি পিত্তবহা ও লঘু বলিয়া মনে হয়। তবে তাহার গর্ভ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানিবে। ৩৩

পিত্তবায়োস্তত্রবাচ্যা লঘুনা গৌরবেণ চ।
আমপক্কবিভাগশ্চ দিনমাসাদিকংবুধৈঃ ॥৩৪॥

পণ্ডিতগণ পিত্ত ও বায়ুর গৌরব ও লঘুতা দেখিয়া দোষের আমও পক্কের বিভাগ এবং রোগের দিন এবং মাসাদি বলিয়া দিবেন। ৩৪

দোষপীড়া বক্রিমত্বেচ প্রহারে ত্রসনেনচ।
ব্যায়ামেঽট্টাট্টহাসে চ নৈতিস্ফুরণতাং ধরা ॥৩৫॥

বাহুর পীড়া বা বক্রতাদ্বারা এবং প্রহার, ত্রাস, ব্যায়াম ও অট্টহাস্য প্রভৃতি দ্বারা নাড়ীর গতি সম্যক প্রকারে স্ফুরিত হয় না। ৩৫

গম্ভীরা বা ভবেন্নাড়ী সা ভবেন্মাংসবাহিনী ॥৩৬॥

যে নাড়ীর গম্ভীর ভাবে বহিয়া যায় তাহাকে মাংসবাহিনী বলিয়া থাকে। ৩৬

দীর্ঘা, কৃশা বাতগতির্বিষমা বেপতে ধরা।
জীবঘ্নী বাহসমৈশ্চিহ্নৈর্ব্যাকুলাহজীর্ণসঙ্কুলা ॥৩৭॥

নাড়ী যদি দীর্ঘাকৃশা ও বায়ুর গতি সম্পন্না হইয়া বিষম ভাবে কম্পিত হইতে থাকে অথবা বহুদিন অজীর্ণ রোগ ভোগ করিয়া কাতর নাড়ী অসম চিহ্ন সকলের দ্বারা কম্পিত হইতে থাকে তবে তাহাকে প্রাণহারিণী বলিয়া জানিবে। ৩৭

শীতার্দিতস্য গাত্রস্য চিরাত্মস্থং মন্থরা।
শয়ানস্য বলোপেতা নাড়ী স্ফুরণভুগ্বহা ॥৩৮॥

সমস্ত গাত্র শীতল হইয়াছে এরূপ ব্যক্তির নাড়ী যদি বহুক্ষণ পরে সূক্ষ্ম ও অতি ধীর ভাবে বহিতে থাকে এবং (উত্থান শক্তি রহিত) শয্যাগত রোগীর নাড়ী যদি বলবতী হয়, তাহা হইলে নাড়ীর উভয়বিধ অবস্থাকেই প্রাণঘাতিনী বলিয়া জানিবে। ৩৮

কিঞ্চিদাভুগ্নগতিকা স্বস্থা নির্বহতে ধ্রুবম্।
সূক্ষ্মরূপা স্ফুটা শীতা স্বস্থানস্থে কফে তথা ॥৩৯॥

কফ স্বস্থান গত হইলে, নাড়ীর গতি ঈষৎ বক্র হইলে সুস্থভাবেই বহিয়া থাকে। এবং নাড়ীর ভার সূক্ষ্ম হইলেও পরিস্ফুট এবং শীতল হইয়া থাকে।৩৯।

পিত্তে স্বস্থানগে তদ্বৎপ্রবলা সরলা চলা।
অনুকুর্বাত কোপেন চণ্ড পিত্তপ্রকোপতঃ ॥৪০॥

পিত্ত স্বস্থান গত হইলে নাড়ীর গতি প্রবল সরল ও চঞ্চল হইবে। (তাদৃশ অবস্থায়) বায়ুর কোপ হইলে নাড়ীর গতি বক্র এবং পিত্তের প্রকোপে নাড়ীর গতি প্রখর হয়।৪০।

সরলা শ্লেষ্মকোপেন নাড়ী দোষৈঃ পৃথক্ স্মৃতা।
কফে হীনেঽধিকং বাতগতিং বহতি নাড়িকা ॥৪১॥

শ্লেষ্ম প্রকোপে নাড়ী সরল হয়। দোষ সকলের দ্বারাই নাড়ী পৃথকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। (যেমন বাতকোপে নাড়ী কুটিলা, পিত্তকোপে প্রখরা এবং শ্লেষ্মকোপে সরলা)—ইত্যাদি) নাড়ীতে কফের হীনতা ঘটিলে নাড়ী অধিক পরিমাণে বায়ুর গতি প্রাপ্ত হইয়া বহিতে থাকে।৪১।

হীনে বাতে কফে চাতিস্বল্পে পিত্তে চিরাৎস্ফুটা।
সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরামন্দা নাড়ী সহজবাতজা ॥৪২॥
বক্রাচ শেষচ্চপলা কঠিনা বাতপিত্তজা।
স্থূলা চ চঞ্চলা শীতা মন্দাস্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা ॥৪৩॥
সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্ম সমুদ্ভবা।
পিত্তাধিক্যে চ চপলা কটুকাদেশ্চ ভক্ষণাৎ ॥৪৪॥

বায়ুর ও কফের হীনতা ঘটিলে এবং পিত্ত অতি স্বল্প হইলে নাড়ীর গতি শান্ত, সূক্ষ্ম, চাঞ্চল্য শূন্য ও মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে থাকে এবং কখন কখন পরিস্ফুট হইয়া থাকে। বায়ু সহজ অবস্থায় থাকিলে নাড়ী বক্রা এবং বায়ুও পিত্তে নাড়ী ঈষৎ চঞ্চল ও কঠিন হইয়া থাকে। শ্লেষ্ম ও বায়ুতে নাড়ীর স্থূল চঞ্চল শীতল এবং বেগশালী হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মাতে নাড়ীর সূক্ষ্ম শীতল ও বেগবতী হয়। পিত্তের আধিক্যে এবং কটু দ্রব্যের ভোজনে নাড়ী চঞ্চল হইয়া থাকে।৪২—৪৪॥

নিরন্তরং খরং সূক্ষ্মমন্নমশ্নাতি বাতলম্।
রুক্ষাজাতোগুণ তস্য নাড়ী স্যাৎ
পিত্তসন্নিভা ॥৪৫॥

যে ব্যক্তি নিরন্তর রুক্ষ ও সূক্ষ্ম বাতবৃদ্ধিকর অন্নাদি দ্রব্য ভোজন করে তাহার নাড়ী ও রুক্ষ এবং বাত প্রধান ও পিত্ত সন্নিভা হইয়া হইয়া থাকে।৪৫।

নাড়ীতন্তু সমা মন্দা শীতলা সর্ব্ব দোষজা।
বিরংসোরূদ্ধতরতে রক্তস্যাপি চ বাতবৎ ॥৪৬॥

সর্ব্বদোষে নাড়ী তন্তু সদৃশ মন্দ বেগও শীতল হইয়া থাকে, বমন অবস্থায় তাহার পূর্ব্বে ও পরে নাড়ীতে বায়ুর গতি লক্ষিত হয়।৪৬।

রুদ্ধবেগস্য বালস্য শল্যাবিদ্ধস্য পিত্তবৎ।
নিদ্রালোর্মেদুরস্যাপি কফবর্দ্ধুগুদৃপ্তয়োঃ ॥৪৭॥

মলমূত্রাদির বেগরোধকারীর, বালকের, শল্যাবিদ্ধব্যক্তির এবং তৃপ্ত ও দৃপ্তব্যক্তির নাড়ীর গতি পিত্তের ন্যায় এবং নিদ্রাশীল ও স্থূল দেহী ব্যক্তির নাড়ীর গতি কফের তুল্য হইয়া থাকে।৪৭।

সমাসূক্ষ্মা দ্রুতস্পন্দা মলাজীর্ণে প্রকীর্ত্তিতা।
বিষমা কঠিনা স্থূলা মলশেষাৎপ্রকীর্ত্তিতা ॥৪৮॥

মলের অজীর্ণতাবশতঃ নাড়ীর গতি সমা সূক্ষ্ম ও ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে থাকে এবং মল শেষে নাড়ী বিষম, কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে ॥৪৮।

রক্তাদজীর্ণাদ্বমনদ্বিরেকা দ্বীজক্ষয়াদ্রক্তস্রুতে নিবন্ধাৎ।
সংমূর্চ্ছনাজ্জৈঠরাগ্নিমান্দ্যান্নাড়ীবহেতন্তু চলাচ জন্তোঃ ॥৪৯॥

রক্ত ক্ষয়, অজীর্ণ, বমন, বিরেচন, বীর্য্যক্ষয় রক্তস্রাব, নিবন্ধন এবং মূর্চ্ছাদি ও জঠরাগ্নির মন্দতা বশতঃ রোগীর নাড়ী —তন্তু সদৃশ ক্ষীণও চঞ্চল হইয়া থাকে।৪৯

নিরামা সূক্ষ্মগা জ্ঞেয়া কফেনাপরিপুরিতা।
নাড়ীতন্তুসমা মন্দা শীতলা সর্ব্বদোষনা ॥৫০॥

নিরাম অর্থাৎ রোগের তরুণ অবস্থায় অতীত হইলে নাড়ী সূক্ষ্ম ও কফের দ্বারা অপরিপূরিত বলিয়া মনে হয়। এবং সর্ব্বদোষে নাড়ী তন্তু সদৃশ ক্ষীণ মন্দবেগ ও শীতল হইয়া থাকে।৫০॥

মন্দং মন্দং মিতাহারে কফপিত্তসমন্বিতা।
বহুদাহকরে রক্তে প্লাবয়ন্তী বিশেষতঃ ॥৫১॥

পরিমিত আহার করিলে কফ পিত্ত সমন্বিতা নাড়ী ধীর ভাবে বহিতে থাকে। শরীরে রক্তাধিক্য বশতঃ যদি দাস্ত উপস্থিত হয় তাহা হইলে নাড়ী বিশেষ রূপে উচ্ছ্বলিত ভাবে বহিতে থাকে।৫১

মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি দীর্ঘা পুনদ্রুর্তা।
তদা নূনং মনুষ্যস্ত রুধিরা পূরিতা মলাঃ ॥৫২॥

করের মধ্যভাগে অর্থাৎ নাড়ী দেখিবার সময় মধ্যাঙ্গুলিতে যদি নাড়ী দীর্ঘ এবং দ্রুত ভাবে বহিতেছে বলিয়া মনে হয়. তবে মনুষ্যের বায়ু, পিত্ত ও কফ রুধির দ্বারা পরিপূরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ বাত পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ যদি রক্তকে আশ্রয় করে তাহা হইলে নাড়ীর গতি বিচ্ছেদ বিরহিত ও প্রবল হইয়া থাকে।৫২॥

বক্রা চ চপলা শীতস্পর্শা বাতজ্বরে ভবেৎ।
দ্রুতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ ॥৫৩

বায়ুর জন্য জ্বরের নাড়ী বক্রা, চপলা ও শীত স্পর্শা এবং পিত্ত জন্য জ্বরের নাড়ী দ্রুতা সরলা দীর্ঘ ও শীঘ্রা হইয়া থাকে।৫৩

মন্দা চ সুস্থিরা শীতা পিচ্ছিলা শ্লেষ্মকে ভবেৎ।
মৃণাল সরলা দীর্ঘা নাড়ী পিত্তজ্বরে বহেৎ ॥৫৪॥

শ্লেষ্ম জন্য জ্বরে—নাড়ী ধীর সুস্থির শীতল পিচ্ছিল হইয়া থাকে এবং পিত্ত জ্বরে নাড়ী মৃণালের ন্যায় সরল ও দীর্ঘ হইয়া বহিতে থাকে।৫৪

শীঘ্রমাবহতে মন্দং মলাজীর্ণাৎ প্রকীর্ত্তিতা।
স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রং স্পন্দতেঽতীব শাস্তয়ে ॥৫৫॥

মলের অজীর্ণতাবশতঃ নাড়ী মন্দ অথচ শীঘ্র বহিতে থাকে। এবং অত্যন্ত শাস্তির (?) জন্য নাড়ী স্থূল, কঠিন ও শীঘ্র স্পন্দিত হইতে থাকে।৫৫

পূরা মন্দা চ শনকৈশ্চপ্লুতোং যাতি নাড়ীকা।
জ্বরং শৈত্যং বেপথোর্ব্বা সংভবং ব্রুস্তি
দ্রুতম্ ॥৫৬॥

প্রথমে শান্ত নাড়ীর গতি যদি ক্রমশঃ বেগবতী হইতে থাকে তাহা হইলে শীঘ্রই শীতজ্বর অথবা কম্পজ্বর হইবে বলিয়া জানিবে।৫৬

হয়মৈকাহিকাদীনাং ব্যাধীনাং জননী মতা।
ভূতগ্রহে শিরাঽলক্ষ্যা ভাবিন্যৈকাহিকেজ্বরে ॥৫৭

ঐরূপ নাড়ী ঐকাহিক ব্যাধির জননী বলিয়া কথিত হয়, ভূতাবেশ জন্য ঐকাহিক জ্বরে নাড়ীর গতি বড়ই অস্পষ্টা লক্ষিত হয়।৫৭

কদাচিন্মন্দগমনা কদাচিদ্বেগবাহিনা।
দ্বিদোষকোপতো জ্ঞেয়া হস্তি চ স্থানবিচ্যুতা ॥৫৮

কদাচিৎ মন্দ গমনা কদাচিৎ বেগ বাহিনী নাড়ী দ্বিদোষের প্রকোপ জন্য হইয়া থাকে। তাদৃশ নাড়ী যদি স্বস্থান চ্যুত হয় তবে রোগীর জীবনের আশা নাই।৫৮

রক্তপিত্তে বহেন্নাড়ী মন্দাচ কঠিনা ঋজুঃ॥
কাসশ্লেষ্মে স্থিরা মন্দা শ্বাসে তীব্রগতির্ভবেৎ ॥৫৯॥

রক্ত পিত্তের নাড়ী (শিথিল) কঠিন ও সরল ভাবে বহিতে থাকে এবং শ্লেষ্ম জন্য কাশে নাড়ী স্থির ও মন্দ এবং শ্বাসে নাড়ীর গতি তীব্র হইয়া থাকে।৫৯

নাড়ী নাগগতি শ্চৈব রোগরাজে প্রকীর্ত্তিতা।
মদাত্যয়ে চ সূক্ষ্মা স্যাৎকঠিনা পরিতো
জড়া ॥৬০॥

রোগরাজ অর্থাৎ রাজযক্ষ্মার নাড়ীর সর্পের ন্যায় গতি হইয়া থাকে ॥৬০॥

অর্শোরোগে স্থিরা মন্দা কচিদ্বক্রা কচদৃজুঃ
অতিসারে তু মন্দা স্যাৎ হিমকালে
জলৌকাবৎ ॥৬১

অর্শোরোগে নাড়ীর গতি স্থির ও মন্দ, এবং কখন বক্র ও কখন সরল হইয়া থাকে। অতিসারে নাড়ীর মন্দ গতি এবং শীতকালে নাড়ী জলৌকা বৎ হইয়া থাকে।৬১।

মাংসবৃদ্ধা তু সা ধত্তে জ্বরাতীসারয়োর্গতিম্।
মৃতসর্পসমা নাড়ী—গ্রহণীরোগ মাদি
শেৎ ॥৬২

মাংস বৃদ্ধিতে নাড়ী জ্বর অতিসারের ন্যায় গতি প্রাপ্ত হয়। এবং মৃত প্রাণ সর্পের ন্যায় গতি বিশিষ্টা নাড়ী দেখিয়া গ্রহণী রোগ নির্দ্দেশ করিবে ॥৬২॥

মূত্রাঘাতে মুহুর্ভেদস্ফুরণে সংপ্লুতা ভবেৎ।
প্রমেহে চ জড়া সূক্ষ্মা মুহু রাপ্যায়তে শিরা ॥৬৩

মূত্রাঘাতে নাড়ী মুহুর্মুহুঃ ভিন্ন ও স্ফুরিত এবং সংপ্লুত হইয়া থাকে। প্রমেহে নাড়ী জড়তা সম্পন্ন। সূক্ষ্ম ও মুহুঃ আপ্যায়িত হইতে থাকে।৬৩

পাণ্ডুরোগে চলা তীব্রা দৃষ্টা দৃষ্টবিহারিণী।
কুষ্ঠে তু কঠিনা নাড়ী স্থিরস্যাদ প্রবৃত্তিকা ॥৬৪

পাণ্ডুরোগে নাড়ী চঞ্চল তীব্রগতি ও তখনই স্পষ্ট আবার তখনই অস্পষ্ট ভাবে বহিতে থাকে এবং কুষ্ঠরোগে নাড়ী কঠিন স্থির ও অপ্রবৃত্তিকা অর্থাৎ অপ্রসন্ন ভাবে বহিতে থাকে।৬৪।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
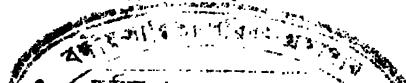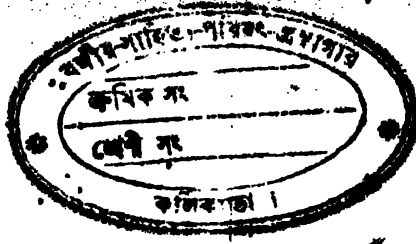
৭ম বর্ষ } পৌষ, ১৩২৯ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের পুরাবৃত্ত।

—:o:—

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শরীরি মাত্রেরই প্রয়োজনীয় এইজন্য প্রাচীনকালেও যে সকল জাতি অতীব অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহারাও তৎকালে এইশাস্ত্র কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইত। যাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জন্য কখন না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। ইতিহাসালোকবর্ত্তী হস্তে করিয়া কালের অন্ধকার পথে যে পর্য্যন্ত গমন করা যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদই প্রাচীনতম। এতদপেক্ষা দূরগত কালে কি ছিল, ভাষা তাহার কিছু পরিচয় দেয় না। আমরা আদৌ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি আর্য্যগণ ঋগ্বেদের সময়ই এই আয়ুর্ব্বিজ্ঞান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

উপাসনাবৃত্তি যেমন মনুষ্যের প্রকৃতিগত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই, বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎপত্তিও তদ্রূপ মানব প্রকৃতির আদি বিকারজনিত। এজন্যই বেদকবি বলিয়াছেন, বেদ নিত্য ও আদি পুরুষ ব্রহ্মার কীর্ত্তিত। আবার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আর্য্যগণ ব্রহ্মাকেই আয়ুর্ব্বেদের আদি বক্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

পুরাণাদি হিন্দু শাস্ত্রে এরূপ প্রথিত আছে যে, সত্যযুগে লোক সকল নিরোগী ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষভাগে রোগ সঞ্জাত হয়। অনেক নব্য শিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী, হয় তো প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুষ্ক কল্পনাসম্ভূত ও একেবারে অন্তঃসার শূন্য বলিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু একটুকু প্রীতির সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চয়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ভ্রমেও একথা বলিব না যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে সুস্থ

ছিল, কদাপি কাহাকেও স্বাস্থ্যভঙ্গ জনিত ক্লেশ পাইতে হয় নাই, বরং ইহাই দেখাইব যে, অতীব প্রাচীন ভারত সমাজেও রোগ, শোক বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু কথা এই যে, সত্যে নিরাময়ত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক বাক্য একেবারে তাৎপর্য্য বিহীন নহে। যখন মানব সমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে প্রতিবর্গ ক্রোশে দ্বিসহস্র লোকও ছিলনা, যখন মানবজাতি প্রাচীন বলিয়া জগতে পরিচিত হয় নাই, বাল্য বিবাহ, মন্তপান ও অপরাপর সভ্যতাসূচক বিলাস সামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র বিনিময়ে দৃঢ়তর বল্কল, বায়ুশোভন ছত্র বিনিময়ে বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিয়া আর্য্য ঋষি ক্লান্ত হয়েন নাই, সেই সময়ে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি সাধারণ রকমের কোনো কোনো পীড়া ব্যতীত প্রায়ই রোগ-প্রাচুর্য্য ছিল না। এ স্থলে 'নিরোগ'—এই পদটি রোগহীনত্ব সূচক নহে, নঞের অল্পত্ব অর্থই এ স্থলে প্রযুজ্য।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন সুখও আসিয়াছে, অনেক দুঃখও আসিয়াছে। যে দেশ যত জনাকীর্ণ হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার জ্বালায় জ্বলিয়াছে।

ঋগ্বেদের পূর্ব্বে ও তৎসম কালে যে অল্পে অল্পে আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছিল, বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এইকালে আয়ুর্ব্বেদ একটি শাস্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। যাহা হউক ইহাই আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিভূমি। আমরা এই কালকে বেদায়ুর্ব্বেদ বা দেবায়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আদি গুরু ব্রহ্মা, শেষ গুরু ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন, ইহারাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্ত্তক। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া ইহার নাম ব্রাহ্মণ-বৈশ্যায়ুর্ব্বেদ বা মিশ্রায়ুর্ব্বেদ। মিশ্রায়ুর্ব্বেদই কালক্রমে বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ রূপে পরিণত হয় শেষকাল বা সর্ব্বায়ুর্ব্বেদ—মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়। আমরা নিম্নে এই চারিটি বিভাগের বিবরণ প্রকটিত করিতেছি।

দেবায়ুর্ব্বেদ।

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতই ব্রহ্মাকে আয়ুর্ব্বেদের আদি গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ বিবৃত আছে যে, তিনি লক্ষ শ্লোকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে যখন মানবগণ অল্পায়ু ও অল্পমেধ হইয়া উঠিল, তখন তাহারা তদধ্যয়নে অক্ষম বিবেচনায় পিতামহ সমগ্র আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ন করিলেন। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ প্রজাপতি হইতে অশ্বিনী কুমারদ্বয় অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে দেবরাজ ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অপর নাম সনৎকুমার। ইহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন। ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ—ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে 'শারীর বিজ্ঞানের আদি প্রচারক হয়েন। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে পাঁচজন গুরু পরম্পরা পর্য্যন্ত, স্বর্গে

আয়ুর্ব্বেদ প্রচারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে দৃষ্ট হইবে যে, ঋগ্বেদ কালে ইহারাই বৈদ্য বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিককালে যে সকল ভেষজতত্ত্ব বেদকোবিদের বহুগবেষণাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহাই অল্পে অল্পে ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এক অত্যুৎকৃষ্ট শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়। বেদ-কবি মেধাতিথি বলিয়াছেন, "জলেতেই অমৃত, জলেতেই সমস্ত রোগ নাশক ওষধি বর্ত্তমান।" "হে (†) সোম তুমিই আমাদের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তরুর প্রভু।" এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জলের অসাধারণ রোগনিবারিণী শক্তি অতি প্রাচীনকালেই ভারত সমাজে বিদিত ছিল।

পুনশ্চ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তোত্রে সোম-কন্দের নিকট রোগ দূরকরণার্থ প্রার্থনা বিদ্যমান দেখা যায়। সোমকন্দ যে শুদ্ধ বলকর ও মাদক এমত নহে, ইহা যে বহুবিধ জরাজীর্ণাপহারক, তাহাও সেই পুরাকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোমদেবের নিকট, কারণ পরবর্ত্তী স্তোত্রেই "হে সোম, তুমি অন্য তরুর সহিত বহু আবর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হও"—এরূপ বাক্যে সোম পদ কদাপি চন্দ্র নামান্তর নহে। সোমকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থান-ক্রিয়াদি ভেদে চতুর্ব্বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।*

তাঁহারাও ইহার অসাধারণ জরাপহারিণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে ওষধিপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুনরপি ২০শ সূক্তে "সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলেতেই সমস্ত ওষধি..........হে জল, তুমি আমাদের শরীরের নিমিত্ত রোগ নিবারক তেজের সৃষ্টি কর। ২১শ সূক্ত। এতদ্বারা অনুমতি হয় যে, তৎকালে অধিকাংশ ভেষজই জলজ ছিল, জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইলে যে, বেদ-কবিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবেরও কল্পনা করিয়াছেন, কারণ অনেক সূক্তে সোমদেবের প্রার্থনাও বিদ্যমান আছে। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ আশ্বিন-রুদ্রাদির ন্যায় সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই, শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বল লাভের নিমিত্ত রুদ্র দেবের প্রার্থনা বর্ত্তমান দেখা যায়, পরবর্ত্তী গ্রন্থাদিতে "স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্" বলিয়া অনেক তৈল-বটিকার প্রশংসা ধ্বনিও বিদ্যমান আছে। অন্যতর বেদকবিগৃৎ সমদ বলিয়াছেন, —"হে রুদ্র, তোমার প্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ঔষধিদ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাঁচিয়া থাকি। ওষধি তরুদ্বারা তুমি আমাদের সন্তানগণকে বলান্বিত কর। কারণ শুনিতে পাই, তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, আত্রেয় ধন্বন্তরি, সুশ্রুত এমন কি বাগভট পর্য্যন্ত ইহাদিগকে আশ্বিন, ইন্দ্রাদির ন্যায় বৈদ্য শ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্রসারসংগ্রহাদি অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূরি ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ

† অপ্ স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে। ঋগ্বেদ সংহিতা।

* এক এব ভগবান সোমঃ স্থান ক্রিয়া ভেদেন চতুর্বিংশতিধাভিদ্যতে। যথা অংশুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজত প্রভঃ।

অনুমিত হয় যে, তন্ত্রকারকগণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই ভ্রমানুসন্ধান পাইয়া বেদোল্লিখিত রুদ্র দেবকে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়টী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্য দেব রূপে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নৃপতিগণ যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতেন, ঋকেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তব, যে প্রণালীতে ভারতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান পত্রপল্লব ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূলসূত্র—আধার উর্ব্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি ঋকের সময়েই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গণ ম্যাক্সি্মলত গণনানুসারে ঋকের কাল খ্রীঃ জন্মের পূর্ব্বে ২০০০বৎসরের অন্যূন বলেন। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের দুই একটি গলিত পত্র আজও যে প্রাপ্ত হইতেছি, অন্ততঃ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহার বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ মাত্রেরই সাধারণতঃ জলের উপকারীতা, বহুবিধ জলজ পদার্থের রোগাপ-হারিণীশক্তি, উর্দ্ধজত্রুগত রোগ চিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষু রোগাপনয়ন ও রাজার আয়ু-র্ব্বেদ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশুকতা, সেই পুরাকালেই আর্য্যমনস্বী-দিগের নির্ম্মল জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতিভেদও হয় নাই, ব্যবসায়-ভেদও হয় নাই। একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব রুচি অনু-সারে উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেন। জনৈক বেদঋষি এই বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন,—আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা তণ্ডুল প্রস্তুতকারিণী এবং আমি কবি।" ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল যাজনাধ্যয়নাদি ব্যতীত ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারি-বেন না, তৎকালে এমন কোনো সামাজিক অনুশাসন ছিল না। কে কি ব্যবসায় অব-লম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কাহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করি-বার জন্য তখন আকুলিত হইত না।

ব্রাহ্মণবৈদ্যায়ুর্ব্বেদ বা মিশ্রায়ুর্ব্বেদ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষ ভাগে ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে, সত্যের অনাময়ত্ব, রোগহীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্যঞ্জক, এস্থলেও রোগোৎপত্তি রোগবাহুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবে। এই সময়েই ভগবান ধন্বন্তরি জন্ম গ্রহণ করেন। ধন্বন্তরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কল্পনামিশ্রিত হইলেও উহার কাল্পনিকাংশে কবিপ্রতিভা ও সমুদায়ে ঐতিহাসিকতার সারবত্তা বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যভূমিতে ধন্বন্তরিই আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, যে কালে সমস্ত গ্রাম, নগর, উপনগর নানা-বিধ মহামারীতে ব্যতিব্যস্ত, নিরুপায় আতুর অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনো পন্থা না দেখিয়া একেবারে হতাশ, সেই সম-য়েই অতি কুশল করুণাপরায়ণ বৈদ্যলাভ, সমস্ত প্রাণীর ভয়ানক পীড়া নিবারণের অমোঘ প্রায় উপায় লাভ, ভারত ক্ষেত্রের ধর্ম্মশীল মনুষ্যহৃদয়ে দয়ার নিধান মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতবাসী এইজন্যই ধন্বন্তরিকে অযোনিসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধন্ব-ন্তরির অমানুষী প্রতিভাই তাঁহাকে নারায়ণ

ঋণী বলিয়া তাঁহাদের পুজোপহার প্রদান করিয়াছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থানব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব, সুতরাং বাধ্য হইয়াই শীঘ্র শীঘ্র অনেক আর্য্য ঋষি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্ব্যবহার অবলম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদ শান্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় দ্বিজ মাত্রেই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। কিন্তু কালান্তরে ধন্বন্তরির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে ও ব্যবহার জীবিদের অনুশাসন ভয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তদ্ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। যাহাহউক এই সময়ের প্রথম ভাগ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ ও পরভাগে দ্বিজাতিগণের মধ্যে কেবল বৈদ্যগণ তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিশ্র কাল নামে অভিহিত করা গেল।

ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্য।

স্কন্দ, গারুড় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে ভগবান্ ধন্বন্তরি ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সমুদ্ভূত হয়েন। এইরূপ প্রথিত আছে যে, মহর্ষি গালব সমিৎ কুশাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বনোপান্তে উপস্থিত হইলেন। অধ্বশ্রান্ত, মুনি তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, বন বহির্ভাগে একটি কন্যা জলপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে করিয়া গৃহে যাইতেছে। মুনিবর তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,—"হে কন্যে! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর, জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।" ব্রাহ্মণ-ভক্তি পরায়ণা কন্যা জলকুম্ভ প্রদান করিলে মহর্ষি গালব স্নান করিয়া যথেষ্ট জলপান করিলেন এবং অতি পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন,—"হে কন্যে! আমার পরিতোষ হেতু তোমার সৎ পুত্র লাভ হউক।" কন্যা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন,—"ভগবন! আমার যে বিবাহ হয় নাই।" গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা বলিলেন,—"আমার নাম বীরভদ্রা, আমি বৈশ্যকন্যা।" মুনিবর তচ্ছ্রবণে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুনি সমাজে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন,—"মুনিবর! আপনি বড় মঙ্গল করিয়াছেন, এই বীরভদ্রার গর্ভে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিবেন।" এই বলিয়া সকলে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি সৌম্যাকৃতি কাঞ্চনরাশি গৌরবীর বালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন এবং জননী ক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অম্বষ্ঠনামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনিই বৈদ্যবংশের মূল সংস্থাপক।

কায় চিকিৎসাক্রমোপদেশ।

বাতব্যাধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন]

—:০:—

কল্যাণকাবলেহ নামক ঔষধ টিও বাতব্যাধির গদগদ ভাষী অবস্থায় হিতকর।

ইহার উপাদান

হরিদ্রা,—
বচ,
কুড়
পিঁপুল
শুঁঠ
কৃষ্ণজীরা
বনযমানী
যষ্টিমধু
সৈন্ধব

সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমান। ঘৃত মিশাইয়া ভক্ষণ করিতে হয়। শাস্ত্রকার এই ঔষধের গুণ পরিচয়ে বলিয়াছেন।

একবিংশতি রাত্রেণ ভবেচ্ছ্রুতিতিংরো নরঃ।
মেঘ দুন্দুভি নির্ঘোষো মত্ত কোকিল নিস্বনঃ॥

অর্থাৎ ইহা এক বিংশতি দিবস সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায় এবং মেঘ দুন্দুভির ন্যায় শব্দ অথচ কোকিলের ন্যায় সুমধুর ধ্বনি সমন্বিত বাক্যোচ্চারণ শক্তি জন্মিয়া থাকে।

বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে—দশমূল, বেড়েলা ও মাষকলাই—ইহাদের কাথে তৈল ও ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া রাত্রিকালীন ভোজনের পর তাহার নস্য লইবে।

বাহুশোষ রোগে—শাল পানির সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

গৃধ্রসী রোগে—মৃদু অগ্নিতে নিসিন্দার কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। এরণ্ডমূল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ,সচল লবণের সহিত পান করিলে গৃধ্রসী জন্য ও বস্তিদেশের স্থায়ী বেদনা প্রশমিত হয়।

পঙ্গুতা রোগে—দশমূল, বেড়েলা রাস্না গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের কাথের সহিত এরণ্ড তৈল পান হিতকর। খঞ্জতা ও গৃধ্রসী রোগেও ইহা উপকারী।

আধ্মান রোগে—পিঁপুল চূর্ণ ২ তোলা তেউড়ীর মূলচূর্ণ ৮ তোলা ও চিনি ৮ তোলা, একত্র মিশাইয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করাইবে। দেবদারু, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব লবণ একত্র

কাঞ্জির সহিত বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে শূল ও আধ্মান রোগ প্রকাশিত হয়।

প্রত্যাধ্মান রোগে—বমন ও লঙ্ঘন এবং অগ্নিদীপক ও পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

শিরোগ্রহে—দশমূলের কাথ ও টাবা লেবুর রস দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিবে।

অষ্ঠীলারোগে— গুল্ম রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

তুনী ও প্রতিতুনী রোগে—স্নেহ পিচকারী দেওয়া উপকারী। হিং ও যবক্ষার মিশ্রিত উষ্ণ ঘৃত পান এই রোগে হিতকর।

খল্লী রোগে—কুড়, সৈন্ধব লবণ ও তক্র মিশ্রিত করিয়া ও গরম করিয়া মর্দ্দন করিবে।

বাতকণ্টক রোগে—জোঁক দ্বারা রক্ত শোষণ, এরণ্ড তৈল পান এবং উত্তপ্ত সূচী দ্বারা পীড়িত স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য।

ক্রোষ্টুকশীর্ষে ও পাদদাহ রোগে—বাত রক্ত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মসুর কলাই পেষণ করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে এরূপ অবস্থায় উপকার হয়। পাদদ্বয়ে নবনীত মাখাইয়া অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হিতকর।

পাদহর্ষ রোগে—কুব্জ প্রসারনী তৈলের মর্দ্দন উপকারী।

সকল প্রকার বাতব্যাধিতেই তৈল মর্দ্দন করা প্রধান চিকিৎসা। কোষ্ঠস্থ বায়ুর পক্ষে নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈল, মধ্যম নারায়ণ তৈলের অভ্যঙ্গ হিতকর। নিম্নে ঐ তৈলগুলির উপাদান বলা যাইতেছে—

নারায়ণ তৈলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থ শ্যোনাক পাটলা পারিভদ্রকম্।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধাচ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা স পুনর্ণবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতু দ্রোণেহম্ভসঃ
পচেৎ॥
পাদ শেষং পরিস্রাব্য তৈল পাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠ মেলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগ গন্ধা চ সৈন্ধবং স পুনর্ণবম্॥
এষাং দ্বিপলিকান ভাগান্ পেষয়িত্বা
বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরী রসঞ্চৈব তৈল তুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্য ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব
প্রশস্যতে॥

তিল তৈল ১৬ সের। কাথার্থ—বিল্ব-ছাল, গণিয়ারি ছাল, শোনা ছাল, পারুল ছাল, পালিধা মাদারের ছাল, গন্ধ ভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্ণবা—প্রত্যেকের ৮০ তোলা, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শত মূলীর রস ১৬ সের এবং গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্ণবা মূল—ইহাদের প্রত্যেকটি

১৬ তোলা। এই তৈল পানে, মর্দনে এবং বস্তি প্রয়োগে বিবিধ বাত রোগ বিনষ্ট হয়।

বিষ্ণু তৈলম্।

শাল পর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহু পুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেবধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈল প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যংক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।

তিল তৈল ⁄৪ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপাণি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ড মূল, বৃহতী মূল, কণ্টকারী মূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ও ঝাঁটিমূল—ইহাদের প্রত্যেকটী আট তোলা। যথা নিয়মে পাক করিবে।

বৃহদ্বিষ্ণু তৈলম্।

জলধর মশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী।
কাকোলী ক্ষীর কাকোলী জীবন্তী মধু যষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দন কুঙ্কুমম॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন রেণুকম্।
পার্ণী কুন্দখোটীশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ স্তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরীরস সমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ।

তিল তৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—মুথা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেত চন্দন, রেণুকা, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, কুন্দরখোটা, ও নখী—ইহাদের প্রত্যেকটি ৮ তোলা। জল ৬৪ সের।

মধ্যম নারায়ণ তৈলম্।

বিশ্বাশ্বগন্ধা বৃহতীশ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাক বাট্যালক পারিভদ্রম্।
ক্ষুদ্রা কঠিল্লাতি বলাগ্নি মন্থং মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্॥
মূলং বিদধ্যাদথ পাটলীনাং প্রস্থং সপাদং বিধিনোদ্ধৃতানাম্।
দ্রোণৈরপামষ্টভিরেব পক্ত্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন।
তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেব দুগ্ধ মাজং নিদধ্যা দথবাপি গব্যম্॥
একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দদ্যাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাম্।
তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধা মিসিদারু কুষ্ঠম্॥
পর্ণীচতুষ্কাগুরু কেশরাণি এলাদ্বয় যষ্টি তগরাম্র পত্রম্॥
ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বু বচা পলাশং স্থৌণেয় বৃশ্চীরক চোরকাখ্যম্।
এতৈঃ সমস্তৈ দ্বিপল প্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিধিনাবিপক্বম্॥
কর্পূর কাশ্মীর মৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপল প্রমাণম্।
প্রক্ষেপ দৌর্গন্ধ্য নিবারণায় দদ্যাৎ সুগন্ধায় বুধাস্তু কেচিৎ॥

তিলতৈল ৩২ সের। কাথার্থ—বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোনা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষ চাকুলে,

গণিয়ারি, গন্ধভাদুলে ও পারুল—ইহাদের প্রত্যেকটী ২॥০ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের; শেষ ১২৮ সের। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। শতমূলীর রস ৩২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরি, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, ঝুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেত পুনর্ণবা ও চোরপুষ্পী—ইহাদের প্রত্যেকটি ১৬তোলা। গন্ধ দ্রব্য কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি। প্রত্যেক ৮ তোলা।

কোষ্ঠগত বাতরোগে তৈলের অভ্যঙ্গ ভিন্ন নিম্নলিখিত ব্যবস্থার ঔষধগুলি সেবন করা হিতকর।

প্রাতে—চতুর্ম্মুখ অনুপান ত্রিফলা ও মিছরির জল কিম্বা শতমূলীর রস কিম্বা হেলেঞ্চার রস ও মধু।

বেলা ৩টায়—বজ্রক্ষার এক আনা মাত্রায়, মৌরির জলসহ। ২ বেলা আহারান্তে—বৃহৎ অগ্নিকুমার—গরম জল সহ। বৃহৎ অগ্নিকুমারের পরিবর্ত্তে বিট্ লবণের গুঁড়া দুই আনা মাত্রায় মুখে ফেলিয়া জল পান করিলেও উপকার দর্শিয়া থাকে।

উপরোক্ত ঔষধগুলির প্রস্তুতবিধি বলা যাইতেছে—

চতুর্ম্মুখ রস।

রসগন্ধক লৌহাভ্রং সমং সূতাদ্দ্বি হেম চ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যা স্বরস মর্দ্দিতম্॥

এরণ্ড পত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেক এক তোলা এবং স্বর্ণ।০ চারি আনা। ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে। ২রতি বটী।

বজ্রক্ষার।

কটকিরির চারিগুণ সোরা—অগ্নি উত্তাপে এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বৃহৎ অগ্নিকুমার।

হরীতকী, যমানী, সৈন্ধব—প্রত্যেক ১ভাগ বহেড়া ২ভাগ—জলসহ মর্দ্দন, দুই আনা বটী।

কোষ্ঠগত বায়ু, বিকারে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য অভয়াদ্য মোদক নামক ঔষধটি সপ্তাহে তিন দিন করিয়াও সেবন করান যাইতে পারে। ইহার উপাদান—

হরীতকী, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, দারুচিনি, তেজপত্র, পিপুল, মুথা, বিড়ঙ্গ, আমলকী, প্রত্যেকটি ২ তোলা। দন্তীমূল ৬তোলা, চিনি ১২ তোলা, তেউড়ীমূল ১৬ তোলা। মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। রাত্রে আহারের পরে শীতল জল সহ সেব্য।

আমাশয়গত বায়ুর বিকারে—

প্রাতে রসোনপিণ্ড মাত্রা ॥০ তোলা, অনুপান এরণ্ড মূলের কাথ।

বেলা ৩টায় বাতগজাঙ্কুশ—বেড়েলার কাথ ও মধু।

সন্ধ্যায়—মহালক্ষ্মীবিলাস—পানের রস ও মধু এইরূপ ব্যবস্থা হিতকর। গুগ্‌গুলু ঘটিত ঔষধও এইরূপ অবস্থায় উপকারী। উহার মধ্যে আদিত্যপাক গুগ্‌গুলু, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলুর ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এ দুইটি ঔষধের একটি প্রয়োগ করিলে রসোনপিণ্ড দিবার আর প্রয়োজন নাই।

মর্দ্দনের জন্য রসোনতৈল, সৈন্ধবাদ্য তৈল, এবং মূলকাদ্য তৈল প্রশস্ত।

নিম্নে এই আমাশয়গত বায়ু বিকারের সকল ঔষধেরই উপাদান বলা যাইতেছে।

রসোন পিণ্ড।

পলমর্দ্ধ পলঞ্চৈব রসোনস্য সুকুট্টিতম্।
হিঙ্গুজীরক সিন্ধুত্থ সৌবর্চ্চল কটু ত্রিকৈঃ॥
চূর্ণিতৈর্মাষিকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্।

রসুন ১২ তোলা পেষণ করিয়া তাহার সহিত হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচল লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ—ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৵০ দুই আনা মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ৷০ তোলা।

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ।

পারদ, অভ্র, লৌহ, তাম্র, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, বালা, ধনে, কটফল, হরীতকী, বিষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, মরিচ, সোহাগা—প্রত্যেক সমভাগ। মুণ্ডী ও নিসিন্দা পাতার রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি বটী। অনুপান আদার রস; নিসিন্দা পাতা ও আদার রস এবং মধু।

মহালক্ষ্মী বিলাসো রসঃ।

পলং বজ্রাভ্র চূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধকং ভবেৎ।
তদর্দ্ধং বঙ্গ ভস্মাপি তদর্দ্ধং পারদং তথা॥
তৎসমং হরিতালঞ্চ তদর্দ্ধং তাম্র ভস্মকম্।
রস সাম্যঞ্চ কর্পূরং জাতী কোষকলে তথা॥
বৃদ্ধদারক বীজঞ্চ বীজং স্বর্ণ ফলস্য চ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং মৃতস্বর্ণঞ্চ শাণকম্॥
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জা ফল মানতঃ।

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী ও জায় ফল—প্রত্যেক ১ তোলা, বৃদ্ধদারবীজ ও ধুস্তুরা বীজচূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি বটী।

আদিত্যপাক গুগ্‌গুলু।

ত্রিফলা ও পিপুল—প্রত্যেক দ্রব্য ১ পল। দারুচিনি, এলাইচ—প্রত্যেক ২ তোলা, গুগগুলু ৫ পল। দশমূলের কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ৵০ দুই আনা মাত্রায় বটী। অনুপান গরম জল।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগগুলু।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী
শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারকম্।
রাস্না শতাহ্বা সশঠী যমানী
সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্॥
তুল্যং ভবেৎ কৌশিক মত্র-
মধ্যে দেয়ং তথা সর্পিরথার্দ্ধ ভাগম্।

বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুষ (অভাবে ধনে), গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধড়ক, রাস্না, শুলফ, শঠী, যমানী ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকটির চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত গুগ্‌গুলু

১২ তোলা এবং ঘৃত ৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা। অনুপান মদ্য, মাংসাদির যূষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল।

রসোন তৈল।

তৈল /৪ সের।৩ রসোন /১ সের। কাথার্থ—রসোন /৮ সের। জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের।

সৈন্ধবাদ্য তৈল।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
স্বর্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্॥
বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা।
এতান্যর্দ্ধ পলাংশানি শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানি কারয়েৎ॥
প্রস্থমেরণ্ড তৈলস্য প্রস্থাম্বু শত পুষ্পজম্।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দত্বা তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ॥

এরণ্ড তৈল /৪ সের। কথার্থ—সৈন্ধব, গজপিপুল, রাস্না, শুলফা যমানী, সাচিমাটি, মরিচ, কুড়, শুঁঠ, সচল লবণ, বিটলবণ, বচ, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কুড়, ও পিপুল—প্রত্যেক ৪ তোলা। শুলফার কাথ /৪ সের, কাঁজি /৮ সের, দধির মাত /৮ সের।

মূলকাদ্য তৈল।

তৈল /৪ সের। মূলকের স্বরস বা শুষ্ক মূলার কাথ /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধি /৪ সের, কাঁজি /৪ সের। কল্কার্থ—বেড়েলার মূল, সৈন্ধব, চিতামূল, পিপুল, আতইচ, রাস্না, চই, অগুরু, চিতামূল, ভেলা, বচ, কুড়, গোক্ষুর, শুঁঠ, কুড়, শঠী, বেলশুঁঠ, শুলফা, তগরপাদুকা, দেবদারু—মিলিত /১ সের।

পক্বাশয়গত বায়ুর বিকারে—
প্রাতে—বৃহৎ বাতচিন্তামণি
অথবা—চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ
অথবা—বৃহৎ চিন্তামণি

ত্রিফলা ও মিছরির জল অথবা শতমূলীর রস ও মধু। মধ্যাহ্নে আহারের পর হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ—জলসহ এবং বৈকালে বজ্রক্ষার এক আনায় মাত্রায় মৌরি ভিজান জল সহ সেবন হিতকর। এইরূপ অবস্থায় সুশ্রুত সংহিতায় কাণ্ড লবণ ও পত্র লবণ সেবনের বিধি আছে। যদি এই দুইটী ঔষধের একটি ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ ব্যবহারের আর আবশ্যক নাই। নারায়ণ তৈল, বৃহৎ বিষ্ণু তৈলের অভ্যঙ্গ এইরূপ অবস্থায় উপকারী।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর ধ্বংসের কারণ।

[শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, "নির্ব্বংশ হ'বার আগে মরে পৌত্র।" এই প্রবাদ বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালী জাতির নির্ব্বংশ হইবার আর বিলম্ব নাই। কারণ এ জাতির পৌত্র পর্য্যায়ের 'শিশুই" অধিক সংখ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। জাতিকে বাঁচাইতে হইলে—বাঙালীর বংশ ধারা বজায় রাখিতে হইলে এই শিশু মৃত্যু বন্ধ করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। আমার বোধ হয় অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় কার্য্যের মধ্যে এই কার্য্যই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। কারণ যত কিছু যা' সুখ-সম্পদের জন্য আবশ্যক, সে সকলই জাতির অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। কথায় বলে 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।" যদি জাতির অস্তিত্বই লোপ পায়—যদি বাঙলা হইতে বাঙালীর বংশধারা একেবারে মুছিয়াই যায়, তাহা হইলে বাঞ্ছিত সুখ-সম্পদ ভোগ করিবে কে? আগে বাঁচিবার চেষ্টা, পরে ভোগসুখের অন্যান্য কথা। বাঁচিতে হইলেই—জাতিকে রক্ষা করিতে হইলেই আগে—শিশুরক্ষার যত্ন লইতে হইবে।

শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদিগকে নিরোগ-শরীরে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য অনেক কথাই প্রচার করা হইতেছে। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে আঁতুড়ঘরের দোষাদিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। হিন্দুর যাহা কিছু পুরাতন, সে সকলই নিন্দনীয়; তাই অন্যান্য সহস্রটার মধ্যে এও একটা নিন্দার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। তথাকথিত শিশুর শ্মশান স্বরূপ হিন্দুর আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থার মধ্যে কিছু দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তবু যেন মনে হয়, এ অনুষ্ঠান আশাপ্রদ হইলেও, অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন। কেন এরূপ মনে হয়, সংক্ষেপে তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

এই আঁতুড় ঘর পূর্ব্বেও এখনকার মতই ছিল; কারণ বর্ত্তমানত' পুরাতনেরই অনুকরণ। পুরাতনের আদর্শ লইয়াই ত বর্ত্তমান। সুতরাং বর্ত্তমান আঁতুড় ঘরের অনুরূপ আঁতুড় ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াও সেকালে ত এত শিশুমৃত্যু ছিল না। এখনও দেখি বঙ্গের পল্লীপ্রদেশে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও পুরাতন প্রথার আঁতুড় ঘরই বর্ত্তমান। সে সকল স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী ও শিক্ষিত ডাক্তারের নিতান্তই অভাব; কিন্তু তথাপি কলিকাতা অপেক্ষা ঐ সকল স্থানে শিশু মৃত্যুর হার অল্প। কেন এরূপ হয় ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? এক প্রকার আঁতুড়েই জন্মগ্রহণ করিয়া কোন কোন স্থানে শিশু মরে না, আবার কোন কোন স্থানে প্রায়ই মরে, সুতরাং আমরা শিশু মৃত্যুর কারণ বলিয়া কেবল আঁতুড় ঘরকেই দোষী করিতে পারি না। যদি কেবল আঁতুড়ঘরের দোষেই এই দুর্ঘটনা

ঘটিত, তাহা হইলে ফল সর্ব্বত্রই সমান দেখিতাম। কিন্তু তা' যখন দেখিনা, তখন বুঝিতে হইবে এই আঁতুড় ব্যতীত আরও কিছু আছে, যাহাতে শিশু ভূমিষ্ট হইবার পূর্ব্ব হইতেই রোগপ্রবণ শরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং অল্প কারণেই রুগ্ন হইয়া পড়ে এবং শীঘ্রই মরে।

অবশ্য আমরাও যে আঁতুড় ঘরের উন্নতি চাইনা তা' নয়। আমরা উন্নতি চাই, কিন্তু পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া, পুরাতনকে একেবারে বন্ধ করিয়া নহে। পুরাতন আচার ব্যবহার এ জাতির যেরূপ মজ্জাগত, তাহাতে এই চিরাচরিত দেশীয় প্রথাটাকে একেবারেই যে সকলে বর্জ্জন করিবে তাহাও বোধ হয় না। আজকাল দেখিতে পাই, দেশীয় পূর্ব্বপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেই এক শ্রেণীর সংস্কারকদলের যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই শিশুপালন সম্বন্ধেও আমরা এইরূপ অনেক কথা শুনিয়াছি। কিন্তু সে সকলের সবিশেষ আলোচনা এখানে আর করিব না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে প্রথাকে আমরা শিশুপালনের পক্ষে অনুপযোগী বলিয়া শ্রবণ করিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু সেই প্রথায় প্রতিপালিত শিশু, এ দেশের শীতাতপ সহ্য করিবার শরীর লইয়া বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখনকার মত শীত-প্রধান দেশের আদর্শ প্রথায় প্রতিপালিত শিশু, ঠিক এদেশের উপযোগী শরীর পায় না; সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেকালের প্রথায় প্রতিপালিত অনেককেই জানি যাঁহারা একালের প্রথায় প্রতিপালিত খোকা বাবুদের তুলনায় অদ্ভুত মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

এই সকল দেখিয়াই আমরা বিশ্বাস করি না যে, কেবল মাত্র আঁতুড় ঘরের দোষেই বা শিশুপালনের পূর্ব্ব প্রথার জন্যই শিশুমৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই শিশুমৃত্যুর মূলে আরও কোন প্রবল ও গূঢ় কারণ বর্ত্তমান আছে। সে কারণ কি?

বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, বালকজননীর শারীরিক অপূর্ণতা ও দৌর্ব্বল্য বশতঃই শিশুমৃত্যুর হার বর্দ্ধিত হইতেছে। আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের যে শারীরিক বর্ণনা প্রাপ্ত হই এবং বৃদ্ধদিগের যেরূপ শ্রম সহিষ্ণু শরীর দেখিয়া, তাহার তুলনায় এখনকার চশমা আঁটা-টেরি-কাটা বাবুদের শারীরিক পার্থক্য যে কত তাহা বোধ হয় বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে না! আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা এখনকার কালে উপকথার মতই গালগল্প হইয়া পড়িয়াছে। সেকালে তাঁহাদের অটুট স্বাস্থ্য ছিল, সুপুষ্ট শরীর ছিল, সুতরাং তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইয়া সংসার সুখ উপভোগ করিতেন। আর এখন তাঁহাদেরই বংশের ক্ষীণপ্রাণ খোকাবাবুদের দেখিলে মনে হয় কি এই সকল দুর্ব্বলদেহ মানবগুলি সেই বলিষ্ঠ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে?

এই দৌর্ব্বল্যের প্রমাণ ত সেদিনও প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে যাহারা বর্দ্ধমানে হাঁটিয়া যাইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ নিশ্চয়ই ঘণ্টায় ২ মাইল পথ হাঁটিয়া বর্দ্ধমান কেন, সুদূর কাশী-

বৃন্দাবনাদি তীর্থ করিয়া আসিতেন। তাঁহারা কিন্তু তথাকথিত উন্নত প্রণালীর আঁতুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নাই, সকালে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে চায়ের মৌতাতেও অভ্যস্ত হইয়া পড়েন নাই।

এই যে আমাদের জাতীয় দৌর্ব্বল্য—এই যে আমাদিগের দৈহিক শক্তি সামর্থ্যের পরিবর্ত্তন ইহা এক দিনেও হয় নাই, এক কারণেও হয় নাই। নানাকারণে দিনে দিনে তিল তিল করিয়া এই ক্ষয় চলিয়া আসিতেছে। যেরূপ ভাবে এই ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আর ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। এখন ইহার উপর দৃষ্টিদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন জন্য যে ক্ষতি তাহার কথা আমি আর আলোচনা করিব না। কারণ এখন অনেকেরই "ম্যালেরিয়া" দমনের আগ্রহ দেখা যাইতেছে, এবং জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। সুতরাং আমি আর একটা দিক দেখিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছি। ভরসা করি এ বিষয় সকলেই একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমাদের বিবেচনায় বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই দেশের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ। বালচাপল্য বশতঃই শরীর অপূর্ণ ও জীবনী শক্তি ক্ষীণ হইয়া থাকে। সেই অপূর্ণ শরীর ও ক্ষীণ শক্তির সন্তান যথোপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। সঙ্গদোষে সেও আবার বাল্যে অমিতাচারী হইয়া শরীর ও শক্তির অপচয় করিতে অভ্যস্ত হয়। এই সকল পুরুষের প্রজনন শক্তি কমিয়া যায়। তাই ঐ সকল পিতার পুত্রেরা অল্প অনিয়মেই রোগগ্রস্ত হয়, অথবা আঁতুড়েই মরে। যেটি বাঁচে সে রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া কোন রকমে জীবনের ক'টাদিন কাটাইয়া দেয় মাত্র। দুঃখের বিষয় বালকদিগের মত আজকালকার সস্তা গল্প উপন্যাসের পাঠিকা বালিকারাও সংযমহীনা হইয়া পড়িতেছে। দেশের লোকেও তাহাদিগের সম্মুখে অসংযমের মনোজ্ঞপ্রবৃত্তি আনিয়া দিতেছে। এই অসংযম ও চপল বৃত্তির জন্য ভাবী জননীরা নানারূপ ব্যাধি দুষ্ট শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সর্ব্বনাশ এইখানেই। এসকল বিষয় শুনিতেও লজ্জা করে, শুনাইতেও লজ্জা করে। কিন্তু আর লজ্জা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এখন কুৎসিৎকথা শুনিতেও হইবে, শুনাইতেও হইবে। আর আজকালকার নব্য অসংযমী অাটিষ্ট সাহিত্যিক ও ছবিওয়ালা মাসিকের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারিগণকে সতর্ক করিতেই হইবে। নতুবা এজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

হোমে আয়ুর্ব্বেদ ।

[শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ-বেদান্তবাগীশ]

শ্রীভগবানের বা দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিমুখে প্রদত্ত ঘৃতাহুতি বা ঘৃত সম্বৃত সমিধ বিল্বপত্রাদির আহুতির নামই হোম। অগ্নিমুখেই দেবতারা ভোজন করেন; অগ্নিমুখে মন্ত্র সহকারে প্রদত্ত আহুতিই হবিঃ। এই হবিই দেবতাদের প্রিয় খাদ্য। এই হবিই অমৃত। এই হবির্ভোজন রূপ অমৃত পানেই দেবতা-শরীর বৰ্দ্ধিত। ইহা দ্বারাই দেবতারা বলশালী। দেবতারা বলশালী না হইলেই অসুরগণের প্রাদুর্ভাব ফলে সৃষ্টির ক্ষতি। উপনিষৎ ও পুরাণাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া সমন্বয় করিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই হবি ব্যতীত দেবতাদের অন্য অমৃত নাই।

উপনিষদে দেবতা ত্রয়স্ত্রিংশৎ। "ত্রয়স্ত্রিংশদ্বৈ দেবাঃ"। অগ্নি, বায়ু, জল, পৃথিবী, মন, বুদ্ধি, প্রাণ প্রভৃতিই দেবতা। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট দেবতারা এই অগ্নিতে দত্ত আহুতি না পাইলে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া পড়েন। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাৎ, ধূমকেতু, জলপ্লাবন, ও অনাবৃষ্টি এই সকলই অসুর। লোক রক্ষার্থে সৃষ্ট লোকপাল দেবতারা যাহাতে শক্তিশালী থাকেন, অসুরদের প্রাদুর্ভাব না ঘটে, তাহার জন্য স্বতঃ পরতঃ যত্ন করা সকল মানবেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এই হোমই দেব যজ্ঞ। "হোমো দৈবো"।

এই হোম ব্রাহ্মণের অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। উপনিষদধ্যায়ীই হউন বা বৈদিকই হউন, সকলকার পক্ষেই হোম অবশ্যানুষ্ঠেয়। "ত্রিণাচিকেত অগ্নি" "পঞ্চাগ্নি" উপনিষদের কথা। "অগ্নিহোত্রী" "আহিতাগ্নি" "সাগ্নিক গৃহস্থ" এই সকল শব্দাবলি দ্রষ্টব্য আমাদের গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন এবং বিবাহ (কুশণ্ডিকা) প্রভৃতি সংস্কারে বৈদিক হোমরূপ দৈবযজ্ঞ অবশ্যানুষ্ঠেয়। শ্রাদ্ধ, ব্রতপ্রতিষ্ঠা, গৃহপ্রবেশ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি ব্যাপারেও এই দৈবযজ্ঞের নিয়ম। তান্ত্রিক দীক্ষা-পুরশ্চরণাদিতে তান্ত্রিক হোমের ব্যবস্থা শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বহু শুভ কার্য্যেই হোম অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই অবশ্যানুষ্ঠেয় হোমরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ কি প্রকারে আয়ুর্ব্বেদের উদ্দেশ্য সাধিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। "বিধিনিষেধে আয়ুর্ব্বেদ" "সংস্কারতত্ত্বে আয়ুর্ব্বেদ" "হোমে আয়ুর্ব্বেদ" সকল ধর্ম্মকার্য্যেই আয়ুর্ব্বেদ। যাবতীয় খুঁটী নাটী পালনেও আয়ুর্ব্বেদ।

হোমে আয়ুর্ব্বেদের এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। হোমের মধ্য দিয়া এক অপূর্ব্ব নিয়মে আয়ু-

র্ব্বেদের মহোদ্দেশ্য সাধিত হইয়া গিয়াছে। তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইব।

প্রথমতঃ হোমের অগ্নি শিখা যে স্থান স্পর্শ করে, সেই স্থান মালিন্যশূন্য, নিষ্কলুষ সত্ত্বগুণময় ও পুণ্যস্নিগ্ধ হইয়া উঠে। আহুত অগ্নির সুগন্ধি ধূমে দূষিত ও কলুষিত বাতাস নিমেষেই নষ্ট হইয়া যায়। হোমীয় ঘৃত গন্ধে ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, অজীর্ণ নষ্ট হয়, সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়, তমোগুণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হোমের ভস্ম ললাটে লেপন করিলে শিরোঘূর্ণন আরোগ্য হয়, কাজলরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুরোগ আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। সন্ধিস্থলে লেপন করিলে বাতব্যাধির ভয় দূর হয়। হোমের ভস্মে তিলক পরিয়া যে কি শোভা হয়—তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অবগত আছেন। এক্ষণে বিশুদ্ধ গবাঘৃতের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মহার্ঘতার ফলে নিত্য হোম সাধারণের পক্ষে কষ্টকর এবং কঠিনসাধ্য হইয়াছে। অতীতকালে যখন গব্যঘৃত সুলভ ছিল, জীবিকানির্ব্বাহ অতি সহজ ছিল—সে সময়ে নিত্যহোম সকলকার পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত।

দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বড় রকমের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার নামই নৈমিত্তিক যজ্ঞ। এই যজ্ঞে কত যাজ্ঞিকেরা বৃহৎ হোম-কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া লেলিহান অগ্নিতে রাত্রিদিন আহুতি দিতেন। রাশি রাশি ঘৃতাহুতি হইত, বিল্বপত্র সমিধাদি ভারে ভারে সংগৃহীত হইত। সেই যজ্ঞীয় অগ্নি যখন লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া ঊর্দ্ধে প্রসৃত হইত—সে এক অপূর্ব্ব শোভা।

এই যজ্ঞীয় তপ্ত হোমশিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উপরিস্থ মেঘগুলির তাপ বিধান করে, বিশৃঙ্খল এবং বিচ্ছিন্ন মেঘগুলিকে জমাট বাধিয়া দিয়া একটি বৃত্ত অবিচ্ছিন্ন বৃহৎ মেঘে পরিণত করে। আর মেঘগুলির তলদেশে এমন একটি তাপময় চাপ দেয়, যাহার ফলে মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত করান দেশের মধ্যে যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা এই অনাবৃষ্টি অতি-বৃষ্টি পীড়িত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী সকলেই অবগত আছেন। আর এই ইচ্ছামত বৃষ্টিপাত যজ্ঞের অধীন। সম্প্রতি যজ্ঞের ফলে বৃষ্টিপাত হইয়াছে—ইহার নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে।

অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতি সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

যজ্ঞীয় ধূমের শক্তি অসীম। ইহা দূষিত ও কলুষিত বাতাস এবং রোগের বীজাণু নষ্ট করেই; তদ্ভিন্ন এই ধূম তরুলতায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে পত্রপল্লবে ভূষিত করে, অপর্য্যাপ্ত ফল ও পুষ্পের ভারে অবনত রাখে। এই ধূমের স্পর্শে পত্ররাশি নিমেষের মধ্যে অধিকতর শ্যামল এবং চিক্কণ হইয়া উঠে। এই ধূমের ফলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। ভূমি "অকৃষ্ট পচ্যাইব শস্যসম্পদ" সম্পৎশালিনী হইয়া উঠে।

এই যজ্ঞাগ্নির ঊর্দ্ধ প্রসৃত শিখাই যজমানকে স্বর্গমার্গ দেখাইয়া দেয়। আত্মা ঐ জ্যোতির্ম্ময় শিখাসূত্র অবলম্বন করিয়া সেই শান্তিময় স্থানে যাইতে সমর্থ হয়।

হোমের দ্বারা যেমন ঐহিক লাভ, তদ্রূপ পরলোকেরও উন্নতি। শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের, প্রাণের যেমন শুদ্ধি বৃদ্ধি, আত্মারও ইহা সেইরূপই উপকারক।

বিল্বকাষ্ঠের অগ্নিতে সঘৃত বিল্বপত্র নিক্ষেপ করিয়া হোম করিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। সেই সুমধুর গন্ধে সেই গৃহ এবং গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ কি সুন্দর গন্ধে ভরপুর হয় তাহাও অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। গৃহের দোষ কাটাইতে এমন রসায়ন আর নাই। এমন কি হোমের শেষে পূর্ণাহুতিরূপে দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ রম্ভা ভোজন যে গর্ভ দোষের নিবারক—ইহা সাধারণ্যে প্রসিদ্ধই আছে।

যাঁহারা অজীর্ণ ব্যাধি ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছেন—তাঁহারা যদি কিছুদিন নিয়মিত ভাবে বিল্বপত্রে হোম অভ্যাস করেন,তবে তাঁহারা রোগ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবেন। সাবধান, হোম করায় সময় মস্তকে উত্তরীয়টি উষ্ণীশরূপে বাঁধা চাইই চাই। ইহা কেবল যে শাস্ত্রেরই নিয়ম তাহা নহে, পরন্তু বড়ই উপকারক।

শিষ্যালয়ে অনেক সময়ে আমাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হয় এবং সময়ে সময়ে সঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা হোমও করিতে হয়। হোম করিয়া যথেষ্ট সুখ ও স্বস্তি হয়—অগ্নির তাপে মস্তকে কোনরূপ কষ্টও হয় না। কিন্তু রন্ধনকালে অগ্নি তাপে কষ্ট হয়, সময়ে সময়ে মাথা গরম হইয়াও উঠে। হোমাগ্নিতে যে যে কামনা করিয়া আহুতি দিবে, সে সেই ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাই আমাদের শাস্ত্র-বিশ্বাস। যাহারা ঐহিক সুখ প্রয়াসী, স্বাস্থ্য-কামী তাহারা ঐ সুখ ও স্বাস্থ্যের অনুরোধেই হোম করিতে পারেন—তাহাতেও তাঁহাদের উপকার হইবে।

তাই বলিতেছি আমাদের শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধে আয়ুর্ব্বেদ, সংস্কার তত্ত্বে আয়ুর্ব্বেদ, হোমে আয়ুর্ব্বেদ, সকল খুটীনাটী পালনে আয়ুর্ব্বেদ।

সুশ্রুতের সার্জ্জারি।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত এইচ, এম্, বি]

যাঁহারা সুশ্রুত সংহিতা ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মহর্ষি সুশ্রুতকে একজন পাকা সার্জ্জন না বলিয়া থাকিতে পারিবেন না। ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য ক্রমে সুশ্রুতের অস্ত্র চিকিৎসা এখন, দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন একদিন ছিল, যে দিন ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকদিগের নিকট হইতেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দিগকে মহর্ষি সুশ্রুত প্রবর্ত্তিত অস্ত্র চিকিৎসাকেই মূল ভিত্তি করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখনকার দিনে ডাক্তারি ও কবিরাজী—দুইটি নাম পৃথক ভাবে প্রচলিত হইলেও বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মুখ হইতেই চিকিৎসা বিদ্যা নিঃসৃত হইয়াছিল।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র—সাম, ঋর্ক, যজু ও অথর্ব্ব—এই বেদ চতুষ্টয়েরই অন্তর্গম। অনাদি পুরুষ ব্রহ্মা—প্রাণী সমূহের সৃষ্টির প্রারম্ভেই বেদের সৃষ্টি করেন, আয়ুর্ব্বেদও সেই সময়ে তাঁহারই সৃষ্টি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা তাহারই শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমোন্নতির সাহায্যে অধুনা লোক সমাজে অদ্ভুত ব্যাপোর দর্শাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং ডাক্তারি চিকিৎসা ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা মূলতঃ যে একই চিকিৎসা—একথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

ডাক্তারিতেও অস্ত্র চিকিৎসায় যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের আবশ্যক, আয়ুর্ব্বেদেও যে সেইরূপ—সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে অস্ত্রকে যন্ত্র ও শস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহারই পরিচয় দিতেছি—

যন্ত্র। আয়ুর্ব্বেদে যন্ত্র সর্ব্ব সমেত একশত একটি ইহারা মূলতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত, যথা, ১। স্বস্তিক যন্ত্র। ২। সন্দংশ যন্ত্র। ৩। তাল-যন্ত্র। নাড়ী যন্ত্র। ৫। শলাকা যন্ত্র। উপযন্ত্র। এই ছয় প্রকার যন্ত্রের মধ্যে স্বস্তিক যন্ত্র চব্বিশ প্রকার, এই যন্ত্র অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ করিতে হয়। এই চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্রের নাম—সিংহ মুখ যন্ত্র, ব্যাঘ্র মুখ যন্ত্র, তরক্ষুমুখযন্ত্র, বৃক মুখ যন্ত্র, ভল্লুক মুখ যন্ত্র, দ্বীপী মুখ যন্ত্র, বিড়াল মুখ যন্ত্র, মৃগ মুখ যন্ত্র, এর্ব্বারুক (হরিণের ন্যায় পশু বিশেষ) মুখ যন্ত্র, কাক মুখ যন্ত্র, কঙ্ক মুখ যন্ত্র, কুরর (কুরো, কুরল পক্ষী) মুখ যন্ত্র, চাস (নীলকণ্ঠ পক্ষী) মুখ যন্ত্র, তাস (শিকুরে পাখী) মুখ যন্ত্র, শশঘাতী (শরাল পাখী) মুখ যন্ত্র, উলুক (হুতুম পেচা) মুখ যন্ত্র, চিল্লি (চিল) মুখ যন্ত্র, শ্যেন (বাজ পাখী) মুখ যন্ত্র, গৃধ্র মুখ যন্ত্র, ক্রৌঞ্চ মুখ যন্ত্র, ভৃঙ্গিরাজ মুখ যন্ত্র, অঞ্জলি (পক্ষী বিশেষ) মুখ যন্ত্র, কর্ণাবভঞ্জন (পক্ষী বিশেষ) মুখ যন্ত্র ও নন্দী মুখ যন্ত্র।

সন্দংশ যন্ত্র। ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার, কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত এবং তাহাতে খিল থাকে, ইহাকে সনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র বলে। অন্য প্রকার খিল বিহীন, ক্ষৌরকারের সন্নার অনুরূপ, ইহাকে অনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র বলে। এই সন্দংশ যন্ত্র দৈর্ঘ্যে ১৬ অঙ্গুলি। এই যন্ত্র দ্বারা চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে সংবিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির করিতে হয়।

তাল যন্ত্র। ইহাও দুই প্রকার, একটি মৎস্য তালের ন্যায় অর্থাৎ শঙ্কের ন্যায় পাতলা ও বক্র, এক মুখ বিশিষ্ট এবং অপরটি দুই মুখ বিশিষ্ট। এই যন্ত্র দ্বারা কর্ণ ও নাসিকাদির মলাদি বাহির করিতে হয়। এই যন্ত্র ১২ অঙ্গুলি লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

নাড়ী যন্ত্র। এই যন্ত্র নানাবিধ আকারে প্রস্তুত করিতে হয়। সাধারণতঃ মুখ ভেদে ইহা দুই প্রকার, এক প্রকারের একদিকে মুখ থাকে এবং অন্য প্রকারের দুই দিকে মুখ থাকে। এই যন্ত্রসকল ছিদ্র বিশিষ্ট। এই যন্ত্র দ্বারা দেহের স্রোতোগত কণ্টকাদি শল্য বাহির করা হয় এবং শরীরের মধ্যগত ফোড়া ও অর্শাদি রোগ পরীক্ষা করা হয়। ইহা ভিন্ন এই যন্ত্র সাহায্যে দেহ মধ্যস্থ ক্ষতাদিতে ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং আরও নানারূপ কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

শলাকা যন্ত্র। ইহাও আটাইশ প্রকার। এই আটাইশ প্রকারের মধ্যে গণ্ডূপদ বা কেঁচোর মুখের সুরূপ শলাকা যন্ত্র দুই প্রকার, শরপুঙ্খ মুখের অনুরূপ দুই প্রকার, সর্পফণা মুখাকৃতি দুই প্রকার ও বড়িশ মুখাবৃতি দুই প্রকার। ইহাদিগের মধ্যে গণ্ডূপদ মুখাকৃতি দুইটি এষণ অর্থাৎ ব্রণাদির শোষ বা নালী অন্বেষণে ব্যবহার করিতে হয়। শরপুঙ্খ মুখাকৃতি দুইটি বৃংহন কার্য্য অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যগত কোনো অংশ ছেদন পূর্ব্বক তুলিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়, সর্পফণাকৃতি দুইটি চালন কার্য্যে অর্থাৎ আঘাতাদি হেতু স্থানান্তরিত অস্থি প্রভৃতি চালনা করিয়া স্বস্থানে নিয়োজনার্থ এবং বড়িশ মুখাকৃতি দুইটি আহরণ কার্য্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কণ্টকাদি কোনো বস্তু আহরণ পূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়।

আর কয়েক প্রকার শলাকা যন্ত্রের মধ্যে দুই প্রকার অর্দ্ধ খণ্ড মসুর দাইলের আকারের মত এবং অল্প আনত মুখ বিশিষ্ট। স্রোতগত কণ্টকাদিশল্য ইহাদের দ্বারা বাহির করা হয়। ক্ষতস্থান পরিষ্কারের জন্য তুলির মত ছয় প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়, ইহাদের মুখে বা অগ্রভাগে তুলান জড়ান থাকে। হাতার আকারে তিন প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহাদের আকার হাতার ন্যায় এবং মুখ গঠন খলের অনুরূপ। এই যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষতস্থানে ক্ষার এবং ঔষধাদির প্রয়োগ করিতে হয়। ব্রণাদি দগ্ধ করিবার জন্য ছয় প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে তিন প্রকার জাম ফলের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট এবং তিনটি অঙ্কুশের ন্যায় বক্র মুখ বিশিষ্ট। নাসিকাদির মধ্যগত অর্শ তুলিবার জন্য কুলের আঁটির মধ্যগত শস্যের অর্দ্ধ খণ্ডের অনুরূপ এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। আর এক প্রকার শলাকা যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে এক প্রকারের আকার মাষ কলাইয়ের ন্যায় স্থূল এবং উহার দুইদিকে পুষ্পের মুকুলের মত দুইটি মুখবিশিষ্ট। এই যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিতে হয়। আর এক প্রকার শলাকা যন্ত্র আছে— তাহার মুখের অগ্রভাগ মালতী পুষ্পের বোঁটার ন্যায় স্থূল ও গোলাকার। এই যন্ত্র দ্বারা মূত্রমার্গ, যোনিদ্বার ও লিঙ্গনাল পরিষ্কার করিতে হয়।

উপযন্ত্র। ইহা পঁচিশ প্রকার। রজ্জু, বেণীকা, পাট, চর্ম্ম, বল্কল, লতা, বস্ত্র, অষ্ঠীলাশ্ম, মুদগর, হস্ততল, পদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, নখ, চুল, মুখ, অশ্বকটক (ঘোড়ার মুখ সংলগ্ন লৌহ বলয়) বৃক্ষ শাখা, ষ্ঠীবন (থুতু), প্রবাহন (বমন, বিরেচনাদি), হর্ষ (সন্তোষজনক দ্রব্যাদি) অয়স্কান্ত (পাষাণ বিশেষ), ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ।

শস্ত্র। ইহা বিংশতি প্রকার। মণ্ডলাগ্র, করপত্র,—বৃদ্ধিপত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা, উৎপল পত্র, অর্দ্ধধার, সূচ, কুশপত্র, আটীমুখ, শরারী মুখ, অন্তর্মুখ, ত্রিকূর্চ্চক, কুঠারিকা, ব্রীহিমুখ, আরা, বেতস পত্রক, বড়িশ, দন্তশঙ্কু ও এষণী।

নানা প্রকার শস্ত্রের পরিচয়। মণ্ডলাগ্র ও করপত্র (করাত) নামক অস্ত্র ছেদন (কর্ত্তন) ও লেখন (আঁচড়ান বা ছাল তোলা) কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। বৃদ্ধি পত্র, নখশস্ত্র, মুদ্রিকা,

উৎপল পত্র ও অর্দ্ধধার নামক পাঁচ প্রকার অস্ত্র—ছেদন, ভেদন ও লেখন কার্য্যে ব্যবহার করিতে হয়। সূচী (সূঁচ), কুশপত্র, আটীমুখ, শরারী মুখ, অন্তর্মুখ, ও ত্রিকূর্চ্চক নামক ছয় প্রকার অস্ত্র—বিস্রাবন কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণাদি হইতে—পূয রক্তাদি নিঃসারণ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। কুঠারিকা, ব্রীহি মুখ, আরা, বেতস পত্র ও সূচী—এই পাঁচ প্রকার অস্ত্র—ব্যধন কার্য্যে অর্থাৎ কোনো স্থান বিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। বড়িশ ও দন্তশঙ্কু নামক অস্ত্রদ্বয়—আহরণ কার্য্যে অর্থাৎ শরীর হইতে কোনো শল্য আহরণ পূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য ব্যবহার্য্য। এষণী অস্ত্র—এষণ কার্য্যে অর্থাৎ দেহ মধ্যগত কোনো বস্তু অন্বেষণ করিবার জন্য এবং অনুলোমন কার্য্যে অর্থাৎ কোনো দ্রব্য উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে আনিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়। সূচী—অস্ত্র—শরীরের কোনো অংশ সেলাই করিবার জন্য ব্যবহার্য্য।

এই সকল অস্ত্র কিরূপ ভাবে বালক, বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুর শরীরে প্রয়োগ করিতে হয়, কোন্ অস্ত্র কাহার শরীরে প্রয়োগ করা উচিত নহে—সে সকল পরিচয় সুশ্রুত অতি সুন্দর রূপেই দিয়াছেন, আমরা এস্থলে আর সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত পরিচয় দিয়া পুঁথি বাড়াইব না। এখনকার দিনে ডাক্তারি অস্ত্র চিকিৎসা সমুন্নতি লাভ করিলেও আর্য্য ঋষি এক সময়ে এ সম্বন্ধে কিরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র এস্থলে প্রদান করিলাম।

ওলাউঠার কারণ নির্ণয়।*

—:o:—

ওলাউঠার কারণ বহুতর, এবং তাহাদের কার্য্য অনেক সময়ে যুগপৎ ও মিশ্রভাবে হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণকে তিনটি মুখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা;—

প্রথম। ব্যাপক (Epidemic) কারণ, যথা সৌর উত্তাপ; শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা; বায়ু মণ্ডলস্থিত তড়িৎ; ওজোন (ozone) বা প্রাণকের অভাব; বিষবায়ু (Malaria)।

দ্বিতীয়। ভৌম (Telluric) কারণ, যথা, অনূপদেশ বা নিম্নভূমি। তৃতীয়। দৈশিক (Endemic) কারণ যথা,—তীর্থাদি উপলক্ষে দূর যাত্রা; দুর্গন্ধ উত্তাপ (Effluvia); অপরিষ্কার জল; অপকৃষ্ট খাদ্য ও অতিভোজন; দন্তোদ্গম জন্য উপদাহ; বিরেচক ঔষধ; সুরা; স্নায়বোত্তেজক অর্থাৎ বায়ুবৃদ্ধিকারক; মানসিক আবেগ; রাত্রিগত কাল প্রভাব বিশেষ; এক ব্যক্তির এবং এক জাতির বারংবার আক্রান্ত হইবার প্রবণতা।

সৌর উত্তাপ। ওলাউঠার উৎপাদন

---

* এই প্রবন্ধটি একজন এম, বি ডাক্তারের লিখিত এজন্য ইহাতে যে সকল যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অ্যালোপ্যাথিক মতেই বর্ণিত। আং সং।

সম্বন্ধে সূর্য্যোত্তাপের যে বিশিষ্টরূপ প্রভাব আছে; ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। সমশীতোষ্ণ দেশে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই ছয় মাসেই ওলাউঠা বেশী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে, বৎসরের সকল সময়েই ওলাউঠা হইতে দেখা যায়; যে সময়ে সূর্য্যোত্তাপ খুব বেশী হয়, তাহার প্রায় কয়েক সপ্তাহ পরে বায়ুমণ্ডলে ঐ উত্তাপাধিক্যের প্রভাব বলবান হইয়া থাকে; যে সকল ব্যাধির শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে অতিরিক্ত উষ্ণতা আনুকূল্য করিয়া থাকে, তাহারা প্রায় উত্তাপাধিক্য হওয়ার কিছুকাল পরে প্রভাব প্রকাশ করে।

শীতোষ্ণতার অতিমাত্র বিভিন্নতা। যদিও ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে উষ্ণতাধিক্যের প্রয়োজন হয়; পরন্তু এই উত্তাপ-বাহুল্যের সহিত যখন প্রত্যেক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উষ্ণতার চূড়ান্ত পরিমাণ ও শৈত্যের চূড়ান্ত পরিমাণ এই দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত বেশী তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সময়েই এই রোগের বেশী প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

বায়ুমণ্ডলের শুষ্ক ও স্বচ্ছভাব ওলাউঠা বিকাশের অনুকূল; কিন্তু ইহাও অতিশয় শীতোষ্ণতান্তরের সহবর্ত্তী অবস্থা মাত্র। মেঘাচ্ছন্ন দিনে দিবাভাগ ঠাণ্ডা থাকে, এবং রাত্রিভাগ অপেক্ষাকৃত গরম থাকে। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া, আমাদের এই বঙ্গদেশে বর্ষার কয়েক মাসে, উত্তাপমান যদিও গড়ে ৮৩ অংশ থাকে, তথাপি, ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা কম হইয়া থাকে। এপ্রিল, ও মে মাসে যদিও ৩ মাত্র উষ্ণতা বাড়ে, তথাপি ঐ দুই মাসে ওলাউঠার মৃত্যুসংখ্যা অধিকতর বৃদ্ধি হয়।

শুষ্ক বায়ু, প্রচণ্ড ও গ্রীষ্ম ও শীতোষ্ণতার অতিমাত্র অন্তর, ওলাউঠার উৎপাদন পক্ষে অনুকূল অবস্থা; আর আর্দ্র বায়ু, প্রচণ্ড উত্তাপ, শীতোষ্ণতার অনুমাত্র অন্তর তৎপক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল. কিন্তু শীতোষ্ণতার অন্তরের সহিত যত, বায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতার সহিত ওলাউঠার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ তত নয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যদিও মধ্যে মধ্যে শুষ্ক গ্রীষ্ম সময়ে ওলাউঠা দেখা যায়; কিন্তু অধিকাংশ মড়ক বর্ষার সময়েই হয়। শীতোষ্ণতার অতিমাত্র তফাতের দ্বারা যে উদর পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তাহার প্রমাণ স্থলে আর একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। সমতল হইতে দার্জ্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পাহাড়ের উপর উঠিলে, অনেক সময় উদরাময় হইতে দেখা যায়। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কখনও কখনও অত্যন্ত শীতাধিক্যের সময়েও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮৬৬ সালে রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে প্রচণ্ড শীতের সময়ে একবার ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা বেশী হয় নাই। ১১ হাজারেরও অধিক লোকে আক্রান্ত হয়, ২৭০০ আন্দাজ মরে।

বায়ু মণ্ডলস্থিত তাড়িত। স্নায়ব্য দ্রব যে বিশ্বব্যাপী তাড়িতের রূপান্তর মাত্র, ইহা প্রায় দেহতত্ত্ববিৎ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ওলাউঠাকে যদি স্নায়ু মণ্ডলের ব্যাধি বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে, তাড়িতের পরিবর্ত্তন বিশেষের দ্বারা যে উহার

উৎপাতের আনুকুল্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না; অপিচ উত্তাপের সহিত যে তাড়িতের সম্বন্ধ আছে, তাহার নিদর্শন দেখ, গ্রীষ্মকালে যেদিন যত গরম হয়, সেই দিন প্রায়ই দিবাশেষে মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রপাত হইয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডলার ব্যাধির সহিত যে বায়ুমণ্ডলস্থিত তাড়িতের সম্বন্ধ থাকা সম্ভব, [তৎপ্রতিপাদনার্থ ডাক্তার চার্চ্চ্ হিল প্রণীত ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ক পুস্তকে প্রসবান্তিক আক্ষেপ রোগ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মোল্লেখ করিতেছি। তিনি অনেকবার গ্রীষ্মের সময়ে এবং যৎকালে মেঘসকল বৈদ্যুতিক দ্রবে পূর্ণ আছে আকাশের ভাব দেখিলে বৃষ্টি-বজ্রপাত হইবে কি—এই কতক্ষণ হইয়া গিয়াছে, বলিয়া বোধ হইয়াছে এই রকম সময়ে এই রোগ অনেকগুলি হইতে দেখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অনেক চিকিৎসকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে যখন ইহা উপস্থিত হয়, তখন একেবারে কতকগুলি প্রসবান্তিক আক্ষেপের কেস (case) হইয়া থাকে, যেন কোন বিশেষ বহুব্যাপী কারণের উপর তাহার উৎপত্তি নির্ভর করে।

ফরাসী বিদ্রোহের পর যৎকালে প্যারী নগরের সমস্ত হাসপাতাল আহত ব্যক্তিতে ভরা ছিল, সেই সময় একদিন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত হয়। সেই দুর্য্যোগের রাত্রিতে সকল হাসপাতালেই মৃত্যুসংখ্যাও পূর্ব্বের ও পরের সকল দিন অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

অপিচ, বিদ্যুদাহত ব্যক্তিদিগের ওলাউঠার প্রায় সমস্ত লক্ষণই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভ্রম, মূর্চ্ছা, কর্ণনাদ, বধিরতা, আক্ষেপ—স্থায়ী ও পৌনঃপুনিক উভয়বিধ—এ সমস্তই দৃষ্ট হয়। শ্বাসকৃচ্ছ, হৃৎপ্রদেশের নিষ্পীড়ন, উর্দ্ধোদরে নিষ্পীড়ক ব্যথা, এগুলিও নিতান্ত বিরল নহে। এই অবস্থায় স্বর ক্ষীণ ও লুপ্ত ওলাউঠার শেষোক্ত লক্ষণও কখনও কখনও উপস্থিত হইয়া থাকে। বমন সচরাচরই। নির্গত হইতেও দেখা যায়। উদরাধ্মান, অন্ত্র সমূহের [ক্রিমিবৎ সঙ্করণ ও আক্ষেপিত সঙ্কোচনের ন্যায় সঙ্করণ এগুলি প্রায়ই দেখা যায়। তদ্ভিন্ন বায়বীয় তাড়িতের যতগুলি লক্ষণ উৎপন্ন করে,] তন্মধ্যে অতীসারই অধিকস্থলে দেখা যায়। [কারম্যান কতকগুলির পক্ষীর শরীরে তাড়িত] প্রয়োগ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাহারা সর্ব্বাগ্রেই মলত্যাগ করে এবং অধিকক্ষণ বিদ্যুৎ প্রয়োগ করিতে থাকিলে মল ক্রমশঃ তরল হইয়া পরিশেষে জলবৎ হয়। মূত্রাঘাত (uremia) সচরাচরই হইয়া থাকে।

আঘাত মাত্র বিদ্যুদাহত ব্যক্তির সম্পূর্ণ হিমাঙ্গাবস্থা (colapse) উৎপন্ন হয়, এবং এই অবস্থা বহুক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। নাড়ী কখনও ক্ষীণা, কখনও অননুভাব্যা (imperceptible); ক্বচিৎ কোমলা ও সহজে দমনীয়া, কখনও বা এই সকল লক্ষণ যুক্তা থাকে এবং দ্রুত হয়। পরন্তু অধিকাংশ স্থলে বিলক্ষণ মন্দাই দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও সূক্ষ্মা মধ্য লোপিনী এবং বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তৎসঙ্গে শরীর শীতল—তুষারবৎ—বিশেষতঃ হাত পা যে ঘর্ম্ম থাকিলে উহা শীতল ও পিচ্ছিল হয়।

কতকটা সময়—প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা পরে এই অবসাদনাবস্থা হয়, তা'র পর ইহার শেষে

প্রতিক্রিয়াবস্থা উপস্থিত হয়। এই প্রতিক্রিয়া ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রবল ও স্থায়ী থাকে। তখন নাড়ী দ্রুতগতি সম্পূর্ণ ও কঠিন হয়। কায়োত্তাপ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অবশেষে অগ্নিবৎ হয় এবং কখনও কখনও রোগী প্রচুর ঘর্ম্মে স্নাত হইয়া উঠে। এই জ্বর সত্বরই উপশমিত হইয়া নিদ্রাবেশ হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রবল হইয়াও উঠে ও তৎসঙ্গে অন্য উপসর্গেরও যোজনা হয়।

ডাক্তার ম্যাকফার্শন তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ১৮৬৬ সালে যৎকালে সেণ্টপিটার্সবার্গে ওলাউঠার মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কম্পাসের কাঁটা নৈসার্গিক আকর্ষণের অনুগামী হইত না, এবং যে চুম্বকে প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চে পঁচাত্তর পাউণ্ড ভার ধারণ করার কথা, তাহার শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হইতে হইতে, শেষ রোগের যখন বড় প্রাদুর্ভাব, তখন উহার ১৫ পাউণ্ড মাত্র ভার ধারণের শক্তি ছিল। আবার রোগ যেমন কমিতে লাগিল, উহার শক্তিও তেমনি বাড়িতে লাগিল। অবশেষে উহার পূর্ব্ব শক্তি পুনরায় প্রত্যাগত হইল। ১৮৪৯ সালে, আয়ার্লাণ্ডে যে মড়ক হয়, তাহাতেও এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল। অপিচ, অনেক সময়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গেলে তারই পরে ওলাউঠা দেখা দিয়াছে, ইহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন। এরূপ ঘটনা হামেসাই হয়, যখন ওলাউঠা ব্যাপকাকারে বিস্তৃত নহে।

বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ল্যান্সেট পত্রে ডাক্তার জে, সি এটকিনসন একবার লিখিয়াছেন যে, ওলাউঠা রোগীর হিমাঙ্গাবস্থায় অধিকক্ষণ কম্বল জড়াইয়া রাখিয়া তাহার পরে অন্ধকারে তাহার শরীর স্পর্শ করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি অঙ্গুলির অগ্রভাগের সহিত চট্ চট্ করিয়া বহির্গত হয়। আমরা এরূপ কখনও হইতে দেখি নাই। এবং আর কেহ দেখিয়াছেন, এমনও শুনি নাই।

ওজোন (Ozone) বা ঘ্রাণকের ন্যূনতা। যখন যে প্রদেশে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সেখানে ঘ্রাণকের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে, এবং বায়ুমণ্ডলে ঘ্রাণকের আধিক্য হইলেই প্রায়ই প্রতিশ্যায় ব্যাপক রূপে প্রকাশ পায়।

বিষ বায়ু (Malaria)। বন্যার পর যখন জল কমিতে আরম্ভ হয়, তখনই ম্যালেরিয়া বা বিষ বায়ুর উদ্ভব হয়, ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। যে গ্রামে বন্যার জল উঠে, সেখানে হয় জ্বর, নয় ওলাউঠা, হয় তো দুইটাই এক সঙ্গে কিংবা একটি আগে একটি পরে হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার জানা কথা। ডাক্তার ওয়াইজ পূর্ব্ব বঙ্গ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যৎকালে আমাতীসার ও জ্বর জঙ্গল প্রদেশে খুব প্রবল, তখন প্রত্যা-বর্ত্তনশীল মেঘনার চড় সীমান্তে—ওলাউঠা সর্ব্বনাশ করিতেছিল। তাদৃশস্থলে জ্বরকে যদি কোনস্থানের আমদানী না বলি তো ওলাউঠাকে তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। নিম্ন বঙ্গে ভাদ্র মাসে বন্যা সুরু হয়, এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে শুকাইতে থাকে। ওলাউঠার মৃত্যু সংখ্যা যে ঐ সময় বরাবর বেশী হয়, ইহাও তাহার একটি কারণের মধ্যে ধর্ত্তব্য।

বিষ বায়ু জনিত জ্বর প্রায়শঃ কম্পজ্বরা

কারে প্রকাশ পায়। অনেকে কম্পজ্বর ও ওলাউঠায় তুলনা করিয়া থাকেন। কখনও কখনও এক প্রকার জ্বর কোনও কোনও স্থানে হইতে দেখা যায়। তাহাতে সর্ব্বাগ্রে শীত হইয়া, পরে পীত বা হরিৎবর্ণ পিত্ত বমন ও রেচন হইতে থাকে এবং উদরে ব্যথা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই মুখশ্রী বিশীর্ণ হয়। চক্ষুদ্বয় বসিয়া যায় ও তাহাদের চারি পার্শ্বে গর্ত্ত হইয়া খুব বসিয়া যায়। অধঃপালাজ্বর নামক এক প্রকার জ্বরে সমস্ত শরীর নীলবর্ণ ও শীতল হইয়া যায়। জিহ্বা স্থূল ও সরস কিন্তু তুষার শীতল হয় এবং তৎসঙ্গে আভ্যন্তরিক দাহ ও দারুণ পিপাসা উপস্থিত হয়। নাড়ী সূক্ষ্ম সূত্রবৎ এক একবার মাত্র পাওয়া যায়, কিছুকাল পরে একেবারেই থাকে না। মূত্রস্রাব নিরুদ্ধ হয়, পায়ের ডিমে ও কোমড়ে যন্ত্রণাজনক খিল ধরিতে থাকে, এবং রোগী ক্রন্দন ও চীৎকার করিতে থাকে। রোগীকে হৃৎশূলে ধরে, তাহার দম আটকাইয়া আইসে। বক্ষঃস্থলের নিম্নাংশে কসিয়া ধরে, রোগী শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না। উৎকণ্ঠাকুল হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, তাহার উপর আবার সর্ব্বক্ষণ বমন ও ভেদ। শ্বাস ক্রিয়া উত্তরোত্তর কৃচ্ছ্র সাধ্য হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। হৃদ্দৌর্ব্বল্য ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে হইতে থাকে এবং হৃদয়ের আঘাত আর টের্‌ পাওয়া যায় না, শীতল ঘর্ম্মে রোগীকে ভাসাইয়া দেয় এবং সে দম আটকাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই তুফানের মধ্যেও তাহার জ্ঞান প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে। আর যদি রোগী না মরে, তবে হঠাৎ প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হয়। নাড়ী অল্পে অল্পে দেখা দিতে থাকে, চর্ম্ম সহজ বর্ণ ও নরম হইতে থাকে। হৃদয়ের মন্দ মন্দ গতি ক্রমশঃ নিয়মিত ও শ্রবণ গোচর হয়। শ্বাস সহজ ও ক্রমে দীর্ঘ হইতে থাকে। মুখের শবাকৃতিত্ব ঘুচিয়া যায়, বমি আর হয় না এবং ভেদ একেবারে থামিয়া যায়। যদি প্রতিক্রিয়া বেশী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে অনেক সময়ে বিরূপ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জ্বরের ওলাউঠার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে, কিন্তু প্রভেদও আছে। ইহাতে যে দ্রব্যের স্রাব হয়, তাহা পীত হরিৎ বা পিত্ত মিশ্রিত; ওলাউঠায় আস্রাব তণ্ডুলোদকবৎ। ওলাউঠায় মুখের চেহারা যত বিকৃত হইয়া যায়, এ জ্বরে তত হয় না। কলিকাতায় একবার এইরূপ ওলাউঠাধর্ম্মী জ্বর হইয়াছিল। হিজলী অঞ্চলে অনেক সময়ে ঠিক ওলাউঠার লক্ষণ লইয়া জ্বরের আবেশ হয়। এমন কি প্রভেদ করা কঠিন হয়।

আনূপ বা নিম্ন ভূমি। লণ্ডন নগরে একবার ওলাউঠার মড়ক হইয়াছিল। ডাক্তার ফার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে সহরের যে ভাগ যত বেশী উচ্চ, সেই ভাগে মৃত্যু সংখ্যা তত কম হইয়াছিল। সমুদ্র সীমা হইতে যে সকল স্থান অনুচ্চ, নদীতীরস্থিত স্থান সকল, এবং নদীমুখ সন্নিকট স্থান সমূহ ওলাউঠার প্রিয় বিহার স্থান। নিম্নভূমি অপেক্ষা পার্ব্বত্য স্থানে ওলাউঠা কম হইয়া থাকে। তথাপি দার্জ্জিলিং সিমলা মসূরি প্রভৃতি শৈলনগরীও ইহার উৎপাত বিলক্ষণ সহ্য করিয়া থাকে।

তীর্থাদি উপলক্ষে দূর যাত্রা।—ভূয়োদর্শন দ্বারা ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা অবগত হইয়া-

ছেন যে ভারতবর্ষে গোরা ও সিপাহী উভয় জাতীয় সৈনিকদিগের মধ্যে শিবিরে অবস্থান কালের অপেক্ষা অভিযান কালে মৃত্যু সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে। জগন্নাথ-যাত্রীদিগের মধ্যে বৎসরে বৎসরে অনেকেই ওলাউঠার কাল কবলিত হন। যেখানেই তীর্থদর্শনোপলক্ষে জন সমাগম বেশী হয়, সেখানেই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। মক্কা নগরেও হজ উপলক্ষে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে কলেরা প্রায়ই দেখা দেয়।

দুর্গন্ধ উদ্বাষ্প। ইহা ওলাউঠার উৎপত্তির অন্যতম কারণ। সত্য বটে ইহার অস্তিত্ব সত্বেও অনেক স্থান এই রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে; কিন্তু পাইখানা, গাড়ী, নর্দ্দমা, পচনশীল জান্তব ও উদ্ভিদ্ আবর্জ্জনা অথবা মানব দেহগত পদার্থ নিচয়ের একত্র অতি সমাবেশ যে স্থানে থাকে, সেই সেই স্থানে যে ওলাউঠা সমধিক মারাত্মক ও সমধিক ব্যাপ্তিশীল হয়, তাহা অনেকবার দেখা গিয়াছে।

অবিশুদ্ধ জল। ইহা যে ওলাউঠার একটি কারণ তাহা ভূরি ভূরি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে। অবিশুদ্ধ জলপানে যে ওলাউঠা রোগ হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সর্ব্ব দেশের চিকিৎসকগণ একমত। সুতরাং উহার সবিস্তার বর্ণনার আবশ্যকতা নাই।

বাবুমহলে হার্টফেল।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—:o:—

এক একখানি আস্ত, নিখুঁত, নিরেট, শক্ত, সারবান্ কঠিন ইষ্টক বা প্রস্তরের উপর আর একখানি স্থাপন করিয়া কালক্রমে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা বা সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ছাতাপড়া নোনাধরা, ঠুন্‌কো ইট, কাঠ, পাথর দিয়া কি মজবুদ প্রাসাদ প্রস্তুত হয়? কখনও না। সেইরূপ জাতীয় সৌধের উপাদান স্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন উন্নত না হইলে কি জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর? প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের চরমোন্নতি কালে প্রত্যেক ব্যক্তি অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন মহাপ্রাণ তেজস্বী ছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল গ্রীসের অন্তর্গত স্পার্টা নগরের প্রত্যেক অধিবাসী দৃঢ়কায় সংযতেন্দ্রিয় মহা পরাক্রমশালী অমিত তেজা বীরপদবাচ্য ছিল। এখনও ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি সুসভ্যদেশে যুবকবৃন্দের দৈহিক উৎকর্ষের প্রতি যথোচিত মনোনিবেশ করা হয়—আমাদের দেশের মত খোদার নৌকা দহে ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। আত্ম সংযম, কঠোরতা, ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না পড়িলে ভারতের জাতীয়

সৌধ কখনও মাথা তুলিতে পারিবে কি না ঘোর সন্দেহ স্থল।

ইতঃপূর্ব্বে মাংস, মেদ, মজ্জা সম্বন্ধে অনেক বাক্যব্যয় করিয়াছি। এখন এক বার বাবুদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া প্রাণে ঘা দিয়া দেখি, ফাটা হাঁড়ির মত বেসুরো কি না। এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই আমার পল্লীর কথা মনে হয়। যখন এতগুলো পল্লী চোখের সাম্‌নে তিল তিল করিয়া মরিতেছে, তখন বাঙ্গালীর হৃদয় আছে আর কোন মুখে বলিব? লোকে বলে, বাঙ্গালী মাছ খায় বলিয়া এত মেধাবী ও বুদ্ধিমান্। এখন বলিয়া দিবেন কি, বাঙ্গালী কি খাইলে ও কিরূপ শিক্ষা পাইলে হৃদয়বান্ হয়? আমরা যে দিন দিন স্বার্থপর, শুষ্ক প্রাণ ও হৃদয়হীন হইয়া যাইতেছি, ইহার উপায় কি কেহই নির্দ্দেশ করিবেন না? কিরূপ খাদ্য খাইলে আমাদের মজ্জার জোর বাঁধে, এবং হৃদয়ে বল ও সাহস হয় তাহা বলিতে আর বেশী বিলম্ব করিলে চলিবেনা। এমন ধর্ম্মনীতি এখন শিখিতে হইবে—যাহাতে প্রাণে উদারতা ও পরার্থপরতার বিমল উৎস খুলিয়া যায়। পাস করিয়া হাতে ঘড়ি ও নাকে চসমা দিলেই কি দেশের উন্নতি হয়? প্রতি বৎসরই ত কতশত পল্লীবাসী যুবক লেখাপড়া শিখিয়া চাকরী পাইতেছেন, কিন্তু পল্লীর তাঁহারা কোন উপকারই করিলেন না। পল্লীর জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিল না। তাই বলি, শিক্ষাতে অনেকেই পাইলেন, কিন্তু দেহ সুগঠিত ও তৈয়ারী হইল কয় জনের? এমন শিক্ষা এখন চাই যাহাতে বাঙ্গালীর দেহ ও প্রাণ মজবুদ হয়—শরীরে শক্তি সামর্থ্য হয় এবং হৃদয়ে প্রেম-ভক্তি-দয়া ও উপচিকীর্ষা জাগিয়া উঠে। বিদ্বান্ ও অর্থবান্ দেশে অনেকেই হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণ ও উচ্চ হৃদয় কয়জন পাইলেন? পরম কারুণিক পরমেশ্বরের পবিত্র মঙ্গলময় নাম দয়ার সাগর ঈশ্বর চন্দ্রেই সার্থক হইয়াছিল।

প্রাতঃস্মরণীয় দেবতুল্য বিদ্যাসাগর, ভূদেব, গুরুদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের উদারচিত্ত ও মনুষ্যত্ব কয়জন পাইলেন? পরের জন্য তাঁহাদের ন্যায় কয়জনের প্রাণ কাঁদিয়াছে? পরের দুঃখে তাঁহাদের মত কাতর হইয়া আর কে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে? দেশ উদ্ধার, জাতীয় উন্নতি—বলিলেই কি হয়? বড় হইবার উপযুক্ত না হইলে কি বড় হওয়া যায়? মাংস, মেদ ও আয়তনে বৃহৎ হইলেই কি বড় হওয়া চলে? Bigness জিনিষটা Greatness নয়। বৃহদায়তন মহত্ব নয়; প্রকাণ্ড শূন্যেরও কোন মূল্য নাই। ত্যাগই উন্নতি ও মহত্বের মূল; বড় হইবার আদি কারণ—বড় মন। যে জাতি কুন্তলগত প্রাণ—অবোধ নারীর ন্যায় কেবল বেশ ভূষার পারিপাট্যে সর্ব্বদা শশব্যস্ত; যে জাতির আরামপ্রিয়তা ও ব্যসন বিলাসিতা মজ্জাগত হইয়াছে, যে জাতির পানে একটু চূর্ণ কম হইলে পৃথিবী রসাতলে যায়, সে জাতি ক্রমশঃ হাল্‌কা হইয়া অবনতি ও ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। দশের ও দেশের উন্নতি চাও, আহার-বিহার বসনভূষণ-বচন প্রভৃতি বিষয়ে কঠোর সংযম অভ্যাস কর; বিলাসিতা, আরাম স্পৃহা, হালকা আমোদ—রঙ্গরস একবারে বর্জ্জন কর; স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন কর; পরকে প্রেম ডোরে বাঁধিয়া আপন কর; পরের দুঃখে

ব্যাকুল ও কাতর হইতে শিখ এবং পরের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দাও। ইহাই শিক্ষা, ইহাই দীক্ষা, ইহাই উন্নতির বীজ মন্ত্র। পিতামাতার কাছে ও দুঃখদৈন্যের পাঠশালে পড়িয়া বিদ্যাসাগর এই উচ্চ শিক্ষা পাইয়াই আদর্শ জীবন গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অহো! কে আর তেমন করিয়া পরের জন্য কাঁদিবে; আত্মপর ভুলিয়া, সর্ব্বজীবে সমদর্শী হইয়া কে আর পরার্থে সর্ব্বস্বত্যাগ করিবে? ওগো বঙ্গজননি। কি দোষে আর তেমন রত্নসম সুসন্তান প্রসব করিতেছনা? তারার আলোকে কি মা রজনীর অন্ধকার দুরীভুত হয়? সমুজ্জল চন্দ্র কিরণ আবার কবে দেখিব?

শিক্ষিত সুসভ্য মানব যদি হৃদয়হীন হয়, তবে কাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মন সাধারণ শিক্ষা লাভ করিবে? শিক্ষিত লোক যদি একে একে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান, তবে আর পল্লী সংস্কার কে করিবে? চাষা পায়ের জোরে লাঙ্গল ঠেলিয়া ফসল উৎপাদন করে; কাঠ গোঁয়ার সৈনিক বন্দুক ধরিয়া লড়াই করিতে পারে, কিন্তু কাপ্তেন না থাকিলে কি যুদ্ধ জয় হয়? মাথায় 'চাল' বলিয়া না দিলে কি শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করিতে পারে? শিক্ষিত বাবু সহরে রোজগার করিয়া কি নিজ নিজ পল্লীতে আসিয়া গ্রামের উন্নতি বিধান করিতে পারেন না? তাঁহাদের যুক্তি আপত্তি—পল্লীতে গেলে মরিয়া যাইব। কেন, সহরে কি মানুষ মরে না? সহরে কি এক মাত্র পাশ করা ছেলে, পিতা মাতাও নবোঢ়া পত্নীর বুকে শেল্ বিদ্ধ করিয়া সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া যায় না? সহরে কি চোখের সামনে স্বর্ণলতিকা নয়নতারা বিধবা হয় না? কৃত্রিমতাপ্লাবিত ধূমধূলিপূর্ণ কোলাহল আকুলিত সহরের ঠেসাঠেসিতে ফৌজদারী ব্যারাম তো লাগিয়াই আছে, তবে দেওয়ানী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কম। বঙ্গের বাহিরে গিয়া ত হাওয়া খাইতেই হয়। শিমুল তলা, রাচি, ও গিরিডির হাওয়া কি এত মিষ্ট? কেন বঙ্গপল্লীতে কি হাওয়া নাই? জল আছে, হাওয়া আছে, বাঙ্গালীর মোটামুটি খাওয়া পরার সবই আছে। ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লীই ভূস্বর্গ ছিল। কি প্রাচুর্য্য, কি স্বাস্থ্য কি নৈতিক বল, কি পবিত্রতা, কি সরলতা, কি আনন্দ, কি নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি যে কি সুখশান্তি ছিল—তাহা এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তখনও বনজঙ্গল, পুকুর ডোবা, গর্ত্ত-খাল—বিল সবই ছিল, তবে ছিল না কেবল এই সর্ব্বনাশিনী ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী। তাই পল্লীগুলি বনাবৃত হইলেও তপোবন তুল্য শান্তি নিকেতন ছিল। তখন কিছু পয়সা হইলেই লোকে নিজের ভদ্রাসন ফেলিয়া বৎসরে দু' এক সপ্তাহ হাওয়া খাইবার জন্য পশ্চিমে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী করিতে অস্থির হইত না। সকলেই সহরে থাকিলেও আপন আপন পল্লীগ্রামের প্রতি কৃপা দৃষ্টি রাখিতেন—অন্ততঃ বৎসরে ৺পূজার ছুটীতেও একবার বাড়ী আসিয়া বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীর সহিত আমোদ আহ্লাদ করিতেন। কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, পল্লীর প্রতি বাবুদের আর তেমন টান নাই। শিক্ষিত লোক মাত্রেই

গ্রাম ছাড়িয়া নগরে গিয়া বসবাস করিতেছেন। এমন করিলে কি দেশের উন্নতি হয়? ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর উৎপাতেই তো বঙ্গপল্লী ম্রিয়মাণ। এই তাড়কাকে বধ করিবার জন্য কি কোন বিশ্বামিত্রই রামলক্ষ্মণ লইয়া আসিবেন না? বিশ্বামিত্রের মহাপ্রাণ, উচ্চহৃদয় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কি কাহারও নাই? এমন কি কেহই নাই, যিনি রাম লক্ষ্মণের ক্ষাত্রতেজোবলে এই বঙ্গ ধ্বংসকারিণী ম্যালেরিয়া সংহার করিতে পারেন? রণে ভঙ্গ দিয়া বঙ্গের বাহিরে পলায়ন করা কি বীরের ধর্ম্ম? পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণের অদম্য অধ্যবসায় ও একতা-বলে কত আধিব্যাধি-প্রপীড়িত প্রাচীন পল্লী-নগর আবার পরম রমণীয় বলবীর্য্যপ্রদ স্বাস্থ্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছে। আর আমাদের বঙ্গবীরগণ জ্বরের জ্বালায় নিজ নিজ পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া জন্মভূমি বঙ্গমাতাকে চরণে দলিয়া পশ্চিমদিকে ধাবমান। কি অদ্ভুত শোচনীয় পার্থক্য!! এই আত্মম্ভরি স্বার্থসেবী ভীরু কাপুরুষ পলাতকের ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া দেশ উদ্ধার করা চলে? আমাদের আত্মোদ্ধার যদি না হইল—আমরা যদি ক্রমশঃই বর্ত্তমান সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যময়ী মনোহারিণী ভোগবিলাস-বন্যায় গা ঢালিয়া দিই; আমরা যদি সামান্য একটা পল্লী উদ্ধার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের উচ্চাভিলাষের ভিত্তি কোথায়? এ সংশয় কি একেবারেই অমূলক? বঙ্গপল্লীজাত সহরপ্রিয় বাবুরা একবার স্বার্থ ভুলিয়া, একতা-বদ্ধ হইয়া নিজ নিজ পল্লীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বন জঙ্গল পরিষ্কার ও পচা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া দেখুন, স্বীয় পল্লীর হাওয়া পশ্চিমের হাওয়া অপেক্ষা মধুর কিনা। কত সহৃদয় দানবীর দেশে শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন, একবার বঙ্গপল্লীর বন-জঙ্গল পরিষ্কার ও জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার কল্পে অর্থদানে মনোনিবেশ করিয়া দেখুন, পল্লী আবার সজীব হইয়া উঠে কিনা। এখনও সময় আছে, পল্লী—ম্যালেরিয়ার সহিত লড়িয়া এখনও গতায়ু হয় নাই। কিন্তু প্রাণবায়ু থাকিতে থাকিতে চিকিৎসার দরকার, নতুবা সকল চেষ্টা বিফল হইবে।

দেশের যাঁহারা মাথা—সেই গণ্যমান্য ভদ্রলোকদিগের হৃদয়ই যদি এমন দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অন্যে পরে কা কথা। বাবু-মহলে আজ কাল যখন তখন হার্টফেল। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, হার্ট-ফেল হইয়া অমুক বাবুর মৃত্যু হইল। পাঁচ বছরের ছেলেটী পর্য্যন্ত বলে—আজ অমুকের হার্টফেল হ'ল। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে, মাংস-মেদ-মজ্জার উন্নতি হইলেও আমাদের হৃদয়গুলো ক্রমশঃ ক্ষীণ-দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ইহার আশু প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়, নতুবা এই সব স্থূলকায় বুদ্ধিজীবী স্মৃতিবীর বঙ্গবাসী দিন দিন অন্তঃ-সারশূন্য হৃদয়হীন আমড়া কাঠের ঢেঁকি হইয়া যাইবে। তবে এ হৃদ্‌রোগের চিকিৎসা বড় কঠিন—ভারতে হইতে পারে কি না—এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে ডাক্তার-কবিরাজ মহাশয়দিগের একটা বিশেষ স্বাস্থ্যবৈঠক হওয়া আবশ্যক। আমার কিন্তু বিশ্বাস, খুব দামী ঘড়ি যেমন যা'কে তা'কে সারাইতে দেওয়া চলেনা,

সেইরূপ বিলাতপ্রিয় আমাদের বহুমূল্য পৈতৃক হৃদয়গুলো একবার খাস বিলাতে বড় কোম্পানীর হেড আফিস হইতে মেরামত হইয়া আসিলে আবার দুই একশত বৎসর বেশ চলিতে পারে। Power House বা বিদ্যুৎ আগারে তাড়িত উৎপাদিত হইয়া যেমন সহরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয়, সেইরূপ হৃদয়কেন্দ্রে বলশক্তি উদ্ভূত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাই পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আহার-বিহারের প্রতি সত্বর লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রচুর বিশুদ্ধ খাদ্য না খাইলে হৃদয়ে কখনই জোর বাঁধিবে না। এইরূপ স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিতে থাকিলে পাউয়ার হাউসের কল বিগড়াইয়া কথায় কথায় বাবুদের হার্টফেল হইবে। ফলকথা, আমাদের হৃৎপিণ্ড, ফুঁসফুস্, যকৃৎ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি জীবনীশক্তির উৎসস্বরূপ অত্যাবশ্যক সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির ঝাড়া মেরামত ও অয়েল করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, জাতির এই জীর্ণ সংস্কার বিষয়ে দেশের নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই মনোযোগ দিবেন।

পলাশ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)।

পলাশ—হিং ঢাক্ টেসু কেসু। পলাশ বৃক্ষ বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। গোয়ালিয়র অঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত পলাশ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, শাল পত্র দ্বারা যেরূপ ভোজন পাত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, গোয়ালিয়র অঞ্চলে তদ্রূপ পলাশ পত্র দ্বারা ভোজন পাত্র ব্যবহৃত হয়।

পলাশের শিম্বী চেপ্টা, ইহার ফুল সুদৃশ্য। পৌষের শেষ হইতে পুষ্প দৃষ্ট হয়। পলাশ পুষ্পে বস্ত্রাদি রঞ্জিত করা হয়। মাঘ মাসে পলাশের প্রায় পত্রশূন্য হইয়া থাকে, ঐ সময় পুষ্প শোভিত বৃক্ষগুলি দেখিতে অতি মনোরম।

কৃমি রোগে—পলাশ বীজ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

রক্ত পিত্তে পলাশ—পলাশ বল্কলের কাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া ঐ ঘৃত সেবনে রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধ ও অধো উভয়বিধ রোগে বিশেষ হিতকর।

অতিসারে পলাশ—বিরেচনযোগ্য অতিসারে পলাশ বীজের কাথ দুগ্ধসহ পান করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। ইহা আমাতিসারেই প্রযোজ্য।

অর্শে পলাশ পত্র—কচি পলাশ পত্র কয়েকটী গ্রহণ করিবে, অতঃপর সমপরিমাণ তিল তৈল ও গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঐ সংগৃহীত পলাশ পত্র ভাজিয়া গো-দুগ্ধজাত

দধির সরের সহিত ভর্জ্জিত পত্র পেষণ করিয়া সেবন করিবে।

রক্তরোধক পলাশ—পলাশ ত্বকের কাথ শীতল করিয়া উহার সহিত কিঞ্চিৎ ইক্ষু চিনি অথবা মধু সহযোগে প্রত্যহ একবার সেবন করিলে রক্ত বমন ও অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি হয়। ক্কাথের নিয়ম—পলাশ ত্বক ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

রক্ত গুল্মে পলাশ—পলাশের ক্ষারোদক দ্বারা পক্ক ঘৃত—গুল্ম রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

অক্ষিরোগে পলাশ—চক্ষুতে ছানি পড়িবার প্রথম সূত্রপাতে ডহরকরঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া উহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে, ঐ বর্ত্তি (ঈষৎ লম্বাকৃতি বটিকা) মধু অথবা ছাগী দুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করিয়া নয়নে প্রলেপ দিবে। কবুতরের পালকের দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রলেপ লাগাইবে, ইহাতে চক্ষুর ছানি বিনষ্ট হইবে।

ব্রণে পলাশ—পলাশ পত্র পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করিবে উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া বসিয়া যায়।

পলাশ পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা রক্তপ্রদরগ্রস্থা নারীর যোনিতে পিচকারী প্রদান করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

মুখ-ক্ষতে এবং কণ্ঠনালীর ক্ষতে ঐ কাথ দ্বারা কবল করিলে ঐ ক্ষতসমূহ আরোগ্য হয়।

ফিতা কৃমি নষ্ট করিতে পলাশ বীজ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে।

মূত্র কৃচ্ছ্রে পলাশ—পলাশ বীজের কাথ ও পলাশ ফুলের ফাণ্ট (পলাশ পুষ্প গরম জলে উত্তমরূপে চটকাইয়া লইলে ফাণ্ট হয়) সেবন করিলে মূত্র কৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে প্রস্রাব সরল হইয়া নির্গত হয়।

পলাশ পুষ্প মূত্রকারক, বস্তিদেশে (নাভির নিম্ন স্থানে) পলাশ পুষ্পের দল পুরু করিয়া বিছাইয়া কদলী পত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিলে মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকার দর্শে। পলাশ পুষ্প পেষণ করিয়া বস্তিতে প্রলেপ দিলেও মূত্র সরলভাবে নির্গত হয়।

পলাশ পত্রের কাথ অথবা স্বরস শোষ রোগীর ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে পান করিলে উপশম হয়। রক্তপ্রদর, কৃমি ও শূল রোগীর পক্ষেও ইহা বিশেষ হিতকর।

অতিসারে পলাশ ত্বকের কাথ প্রয়োগ করিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরলোক।—বর্ত্তমান মাসে কলিকাতার তিন জন কবিরাজের পরলোক ঘটিয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জন নেবুতলার সুপ্রসিদ্ধ মহানন্দ গুপ্ত, এক জন হরিনাথ বিশারদ ও অপরের নাম মনোরঞ্জন গুপ্ত। মহানন্দ গুপ্ত মহাশয় ইদানীন্তন কালে বয়োপ্রবীণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হরিনাথ বিশারদ মহাশয় চরকের টীকা রচনায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছিলেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয় সবে মাত্র উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিলেন। আমরা ইঁহাদিগের বিয়োগে ইঁহাদিগের পরিজনবর্গের সহিত সমবেদনা অনুভব করিতেছি।

বিহারে আয়ুর্ব্বেদ।—বিহারের ভাগলপুর জেলার সাগুন্দা নামক গ্রামে তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড একটী দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আমরা ভাগলপুর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাঙ্গালার সকল ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণই এরূপ সাধু অনুষ্ঠানে অগ্রসর হউন না।

ডাক্তারের উদ্ভাবনা।—"অমৃতবাজার পত্রিকায়" এক জন ডাক্তার প্রকাশ করিয়াছেন যে, নোনা আতার (Custard apple) পাতার রসে ও পুলটিশে কার্ব্বঙ্কল আরোগ্য হইয়া থাকে। তিনি অনেক রোগীর মধ্যে ইহার ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। নোনাআতা ও সাধারণ আতার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটিয়া থাকে। ইহাদিগের রসে ক্ষত আরোগ্য হয়, এ সকল কথা দেশীয় চিকিৎসকেরা বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদের মুখে আমাদের দেশের লোক যে পর্য্যন্ত সে কথা না শুনিতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে আস্থা স্থাপন করা চলে কি? দেশীয় চিকিৎসা এই জন্যই ত মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

ঔষধের অপব্যবহার।—রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারোক্ত শ্রীমদনানন্দ মোদক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এঔষধটির অপব্যবহার কিন্তু এক্ষণে যথেষ্ট ভাবেই দেখিতে পাইতেছি। ঐ মোদকের উপাদানগুলির মধ্যে সিদ্ধি অন্যতম উপাদান। এই জন্য নেশার উদ্দেশ্যে এই মোদক অনেকেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ঔষধে ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে, অকারণে তাহার অযথা ব্যবহারে সেই ঔষধে সেই ব্যাধির উৎপত্তিও হইতে পারে। সামান্য সর্দ্দি কাসিতে যদি যক্ষ্মা অধিকারের ঔষধ সেবন করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র সর্দ্দি কাসির উপশম হইয়া থাকে কিন্তু ভবিষ্যতে তাহারই ফলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে

হয়। সিদ্ধি ঘটিত মোদকও সুস্থ শরীরে সেবনের ফল তদ্রূপ। কলিকাতায় পানের দোকানে, মণিহারি দোকানে এই সিদ্ধি ঘটিত মদনানন্দ মোদকের কিন্তু অবাধ বিক্রয় চলিতেছে। গ্রে ষ্ট্রিট, বিডন ষ্ট্রীট প্রভৃতি স্থানের মোড়ে মোড়েও কোন কোনও কবিরাজ নামধারীর ফেরিওয়ালাগণও "চাই মদনানন্দ মোদক" বলিয়া উহার বিক্রয় অপ্রতিহত গতিতে চালাইতেছে। এরূপ প্রচারাধিক্যে দেশবাসীর স্বাস্থ্যের যে কত দূর অনিষ্ট করা হইতেছে—তাহা প্রত্যেক চিকিৎসকই স্বীকার করিবেন। সিদ্ধিঘটিত মোদক বিক্রয়ের জন্য আবকারি বিভাগ হইতে যে লাইসেন্স লইতে হয়, তাহাতে কেবল রোগীদিগকে উহা বিক্রয় করিবারই অনুমতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। এরূপভাবে রাস্তায় রাস্তায় ফেরিওয়ালার সাহায্যে এবং পানের দোকানে, মণিহারি দোকানে ইহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা আবগারি-আইনের কখনই উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু আমরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি যে, কলিকাতার মত সহরেও আবগারি বিভাগ এ বিষয়ে লক্ষ্যহীন। সাধারণের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি।

সমালোচনা।

বৈদিক ভারত।—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট প্রণীত। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র বি-এ সম্পাদিত। এই পুস্তকের সকল গল্পই বেদ অবলম্বনে লিখিত। সুকুমার মতি শিশু-হৃদয়ে এই পুস্তকের গল্প গুলি অঙ্কিত হইলে দেশে ধর্ম্মের স্রোত যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা ইংলণ্ডের কুলজী মুখস্থ করিতে পারি, কিন্তু আপনার দেশের আত্ম পরিচয় জানিনা ইহা কম দুঃখের কথা নহে। রায় বাহাদুরের এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্যও বোধ হয় তাহাই। গল্পগুলি অতি সহজ ভাষায় লিখিত, এজন্য বড়ই সরস হইয়াছে। এই বৈদিক ভারত প্রত্যেক ছাত্রের হস্তে প্রদান করিয়া তাহাদিগের কোমল প্রাণে ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুর করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্য—আমরা রায় বাহাদুরের এই পুস্তকখানি পাইয়া অতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। এখনকার যুগে দীনেশ বাবুকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাট বলা যাইতে পারে। তিনি এই ধরণের গ্রন্থ প্রণয়নে শিশু সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করুন—ইহাই আমাদিগের কামনা।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
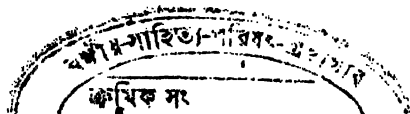
আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ } মাঘ, ১৩২৯ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ।

[শ্রী—পাইকর, বীরভূম]

ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে এবার কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের মনে হয় ম্যালেরিয়া রোগ উপস্থিত হইলে আমাদের শরীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহার প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার স্বরূপ প্রদর্শিত হইবে। আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের দেহস্থ স্বাভাবিক তাপ—দেহ প্রবিষ্ট পদার্থ সমূহকে পরিপাক করে এবং এই পাচিত পদার্থের সারাংশ দেহের উপযোগী বলিয়া দেহ পুষ্টির জন্য তাহা পরিগৃহীত ও অপরাংশ অনুপযোগী বলিয়া মলরূপে পরিত্যক্ত হইতেছে। এইরূপ পাকক্রিয়া যতদিন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় ততদিন আমরা শরীরের মধ্যে কোনরূপ গ্লানি বুঝিতে পারি না, কিন্তু এই পাকক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই শারীরযন্ত্রগুলি যেন নিজ নিজ ক্রিয়া সাধনে এক প্রকার বাধা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে আমাদের শরীর "ম্যাজ ম্যাজ" করিতে থাকে।

আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আলোচ্য পাকক্রিয়ার সময় দেহস্থ অগ্নি ও দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ এতদুভয়ের মধ্যে একরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সংগ্রামে অগ্নির জয় হইলে দেহমধ্যে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির আধিক্য ও প্রকৃতি বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে অগ্নি পরাজিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে এই সকল পদার্থের পরিপাক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হয় না কাজেই তখন দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর সারাংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া শরীর পোষণে নিয়োজিত হইতে পারে না। উপরন্তু উহা অসারাংশের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের উপাদানের মধ্যে একরূপ বিভ্রাট উপস্থিত করে। বলা বাহুল্য,

এই বিভ্রাটই বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যাবস্থা ঘটাইবার প্রধান কারণ। যতদিন দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর যথারীতি পরিপাক ক্রিয়া সমাপিত হইতে থাকে, ততদিন দৈহিক উপাদানের শাসক বায়ু, পিত্ত ও কফ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া সাম্যাবস্থায় থাকিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেই দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির অসারাংশ—সারাংশের সহিত মিলিত হইয়া বায়ু, পিত্ত ও কফের ক্রিয়াশক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাহার ফলে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটীর মধ্যে কোন একটী, অথবা দুইটী কিম্বা তিনটীই কুপিত হইয়া পড়ে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেহস্থ তাপ স্বভাব বশেই দেহের মধ্যস্থ যাবতীয় পদার্থকে শাসন করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ অবস্থায় আনয়ন করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেও এই অগ্নি যে তাহাদিগকে শাসন করিয়া তাহাদিগের নিজ নিজ অবস্থায় আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? পাঠক আরও অবগত আছেন যে, এই পাকাগ্নির শক্তি অসাধারণ। স্বভাবতঃ ইহার তাপের মাত্রা ৯৮॥০ রেখা হইলেও নরদেহে ইহা কারণ বিশেষে ১১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ যখন সামান্য মাত্রায় কুপিত হয়, তখন আমাদের দেহের তাপ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়াও তাহাদিগের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। আমাদের শরীর যখন সামান্য রূপ ভার বোধ হয়, তখন উক্ত ত্রিদোষের প্রকোপ সামান্যরূপ হইয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হয় এবং তখন একটু সাবধান হইলেই অর্থাৎ ২।১ বেলা উপবাস বা লঘু আহার করিলেই আমাদের দেহস্থ অগ্নি তাহার শোধন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কেহ সতর্ক না হইয়া পূর্ণ আহার বা অনুরূপ অত্যাচার করিয়া বসে, তাহা হইলে তাহার ফলে বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং পাচকাগ্নি সেই দোষের ফলে ক্ষীণবল হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অগ্নি—দোষের প্রাদুর্ভাবে ক্ষীণবল হইলেও একেবারে পরাভূত হয় না। পরন্তু এই অগ্নি যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দোষের মাত্রানুসারে প্রবলতর হইয়া দোষকে দগ্ধ করতঃ তাহার শোধন করিতে ক্ষান্ত থাকে না।

যখন এইরূপ তাপ বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ যখন আমাদের জ্বর হয়—তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদের দেহস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে কোন একটী, অথবা ২টী অথবা তিনটীর দোষ উপস্থিত হইয়াছে এবং দেহাগ্নি কুপিত দোষকে পরিপাক করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। কোন্ দোষের প্রকোপ হইয়া যে জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নাড়ী পরীক্ষা করিলেই অনায়াসে বুঝা যায়। ডাক্তার বাবুরা এইরূপ নাড়ী পরীক্ষার গুরুত্ব স্বীকার না করিলেও আমাদের ত্রিকালজ্ঞ আর্য্যঋষিগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এইরূপ নাড়ী পরীক্ষা বিষয়ে বহু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের প্রকৃত কবিরাজগণ এই মতেরই সমর্থক।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, ত্রিদোষের সহিত দেহস্থ অগ্নির যে

মল্লযুদ্ধ বাধে অগ্নি বিশেষে তাহারই নাম জ্বর। এই যুদ্ধে অগ্নি যখন স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ ৯৮৷৷০ রেখায় থাকিয়া দোষকে সংশোধন করিয়া লইতেছে তখন আর তাহা জ্বর বলিয়া কথিত হয় না, কিন্তু দোষের গুরুত্ব নিবন্ধন অগ্নির যেমন ৯৯, ১০০, ১০১ ডিগ্রি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী তত ডিগ্রির (রেখার) জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি।

যাহা হউক এখন কথা এই যে, বায়ু, পিত্ত ও কফের দোষ ও দেহস্থ অগ্নি এতদুভয়ের মধ্যে যে মল্ল যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহারই নাম যে জ্বর তাহা বেশ বুঝা গেল। এই মল্লযুদ্ধ কিছুদিন পরে থামিয়া গেলেই তাহা তরুণজ্বর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনেক-সময় দেখা যায় যে, এই মল্লযুদ্ধ যেন লাগিয়াই আছে। দেহের অগ্নি সকল সময় স্বাভাবিক রেখা অতিক্রম করে না বটে কিন্তু তখনও দোষের সহিত তাহার সংঘর্ষ বন্ধ হয় না। এই অবস্থা থাকিতে থাকিতে এক সময় হঠাৎ অগ্নির রেখা বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। ফলতঃ কোনক্রমেই উভয়ের মল্লযুদ্ধ বন্ধ হয় না। দোষের সহিত অগ্নির যে এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী মল্লযুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহাকেই বিষম জ্বর নামে অভিহিত করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, ইহারই ইংরাজি নাম ম্যালেরিয়া।

এই ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্বর নানাবিধ। শারীরাগ্নির সহিত যে ত্রিদোষের এইরূপ মল্লযুদ্ধ হয়, সেই দোষের প্রকৃতি অনুসারে বিষমজ্বর নানাপ্রকার। তবে সাধারণতঃ এই মল্লযুদ্ধ ত্রিবিধ। একপ্রকার মল্লযুদ্ধের সময় শারীরাগ্নির তাপ স্বাভাবিক রেখায় (Normal Temperature) থাকিয়া দোষত্রয়কে পরিপাক করিতে থাকে। এমত অবস্থায় শরীর ভার থাকিয়া রোগের অনুভূতি হয় মাত্র। কিন্তু গাত্রের তাপ বৃদ্ধি হয় না। কাজেই জ্বর হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় না। এই সময় সতর্ক হইয়া দোষের স্খালন করিবার চেষ্টা করিলে দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং শারীরাগ্নি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া ক্রমে দুর্ব্বল দোষ গুলিকে পরিপাক করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় অবস্থায় দোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তখন শারী-রাগ্নি আর স্বাভাবিক অবস্থায় তৎসমুদয়কে পরিপাক করিতে পারেনা। তখন দেখা যায়, শারীরাগ্নি নিজের তাপের রেখা বৃদ্ধি করে এবং হুতাশন মূর্ত্তিতে দোষগুলিকে দগ্ধ করিবার জন্য মল্লযোদ্ধার ন্যায় তাহাদের উপর আধি-পত্য বিস্তার করে। এই সময় গাত্রতাপ ১০৭৷১০৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এই-রূপে দোষগুলি কথঞ্চিৎ দগ্ধ হইলেই শারীরাগ্নি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া দোষগুলিকে পরিপাক করিতে থাকে। তৃতীয় অবস্থায় শারীরাগ্নি স্বাভাবিক অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চতর রেখায় অহরহঃ দোষ-গুলিকে দগ্ধ করে এবং যতদিন না দোষ সমূলে বিনষ্ট হয়, ততদিন পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণ করেনা। বলা বাহুল্য এই তিন অবস্থাতেই রোগী রোগের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারে। তবে ইহা ঠিক যে, রোগী ১ম অবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয়াবস্থায়, এবং দ্বিতীয়বস্থা অপেক্ষা তৃতীয়াবস্থায় রোগ-জনিত যন্ত্রণার অধিকতর অনুভূতি করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, যাহা তাহাতে বুঝা

যায় যে, শারীরাগ্নি ও দেহপ্রবিষ্ট পদার্থ রাশির মধ্যে সততই একরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে শারীরাগ্নি যতদিন বিজয়ী থাকে অর্থাৎ যতদিন দেহপ্রবিষ্ট পদার্থগুলিকে নির্ব্বিঘ্নে পরিপাক করিয়া তাহা হইতে দেহের উপযোগী সারাংশ বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে, ততদিন দেহের মধ্যে আমরা কোনরূপ গ্লানি অনুভব করিনা। কিন্তু যখন শরীর প্রবিষ্ট পদার্থের মাত্রাধিক্য ঘটে অথবা ঈদৃশ পদার্থ বিকৃত হইয়া শরীরে স্থান প্রাপ্ত হয়, তখন দেহাগ্নি আর স্বচ্ছন্দে নিজ ক্রিয়া সাধন করিতে সক্ষম হয় না। বলা বাহুল্য, তখনই আমরা শারীরিক গ্লানি উপলব্ধি করিয়া থাকি।

এক্ষণে এই দেহাগ্নি কিরূপ পদার্থ এবং কিরূপেই তাহার শক্তি ক্রিয়াশালা অথবা ক্ষীণক্রিয়া হয় এইবার তাহাই আলোচ্য। অধ্যাত্ম শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, আমাদের প্রাণই অগ্নিস্বরূপ। এই অগ্নি—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—এই পঞ্চ শাখায় বিভক্ত হইয়া একই শক্তির পঞ্চ ধারার ন্যায় সর্ব্বশরীর ব্যাপক হয় এবং তাহার ফলে শরীরগত বস্তুর পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং প্রত্যেক অণুপরমাণু যথাবশ্যক ভাবে উষ্ণ থাকিয়া অবিকৃত থাকে। অতএব ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে এই প্রাণাগ্নি ও দেহ প্রবিষ্ট পদার্থ নিচয় এতদুভয়েরই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রাণ যে অগ্নিস্বরূপ তাহা ব্রাহ্মণমাত্রেই অবগত আছেন। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে প্রাণকে পুনঃপুনঃ অগ্নিনামে অভিহিত করা হইয়াছে। সৎগুরু মাত্রেই উপদেশ দিয়া থাকেন যে, এই অগ্নির শক্তি ও ক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সন্ধ্যা, উপাসনা, ধ্যান ধারণা, প্রাণায়াম, ইত্যাদির অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক; কারণ ইহা অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্মত ধ্রুব সত্য। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন লোক প্রবল প্রাণসংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সান্ধ্যাহ্নিক না করিয়াও সুস্থ থাকিতে পারেন কিন্তু যাঁহাদের প্রাণসংস্কার দুর্ব্বল, তাঁহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিলে রুগ্নই থাকিয়া যান। কারণ তাঁহাদের প্রাণাগ্নি দুর্ব্বল বলিয়া দেহ প্রবিষ্ট পদার্থের পরিপাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অনেকেই এই গূঢ়তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন। ফলে দেখা যায়, যাঁহাদের প্রাণসংস্কার দুর্ব্বল, তাঁহারা প্রবল প্রাণসংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে গিয়া নানারূপ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করেন। রামবাবু সন্ধ্যা বন্দনাদি করেন না, কদাচার করিতেও ক্ষান্ত নহেন, পানাহারেও মিতাচারী থাকেন না, অথচ তাঁহার শরীর সবল ও সুস্থ। কিন্তু শ্যামবাবু এইরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিতে না করিতেই পীড়িত হন। এরূপ ক্ষেত্রে অজ্ঞান ব্যক্তিগণ কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। কারণ, তাঁহারা অজ্ঞানান্ধ বলিয়া ইহা ধারণা করিতে পারেন না যে, রামবাবু ও শ্যামবাবুর প্রাণসংস্কারের বিশেষ তারতম্যই উল্লিখিতরূপ বৈচিত্র্যের অবিসম্বাদী কারণ।

যাহা হউক, এ সব অধ্যাত্ম বিদ্যার কথা এস্থলে আলোচনা করা অনাবশ্যক

বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি। তবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই অধ্যাত্ম তত্ত্বের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্থূল জগতের যে বিচার করিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই ২।১ কথা বলা আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদের মতে এই দেহাগ্নির নাম পাচকাগ্নি, রঞ্জকাগ্নি, সাধকাগ্নি, আলোচকাগ্নি ও ভ্রাজকাগ্নি। এই দেহাগ্নিকে সবল ও ক্রিয়াশীল রাখিতে হইলে এই পঞ্চাগ্নির ক্রিয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ তাহা হইলেই দেহাগ্নি দেহের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া দেহপ্রবিষ্ট বস্তুর পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবে। এবং তৎসমুদয় তখন যথাবশ্যকভাবে উষ্ণ রাখিবে এস্থলে প্রকাশ থাকা আবশ্যক যে, অন্নব্যঞ্জনাদি খাদ্য বস্তুর উষ্ণতার হ্রাস ও শৈত্যের বৃদ্ধি অনুসারে তৎসমুদয় যেমন বিকৃত হইয়া উঠে, তদ্রূপ প্রাণাগ্নির তাপে বঞ্চিত হইলে আমাদের দেহও বিকৃত ও বিবিধ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অতঃপর আমাদের দেহ প্রবিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। এই দেহপ্রবিষ্ট বস্তু স্থূলতঃ দ্বিবিধ। ১ম, চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্নপান। ইহা আমাদের মুখ গহ্বর দিয়া প্রবিষ্ট হয়। ২য়, বাহ্য প্রকৃতি অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, তেজ, আকাশ ও বায়ু এই পঞ্চবিধ স্থূলভূত অহরহঃ আমাদের দেহের আহার বা আহৃত পদার্থ। আমাদের জন্মলব্ধ সংস্কার খাদ্যপানীয়ের ন্যায় সতত এই এই পঞ্চ স্থূলভূত পদার্থকেও দেহ সংলগ্ন করিয়া দিতেছে। অতএব এই অন্নপান ও পঞ্চস্থূলভূত যে পরিমাণে খাঁটি হইবে, আমাদের দেহাগ্নি নিজ সংস্কার বশেই সেই পরিমাণে নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। আর যে পরিমাণে তাহারা দূষিত হইবে, সেই পরিমাণে এই অগ্নি নিজ ক্রিয়া সাধনে বাধা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহার ফলে দেহ গঠনের মুখ্য উপাদান রসাদি সপ্তধাতু ও বায়ু, পিত্ত এবং কফ নামক দোষধাতু দূষিত হইবে। এই দশটী পদার্থ লইয়াই যখন দেহ, তখন তাহার সমস্তগুলি অথবা কতকগুলি দূষিত হইলে যে দেহের অসুস্থতা আনয়ন করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দেহাগ্নি খাদ্য, পানীয় ও আহৃত পঞ্চভূত হইতেই রস এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক দোষ ধাতু প্রস্তুত করে। আবার রস হইতে যখন রক্ত মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র প্রস্তুত হইতেছে, তখন রস দূষিত হইলে সকল গুলিই যে দূষিত হইবে তাহাতে আর মতভেদ থাকিতে পারে না। এইরূপে ঐ সকল ভুক্ত পীত ও আহৃত বস্তুই যখন বায়ু, পিত্ত ও কফের জনক, তখন তাহাদের বিকৃতিতে এই দোষ ধাতু ত্রয়ের বিকৃতি হওয়াও সাম্ভব্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সমস্ত খাদ্য ও পানীয় বস্তুর আলোচনা করা অসম্ভব। সুতরাং এস্থলে আমরা কেবল ২।১টীর দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। শরীর নির্ম্মাণার্থ যে সকল উপাদান আবশ্যক তাহার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগই যে জল তাহা আমরা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। কি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র, কি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাগ্রন্থ, কি এলোপ্যাথিক শাস্ত্র, সকল শাস্ত্রই একবাক্যে এতৎ পরিমাণ জলের অত্যাবশ্যকতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন

কিন্তু আজকাল এদেশের লোক কিরূপ জল ব্যবহার করিতেছেন তাহাই আলোচ্য। সুশ্রুত বলেন,—

কীটমূত্র পুরীষাণ্ড শবকোথপ্রদূষিতং
তৃণপর্ণোৎকর যুতং কলুষং বিষসংযুতং
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেৎ বাপি নবং জলং
স বাহ্যাভ্যন্তরান্ রোগান্ প্রাপ্নুয়াৎ ক্ষিপ্রমেবতু।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি কীট, মূত্র, পুরীষ, শব অথবা বিষ কর্ত্তৃক দূষিত কিম্বা তৃণপত্র প্রভৃতি দ্বারা কলঙ্কিত জলে অবগাহন বা সেই জল পান করে অথবা যে ব্যক্তি বর্ষাকালে নূতন জল অবগাহনার্থে ব্যবহার করে, তাহার বাহ্যিক ও আন্তরিক নানাবিধ রোগ জন্মে।

পল্লীবাসী জনসাধারণ ও পল্লীর অবস্থাভিজ্ঞ চৈতন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, পল্লীমাত্রেই ঐরূপ জল ব্যতীত অন্যরূপ জল পাওয়া যায় না। কারণ পল্লীবাসিগণ পুষ্করিণীর জলে মূত্র ও তাহার তীরে মলত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারে না। একে তো পল্লীগ্রামের পুষ্করিণীগুলির সংস্কার হয়না অথবা তথায় আর নূতন পুষ্করিণী খনন করা হয় না, তাহার উপর এতাদৃশ পশুবৎ অত্যাচার! অজ্ঞান গবাদি জন্তু যেমন গোশালায় মলমূত্র ত্যাগ করে, পশু প্রভৃতি অনেক পল্লিবাসী নিজ নিজ স্বাস্থ্যের আধার স্থানগুলি তদ্রূপ মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দূষিত করে। মলমূত্রাদি শরীরের অনুপযোগী বলিয়া প্রাণক্রিয়ার ফলে পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু পল্লীবাসীগণ এমনই দুর্ভাগা যে, পুনরায় তাহারা তৎসমুদয়কে জলের সহিত দেহপ্রবিষ্ট করিয়া থাকে।

'এই তো গেল জলের' কথা। এখন শরীর রক্ষা ও পোষণের অন্যতম প্রধান উপাদান বায়ুর বিষয় আলোচ্য। জলমধ্যে যেমন জল জন্তুর বাস, স্থলচর জন্তুগণ তদ্রূপ বায়ুর মধ্যে বাস করিয়া নিজ নিজ জীবন রক্ষা করে। বায়ু মধ্যস্থ অম্লজান প্রাণাগ্নির প্রধানতম ইন্ধন' বিশেষ। সেই জন্য ক্ষীণশ্বাস রোগীদিগকে অম্লজ'ন শুঁকাই বার ব্যবস্থা করা হয়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত অথবা অন্য কোন রোগে দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ এই জন্য মৃদুমধুর প্রাতঃসমীরণ সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়া থাকেন। উষাকালে পুষ্প চয়নাদি করিলেও অধিক মাত্রায় অম্লজান বায়ু ফুসফুস্ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণাগ্নিকে প্রবলতর করিতে সক্ষম হয়।

পাঠক অবগত আছেন যে, পল্লীমাত্রেই পয়ঃনালীর (Drainge) সুবন্দোবস্ত নাই, কাজেই গ্রামের মধ্যস্থ খাল—ডোবায় জল জমে এবং তাহার ফলে তৃণ পত্রাদি পচিয়া বায়ু দূষিত করে। পল্লীবাসগণ নিজ নিজ বাটীর নিকটে "সারগড়" রাখে এবং তন্মধ্যে গলিত খড়, গোময় ও গো-মূত্রাদি বায়ুকে বিষাক্ত করে। এতদ্ব্যতীত প্রতিগ্রামের অধিকাংশ পুষ্করিণী ও গর্ত্তে দূষিত জল পূর্ণ বলিয়া তৎসমুদয় হইতেও বিষাক্ত বায়ু উত্থিত হয়। এইরূপ নানারূপ অত্যাচারের ফলে মৃত্তিকা হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা দূষিত হইয়া পল্লী বাসীর দেহে শুষিয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এই ভূবাষ্পের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক

বাড়ীর মল মূত্রাগার ধৌত দূষিত জলই পুষ্করিণীর জল সরবরাহ কার্য্যে সহায়তা করে। যে সমস্ত পল্লীতে এইরূপ ত্রুটী বিদ্যমান, তৎসমুদয়ের বায়ুই দূষিত। সুতরাং ঈদৃশ বায়ু সেবন করিলে ফুস্ফুসে অম্লজান প্রবেশ না করিয়া কেবল অঙ্গারজান প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অপকারই করিয়া থাকে।"

দেহের জন্য যে সকল বস্তু আহৃত হয়, তন্মধ্যে জল ও বায়ু প্রধান হইলেও ঘৃত,তৈল, মৎস্য, মাংস, তণ্ডুলাদি বস্তুও কদাচ উপেক্ষণীয় নহে। এখন লোকে ঘৃতের নামে প্রায় শৃগাল কুক্কুরাদি ও গলিত শবদেহ হইতে নিঃসৃত চর্ব্বি ভোজন করে। খনিজ জলীয় পদার্থ মিশ্রিত তৈল, বিষাক্ত জলের মৎস্য প্রভৃতিও বিশেষ অনিষ্টকর। উল্লিখিত দূষিত খাদ্য ও আহার্য্যবস্তু পাকস্থলী নিহিত হইলে তাহা হইতে যে রস প্রস্তুত হয় তাহাও দূষিত পদার্থ। এইরূপ তৎসমুদয় হইতে দেহস্থ বায়ু, পিত্ত, কফের ক্ষয়পূরণার্থ যে বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্মে,তাহাও দূষিত। সুতরাং এই সকল দূষিত বায়ু পিত্তাদি দেহস্থ বায়ু পিত্তাদির ক্ষয়পূরণ করিবে কি— তাহাদিগকে বিকৃত ও কুপিতই করিয়া থাকে। দেহাগ্নি যতই কেন পরিপাক ক্রিয়া সক্ষম হউক না, তাহার মুখে নিয়তকাল এইরূপ সংস্কার বিরুদ্ধ পদার্থরাশি প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে তাহা আর কতকাল পাকক্রিয়ায় সক্ষম থাকিবে? ফলে এই অগ্নি অচিরকাল মধ্যেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।'

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেহস্থ দূষিত রসাদি ৭টী ধাতু এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষধাতু মোট এই ১০টী বা তাহাদের কয়েকটীর সহিত দেহাগ্নির সংগ্রামই, জ্বরের বীজাবস্থা। এই সংগ্রামের সময় মিথ্যাহার, অযথা বিহার, অথবা ঋতুবিপর্য্যয় নিবন্ধন দূষিত ধাতুর বলাধিক্য ঘটিলেই দেহাগ্নি নিজ রেখা (Degree) চড়াইয়া ফেলে এবং তাহার ফলে আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপ (Normal-temperature) উচ্চতর রেখায় (High Temperaturre) এ উপনীত হয়। বলা বাহুল্য, এই জন্যই শুধু ম্যালেরিয়ার রোগী কেন, যে কোন রোগীরই বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করা উচিত।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, জ্বর ছাড়াইতে হইলে যাহাতে আমাদের দেহে দোষের মাত্রা কমিয়া আসে তৎপ্রতিই বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ডাক্তার বাবুরা কুইনাইন প্রয়োগ এবং কবিরাজগণ হরিতাল ভস্ম ও পাচন প্রভৃতি কষায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া অগ্নির ক্রিয়া অস্বাভাবিকভাবে সংযত করিয়া থাকেন। ফলে দেখা যায়, ইহাতে দোষের বৃদ্ধি ও অগ্নির ক্ষয় হইয়া থাকে। এমন কি শেষ পর্য্যন্ত দোষের মাত্রাধিক্য ঘটিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। রোগীর অরুচি হইলে অখাদ্য বস্তু তাহার মুখরোচক হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম অতি শোচনীয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ কুইনাইন, হরিতাল ভস্ম প্রভৃতি অগ্নিনাশক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা দেহাগ্নির হ্রাস হইলে প্রথম প্রথম দেখিতে ও শুনিতে তৃপ্তিপ্রদ হয় বটে,কিন্তু তাহার পরিণাম অতি ভীষণ। কারণ, শারীরাগ্নিকে কমাইবার জন্য এইরূপ অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াবলম্বন করিলে দেহের মধ্যে দোষরাশি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করে এবং তাহা বিবিধ রোগবীজাঙ্কুর ক্ষেত্রস্বরূপ

হইয়া বিবিধ রোগকে আনয়ন করে। বলা বাহুল্য, এই জন্যই ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষয়, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এইরূপ চিকিৎসা-বিভ্রাটের জন্য সকল সময় চিকিৎসকগণ দায়ী নহেন। অনেক অভিভাবকও রোগীর জ্বর নিবারণ জন্য ঈদৃশ চিকিৎসার বিশেষ পক্ষপাতী। এই দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ঔষধ প্রয়োগ করার একটী নির্দ্দিষ্ট কাল নির্ণয় করিয়াছেন যথা —

মৃদৌজ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ
পকং দোষং বিজানীয়াৎ জ্বরে দেয়ং তদৌষধং।
ক্ষুৎক্ষামতা লঘুত্বঞ্চ গাত্রানাং জ্বর মার্দ্দবং।
দোষ প্রবৃত্তিরষ্টাহো নিরাম জ্বর লক্ষণং॥

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, ম্যালেরিয়ার স্বরূপ প্রবন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহার সমস্তই হিন্দুশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া আমরা অবগত আছি। অতএব ইহাতে কোন শাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইয়া থাকিলে কোন চিকিৎসক বা কোন অভিজ্ঞ লোক তাহার যথাযথ প্রতিবাদ করিলে আমরা সুখী হইব। আর যদি আমাদের উক্তিই অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদের সঙ্কেত মত যাহাতে চিকিৎসা কার্য্য সমাপিত হয় এবং রোগীগণও সতর্ক হইতে পারেন তৎপক্ষে আমাদের পাঠক এবং চিকিৎসক মণ্ডলী চেষ্টা করিলে আমরা সুখী হইব। তবে আজকাল অস্বাভাবিকভাবে জ্বর চিকিৎসা করিবার যে মত প্রবল ভাবে সমাদৃত হইয়াছে তাহাতে আমাদের মতের কোন রূপ আলোচনা অরণ্যে রোদনবৎ হইবে বলিয়াই আমাদের মনে এক আশঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর এ কথাও বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি, আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, এনোফেলিস মশকই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। কেননা তাহার দংশনে শরীর মধ্যে একপ্রকার ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হয়। বলা বাহুল্য আমরা ও যে এ মতের সমর্থন একেবারে করিনা তাহা নহে। কারণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও মশক কর্ত্তৃক রোগ-বীজাণু আনয়নের কথারও উল্লেখ আছে। তবে ডাক্তার বাবুরা যে ভাবে মশা ব্যাচারীদের দায়ী করেন, আমরা তেমন করি না। আমরা বলি, যে যে কারণে আমাদের শরীরে দোষ উৎপন্ন হয়, এনোফেলিস মশক তাহার অন্যতম। জল বায়ু দূষিত না হইলে এই মশক জন্মাইতেই পারে না। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইহারা দূষিত বায়ুতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জল বায়ুর ন্যায় মানব শরীরে দোষ বা রোগ-বীজাণু জন্মাইবার সহায়তা করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা ইহাদের মুখ নিঃসৃত বিষাক্ত লালা দ্বারা শরীরে বিষই প্রবেশ করাইয়া দেয়, কিন্তু যে তাপ দ্বারা জ্বরের অনুভূতি হয়, এনোফেলিস মশক সেই তাপ বা তাহার বীজ আনয়ন করে না। সেই তাপ আমাদের দেহেরই নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার নাম পিত্ত। এনোফেলিস মশক, অযথা আহার বিহার, ঋতুবিপর্য্যয় প্রভৃতি

যে কোন কারণেই দেহ-দোষ উৎপন্ন হউক না কেন, আমাদের দেহস্থিত পিত্তাগ্নি উত্তেজিত হইয়া তাহার ক্ষালন অথবা পরিপাক ক্রিয়ার জন্য চেষ্টা করে এবং এজন্য পিত্ত অবস্থা-বিশেষে নিজ তাপের মাত্রা (temperature) বৃদ্ধি করে। বলা বাহুল্য, তাপের এই মাত্রাধিক্যের নামই জ্বর। সুতরাং ইহা বেশ বুঝা যায়, এনোফিলিস মশক জ্বর আনয়ন করে না। তবে যে অসংখ্য কারণে জ্বর হইয়া থাকে, এই মশক তাহার অন্যতম প্রবল কারণ মাত্র। আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, এক জাতীয় মশক দংশনে কুষ্টব্যাধি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুধু মশক কেন, মাকড়সা, সরীসৃপ জন্তু প্রভৃতির দংশনেও আমাদের বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত ও কুপিত হইয়া বিবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ত্তমান দেশ, কাল ও পাত্র মাহাত্ম্যে এইরূপ ম্যালেরিয়া বা বিষম-জ্বর উপস্থিত হওয়ার কারণ যথেষ্ট। যে হেতু আমাদের হাবভাব, চালচলন, আহার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি নিয়তই আমাদের প্রাণাগ্নির ক্ষয় ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দোষত্রয়ের প্রকোপ কল্পে সহায়তা করিতেছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে প্রাণাগ্নির শক্তি ও দোষত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

নিদ্রা তত্ত্ব।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ]

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা—
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

সূর্য্যকে দেখিতে যেমন প্রদীপ জ্বালিতে হয়না; নিদ্রাকে জানিতেও তেমনই কোন যুক্তিতর্কের আবশ্যক নাই। নিদ্রা আমাদের সকলেরই সুপরিচিত। তাঁর আশ্রয় ভিন্ন কাহারও গত্যন্তর নাই। আহারের ন্যায় নিদ্রাও যে মানুষের সুখ, দুঃখ, পুষ্টি, কার্শ্য, বলাবল, বৃষতা, ক্লীবতা, জ্ঞান ও অজ্ঞান জীবন ও মরণের কারণ হইয়া থাকে—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সত্য। বিশেষজ্ঞগণ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। অতএব প্রত্যেক স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, নিদ্রাবিষয়েও তদ্রূপ জ্ঞান আবশ্যক। আমাদের জীবনের প্রায় একতৃতীয়াংশ যাঁর সেবায় অতিবাহিত হয়, শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণু পর্য্যন্ত যাঁ'র স্নেহবিন্দু পানে বঞ্চিত হয় না, যিনি পথশ্রান্ত পথিকের সকল শ্রান্তি ক্ষণিকের মধ্যে বিতাড়িত ক'রে অনির্ব্বচনীয় শান্তির ক্রোড়ে

নিয়ে থান, যাঁর স্পর্শনে শোকাতুরা জননীর আকুল ক্রন্দন সহসা যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে যায়, রোগের যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্ করিতেছে—বৈদ্যের শতশত ঔষধ বিফল হ'য়ে গেল- জীবন যায় যায়—সকলে হতাশ-প্রাণে ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে যাঁর আগমন-বার্ত্তা দর্শকবৃন্দের শুষ্কমুখে হাসি ফুটিয়ে তোলে, যাঁর অগাধকরুণায় আমরা প্রতিদিন নবজীবন লাভ করি, সেই অসামান্য শক্তি-সম্পন্না নিদ্রা জিনিষটা কি তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিনা। ভাবিলে ভগবৎ শক্তির মাহাত্ম্য দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইতে হয়। কিন্তু হায়! আমরা স্বেচ্ছায় সে রসে বঞ্চিত।

নিদ্রাকে কেবল শারীরিক চেষ্টা-বিশেষ ব'লে জা'নলেই সম্যক্ জানা হয় না। তাঁকে জানিতে হইলে যিনি তাঁর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, যাঁর ইচ্ছায় এবং যাঁর শক্তি নিদ্রারূপে জীব দেহে কার্য্য করে তাঁকে জানিতে হয়। যিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ মূলকর্ত্তাকে নিজের হৃৎপদ্মে স্থান দিতে সমর্থ হন তাঁ'র অজ্ঞেয় কিছু থাকেনা, তাঁকে জানাই সম্যক্ জানা হয়। সেই দেবতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত মানুষই একমাত্র সত্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম এবং সেই সত্যই ত্রিকালে অব্যাহত থাকে; অতএব আমি সেই দেবতাবিষ্ট ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্য যাহা নিদ্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতার বাণীরূপে ঋষিগণের হৃদয়ে সংপ্রকাশিত হয়েছিল তাহাই যথাসাধ্য প্রকাশ করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

জাগতিক কোন পদার্থই নিয়ত সুখ বা দুঃখ দিতে পারেনা। ভগবান্ যাহা কিছু দিয়াছেন তাহার এমন একটীমাত্রা ও অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, ঠিক সেই মাত্রায় ও অবস্থায় প্রযুক্ত হইলে তাহা সুখাবহ হইবে; নতুবা দুঃখ দিবে। অন্ন যেমন সাক্ষাৎ প্রাণস্বরূপ হইয়াও অযুক্তি-যুক্ত প্রয়োগে জীবন-নাশের কারণ হয়—যে বিষকে যমের অনুচর ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, সেই বিষও যেমন অবস্থা-ভেদে যুক্তিযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে এনে দেয়, সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থেই হিতাহিত সুখদুঃখ ওতঃ-প্রোত ভাবে বিদ্যমান্। মানুষ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে অনভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞান সত্ত্বেও কার্য্যে সামর্থ-হীনতা অথবা স্মৃতির অভাব বশতঃই রোগ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা যদি আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ মত কার্য্য করিতে পারি, তাহাহইলে যে, নীরোগী হইয়া সুখে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিব তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিদ্রাকে আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ করিতে, স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতে এবং সকল ধাতুর আদি যে রস ধাতু তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে অনুমতি এবং তদুপযুক্ত শক্তি দিয়ে পাঠা'য়েছেন। সে তাহা করিবেই। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, সে দগ্ধ করিবেই, তাহার দ্বারা আপনি প্রয়োজন মত ভাল মন্দ উভয় কাজই করাইতে পারেন; সেইরূপ নিদ্রার যাহা কর্ত্তব্য সে তাহা করিয়া যাইবে, আপনি যদি তাহাকে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য্যে লইতে পারেন তাহা হইলেই নিদ্রা সুখপ্রদ হ'বে, নতুবা নয়। মনে করুন আপনার শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়াছে, অর্থাৎ দেহে যে পরিমাণ জলীয়াংশ স্বাস্থ্যের অনুকূল—তাহার অধিক হইয়াছে, সে অবস্থায় যদি আপনি দিবা

নিদ্রা যান তাহা হইলে নিদ্রান্ত দেখিবে না যে আপনার শ্লেষ্মা অধিক আছে, কাজেই তাহার যাহা কার্য্য শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করা, তাহা করিল এবং তাহার ফলে আপনাকে শয্যাশায়ী হইতে হইল। এই যে আপনার কষ্ট ভোগ তাহার জন্য নিদ্রা দায়ী নহে, দায়ী আপনার কর্ম্ম এবং তাহার মূলে জ্ঞানের অভাব।

নিদ্রা অকালে, অতিমাত্রায় বা অল্পমাত্রায় সেবিত হইলে অথবা একেবারেই সেবিত না হইলে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হয় এবং সত্বরই আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া থাকে। লক্ষ্মণ যে দ্বাদশ বৎসর অনিদ্রায় ছিলেন তাহা অলৌকিক অথবা অভ্যাস ও সাধনাসাধ্য।

আমরা সাধারণতঃ উত্তম ও অধম ভেদে নিদ্রার দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ উত্তম অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা, যাহাতে চিত্তবৃত্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়, কোনরূপ স্বপ্ন পর্য্যন্ত থাকে না, ইহাকেই সুষুপ্তি বলে। যে নিদ্রায় স্বপ্ন দর্শন হয় তাহাকে অধম নিদ্রা বলা যায় এই নিদ্রাই অধিকাংশ লোকের হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যে সকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণ বিশিষ্ট মন দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। এইরূপ পূর্ব্বজন্মের অনুভূত বিষয়ও নিদ্রাকালে জীবাত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। তাহারই নাম স্বপ্নদর্শন। নিদ্রার স্বপ্ন বা লঘু অবস্থাতেই স্বপ্ন হয়। কারণ, ঐ নিদ্রায় বায়ুর সম্বন্ধ থাকায় মন কিছু কিছু কাজ করে, অথচ নিজের বশে থাকে না। কোন কোন নিদ্রা কেবল স্বপ্নময়। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে কখন রাজা, কখন বা কাঙ্গাল হয়। কখন আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে, কখন কাঁদিয়া আকুল হয়। এক একজন স্বপ্ন যোগে এরূপ কাজ করিয়া বসে যাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অনেক দিন পূর্ব্বে আমি এক ব্যক্তিকে গভীর রজনীতে নিদ্রাবস্থায় উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া ক্রোশাধিক পথ যাইতে শুনিয়াছিলাম। আর একটী লোক ঘুমাইতে ঘুমাইতে সমস্ত রাত্রি দ্বিতলস্থ এক অনাবৃত ছাদে ভ্রমণ করিয়াছিল। নিদ্রা একটী রহস্যময় ব্যাপার। নিদ্রার পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গীন অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এক অজ্ঞাত শক্তি যাহাকে আমরা দৈবী শক্তি বলি— মন ও শরীরের উপর কার্য্য করিতে থাকে। চক্ষিপল্লব ভার হয় ও মুদিয়া যায়। ক্রমে দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, ও স্পর্শ শক্তি, পর্য্যায়ক্রমে স্তিমিত হয়, শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্ষীণ হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে। বহির্ম্মুখী গতি— অন্তর্ম্মুখী হয়।

নিদ্রার মত আর একটী জিনিস আছে, তাহাকে তন্দ্রা বলে, ইহাও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই। নিদ্রায় ইন্দ্রিয় ও মন উভয়েরই মোহ হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ রূপ রসাদি নিজ নিজ বিষয় গ্রহণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া থাকে, কিন্তু তন্দ্রায় কেবল ইন্দ্রিয় মোহ, ইন্দ্রিয় সকলের অস্পষ্ট অনুভূতি থাকে এবং নিদ্রার্ত্ত ব্যক্তির হাই চেষ্টা ও দেহের ভার বোধ হয়। নিদ্রাবেগ রোধ করিলে অর্থাৎ থিয়েটার যাত্রা অথবা বিবাহাদি কোন উৎসব বশতঃ নিদ্রাকে বল পূর্ব্বক বিতাড়িত করিলে, তন্দ্রা হয়, এরূপ স্থলে নিদ্রা ও সংবাহন (গাটেপান) হিতকর।

কোন কোন রোগের লক্ষণেও তন্দ্রা থাকে।

মহর্ষি চরক নিদ্রার ছয় প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

তমোভবা শ্লেষ্মা সমুদ্ভবা চ মনঃ শরীর শ্রম সম্ভবা চ
আগন্তুকা ব্যাধ্যানুর্ত্তিনী চ রাত্রি স্বভাব প্রভবা চ নিদ্রা॥
রাত্রি স্বভাব প্রভবা মতা যা তাং ভূতধাত্রীং প্রবদন্তি নিদ্রাং
তমোভবামাহুরঘস্যমূলং শেষং পুনর্ব্যাধিষু নির্দ্দিশন্তি॥

নিদ্রা তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়, শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হয়, মন ও শরীরের শ্রান্তি হইতেও উৎপন্ন হয়, আগন্তুক কারণে অর্থাৎ অহিফেনাদি সেবনেও উৎপন্ন হয়, কোন কোন ব্যাধি হইতেও উৎপন্ন হয়, লোকে নিদ্রাকে ভূতধাত্রী কহিয়া থাকে, কেহ তমোভবা নিদ্রাকে পাপের মূল কহেন এবং অন্যান্য নিদ্রাকে ব্যাধির মধ্যে গণ্য করেন।

তমো গুণ জন্য নিদ্রা যথা—যে সকল আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি দিবা রাত্রি উভয় কালেই নিদ্রা যান—তাঁদের অধিকাংশই তমোগুণ প্রধান। তমো গুণ হইতে নিদ্রা কিরূপ হয় তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের প্রকৃতি সম্ভূত সত্ত্ব, রজ, তমো এই তিনটী গুণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদ্যপি অনেকেই এই গুণ তিনটীর বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন।

আমরা জাগতিক যাহা কিছু দেখি, প্রত্যেক বস্তুই কোন না কোন গুণ বিশিষ্ট, নির্গুণ কোন বস্তুই নাই। যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ- এই পাঁচটী পঞ্চ মহাভূতের প্রধান গুণ। ইহাদিগকে বাদ দিলে আর কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। শাস্ত্র বলেন - যাহাতে গুণ কর্ম্ম আশ্রয় করে—তাহাকেই দ্রব্য কহে। সেইরূপ সত্ত্ব রজ ও তমো এই গুণ তিনটীকে বাদ দিলে জগতের যাহা মূল কারণ যাহার বিকারকেই আমরা জগৎ বলি—সেই প্রকৃতিকে আর পাওয়া যাইবে না প্রকৃতি না থাকিলে তার বিকৃতি জগতও থাকিতে পারে না। বিকৃতি কি তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। সমতা প্রকৃতি ও বিষমতা বিকৃতি। সমতা যথা, সকল দ্রব্যেই ছয় প্রকার রস আছে, কিন্তু যদি এমন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় যাহাতে ছয় প্রকার রসই সমভাবে বিদ্যমান, তাহা হইলে কোন রসেরই আস্বাদন সেই বস্তুতে পাওয়া যাইবে না। সকল রসই তাহাতে অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান সত্ত্বেও কোন রস যে তাহাতে আছে ইহা কাহারও বোধগম্য হইবে না। সেইরূপ সত্ত্ব, রজঃ তমো এই গুণ তিনটী যখন সমভাবে থাকে অর্থাৎ যখন প্রকাশও নয়, অপ্রকাশ নয়, আঁধার নয়, আলোকও নয়, জ্ঞানও নয়, অজ্ঞানও নয়, সুখও নয়, দুখও নয়, এই যে দ্বন্দ্বাতীত অব্যক্ত অবস্থা—ইহাকেই প্রকৃতি এবং কোন গুণ ব্যক্ত হইলেই তাহাকে বিকৃতি বলে। কোনও একটী গুণের আধিক্য বা অল্পতা না হইলে তাহা প্রকাশিত হইতে পারে না। দুইজন মল্লযুদ্ধ করিতেছে—যদি উভয়েরই শক্তি সমান থাকে—তাহা হইলে উভয়েই একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিবে, কেহই

হটিবে না। যদি এক জনের বল বেশী হয়, সে অপরকে হটাইবেই।

সত্ত্বঃ, রজঃ তমো এই তিনটী গুণ সমভাবে (অব্যক্ত অবস্থায়) না থাকিলে সৃষ্টি হইতে পারে না, এই জন্য দ্বন্দ্ব লইয়া জগৎ এবং দ্বন্দ্বাতীত অবস্থাকে মুক্তি বলে। যাহা হউক গুড়ের মধুরতা যেমন গুড়, বিকার চিনি মিছরী প্রভৃতিতে সংক্রামিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির গুণ সকল প্রত্যেক জীবেই বিদ্যমান থাকিয়া স্বকীয় কার্য্য সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জীবাত্মাকে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া থাকে। যেমন লক্ষণ দ্বারা রোগ নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ কার্য্য দেখিয়া সত্ত্ব রজ, অথবা তমো গুণের স্থির করিয়া লইতে হয়, মানবদেহে প্রতিনিয়ত এই গুণ ত্রয়ের যুদ্ধ চলিতেছে, যখন যে গুণের প্রাধান্য হয়; তখন মানসিক অবস্থাও ঠিক সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যখন সৎ-জ্ঞান জন্মে, সকল বস্তুতেই সেই বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব অনুভব করে, সুখ দুঃখ মানাপমান তুল্য হইয়া যায় স্বার্থ বুদ্ধি থাকে না, সত্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তখনই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে। যখন আসক্তি বৃদ্ধি হয়, কর্ম্ম স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠে, নিত্যকে অনিত্য ও অনিত্যে নিত্য বোধ জন্মে; অহঙ্কার, দম্ভ, মান, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত হইতে হয়, তখনই রজো গুণের প্রাধান্য বুঝিতে হইবে। যখন জ্ঞান আবৃত, কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকে না, বিষাদ, নাস্তিকতা, দুষ্ট বুদ্ধিতা, অকর্ম্মকারিতা ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে, তখনই তমোগুণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞানকে আবৃত করা তমোগুণের কার্য্য। যখন দেখিব জ্ঞানাচ্ছন্ন, কে যেন তাহার প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে তমোগুণের আধিক্য বশতঃ সত্ত্ব ও রজঃগুণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে এবং তমোগুণ তাহার স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা জ্ঞান রাজ্যে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে।

হৃদয় চেতনার স্থান, তাহা তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইলে শরীরে নিদ্রা প্রবেশ করে অর্থাৎ চিত্তের অবসাদ জন্মাইয়া তাহার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। তখন ইন্দ্রিয়গণও সারথির অভাবে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। বিশ্রাম উপভোগ নিদ্রা যে তমোগুণের কার্য্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়াছেন।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

এখন দেখা যাউক তমোগুণজাত নিদ্রাকে পাপের কারণ বলা হইয়াছে কেন? পাপ কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখিতে পাই, যাহা আত্ম বিকাশের প্রতিকূল, যাহা ঈশ্বরের নিকট থেকে দূরে নিয়ে যায় তাহাকেই পাপ বলিয়া থাকে। এই আত্ম বিকাশের প্রতিকূল পদার্থ টীর নাম অজ্ঞান বা মোহ। এই মোহই ভগবানকে চিনতে দেয় না। এখন আমরা যদি অনুসন্ধান করি মোহ কোথা থেকে আসে—কে তাহার জন্ম দাতা—তাহা হইলে দেখিতে পাইব তমোগুণই তাহার কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইলে তমো গুণই যখন মূলতঃ পাপের কারণ হইল, তখন তজ্জাত নিদ্রাও যে পাপের কারণ হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তমোগুণ যেমন

নিদ্রাকে বর্দ্ধিত করে, নিদ্রাও তেমনই তমোগুণকে বর্দ্ধিত করে। যা'র তমোগুণ যত বেশী, সে জ্ঞানরূপী ভগবানের নিকট থেকে তত বেশী দূরে স'রে যায়। অতএব অধিক নিদ্রায় যেমন রোগ জন্মায় সেইরূপ পাপও জন্মাইয়া থাকে। ঔষধের যেমন রোগ-বিনাশক শক্তি থাকে, সেইরূপ তমোগুণেরও নিদ্রা জনক শক্তি আছে ইহা একটু চেষ্টা করিলে সহজেই বুঝিতে পার যায়। এখন শ্লেষ্মা জন্ত নিদ্রার বিষয় আলোচনা করা যাউক। শ্লেষ্মা কাহারও অপরিচিত নহে। যা'কে সর্দ্দি লাগা বলে, তাহা ঐ শ্লেষ্মারই—কর্ম্ম। শ্লেষ্মাপ্রধান ব্যক্তির নিদ্রা অধিক হয়। শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইলে যেমন নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয় সেইরূপ নিদ্রার আধিক্য জন্মাইয়া থাকে। শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দ্রব্য প্রায়ই নিদ্রা বর্দ্ধক হয়। আহারের পর যে নিদ্রার ভাব আসে, শয্যা গ্রহণে প্রবৃত্তি জন্মায় ঐ আহার জন্য তাৎকালিক শ্লেষ্মা বৃদ্ধিই তাহার কারণ। শ্লেষ্মা জন্ম নিদ্রাকে জানিতে হইলে প্রথমে শ্লেষ্মার ধারণা করা প্রয়োজন, অতএব শ্লেষ্মা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সকলেই জানেন যে, ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী মহাভূতের সংমিশ্রণে আমাদের এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ প্রস্তুত হইয়াছে। এই পঞ্চভূতই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া বায়ব্য, আগ্নেয়, ও সৌমরূপে জীবদেহে বর্ত্তমান থাকে এবং স্বস্ব কার্য্য দ্বারা দেহকে রক্ষা করে। যখন সৌম্য (জলীয়) ভাগের আধিক্য ঘটে অর্থাৎ যতটুকু জলীয়াংশ দেহ রক্ষার উপযোগী—তদপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে, তাহাকেই আমরা শ্লেষ্মা বৃদ্ধি বলিয়া থাকি। শ্লেষ্মার যে আশ্লেষণ শক্তি আছে তাহা দ্বারা সে চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া ফেলে। গুরুতা প্রযুক্ত শারীরিক যন্ত্রগুলি গুরুভার বহন করিয়া কার্য্য করায় অবশ হইয়া পড়ে এবং জলীয় ভাগের আধিক্য বশতঃ স্রোত সকল রুদ্ধ হওয়ায় মন তাহার পথ দিয়া ইন্দ্রিয়গণের নিকট পৌঁছিতে পারে না, বিষয় গ্রহণও হয় না। জড়ত্ব হেতু দেহেরও জড়তা বৃদ্ধি করিয়া তমো গুণের কার্য্য প্রকাশ করে ও নিদ্রা জন্মায়। অথবা ক্ষিতি ও জল নামক যে দুইটী ভূতের আধিক্যে শ্লেষ্মার উৎপত্তি, সেই দুই টীই তমোগুণ বহুল বলিয়া চিত্তের অবসাদক হয়, অতএব মনীষিগণ নিদ্রাকে কফের কর্ম্ম বলিয়াছেন যথা—

"চিরকর্তৃত্বং শোথো নিদ্রাধিক্যংরসো
পটুস্বাদু
বর্ণঃ শ্বেতোঽলসতা কর্ম্মাণি কফস্য
জানীয়াৎ

বায়ু নিদ্রানাশক ও কফ নিদ্রাজনক ইহা যদি আমরা শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রাখি—তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব। নিদ্রার যে ছয়টী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে তমো ও শ্লেষ্মাই প্রধান বা ক্ষেত্র (উৎপত্তিস্থান)। যেমন শস্যের ক্ষেত্র ভূমি, ভূমি ভিন্ন শস্য জন্মিতে পারে না। এই প্রকার প্রত্যেক রোগেরই এক একটী ক্ষেত্র আছে। যেমন পিত্তকে জ্বরের ক্ষেত্র বলে, যেহেতু পিত্ত ভিন্ন জ্বর হইতে পারে না। জ্বর মাত্রেই সন্তাপ আছে, সেই সন্তাপ পিত্ত ভিন্ন থাকে না। সেইরূপ তমো ও শ্লেষ্মাই নিদ্রা জন্মায়, এই দুইটী ভিন্ন জন্মিতে পারে না. নিদ্রায় যে মোহ থাকে,

তাহা তমোগুণ না হইলে হইতে পারে না এবং স্নিগ্ধত্বাদি গুণও শ্লেষ্মা ভিন্ন হয় না। অতএব তমো ও শ্লেষ্মাই নিদ্রার ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে, অন্যান্য গুলি সহায় হয় মাত্র। তন্মধ্যে যাহার প্রাধান্য থাকে—যে প্রধান ও প্রথম কারণরূপে প্রতীয়মান হয়—আমরা তাহাকেই নিদ্রার কারণ বলি। তমো জন্য নিদ্রাতে শ্লেষ্মা এবং শ্লেষ্মা জন্য নিদ্রাতেও তমোগুণ থাকে। কিন্তু প্রাধান্য অনুসারে নাম নির্দ্দেশ হয়।

তমোগুণের কার্য্য যে সংজ্ঞানাশ—তাহা মূর্চ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা ও নিদ্রা এই সকলের মধ্যেই থাকে। কিন্তু আমরা যে উহাদের পার্থক্য অনুভব করি তাহার কারণ বাত-পিত্ত শ্লেষ্মা। উহারাই নিজ নিজ পৃথক পৃথক কার্য্য দ্বারা পার্থক্য জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রকার উহাদের ভেদ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন।

মূর্চ্ছা পিত্ত তমো প্রায় রজঃ পিত্তানিলাদ্ ভ্রমঃ
তমো বাত কফাৎ তন্দ্রা নিদ্রা শ্রেষ্মা তমো ভবা॥

মন ও শরীরের শ্রম হইতে যে নিদ্রা হয় তাহা যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। তিনি যেন তাঁ'র অনুচরবর্গকে পরিশ্রমে কাতর দেখে দয়াপরবশ হ'য়ে ছুটী দিয়েছেন। মনও ইন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত হ'য়ে যখনই ছুটীর প্রার্থনা জানায়, আত্মরূপী ভগবান্ সুচতুর প্রভুর মত তৎক্ষণাৎ তাঁ'দের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। নেত্র মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন জ্ঞানরূপী হৃৎপদ্মও বুঁজিয়ে যায়। তমোগুণ তাঁ'র সমস্ত শক্তি দিয়ে সত্ব ও রজঃ গুণকে অভিভূত ক'রে ফেলে।

ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ আলয়ে বিশ্রাম সুখ উপভোগ ক'রে নববলে বলীয়ান হয়। কে যেন অজ্ঞাতসারে কোথা থেকে নূতনশক্তি নিয়ে এসে তাঁ'দের শরীরে প্রবেশ করিয়ে চ'লে যায়। জাগরণের সঙ্গেসঙ্গেই তা'রা নূতন স্ফূর্ত্তি—নূতন উদ্যম নিয়ে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এইজন্যই শ্রান্ত ব্যক্তির দিবানিদ্রা অন্যায় নহে।

আকস্মিক কারণে যে সকল নিদ্রা উপস্থিত হয় তাহাদিগকে আগন্তুকী নিদ্রা বলে। যেমন অহিফেনাদি সেবন জন্য নিদ্রা। অহিফেনের এমন একটী আকর্ষণ আছে, যাহা দ্বারা সে শুধু মনকেই আকর্ষণ করে না, শারীরিক যাবতীয় যন্ত্রকেই সঙ্কুচিত করে এবং সেই আকর্ষণের ফলে হৃৎপদ্মকে বলপূর্ব্বক মুদ্রিত করে, তখন ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। কে যেন ভিতর হ'তে চক্ষুর পাতা দু'টিকে টানিয়া নামিয়ে দেয়, তখন আমাদিগকে বাধ্য হয়ে নিদ্রার আশ্রয় নিতে হয়। ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং বলেন, গলার উভয় পার্শ্বস্থ করোটীড্ ধমনী অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিলে ও নিদ্রা আইসে। এতদ্বারা মস্তকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শিরা সকলের সাময়িক সংকোচন হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহাও আমাদের আগন্তুকের মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন ব্যাধিতে নিদ্রা ও অনিদ্রা উভয়ই উপদ্রবরূপে উপস্থিত হয়। যেমন শ্লৈষ্মিক জ্বরে অতিশয় নিদ্রা ও বাতিক জ্বরে অনিদ্রা হয়, এসকল স্থলে কেবল শ্লেষ্মাকেই নিদ্রার কারণ বলিলে চলিবে না। কারণ তাহা হইলে শ্লেষ্মা জন্য যত প্রকার রোগ আছে সকল রোগেই নিদ্রা হইতে পারিত তাহা হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে কোন কোন ব্যাধিরও এমন একটী শক্তি আছে

যাহা নিদ্রা জন্মাইবার পক্ষে সহায়তা করে। এই নিদ্রা মূল রোগের উপশমের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। যে সকল স্থানে রোগ অপেক্ষা উপদ্রবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয় সে স্থানে উপদ্রবেরও পৃথক চিকিৎসা আবশ্যক, অতএব যদি নিদ্রা বা অনিদ্রার এমন অনিষ্টজনক আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহাদের পৃথক চিকিৎসা করিতে হইবে। যে নিদ্রা রাত্রি স্বভাববশতঃ প্রতিদিন হইয়া থাকে উহাকেই ঋষিগণ জীবজননী বলিয়াছেন। নৈশ অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনা দূর করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাকর্ষনের বেশ সুবিধা করিয়া দেয়। এ নিদ্রা অন্যান্য নিদ্রার ন্যায় কারণ হইতে জাত নহে। সকলকেই সমভাবে ইহা আশ্রয় দিয়া থাকে।

পেচক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণী আছে তাহারা রাত্রিতে জাগ্রত থাকে ও দিবাভাগে নিদ্রা যায়। সাপ, ব্যাঙ্, প্রভৃতি কেহ কেহ সমস্ত শীত কালটা নিদ্রায় কাটায়। আবার রোহিত মৎস্য একেবারেই নিদ্রা যায় না। আমরা যত প্রাণী দেখিতে পাই অধিকাংশই রাত্রিতে নিদ্রা যায়। নিদ্রার অনেক প্রকার আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ শয়নের পর নিমেষ মধ্যেই নিদ্রায় মগ্ন হয়। আবার কাহারও বা অনেক পরে নিদ্রা আইসে। কোন কোন ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় ভয়ানক নাসিকা গর্জ্জিতে থাকে। ঐ গর্জ্জনে বাড়ীর অন্যান্য লোকের ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়। 'হা' করিয়া ঘুমাইলে শ্বাস গ্রহণ কালে তালুতে বায়ুর আঘাত লাগিয়া ঐ শব্দ উৎপন্ন হয়। গলার মধ্যে আল্‌জিভ্ বড় থাকিলে অথবা শ্লেষ্মায় নাক বন্ধ থাকিলেও ঐরূপ শব্দ হইতে পারে। কেহ কেহ নিদ্রাবস্থায় ভয় পায়, মনে করে কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিতেছে। সে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না, শ্বাস কষ্টে অস্থির হইয়া উঠে, হস্ত পদাদি অবশ হয়, নাড়িবার শক্তি থাকে না। এই কর্ম্মময় জগতে সর্ব্বদা কাজ করিবার জন্যই বিধাতা জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং কর্ম্মের উপযোগী যাহা কিছু দরকার সমস্তই দিয়াছেন। রাত্রিটা যেন কেরাণীদের রবিবার, অফিস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্ট্রিকের কারেণ্ট বন্ধ হয়। আলো আর জলে না। বিনা প্রয়োজনে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে মহাজন রাজী নয়; অথবা কেরাণীদের সঙ্গে সঙ্গে তা'রাও ছুটী পায়। যদি কেহ দিনের বেলায় (অফিস্ টাইমে) কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত না থেকে; তাঁর আদিষ্ট কর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন করতঃ নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে চায়, বিশ্বপ্রভু তাঁকে ভবনদী উত্তীর্ণ হ'বার সার্টিফিকেট ত দেনই না অধিকন্তু আইন অমান্য জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যথোচিত শাস্তি দিয়ে যাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ পাপ কর্ম্ম না করে তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। এই জন্যই আমাদের উপনয়নে 'মা দিবা স্বাপ্সী" বলিয়া দিবা নিদ্রার নিষেধ করা হইয়াছে। এস্থলে অনেকের এরূপ প্রশ্ন আসিতে পারে যে, যদি দিবা নিদ্রা পাপই হয় তাহা হইলে শূদ্রের পক্ষে এরূপ নিষেধ নাই কেন। সকল প্রকারই তো সকলের পক্ষে সমান যে মদ্যপান ব্রাহ্মণের মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত, তাহা শূদ্রের পক্ষেও পাপ নহে কি। বৃদ্ধের যাহা পাপ

বালকের তাহাতে পাপ নাই। অকাল মৃত্যুর যতগুলি, কারণ আছে তন্মধ্যে দিবানিদ্রা অন্যতম। দিবানিদ্রা অতি কদর্য্য কর্ম্ম; অসময়ে বা অতিশয় নিদ্রা জন্য কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, হলীমক, শিরঃশূল, স্তৈমিত্য, গাত্রভার, হৃদয়ের উৎক্লেশ, শোথ, হৃল্লাস, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক, কোঠপিড়কা, কণ্ডূ, তন্দ্রা, কর্ণরোগ, স্মৃতিনাশ, বুদ্ধিনাশ, স্রোতোরোধ ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্যহীনতা প্রভৃতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রাত্রিকালে জাগরণ করিলেও বায়ু, পিত্ত জন্য ঐ সকল উপদ্রব জন্মাইতে পারে। অতএব রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা—উভয়ই বর্জ্জন করিতে শাস্ত্রের উপদেশ আছে। প্রায় দেখা যায় নিষ্কর্ম্মা লোকেরা দিবসের অধিকাংশ সময় নিদ্রায় ব্যয় করিয়া থাকেন। আবার পক্ষান্তরে কর্ম্মবীরেরা কাযের নেশায় পড়িয়া সময়ে সময়ের নিদ্রার নিয়মিত কালকেও প্রায় নির্ব্বাসিত করিবার যোগাড় করিয়া তোলেন। এতদুভয়ই স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল।

রাত্রি জাগরণে শরীরের রুক্ষতা বৃদ্ধি হয়। দিবানিদ্রায় স্নিগ্ধতা বৃদ্ধি হইয়া শ্লেষ্মা জন্য রোগ সকল জন্মায়।

গ্রীষ্মকালে লোকের শরীর উত্তরায়ন কাল-ধর্ম্মে রুক্ষ হয়। তখন দেহে বায়ু সঞ্চিত হইতে থাকে। আদানকালের পরিপূর্ণতা হেতু সূর্য্যের তেজ বৃদ্ধি হয় এবং দিনমান বৃদ্ধি হওয়ায় সূর্য্য আমাদের দেহ হইতে অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা এই ঋতুতে অধিক রস গ্রহণ করেন। রাত্রিমান অল্প হওয়ায় এবং গ্রীষ্ম জন্য রাত্রিতেও উপযুক্ত নিদ্রা হয় না। অতএব কেবল গ্রীষ্ম ঋতুতেই দিবা নিদ্রা প্রশস্ত। ঐ ঋতুতে সূর্য্য-সন্তাপে অধিক ক্ষয় হওয়ায় শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত না হইয়া ক্ষয়পূরণের সহায়ক হয়। আমাদের শরীরের জলীয় ভাগ শারীরিক উষ্মা দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া সর্ব্বদা বাষ্পাকারে উত্থিত হইতেছে। তাহা এত সূক্ষ্ম যে, কেবল শীত ঋতু ভিন্ন অনুভব করিতে পারা যায় না। শীতকালে বাহিরের শৈত্যপ্রভাবে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প গাঢ় হইয়া ধূমাকারে উত্থিত হওয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সমস্ত দিনে যাহা ক্ষয় হয় রাত্রিতে নিদ্রা দ্বারা তাহার পূরণ হইয়া সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। সকল বিষয়েরই একটী নিয়মিত মাত্রা আছে, তাহার অধিক বা অল্প হইলেও দুঃখের কারণ হয়। আমরা যদি রাত্রিতে জাগরণ করি, তাহা হইলে নিদ্রার যে ক্ষয় পূরণ হইত তাহা হইতে পারে না। তাহার ফলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আবার যদি দিবসে নিদ্রা যাই, তাহা হইলেও জাগরণে যে ক্ষয় হইত তাহা না হইয়া শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি উভয়ই দোষজনক জানিয়া পরিমিত রূপে নিদ্রা যাইবেন। নিদ্রা পরিমিত হইলে দেহ নীরোগ ও বল বর্ণ যুক্ত হয়—স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্য ভাবে থাকে। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ৭।৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। রাত্রি ৯টা হইতে ৪টা অথবা ৫টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়াই বিধি। বৃদ্ধদিগের পক্ষে পূর্ণ বয়স্ক অপেক্ষা নিদ্রার পরিমাণ আরও কিছু বৃদ্ধি করিতে হইবে, কারণ বার্দ্ধক্যে

শারীরিক ক্ষয় অধিক হইতে থাকে। শিশুদের যথেষ্ট ঘুমাইতে দেওয়ার বিধি আছে। ৪ হইতে ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ১০ ঘণ্টা ঘুমের মাত্রা করা মন্দ নহে।

অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করা বিধেয়। এই সময়ের বায়ু পবিত্র ও নির্ম্মল থাকায় দেহ রক্ষার সমধিক উপযোগী হয়। অধিক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া উঠিলে শরীরে জড়তা বৃদ্ধি হওয়ায় তেমন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় না।

তাহা ছাড়া চক্ষু দুটী অকালে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। সমস্ত রাত্রি যে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় ছিল, তাহাকে হঠাৎ যদি সূর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্যে খোলা হয়, তাহাতে স্নায়ু মণ্ডলীর অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হইয়া থাকে।

দিবানিদ্রা দোষাবহ হইলেও আবার এমন কতকগুলি স্থান আছে যেখানে দিবা নিদ্রাতে অপকার না হইয়া থাকে। কারণ সে স্থলে শ্লেষ্মার বৃদ্ধিরই প্রয়োজন।

যে যে অবস্থায় দিবা নিদ্রা প্রশস্ত, মহামতি চরক একটী শ্লোকে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। শ্লোকটীর অর্থ এই,—

"যাঁহারা গীত,অধ্যয়ন,মদ্যপান, স্ত্রীসংসর্গ, পরিশ্রম, ভারবহন ও পথ ভ্রমণ দ্বারা ক্লান্ত হইয়াছেন; যাঁহারা অজীর্ণ রোগী, ক্ষত রোগী বা ক্ষীণ রোগী—যাঁহারা বৃদ্ধ বা বালক বা দুর্ব্বল, যাহারা পতিত, আহত বা উন্মত্ত, যাঁহারা তৃষ্ণা, অতিসার ও শূলরোগে আক্রান্ত, যাঁহারা শ্বাসরোগ বা হিক্কাগ্রস্ত বা কৃশ; যাঁহারা যানারোহণ ও রাত্রি জাগরণ দ্বারা শ্রান্ত, যাঁহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়ে ক্লান্ত এবং যাহারা দিবা নিদ্রা অভ্যস্ত, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বকালে দিবা নিদ্রা সেবন করিবেন।

তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতিসার রোগে দিবানিদ্রায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

বায়ুপ্রবনতা, পিত্তপ্রবনতা, মনস্তাপ, ক্ষয়, ভয়, লোভ, উদ্বেগ, মানসিক দুশ্চিন্তা এই সকলই অনিদ্রার প্রধান কারণ। নিদ্রা হীন ব্যক্তি এক বিষম দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করে। যখনই দেখিবেন রাত্রিতে উপযুক্ত নিদ্রা হইতেছে না, তখনই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। নিদ্রা নাশ হইলেই প্রত্যনীক ক্রিয়া অর্থাৎ যে সকল কারণে নিদ্রা নষ্ট হয় তাহার বিপরীত ক্রিয়া করিতে হয়। অভ্যঙ্গ, উৎসাদন, স্নান, গ্রাম্য ও ঔদক মাংস রস, শাল্যন্ন, দধি ও দুগ্ধাদি স্নেহ সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। নিম্নে কয়েকটি মুষ্টিযোগের কথা বলা যাইতেছে,—

আমলকী চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া ১ তোলা মাত্রায় মধুর সহিত রাত্রিতে সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে। মন্দনিদ্র ব্যক্তি পিপুলের মূল চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া লেহন করিবেন, দুগ্ধ, মাংসরস, দধি, অভ্যঙ্গ তৈল মর্দ্দন, স্নান, মস্তক, কর্ণ ও চক্ষুর তৃপ্তি সাধন এই গুলি অভ্যাস করিবেন। ইক্ষুবিকার, পুঁইশাক, মাষকলাই, মাংসরস, দুগ্ধ, গোধুম, তিল ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য নিদ্রাজনক। যে সকল ব্যক্তি অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত মানসিক শ্রম করেন, তাঁহারা শয়ন করিবার পূর্ব্বে অল্পকাল মুক্তবায়ুতে পরিভ্রমণ করিলে সহজেই অনিদ্রার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন। আমরা দেখিয়াছি, সর্ব্বক্ষণ গ্রন্থীকণ অধ্যয়ন করিলে বায়ু বৃদ্ধি

হইয়া আর নিদ্রা আসিতে চায় না, সেরূপ স্থলে মস্তক, মুখ ও চক্ষু শীতল জল দ্বারা ধৌত করিয়া একটু ভ্রমণের পর শয়ন করিলেই নিদ্রা আসে। কাশ্মীর দেশে একটী প্রথা আছে যে, তথাকার জননীগণ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে শীতল জলে সন্তানের মস্তক ধৌত করিয়া দেন। ইহাও সুনিদ্র আনয়ণের প্রকৃষ্ট উপায়।

ক্ষুধা।

[শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ*]

আমরা সকলেই ক্ষুধার জন্য লালায়িত। কাহারও ক্ষুধা না থাকিলে বা তাহার হ্রাস হইলে তিনি বিপদ মনে করেন, কত ডাক্তার-কবিরাজের নিকট যান, কত ঔষধ খান, তাহাতেও হয়ত তৃপ্ত হন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ক্ষুধাই যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধক, প্রাণহারক—তাহা আমরা বুঝিনা।

আমাদের শরীর নিত্য ক্ষয় হইতেছে। আমরা প্রত্যহ যাহা কিছু করি—নড়াচড়া, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া—তাহাতে তিলে তিলে আমাদের শরীর ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হয়। কিছু কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া থাকিলেও শ্বাস প্রশ্বাসের হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাই না, সুতরাং তাহাতেও আমরা মৃত্যুপথে ধাবিত হই। অনেক রোগী রোগমুক্ত হইয়াও কেবল নিশ্বাস লওয়ার শক্তির অভাবে দেহত্যাগ করে। এমনই ভাবে,যে কোন কর্ম্মই আমাদের 'মাথা খায়'।

যোগ-সাধন করিতে হইলে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করাই সেই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাহা না করিলে মৃত্যুঞ্জয় হওয়া যায় না। যোগে এই জন্য শ্বাসরোধ পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রাণায়াম-সাধনায় সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাই মহাযোগীর যোগ-সাধনায় তাঁহার তৎকালীন অবস্থা "নিবাত নিষ্কম্পামিব প্রদীপম্" বলিয়া "কুমার সম্ভবে" কবি লিখিয়াছেন।

যাহার যতটা ক্ষুধার আধিক্য, তাহার সেই পরিমাণে শরীরের ক্ষয় হইয়া থাকে। যাঁহাদের সুস্থ শরীরে অনেক খাইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি

---

* প্রস্তাব-লেখক প্রথিতনামা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং অমর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি স্বয়ং একজন নানা শাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত ও ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার সুমধুর উচ্ছ্বাসময় কীর্ত্তন-গায়ক। ইঁহার শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে ইনি "প্রভু জ্যোতিশ্চন্দ্র" নামে খ্যাত। সংবাদ পত্রাদিতে ইঁহার সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকে। ইঁহাকে প্রবন্ধ-লেখক স্বরূপ পাইয়া আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আং সং

হয়, প্রায় দেখা যায়, তাঁহারা অধিক দিন বাঁচেন না। রোগীর মধ্যে বহুমূত্র রোগীও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। থার্ম্মিটারে যেমন জ্বর পরিমিত হয়, ক্ষুধার ন্যূনাধিক্যে সেইরূপ দেহের ক্ষয় পরিমিত হইয়া থাকে। সেই জন্য সকলেরই অল্পাশী বা মাত্রাশী হওয়ার কথা আয়ুর্ব্বেদ তারস্বরে বলিয়াছেন। যোগাভ্যাসের প্রথম অবস্থায় ঐ রূপ অল্পাহার করিতে হয়, ফল পাতা খাইয়া দিনপাত করিতে হয়। তখন যোগীর সবিকল্প সমাধির অবস্থা থাকে, তাহার ব্যুত্থান আছে। তাহাই কিছু আহারের আবশ্যক হয়। তাহার পর আর আহারের আবশ্যকই হয় না। তখন নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় যোগী ক্ষুৎপিপাসাদি বিবর্জ্জিত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ত্ব বা শিবত্ব লাভ করেন। যতদিন তাঁহাকে ক্ষুধার অধীন থাকিতে হয়, অর্থাৎ যতদিন তিনি কিছু না খাইয়া পারেন না, ততদিন তাঁহার সবিকল্প সমাধি থাকে, ততদিন তিনি অমর বা শিব নহেন। বোধ হয়, এই জন্যই শিবের অন্নভোগ হয় না। শিলারূপী নারায়ণকেও অন্ন ভোগ দিতে হয়। কিন্তু লিঙ্গরূপী শিবের সে 'ছেঁড়া-ল্যাঠা' নাই। কারণ শিব যোগীশ্বর—মহাযোগী। তবে তাঁহাকে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিয়া দেওয়া হয় বটে, তাঁহার কারণ, ভক্তের কাতর আবাহনে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়। কাজেই তখন যোগীর সবিকল্প সমাধির ব্যুত্থানের ন্যায় তাঁহাকে কিছু খাইতে হয়; কিন্তু তখন যাহা তিনি খান, তাহা ফল পাতা বা তাহারই মত কিছু;—অন্নের ন্যায় গুরুভোজ্য নহে। ভক্ত বা পূজক যে তাঁহার সমাধিভঙ্গ করে, তৎ-সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটি সনাতন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শিব-ব্রত বা গাজনের সময় 'সন্ন্যাসী'রা পূজা করিবার পূর্ব্বে 'প্রভু যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ, সেবকের দেখ রঙ্গ, পরিহার তোমার চরণে'', ইত্যাদি স্তব করিয়া তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করে।

আমরা যাহা খাই, তাহার সারাংশ আমাদের শরীরস্থ সপ্তধাতুর পোষণ করিয়া অসার অংশ মলস্বরূপ নির্গত হয়। কিন্তু যাঁহাদের অগ্নির বিলক্ষণ তেজ আছে, তাঁহাদের মলসঞ্চয় অল্পই হইয়া থাকে; এই জন্য তাঁহাদের শৌচক্রিয়ার নিত্য প্রয়োজন হয় না। আমরা এমনও লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা সপ্তাহে দুই বারের অধিক মলত্যাগ করেন না. অথচ তাঁহাদিগের শরীরে কোন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায় না, পরন্তু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট ও আনন্দময় দেখা যায়। যোগীরাও এই কারণে নিত্য মলত্যাগ করেন না। একটা প্রবাদ আছে:—একবার যোগী, দুইবার ভোগী, তিনবার রোগী।

মিতাচারী ও অল্পভোগী হইলে এবং পারমার্থিক চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। সে অবস্থায় মলে দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে সদগন্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে ভগবান ঋষভদেবের যোগসাধন বিষয়ে ঐ কথা লিখিত হইয়াছে, যথা;—

তস্য হ যঃ পুরীষসুরভিসৌগন্ধ্য বায়ুস্তং দেশং দশযোজনং সমন্তাৎ সুরভীং চকার।'

ইহার মোট অর্থ এই যে, ঋষভদেবের বিষ্ঠার সদগন্ধে দশযোজন স্থান পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়াছিল।

একজন চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ ইংরাজও এই

ভাবের কথা বলিয়াছেন। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে "Statesman" সংবাদপত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সুস্থব্যক্তির মলে দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে সদ্‌গন্ধ থাকে। সে কাগজখানি এখন আমার সম্মুখে নাই ও তাহার সন তারিখও আমার মনে নাই, কিন্তু তিনি যে উক্ত মল সম্বন্ধে 'of good odour' (সদ্‌গন্ধ-বিশিষ্ট) লিখিয়াছিলেন, ইহা আমার বেশ মনে আছে। কাগজখানি আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহাই তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

এখন এ সকল কথা যাক। ক্ষুধার বিষয় বলিতে যাইয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা বলিয়াছি যে, ক্ষুধাই আমাদের দেহ নষ্ট করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, ত্রিগুণের মধ্যে রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন বা স্থিতি এবং তমোগুণে নাশ হয়। ক্ষুধা রজোগুণের সহায়ক; কারণ, উহাতে আহারের দ্বারা দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্রের পুষ্টিসাধন হয়; সুতরাং উহা জীবসৃষ্টির হেতুরূপে কার্য্য করে। পক্ষান্তরে, ইহাতে স্থিতি বা পালন কার্য্যও হয়। কারণ, ক্ষুধা না হইলে আমরা আহার করিতে পারি না, এবং আহার না করিলে আমরা জীবিত থাকিতে পারি না। এই রূপে ক্ষুধা—সৃষ্টি ও স্থিতির সহায়ক হইয়াও ভিতরে ভিতরে প্রলয়ের বা নাশের কার্য্য করিয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ক্ষুধা দেহ-ক্ষয়ের একরূপ পরিমাপক যন্ত্র মাত্র।

এখন একদিকে আমরা দেখিতেছি যে, তমোগুণাত্মক ক্ষুধাই সত্ত্ব গুণের ও রজোগুণের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। ইহা হইতে আমরা পুরাণের একটি গভীর তথ্য বুঝিতে পারি। শৈব-পুরাণ মাত্রেই, রজোগুণাত্মক ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণাত্মক বিষ্ণু এতদুভয়ের উপর তমোগুণাত্মক শিবের বা রুদ্রের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহা কিরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা এখন আমাদিগের বুঝিতে বাকী রহিল না, অন্ততঃ আমরা কতকটাও বুঝিলাম। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এ তিনের (বা সত্ত্বরজস্তমগুণত্রয়ের) প্রত্যেকের অপর দুইটির উপরে বিষয়-বিশেষে প্রভুতা আছে বা হইয়া থাকে, এবং ইহারা আপনাদের মধ্যে কাহাকেও ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করেন না। তাহাই মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন :—

ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।

দেবী ভগবতী মহামায়া ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া পুরাণে কথিতা। রজোগুণের কার্য্যে—তিনি ব্রহ্মার শক্তি বা ব্রাহ্মী, সত্ত্বগুণের কার্য্যে—তিনি বৈষ্ণবী বা বিষ্ণুর শক্তি এবং তমোগুণের কার্য্যে তিনি শৈবী, রুদ্রাণী বা শিবশক্তি। মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীতে তাঁহাকে ত্রিগুণাত্মিকা ভাবে অনেক স্থলে স্তব করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "নারায়ণী স্তোত্র" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাতে তাঁহার রজোগুণাত্মক ও সত্ত্বগুণাত্মক ভাবের স্তুতির সহিত তমোগুণাত্মক বা নাশকর ভাবের স্তুতিকালে বিশেষ মতে উল্লিখিত হইয়াছে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

আবার তাঁহার তমোগুণ বা প্রলয়ঙ্করী শক্তি সম্বন্ধে "আদ্যা" স্তোত্রে বলা হইয়াছে :—

ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাম্ বেলা ত্বং সাগরস্য চ।

সাগরের বেলাও প্রলয়ের বা বিনাশের গম্ভীর চিত্র। এই বেলায় কত না জলমগ্ন নর-নারী-দেহ বিলুণ্ঠিত। এই বেলা কত না বুভুক্ষু শবভুক্ পশু পক্ষীদিগের কঠোর চীৎকারে নিরন্তর মুখরিত। এই বেলায় কত না পোত চূর্ণীকৃত—অন্ধকারে সে দৃশ্য আরও কত ভয়ানক। তাহাই আমেরিকান কবি Edgar Allan Poe তাঁহার বিখ্যাত "Raven" নামক কবিতায় সাগর-বেলার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, Night's Plutonian shore অর্থাৎ "কৃতান্তের তামসী-বেলা"।

পুনশ্চ "প্রাধানিক রহস্য" নামক তন্ত্র—তামসী অর্থাৎ বিনাশকারিণী শক্তি মহাকালীর নামকরণ কালে "ক্ষুধা" তাঁহার অন্যতম নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা: –

মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধাতৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥

এখন বুঝ ক্ষুধা কি জিনিস!!!

পল্লীমাতার অরণ্যে রোদন।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ]

পল্লী উদ্ধারে প্রত্যেক নগরবাসী মনোনিবেশ করুন। সহরে ভদ্রমহোদয়গণ সুসজ্জিত বৈঠকে বসিয়া বুদ্ধিবলে অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন বটে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার (লবু বালাম চালের ভাত ও মুগের দালও) সম্পূর্ণরূপে পল্লীর উপর নির্ভর করিতেছে। পল্লী মরিলে, তাঁহারা কি ইট-কাঠ পাথর-মোটর-স্ত্রীর গহনা ও কোম্পানীর কাগজ চর্ব্বণ করিয়া প্রাণধারণ করিবেন? ভীমকায় নগরাসুরকে খাওয়াইবার জন্য শেষ রাত্রিতে ম্রিয়মাণ পল্লী হইতে দুধ, মাছ, তরকারী প্রভৃতি খাদ্য সম্ভার লইয়া মনোল্লাসে বাষ্পীয় শকট সহরাভিমুখে ছুটিয়াছে। পল্লী মরিলে কে এই বিরাট দৈত্যের খোরাক যোগাইবে?

আর বসিয়া মজা দেখিবেন না—কায়মনোপ্রাণে পল্লী উদ্ধার ব্রতে লাগিয়া যান। মানুষ যাহা করিয়াছে, মানব কেন তাহা করিতে পারিবেনা? প্রতীচ্য জগতে বহু ব্যাধি পীড়িত অস্বাস্থ্যকর স্থানও এক্ষণে অমরাবতী সদৃশ বলবীর্য্যপ্রদ সুন্দর স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত হইয়াছে। সুয়েজ ও পানামা খাল মানুষেই কাটিয়াছে, আর আমাদের দেশের মানুষ কি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের খাত দীঘিপুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিতে পারিবে না? নিবিড় বন জঙ্গল পাহাড় কাটিয়া মানুষেই রেলবর্ত্ম লইয়া গিয়াছে; আর আমাদের দেশের মানুষ কি নিজ নিজ জন্মভূমি ক্ষুদ্রপল্লীর বনঝোপ কাটিয়া স্থানটিকে বাসোপযোগী করিতে পারিবে না? প্রচেষ্টা, একাগ্রতা, অধ্যবসায় ত্যাগ, একতা, সহযোগিতা ও সমবায়ের ফল অবশ্যই ফলিবে। সাধন-সমরে কর্ম্মকেশরী নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, হৃদয়ে

অসীম সাহস, উদ্যম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ধারণ করিয়া পল্লীউদ্ধারে লাগিয়া" দেখুন, আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমের পুরস্কার মিলে কি না।

যাঁহারা ইংরাজীনবিশ ও পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন তাঁহারা যেন স্থিরচিত্তে একটীবার ভাবিয়া দেখেন যে প্রতীচ্য জগতে Back to the country, back to the land এই মঙ্গল বাণী উদ্‌ঘোষিত হইতেছে সে দেশের মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ বুঝিয়াছেন যে, সহরগুলি শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায়াদির কর্ম্মকেন্দ্র হইলেও, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ-জীবনপ্রার্থী মানবকে ধূম-ধূলি আকুলিত অতি কোলাহল আলোড়িত কৃত্রিমতা মণ্ডিত জনতাপূর্ণ অগ্নিতুল্য নগর পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসুন্দর সত্বগুণ-প্রধান উদ্বেগ বিহীন আনন্দময় পল্লীর শান্তিময় সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেই হইবে। তাঁহাদের মনে লাগিয়াছে যে, কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ না হইলে শুধু বিজ্ঞান বলে উদ্ভাবিত শুষ্ক নীরস যন্ত্রে মানবের ক্ষুৎপিপাসা দূর করিতে পারিবে না, এজন্য তাঁহারাও পল্লী উদ্ধারে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। তাহা হইলে, আমাদের দেশের ইংরাজী শিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি সুসভ্য নগরবাসী ভদ্র মহোদয়গণ কি স্বীয় জন্মভূমি পল্লী জননীকে এখনও অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন পাপ পঙ্কময় কণ্টকাকীর্ণ 'পাড়াগাঁ' বলিয়া ঘৃণা করিবেন? স্বদেশ ও স্বজাতি-বৎসল ইংরাজ জ্ঞানশিক্ষা ও অর্থোপার্জ্জনের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রাণ পড়িয়া থাকে আপনার প্রিয়তম জন্মভূমি গ্রেটব্রিটেনের পল্লীগ্রামে। আর আমাদের দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত মহাজনেরা স্বীয় জন্মভূমি পল্লীকে একবারে ভুলিয়া সহরে নগরে পয়সা রোজগার করিতেছেন—পল্লীর নাম উচ্চারণ করিতে, কিংবা "পল্লী আমার পূর্ব্বনিবাস" এ কথা বলিতেও যেন ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন।

পল্লীর প্রতি বিধিই বাম দেখিতেছি, নতুবা পুত্র থাকিতে যে মাতার দুঃখ ঘুচিল না, তাঁহাকে আর ভাগ্যবতী কোন্ মুখে বলিব? পল্লী মাতার যে সন্তানগুলি বিদ্যা বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে উচ্চ স্থান অধিকার পূর্ব্বক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন, তাঁহারা আর দুঃখিনী মাতার দুঃখ দারিদ্র্য মোচনে যত্নশীল নহেন—মায়ের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহেন না। কি বিচিত্র কালের ধর্ম্ম! তাঁহারা বড় লোক হইয়া সহরের বড়লোক সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া যাইতেছেন, স্বীয় জন্মভূমি অনাথা পল্লীমাতার চোখের জল মুছাইতেছেন কই? পল্লীমাতা তাই অহোরাত্র অরণ্যে রোদন করিতেছেন—শিরে করাঘাত করিয়া করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছেন:—"হায়! কতকগুলি প্রাণহীন কৃতঘ্ন পশু প্রসব ও পালন করিয়া আমার কাঁদিতেই জন্ম গেল—সুখ ভোগ আর ভাগ্যে ঘটিল না!!

আচমন ও প্রাণায়ামে আয়ুর্ব্বেদ।

[শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ বেদান্ত শাস্ত্রী]

—:০:—

১ম

আচমন সকল ধর্ম্ম কার্য্যেরই অঙ্গ। ভোজনের পূর্ব্বে অবশ্য করণীয়। আচমন না করিয়া অন্ন ভোজন (অবশ্য বর্ত্তমান সময়েও) দ্বিজের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু যে কোন খাদ্য দ্রব্য গ্রহণের (ভোজনের) পূর্ব্বে আচমনের বিধি। আচমন অন্নের (খাদ্য দ্রব্যের) বাস বা আচ্ছাদন। বাস বা আচ্ছাদন যেমন উপরে ও নিম্নে দুই প্রকার, আচমনও তাই ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে "আস্তরণ ও পিধান" ভেদে দুই রকম। দ্বিবিধ প্রমাণ যথা।

"অমৃতোঽপিস্তরণ মসি"

"অমৃতপিধান মসিস্বাহা"

জলই অমৃত। সেই জলই অন্নের আস্তর (পাতিবার বস্ত্র যথা গালিচা সতরঞ্চি প্রভৃতি) হউক ইহাই ভোজনের পূর্ব্বের প্রার্থনা। জলই আবার ভোজনের শেষে পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন স্বরূপ হউক; ইহা ভোজনের পরের প্রার্থনা। আচ্ছাদন (ঢাকনি দ্রব্য) খুলিয়া ভোজনের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ জলপান এবং ভোজনের শেষে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জলপান অবশ্য কর্ত্তব্য—এই ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে নিরতিশয় উপকারক।

খাদ্য দ্রব্য যত সত্বর দ্রবীভূত হইয়া আইসে, খাদ্য দ্রব্যের কাঠিন্য যত সত্বর দূর হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। কারণ কাঠিন্য দূর হইলে, তরল এবং দ্রবীভূত হইয়া আসিলে সহজে এবং দ্রুত গল-নাল পথে প্রবেশ করিতে পারে। এটি জীর্ণতার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয়—তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

"প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা এবং সমানায় স্বাহা।" এই পাঁচটি মন্ত্রে অন্নগ্রাস গ্রহণের বিধি। প্রাণ অপানাদি পাঁচটি বায়ু জীব-শরীরে বর্ত্তমান। প্রাগ্‌গমনশীল বায়ুই প্রাণ। নিম্ন গমনশীল বায়ু অপান। ঊর্দ্ধগমনস্বভাব বায়ু উদান। সর্ব্বশরীরব্যাপী বায়ু ব্যান। সমীকরণশীল—অর্থাৎ পরিপচনকর্ত্তা বায়ু সমান।

আচমনের পূর্ব্বে অন্নের কিঞ্চিৎ অগ্রভাগ ত্যাগ বিধেয়। অগ্রভাগেই যত কিছু দোষ থাকে, যাহা কিছু পড়িবার সম্ভাবনা উপরি-ভাগেই থাকে। ঐ অগ্রভাগ জীবকে দান করার ব্যবস্থা আচমনে দৃষ্ট হয়। যে খাদ্য-দ্রব্য এত প্রিয়, ক্ষুধার, সময়েও সেই খাদ্য-দ্রব্যের অগ্রভাগ অগ্রে জীবের উদ্দেশে দান করা—কি উদার স্বার্থত্যাগের ব্যবস্থা, কিবা মহান্ সংযমের শিক্ষা!

ক্ষুধার প্রকোপে পরিশ্রমের শান্তিতে কণ্ঠনালী শুষ্ক হইয়া সারা শরীরে পাকস্থলীতে একটি উষ্ম তাপ দেখা যায়। আচমনের জলে

সেই উষ্ণতা দুরীভূত হয় এবং কণ্ঠনালী সরল হইয়া উঠে। অল্পে অল্পে কণ্ঠ ভিজাইলে গলনালী-পথ পরিস্কৃত হইয়া আসে। ফলে খাদ্য প্রবেশের কোন ব্যাঘাত জন্মে না, গলায় গলায় বাধিয়া যাইবার ভয় থাকে না, হঠাৎ উষ্মা পাকস্থলীতে পড়িয়া কোনপ্রকার বিষম ফল উৎপাদিত হইতে পারে না।

ভোজনের পূর্ব্বে কেবল অন্ন অর্থাৎ শুধু ভাত পঞ্চগ্রাসে খাওয়ার ব্যাপারে কেবল যে জীর্ণতার সুবিধা হয় তাহা নহে, প্লীহা-যকৃতাদি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। একটি সন্ন্যাসী আমাকে প্লীহা রোগের একটি মুষ্টিযোগ শিখাইয়া দেন। বলেন—ভোজনের পূর্ব্বে বড় বড় পঞ্চগ্রাস শুধু ভাত খাইয়া লইবে, তৎপরে ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবে। ঐ আচমনটিই বড় বড় গ্রাসে ব্যবস্থিত হইল। বলা বাহুল্য আমি তাহা করিতাম এবং তাহার ফলেই হউক আর অন্য কারণে হউক, আমার প্লীহা সারিয়া গেল।

দম্পতী জীবন।

স্তন্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি—গত বর্ষের পর হইতে)

[কবিরাজ শ্রীদ্বারকানাথ সেন কাব্য-ব্যাকরণ-তর্কতীর্থ]

শিশুর যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে স্তন দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ না হইলে শিশুর পক্ষে হিতকর না হইয়া, অশেষবিধ রোগেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য দুগ্ধ বিশুদ্ধ কিনা—সে দিকে লক্ষ্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন করা, কুপথ্য ভোজন, কোন দিন বেশী—কোন দিন বা কম এবং ঠিক সময়ে না খাওয়া, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ দ্রব্যের এককালে ভোজন, অতিমাত্রায় ভোজন, লবণ, অম্ল, ঝাল, ক্ষারদ্রব্য এবং পচাদ্রব্যের অতি সেবন, মানসিক দুঃখ, শরীরের সন্তাপ, রাত্রিজাগরণ, চিন্তা, মলমূত্রের বেগধারণ বা বেগ না আসিলেও বেগ প্রদান, গুড় কৃত পরমান্ন, দধি, মৎস্য, ছাগাদি গ্রাম্যমাংস, বা কচ্ছপাদি জলজমাংস বা শূকরাদি আনূপ-মাংসের অতি ভোজন, প্রত্যহ আহারের পরই দিবা নিদ্রা, অতিশয় মদ্যপান, পরিশ্রম-হীনতা, লগুড়াদি দ্বারা আঘাত, ক্রোধ এবং রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীরের ক্ষয় প্রভৃতি কারণে বায়ু, পিত্ত এবং কফ প্রকুপিত হইয়া দুগ্ধবাহিনী শিরা সকলকে আশ্রয় করতঃ দুগ্ধকে দূষিত করে। এই স্তন্য দোষ আট

প্রকার, যথা বৈরস্য, ফেনিলতা ও রুক্ষতা. বৈবর্ণ্য, দৌর্গন্ধ্য, স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা।

ইহার মধ্যে স্তন্যের ফেনিলতা ও রুক্ষতা —এই দোষ দুইটী কেবল দুষ্ট বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু কুপিত বায়ু ইহার কারণ হইলেও ইহার সহিত পিত্ত ও কফের কিছু সম্পর্ক থাকে।

স্তন্যের বৈবর্ণ্য ও দৌর্গন্ধ্য প্রধানতঃ পিত্তের দোষেই হইয়া থাকে, তবে বৈবর্ণ দোষে বায়ু ও কফের এবং দৌর্গন্ধ্যে কেবল কফেরই সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

দুষ্ট কফের দ্বারা স্তন্যের স্নিগ্ধতা, পিচ্ছিলতা ও গুরুতা দোষ জন্মে।

এই আটপ্রকার দোষের উৎপত্তি ক্রম-লক্ষণ ও চিকিৎসার্থ ঔষধ লিখিত হইতেছে,

(১) বায়ু রুক্ষাদি নিজ প্রকোপক কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া দুগ্ধাশয়কে আশ্রয় করতঃ স্তন্যের স্বাভাবিক বিকৃতি করিয়া থাকে, সেই বায়ু সংসৃষ্ট বিরস দুগ্ধ পান করিলে শিশু কৃশ হয়। উহার দুগ্ধে রুচি থাকে না এবং উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীঘ্র পুষ্ট না হইয়া দীর্ঘ-কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (স্তন্যের বৈষম্য দোষের লক্ষণ।)

নারীর দুগ্ধ বিরস হইলে দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, অনন্তমূল ও ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক দ্রব্য সমান পরিমাণে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ চারি আনা মাত্রায় সকালে একবার ও বৈকালে একবার গরম জল সহ পান করিবে।

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ ও বনকুলথ কলায়, সমান ভাগে ভাল করিয়া বাটিয়া তাহার দ্বারা স্তনদ্বয়ের উপর প্রলেপ দিতে হইবে, উহা ধুইয়া ফেলিয়া নিঃশেষরূপে দুধ গালিয়া ফেলিবে। এইরূপ কিছু দিন করিলে স্তন্যের বিরসতা দোষ দূর হয়।

(২)

বায়ু কুপিত হইয়া দুগ্ধকে অন্তরে মথিত করে, সেই কারণে স্তন্যের ফেনিলতা দোষ জন্মে, ইহাতে দুগ্ধ অল্প পরিমাণে কষ্টে নির্গত হয়। এই দুগ্ধ পান করিলে শিশুর স্বরভঙ্গ অথবা ক্ষীণ স্বর হয়, মল ও মূত্রের বিবন্ধ—বায়ু জন্য শিরোরোগ এবং পীনস (সর্দ্দি) হইয়া থাকে।

এই দোষে প্রসূতিকে আকনাদি, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘার মূল ও মূর্ব্বা, এই কয়টী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমানভাগে মিশাইয়া এক'সিকি পরিমাণে ঐ চূর্ণ সকালে ও বৈকালে দুইবেলা গরম জল দিয়া খাইতে দিবে।

রসাঞ্জন, তগরপাদুকা, দেবদারু, বেলেরমূল. ও প্রিয়ঙ্গু সমানভাগে জল সহ বাঁটিয়া স্তনদ্বয়ে প্রলেপ দিতে হইবে, প্রলেপ শুষ্ক হইলে ধুইয়া দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে। ইহাতে দুগ্ধ শোধন হইবে।

চিরতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চের কাথ পান করিলে স্তন্য শোধন হয়। (কাথ পাচনবৎ ব্যবস্থেয়)।

এইরূপ দুগ্ধ শোধনের জন্য যব, গম, শ্বেত সর্ষপ বাঁটিয়া পূর্ব্ববৎ লেপন দিবে।

(৩)

দুষ্ট বায়ু দুগ্ধের স্নেহভাগ শোষণ করিলে উহা রুক্ষ হয়, সেই দুগ্ধ পান করিলে শিশুর বল কমিয়া যায় এবং শরীর কর্কশ (খস্‌খসে) হয়।

আকনাদিমূল শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মূর্ব্বা,

(মুগডাল), গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটকী, অনন্তমূল এই দশটী দ্রব্যের সহিত গোদুগ্ধ পাক করিয়া খাইলে স্তন্যের রুক্ষতা দোষ দূর হয়।

ঐ দশটী দ্রব্যের কাথ ও কল্ক দিয়া ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত খাইলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

বেলছাল,শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল-ছাল ও গণিয়ারী ছাল অথবা শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর একত্র বাঁটিয়া ঈষৎ গরম করিয়া পূর্ব্ববৎ লেপন দিলে স্তন্যের রুক্ষতা দুর হয়।

এই রোগে জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, উষ্ণ প্রলেপও হিতকর।

(৪)

যে প্রসূতি লবণ, ঝাল, অম্ল, গরম দ্রব্য প্রভৃতি অতিমাত্রায় সেবন করেন, পিত্ত কুপিত হইয়া তাঁহার দুগ্ধাশয়কে আশ্রয় করিয়া দুগ্ধের বৈবর্ণ্য উৎপাদন করে, ইহাতে দুগ্ধ নীল, হলদে, কাল প্রভৃতি বর্ণ ধারণ করে, শিশু সেই দুগ্ধ পান করিলে তাহার গাত্র বিবর্ণ ও ঘর্ম্মযুক্ত হয়, পিপাসা হয়, পাতলা দাস্ত হয়, সর্ব্বদা শরীর গরম হইয়া থাকে, শিশু ঐ দুগ্ধ খাইতে চাহে না।

যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌, ক্ষীরকাকোলী ও নিসিন্দা মূল প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা একত্র বাটিয়া শীতল জলের সহিত সকালে ও বৈকালে পান করিলে দুগ্ধের বিবর্ণতা নষ্ট হয়।

দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু বাঁটিয়া স্তনে লেপন দিতে হয়। প্রলেপ শুষ্ক হইলে জল দিয়া ধুইয়া পুনঃ পুনঃ গালিয়া ফেলিবে।

(৫)

বাসি-পচা প্রভৃতি দ্রব্যের সেবন হেতু পিত্ত খারাপ হইলে দুগ্ধের দুর্গন্ধতা হয়, তাহা পান করিলে শিশুর পাণ্ডুরোগ ও কামলা হইয়া থাকে।

মেষশৃঙ্গী, অজশৃঙ্গী, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা ও বচ মিলিত একসিকি বাঁটিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত পান করিলে দুগ্ধের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

প্রসূতি পথ্যাশিনী হইয়া হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল ও গোলমরিচের চূর্ণ মধুর সহিত আলোড়ন করিয়া পান করিবেন।

অনন্তমূল, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, চাল্‌তা ও রক্তচন্দন কিংবা তেজপাতা, রক্তচন্দন ও বেণারমূল বাঁটিয়া স্তনের উপর প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে ধুইয়া দুধ গালিয়া ফেলিতে হইবে।

(৬)

শ্লেষ্মগুরু প্রভৃতি কারণে কুপিত হইয়া প্রসূতির দুগ্ধাশয়কে অধিকার করে এবং নিজের স্নেহগুণ দ্বারা দুগ্ধকে অতিশয় স্নেহান্বিত করে। এই অতি স্নিগ্ধ দুগ্ধ পান করিলে শিশুর বমি, কুঁথুনী ও লালাস্রাব হয়। আর শিশুর স্থূল শিরা সকল শ্লেষ্মলিপ্ত হওয়াতে অতিশয় নিদ্রা ও আলস্য, শ্বাস, কাস এবং তমক শ্বাস হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ স্নিগ্ধতা দোষে দূষিত হইলে দেবদারু, মুথা, আকনাদিমূল ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে সত্বর স্তন্যদোষের শান্তি হয়।

দূষিত কফ ঐভাবে দুগ্ধকে দূষিত করিয়া উহার পিচ্ছিলতা দোষ উৎপাদন করে। ঐ পিচ্ছিল দুগ্ধ পান করিলে শিশুর লালাস্রাব, মুখ, চক্ষু শোথযুক্ত ও জড়তা হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ পিচ্ছিল হইলে কাকজঙ্ঘা, হরীতকী ও বচ; কিংবা মুথা, শুঁঠ ও আকনাদি মূল বাটিয়া গরম জল সহ পান করিবে।

এই দোষে ভূমি কুষ্মাণ্ড, বেলছাল ও যষ্টি-মধু পেষণ করিয়া স্তনে লেপন দিতে হইবে।

(৮)

দুষ্ট কফ দুগ্ধাশয়স্থ হইলে নিজের গুরুত্ব-গুণে দুগ্ধের গুরুতা দোষ ঘটাইয়া থাকে। ঐ দুগ্ধ পান করিলে সন্তানের হৃদ্রোগ জন্মে এবং কফ জন্য রোগ হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধ গুরু হইলে প্রসূতি বলাডুমুর, গুলঞ্চ, নিমছাল, পলতা, আমলা, হরীতকী ও বহেড়ার কাথ পান করিবে।

পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠের কাথ ও এই দোষে হিতকর।

দুগ্ধের গুরুত্ব দোষ নিবারণের জন্য বেড়ালামূল, শুঁঠ, কাকজঙ্ঘা, মুর্ব্বা পেষণ করিয়া স্তনে প্রলেপ দিবে।

চাকুলে ও ক্ষীরকাকোলীর লেপনও দুগ্ধের গুরুতা দোষ দূর করিয়া থাকে।

(দুগ্ধ শোধনার্থ সামান্যতঃ কয়েকটি যোগ),—

(১) আকনাদিমূল, শুঁঠ, দেবদারু, মুথা, মুগ্‌রো, (মুর্ব্বা) গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কট্‌কী ও অনন্তমূল।

(২) কাকজঙ্ঘা, ছাতিমছাল, অশ্বগন্ধা।

(৩) গুলঞ্চ ও ছাতিমছালের কাথে, শুঁঠচূর্ণসহ।

(৪) বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালিপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর।

ইহাদের মধ্যে যে কোনটী যোগের পাচন করিয়া খাইলেও সকল প্রকার স্তন্য দোষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দুগ্ধ জনন দ্রব্য

প্রসূতির দুগ্ধ কম হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য-গুলি ভোজন করিলে উহা বৰ্দ্ধিত হয়। মাংস, শাক, অধিক মিষ্ট, অম্ল, ও দুগ্ধ।

ভূমি কুষ্মাণ্ডের চূর্ণ মদ্যের সহিত অথবা রামশালি, গোকুলশালি প্রভৃতি শালি ধান্যের চাউল গোদুগ্ধ সহ বাটিয়া খাইলে জননীগণের স্তন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু, অথবা বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর এই সমস্ত দ্রব্যের পাচন করিয়া খাইলেও দুগ্ধ বৰ্দ্ধিত হয়।

বিশুদ্ধ দুগ্ধের লক্ষণ

দুগ্ধ যদি শীতল, নির্ম্মল, পাতলা, শ্বেতবর্ণ এবং জলে নিক্ষেপ করিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, ফেন যুক্ত হয় এবং তাহাতে সূতা না কাটে, তাহা হইলে সে দুগ্ধ বিশুদ্ধ। ইহার বিপরীত হইলে তাহা দোষযুক্ত জানিবে।

উড়ুম্বর।

(রিপোর্টারের পত্র)।

—:০:—

কলিকাতার আয়ুর্ব্বেদ সভার উদ্যোগে গত ১লা মাঘ সোমবার কলেজ স্কোয়ার থিওসফিকেল হলে 'উড়ুম্বর-পত্রের গুণ আবিষ্কার উপলক্ষে উক্ত সভার এক সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ, ডাক্তার ও ভদ্র মহোদয়গণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। বহু পত্রিকার সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে আয়ুর্ব্বেদ সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথসেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস, মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"অদ্য আমি আপনাদের নিকট চিকিৎসক চূড়ামণি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ইনি চম্পারণ জেলার অন্তর্গত রত্নমালা গ্রামের সদ্ ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইনি বিপুল অর্থশালী হইয়াও পরোপকার ব্রতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইনি জমিদারীর আয় হইতে যৎসামান্য মাত্র স্বীয় পরিজনবর্গের ভরণ পোষণার্থ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অর্থ দীন হীন, মরণোন্মুখ রোগীর ঔষধের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন। এদেশে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বৈদ্যকে বিদ্যার উন্নতি কল্পে এই মহাত্মা স্বীয় জন্মভূমি রত্নমালা গ্রামে একটী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত একটী "আতুরাবাস" স্থাপন করিয়া রোগীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দীন দরিদ্র রোগার্ত্তজনের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। বিদ্যার্থীগণের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ও তাহাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়—ভিন্ন ভিন্ন ঔষধের গুণাবিষ্কারে সর্ব্বদা রত থাকেন। নিখিল আয়ুর্ব্বেদ সমুদ্র মন্থন করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে সম্প্রতি তিনি যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুর দংশনজনিত বিষের ঔষধ, সর্প দংশন জনিত বিষের ঔষধ ও জলোদরের ঔষধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধের মধ্যে আজ উড়ুম্বর পত্রের গুণ সম্বন্ধে তিনি আপনাদের নিকট তাঁহার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিবেন,—"

আয়ুর্ব্বেদের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার দিক্‌দর্শন করাইবার নিমিত্ত উক্ত পণ্ডিত মহাশয় নিম্নলিখিত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন,—

"আমি যদিও বাল্যকাল হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস,

ছিল—আয়ুর্ব্বেদ অপূর্ণ শাস্ত্র, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র পূর্ণ। কারণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা—আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানী প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের সারাংশ লইয়া বহু পরীক্ষা ও গবেষণার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এজন্ত আমার নিকট তখন যত রোগী আসিত, আমি তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী এলোপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারীতে সাহায্য লইতে পাঠাইয়া দিতাম। ঐ ডিস্‌পেন্‌সারীতে ৫০।৬০ বৎসর বয়সের দুইটী জীর্ণজ্বর, গ্রহণী ও শোথগ্রস্ত রোগী পাঠাইয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ ৬ মাসের মধ্যে উভয় রোগীই আমার প্রাণে আঘাত দিয়া ইহলোক ত্যাগ করে। কিছুদিন পরে আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী উক্তরোগে আক্রান্ত হইলেন। আমি তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তাঁহার তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ প্রভৃতি শুনান কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। কিছুদিন পরে আমার একজন শিষ্যের পরামর্শে নিজে আয়ুর্ব্বেদ প্রণালীতে তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই আমার মা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। ইহার পরে আমার একজন প্রজার জলোদর হইয়াছিল, সে ব্যক্তি ডাক্তারী চিকিৎসায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমার নিকট আসিলে ভগবানের অনুগ্রহে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা করিয়া উক্ত রোগীকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। অষ্টাদশ বর্ষীয় একজন মুসলমান বালকেরও ৩ মাসের মধ্যে জলোদরের চিকিৎসায় সফলকাম হইয়াছিলাম। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইল, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এখনও বহু অমূল্য রত্ন নিহিত আছে। অতঃপর আমি বিশেষ সাহসের সহিত আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা-কার্য্যে প্রাণমন সমর্পণ করিলাম। ভগবানের অনুগ্রহে, আমার হাতে বহু রোগীর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে—এই টুকু আমি বিনীত ভাবে আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি। আমার নিজের গ্রাম ও তৎসন্নিহিত গ্রামের লোক সমূহের ধারণা হইল—আমি যাদুমন্ত্রে চিকিৎসা করি। কিন্তু বাস্তবিক আমার ঐরূপ কোন মন্ত্র নাই—যাহা কিছু আছে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদের মাহাত্ম্যে। আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন—আমার এরূপ খ্যাতি শুনিয়া স্থানীয় হাঁসপাতালের ডাক্তার মহাশয়ের ঈর্ষা হইল। তিনি জেলার কলেক্টর সাহেবের নিকট—আমার বিরুদ্ধে আমি অর্থ না লইয়া চিকিৎসা করিয়া হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছি—এই মর্ম্মে অভিযোগ করিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, কলেকটার সাহেব নিজেই আসিয়া আমার কার্য্য পদ্ধতি দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং ডাক্তারের অভিযোগ আমার প্রশংসায় পরিণত হইল। তিনি আমার কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আমাকে বিশেষ রূপে সাহায্য করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। কমিশনার সাহেব আমার চিকিৎসা-প্রণালী দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন ও বিদ্যালয়ের কার্য্যে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিলেন। আমি তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া নূতন নূতন ভেষজের আবিষ্কার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম। জন সাধারণের সুবিধার জন্ত আমার আবিষ্কৃত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব। [আগামীবারে সমাপ্য]।

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।*

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত এচ্, এম্, বি]

—:०:—

(৫৪) অজীর্ণ রোগে—ধনিয়া এক তোলা ও শুঁঠ এক তোলা ইহাদের কাথ সেবনে অজীর্ণ ভাল হয়।

(৫৫) ত্রিফলা চূর্ণ সৈন্ধব লবণ সহ সেবনে অজীর্ণ উপশমিত হয়।

(৫৬) প্রত্যহ প্রাতঃকালে আদা, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও মন্দাগ্নি ভাল হয়।

(৫৭) যোয়ান ও শুঁঠ উভয়ে এক তোলা লইয়া ৴।০ এক পোয়া জলে সিদ্ধ করতঃ ৴০ ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অজীর্ণ, পেটফাঁপা চুঁয়া ঢেকুর প্রভৃতি নষ্ট হয়,। উপরোক্ত মুষ্টিযোগ চারটী আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

(৫৮) হিক্কায়—পলতার রস এক তোলা ও আমলকীর রস এক তোলা মধুর সহিত পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

(৫৯) শুঁঠ চূর্ণ সহ গরম গরম ছাগদুগ্ধ পান করিলে হিক্কা নষ্ট হয়।

(৬০) শ্বাসে শ্বেত ধুতুরার শুষ্ক ফুল গুঁড়া করিয়া কাগজের দ্বারা চুরুট করিয়া তাহার ধুম পান করিবে শ্বাস ভাল হয়। ইহা ব্যবহারে আমরা অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছ।

(৬১) পিপাসায়—পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত দধি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু পিপাসার নিবৃত্তি হয়। দাহ রোগে—ধনিয়ার কাথ চিনির সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে দাহ ও তৃষ্ণা নষ্ট হয়।

(৬২) উপদংশে—সাদা ধুনার গুঁড়া ও মাখম—সম পরিমাণে মর্দ্দন করিলে উপদংশের ঘা শুকাইয়া যায়।

(৬৩) বামন হাটির মূল, আপাঙ্গ মূল, চন্দন, মনঃশিলা এই সকল পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত ভাল হয়।

(৬৪) সোণাছাল, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ইহাদের কাথে, গুগ্গুলু ও ত্রিফলা চূর্ণ ৴০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া ৫।৭ দিন পান করিলে উপদংশের বিষ নষ্ট হয়। ইহা ব্যবহারে আমরা অনেক স্থলে বিশেষ উপকার পাইয়াছি।

(৬৫) বসন্তে—পিড়কা সকল সম্পূর্ণরূপে উন্নত না হইলে কাঁচা হরিদ্রার রস, মাখমের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে।

(৬৬) বসন্তের প্রথম অবস্থায়—মেথী

* আমার পিতামহ ইটালির স্বনামধন্য স্বধিকর্ম্ম কবিরাজ স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের পরীক্ষিত ঔষধাবলীর জীর্ণ খাতা হইতে সংগৃহীত।—লেখক।

ভিজান জল, কুড় ও বাবুই তুলসীর কাথ অথবা কুড়, বাবুইতুলসীর শিকড় ও মানকচুর শিকড়ের কাথ সেবন করিলে উপকার হয়।

(৬৭) বসন্তের প্রথমাবস্থায় কুম্মুরিয়া লতার কাথে ৵০ আনা পরিমিত হিং প্রক্ষেপে দিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

(৬৮) বসন্তের প্রথমাবস্থায় জয়ন্তী অথবা শিকটী মূল—ঘৃত ও পর্য্যুসিক জলের সহিত পান করিতে হইবে।

(৬৯) সুপারীর মূল কিম্বা মরিচ ও ময়না ফল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জার মূল বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করা বসন্তের প্রথমাবস্থায় উপকারী।

(৭০) শ্বেত চন্দন ঘষা ৵০ আনা ও অর্দ্ধ ছটাক হিঞ্চেশাকের রস পান করিলে বসন্তের স্ফোটকগুলি ভাসিয়া উঠে।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

:o:

শোক সংবাদ।

আমরা শোক সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১০শে পৌষ বুধবার রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় দুবলহাটীর বিখ্যাত বড় রাজকুমার যদুনাথ রায় বাহাদুর পরলোক প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। স্বধর্ম্মপরায়ণতা, আশ্রিত বাৎসল্য, অতিথি সেবা, দানপালন, পরোপকার প্রভৃতি বংশোচিত গুণে দুবলহাটির রাজবংশ চিরকালই বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। স্বর্গীয় কুমার বাহাদুর বংশোচিত সমস্ত গুণেরই অধিকারী ছিলেন। ইঁহার স্বর্গীয় পিতা রাজা হর নাথ রায় বাহাদুর রাজসাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের ভূসম্পত্তি গভর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচুর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বোয়ালিয়া "তমোঘ্ন যন্ত্র" বিশ্রুত "হিন্দুরঞ্জিকা" মুদ্রিত হইয়া অদ্যাপি গৌরবের সহিত সমগ্র বঙ্গদেশে বিবিধ ধর্ম্মালোচনার পথ সুগম করিয়া আসিতেছে। পিতৃদেবের আচরিত পন্থানুসরণে উক্ত কুমার বাহাদুর দেশের ও সাধারণের বিবিধ হিতানুষ্ঠান রত ছিলেন। প্রজামণ্ডলীর হিতার্থ রাজধানীতে প্রথম শ্রেণীর এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ইঁহাদের অন্যতম সাধারণ কীর্ত্তি। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল দাস গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ মহাশয় উক্ত রাজ বংশের পারিবারিক চিকিৎসক পদে দীর্ঘ ২০শ বর্ষ ব্যাপিতকাল বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা তাঁহার মুখে বহু দিন হইতেই স্বর্গীয় কুমার বাহাদুরের বিবিধ সদগুণের কথা শুনিয়া আসিয়াছি। তাঁহার অমায়িক উদার চরিত্রে ইতর, ভদ্র সকলেই প্রীতিলাভ করিত। সর্ব্বসাধারণের উচ্চ শিক্ষার জন্ত তিনি নিজ বাটীতে উচ্চ ইংরজো বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ে বহুদূরাগত নিঃস্ব ছাত্রগণ রাজানুকূল্যে শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইতেছে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ধ্বংসের পথে বাঙ্গালী।

(ডাক্তার শ্রীখগেন্দ্রনাথ-বসু-কাব্যবিনোদ)

—— •:০:• ——

বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলেই আতঙ্কে প্রাণ শুকাইয়া যায়, বাঙ্গালী উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে, সভ্য হইতেছে, সভ্যজগতে সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতেছে, কিন্তু এদিকে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বিদেশ হইতে যে কেহ আসুক, সে একবার বাঙ্গালীর উপর তাহার প্রভুত্ব খাটাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। ফল কথা, বাঙ্গালী সকলের নিকটেই যেন সরকারী নাগর হইয়া পড়িয়া আছে, যে আসিবে, সেই একবার ইহাকে পিটিয়া যাইবে ; ব্যাধিগুলিও বাঙ্গালার মাটিতে কি মধু যে পাইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালায় একবার যে ঢুকিতেছে সেই কায়েমী মৌরসী জমা লইয়া চিরদিনের জন্য থাকিয়া যাইতেছে; তাহাকে তাড়াইবে এমন শক্তি কা'র ?

গভর্ণমেণ্টের সেনসাস রিপোর্ট হইতে আমরা দেখিতে পাই, ১৯১১ সালের মার্চ্চমাসের গণনা অনুসারে সমগ্র ভারতে লোকসংখ্যা একত্রিশ কোটী একান্ন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই ছিল, ১৯২১ মার্চ মাসের গণনায় মোটামুটি একত্রিশ কোটী নব্বই লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ দশবৎসরে মাত্র ৩৯ লক্ষের কিছু উপরে বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯০১ হইতে ১১ সালে দুইকোটী আটলক্ষ লোক বাড়িয়াছিল, গত দশবৎসরে লোক বাড়িয়াছে শতকরা ১'২৩ জন, তৎপূর্ব্ব দশবৎসরে বাড়িয়াছিল শতকরা ৭ জনের বেশী। পাঠক দেখিবেন, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে জন্মের হার কেমন ভাবে কমিয়া যাইতেছে! পরাধীনতার অবসাদ দুর্দ্দম্য দারিদ্র্যের সহিত ঘোর সংগ্রামে জীবনীশক্তির দ্রুত অপচয়, আর কলেরা-ইনফ্লুয়েঞ্জা বসন্ত-ম্যালেরিয়া ইত্যাদি

ব্যাধির তাণ্ডবলীলা—ইহাই কি যথেষ্ট কারণ নহে।

আবার স্বাধীন দেশের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন—ইংলণ্ড ও ওয়েলসের লোক-সংখ্যা ১৮৪১ সালের গণনায় শতকরা ১৪'২, ১৮৫১তে ১২'৬; ১৮৬১তে ১১'৯, ১৮৭১তে ১৩'২, ১৮৮১তে ১৪'৩, ১৮৯১তে ১১'৬, ১৯০১ এ ১২'১, এবং ১৯১০য়ে ১০'৯ বাড়িয়া ছিল।

বাঙ্গালায় মৃত্যুর হারই বা কি ভীষণ! বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের মিউনিসিপাল বিভাগ হইতে ১৯১৯ সালের জন্মমৃত্যুর যে তালিকা বাহির হয়, তাহাতে প্রকাশ, গত পূর্ব্ব বৎসরের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা ৩৯৬০০০ বেশী। কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ১,২৫০০০, বসন্তে ৩৭০০, জ্বরে ১২,২৯০০০। শিশুমৃত্যুর হার আরও ভয়ানক। যেখানে বিলাতে হাজার করা ৯০, স্কটল্যাণ্ডে ৯৭ অথবা আয়ারলণ্ডে ৮৩, সেখানে বাঙ্গালা দেশে হাজার করা ১০৫ (কলিকাতায় ২৫০) শিশু মারা যায়। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদী, তাই সে মনে করে সবই অদৃষ্টের ফল, নিয়তির গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, ঈশ্বর যেন শুধু ভারত-বাসী—তথা বাঙ্গালীর জন্যই অদৃষ্ট ও নিয়তির সৃষ্টি করিয়াছেন। বাঙ্গালী এমনি অপদার্থ, শক্তিহীন, 'জড়ভরত' হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার একবার বাঁচিবার ইচ্ছা হয় না, কখনও সে মনে করে না যে, একবার গা'ঝাড়া দিয়া উঠি, জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হই। সে নিতান্ত অসহায়ের মত আপন ইচ্ছায় কৃতান্তের জাল্লের ভিতরে যাইয়া ধরা দিতেছে।

চীনদেশে অকাল মৃত্যুর হার বাড়িয়া গিয়াছে, সেখানকার লোকসংখ্যা ৪০ কোটি, অথচ বৎসরে দেড়কোটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেজন্য সেখানে শিশুরক্ষার বিপুল আয়োজন চলিতেছে। স্বাস্থ্যসভা, শিশু সংরক্ষণ সমিতি, স্বাস্থ্য প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠান দ্বারা সন্তানবতী জননী সমাজকে এবং কুসংস্কারা-পন্ন গ্রামবাসীদিগকে নানাবিধ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বলা বাহুল্য তাহাতে ফলও হইতেছে আশাতিরিক্ত।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, প্রথম বৎসরেই অনেক শিশু মারা যায়, ইহার মধ্যে সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর হার বোধ হয় বেশী, এবং টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কারই সদ্যজাত শিশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ, কলিকাতার ন্যায় সহরে শিশুযকৃৎ অন্যতম। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। পল্লীগ্রামে ধনুষ্টঙ্কার ব্যাধির নামান্তর "পেঁচোয় পাওয়া।"

আজকাল বোধ হয় অনেকেই জানেন, কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর দুগ্ধই শিশুযকৃতের একমাত্র প্রধান কারণ। এখন আর মাতৃ-স্তন্যরূপ অমৃত অনেক শিশু-ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না, বামাগণের স্বাস্থ্য আলোচনা করিবার সময়ে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত বলিব।

গাভীকে যদি উন্মুক্ত ময়দানে চরিতে না দেওয়া যায় সর্ব্বদাই অল্প পরিসর স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে সে গাভীর দুগ্ধ কখনও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না, 'ফুকো' দেওয়া দুধ শিশুগণের পক্ষে বিষ তুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অথচ কলি-কাতার অধিকাংশ দুগ্ধই এই দোষে দুষ্ট, কলিকাতার ন্যায় স্থানে উন্মুক্ত ময়দানে গোচারণ

অসম্ভব হইলেও শেষোক্ত প্রক্রিয়ায়, কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ বহিষ্করণ চেষ্টা করিলে নিবারণ করা যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামে অনেকে গাভীপালন করিয়া থাকেন, কিন্তু যাহাদের অপরের উপর নির্ভর করিতে হয় তাহাদের ভাগ্যে খাঁটি জিনিস মিলে না। কলিকাতার দুধে কলের জল মিশাইলে বোধ হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে তত হানি জনক হয় না, কিন্তু পল্লীগ্রামের অনেকেই পচা ডোবা, হাঁদাপুকুর প্রভৃতির সদ্য প্রাণ নাশক বীজাণুসম্বলিত জল মিশাইয়া দুধকে বিষবৎ করিয়া তুলে, ইহা ভিন্ন দুধের মাখন তুলিয়া অনেকে ময়দা ইত্যাদি নানাবিধ বিক্রয় করে।

"পেঁচোয় পাওয়া" বা পল্লীগ্রামের ভাষায় যাহাদের বলে "পেঁচোপেঁচি", কুসংস্কারাপন্ন পল্লী রমণীদের মতে উপদেবতা বিশেষ। বোধ হয় তাহারা যুগলে অবস্থান করে বলিয়াই তাহাদের নাম পেঁচোপাঁচি, আঁতুড় ঘরের আনাচে কানাচে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকে, ক্ষণে ক্ষণে শিশু নানাবিধ বর্ণ ধারণ করে ও তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া যায়, অভিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবার দেখিবেন, এরূপ লক্ষণ সদ্যজাত শিশুর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়াই হইয়া থাকে, অপিচ সদ্যপ্রসূত শিশুর শ্বাসের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহার দেহের বর্ণের ও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে শিশুর ধনুষ্টারেও এই সমস্ত লক্ষণ ও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় পল্লীগ্রামের আঁতুড় ঘর যে পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়। তাহাতে শিশুদের শ্বাস কষ্ট হইয়া মৃত্যু ঘটিতে বেশী দেরী লাগে না, সাধারণতঃ বাড়ীর মধ্যে যেটি নিকৃষ্ট ঘর, তাহাতে অথবা তাহারই মত বারান্দার আঁতুড় ঘর প্রস্তুত করা হইয়া থাকে—যাহাতে কোনরূপ পেঁচো পাঁচিরা নিশ্বাস পর্য্যন্ত না প্রবেশ করাইতে পারে এরূপভাবে আলোক ও বাতাসের সামান্য পথটুকু রুদ্ধ করিয়াই ঘর খানি প্রস্তুত করা হয়, পরে সপ্তাহ ধরিয়া সেই ঘরে আগুণের কুণ্ড জ্বলিতে থাকে, তাহার গ্যাসটুকু পর্য্যন্ত বহির্গত হইবার উপায় থাকে না, ইহাতেও যে সমস্ত শিশু শ্বাস কষ্টে না মরিয়া বাঁচিয়া উঠে—তাহাদের পরমায়ুর বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে।

কুসংস্কাররূপ ব্যাধির শেষ এই খানেই নহে। আঁতুড়ঘরে কুমুরিয়া লতা নামক এক প্রকার কাঁটাযুক্ত লতার বের দেওয়া হইয়া থাকে। বেতের কাঁটাও দেওয়া হয়। বগ্গা নামক একপ্রকার গুল্মের ডাল বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে গুজিয়া দেওয়া হয়। কাঁটা দেওয়াতে বোধ হয় আঁচড়ে যাওয়ার ভয়ে অপদেবতা আঁতুড় ঘরে ঢুকিতে সাহস করে না।

এক কড়ি, দু কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, ছ'কড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি নামের একটা কৌতুকজনক ইতিহাস আছে, ছেলে জন্মান মাত্র ধাত্রী অথবা মাসী-পিসী ইত্যাদি আত্মীয়ারা মায়ের নিকট হইতে, এক কড়া, দু'কড়া ইত্যাদি কড়ি দিয়া ছেলেকে কিনিয়া লয়,ছেলে তখনই বিক্রীত হইয়া গেল, সুতরাং অপদেবতার সাধ্য কি পরের ছেলেকে লইবেন, অথবা 'উচ্ছিষ্ট' মনে করিয়াও তিনি ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। 'কড়ির' সংখ্যানুসারেই ছেলের নামকরণ হইয়া থাকে।

'মরাকে' পোয়াতির ছেলে জন্মান মাত্র তাহার কাণ, মেয়ে হইলে নাক—অথবা শরীরের অন্য কোনস্থান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয়।' তাহাতে ছেলে খুঁতো হইয়া গেল, এবং খুঁতো ছেলে যমের কোন প্রয়োজনে আইসে না।

কবি বলিয়াছেন—

যে নদী হারা'য়ে স্রোত চ'লিতে না পারে,
সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবন হারা অচল অসাড়,
পদে পদে বাঁধে তা'রে জীর্ণ লোকাচার।

কবির উক্তি এই হতভাগ্য জাতির উপর অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে। এই জাতি আজ সহস্র শৈবাল দাম পরিবেষ্টিত তটিনীর ন্যায় শক্তিহীন—এই জাতি আজ দর্পচ্যুতা অভিশপ্তা দেববালার ন্যায় দীনা ও মলিনা।

আমাদের দেশে আঁতুড় ঘর অত্যন্ত অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির অসাধ্য। আমাদের ধাত্রী বিদ্যার অধ্যাপক—বিষ্ণুর সহিত গর্ভস্থ ভ্রূণের তুলনা করিতেন। ভ্রূণের ফুলটি (placenta) বিষ্ণুর নাভি হইতে উত্থিত পদ্মের সহিত তুলিত হইত, দেবদেবীর আগমন পথ অথবা অবস্থান গৃহ সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখা হয়, ভ্রূণরূপ বিষ্ণুও ধরাতলে অবতীর্ণ হন বলিয়া তাহার পথটীও প্রাকৃতিক নিয়মে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে, অর্থাৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পূর্ব্বেই 'পানমুচি' ভাঙ্গিয়া অপত্যপথ আপনা হইতেই পরিষ্কৃত হইয়া যায়। দেবতাদের সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে—এরূপ সদ্যঃ প্রসূত শিশুর গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পবিত্র জ্ঞান করাই উচিত। অথচ তাহার ঠিক বিপরীতই আমাদের দেশে হইয়া থাকে। কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে অবগত হইয়াছিলাম, পণ্ডিতমণ্ডলী ব্যবস্থা দিয়াছেন, আঁতুড়ঘর অপবিত্র নহে, উহাতে নারায়ণ পূজা পর্য্যন্ত চলিতে পারে। এই ব্যবস্থানুসারে যদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারী তাহাদের আজন্ম সংস্কার দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে, তবেই শিশুদের মঙ্গল, নতুবা এই হতভাগ্য দেশে তাহাদের মঙ্গলের আশা দুরাশা মাত্র।

অনেকে হয়ত বলিবেন, এই সমস্ত কুসংস্কারের মধ্যেও তো আমরা মানুষ হইয়া উঠিয়াছি, তখনকার দিনে এখনকার মত এরূপ পরিবর্ত্তনের কিছু দরকার হইত না। তাহার উত্তরে বলা যায়, অনেকে মানুষ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ঐরূপ প্রথার ফলে অকালে যে কত জীব নষ্ট হইয়া গিয়াছে আজকালকার ন্যায়—তাহার খোঁজ খবর সেকালে কেহই রাখিতেন না।

নাড়ী কাটার দোষে নাড়ীর প্রদাহ হইয়া ও ঠাণ্ডা লাগিয়া এবং অন্যান্য কতকগুলি কারণেও শিশুর ধনুষ্টঙ্কার রোগ জন্মিয়া থাকে। এই রোগে শরীরটী আড়ষ্ট হইয়া ধনুকের ন্যায় বক্র হইয়া যায় এবং শিশু স্তন্যপান করিতে পারে না। 'পেঁচোয় পাওয়ার' ইহাই সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ। শুনিতে পাওয়া যায়, ওঝারা পেঁচোয় পাওয়া শিশুদের হাতে কাটি দিয়া তাহাদিগকে হাঁটাইয়া থাকে, ইহাতেও তাঁহাদের বাহাদুরী বিশেষ কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত

আড়ষ্ট শিশুর হাতে কাটি দিয়া তাহাকে যে কেহ হাঁটাইতে পারে। তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া বায়স বেঙ ইত্যাদি জন্তুতে পরিণত করার গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। সদ্যজাত শিশুকে কিছু সময় ধরিয়া ঐরূপ করিলে তাহারা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সুধীগণ একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে একটী পৈশাচিক ঘটনা ঘটে বলিয়া শুনিতে পাই। সে কথা স্মরণ করিতে আজও সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, একটী নিম্ন শ্রেণীর গৃহে এক সদ্যজাত শিশুর ধনুষ্টঙ্কার হয়। ফকির আসিয়া মত দিয়া গেল,—"ইহার ভিতরের সারপদার্থ অর্থাৎ জীবন অনেক ক্ষণ হইল পেঁচোপাঁচিতে লইয়া গিয়াছে, ফিরাইবার আর কোন উপায় নাই, এখন যাহা দেখিতেছ, সে অপদেবতার লীলা মাত্র। ইহাকে এখন ফেলিয়া দিতে পার, কিন্তু লাথি মারিতে মারিতে লইয়া যাইতে হইবে, অপদেবতাকে তো জব্দ করা চাই!" গৃহস্বামীও সেই হতভাগ্য শিশুটীকে ফুটবলের স্থায় কিক্ (Kick) করিতে করিতে লইয়া গেল! হায় বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য শিশুরা!—হায় তাহাদের দুর্ভাগ্য পিতৃমাতৃগণ? এই সমস্ত রোমহর্ষণ পৈশাচিক অনুষ্ঠানের ফলভোগ আর তাহারা কতদিন করিবে?

(ক্রমশঃ)

হিতকথা।

[শ্রী ক্ষীরোদ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ]

—— •:•:• ——

গৃহের লক্ষ্মী বঙ্গনারীকে রাঁধুনী করোনা,
পরাধীন এই দুঃস্থ জাতির গৃহ-সুখটি ঘুচাও না।
রোগে শোকে দাসত্বে তা'র পরাণ ওষ্ঠাগত প্রায়;
শ্রান্ত পান্থসম জুড়াক (এসে) ঠাণ্ডাগৃহ বটতলায়।
ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন—এই কথাটী ভুলোনা;
পরের দেখে ধাঁ ক'রে ভাই নিজের ভাল ছেড়োনা।

জাতি ধর্ম্ম বজায় রেখে সবাই বেড়ে উঠেছে;
আম কখনো হয়নি কাঁঠাল—কাক কি ময়ূর হ'য়েছে?
নারী শিক্ষা ভাল বটে, স্বাতন্ত্র্যে তা'র নাই কল্যাণ—
বিধাতার এই শুভ বিধান—নরের পাশে নারীর স্থান।
স্বাস্থ্য, সেবা, ধর্ম্ম, নীতি, কুটীর শিল্প শিক্ষা দাও;

সতী সহধর্ম্মিনীকে সহযোগিনী গড়ে' নাও।
সবাই যদি বাহিরে গিয়ে মাঠে ঘাটে হাওয়া খায়,
রান্না বাড়া গৃহস্থালী—শিশু পালন হ'বে দায়।

স্ত্রীকে স্বাধীন করতে তোমরা
নাছোড়বন্দা দেখ্‌ছি ভাই,
(কিন্তু) লক্ষ লক্ষ পল্লী ম'রছে—
সেদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই।
ঘৃত সর ক্ষীর ছানা ননী দই
মাখন গোরস শূন্য দেশ :—
গোপালন ভুলি, কুকুর পুষিলে,
মোক্ষ তোমার মাথার কেশ।
ব্যসন-বিলাসে গাত্র ঢালিয়া
সাবান মাখিয়া খাইছ ছাই ;
ভেজাল ময়দা ঘৃত তেল চিনি,—
বিশুদ্ধ খাদ্য দেশেতে নাই।
রোগের জ্বালায় পাগল হইয়া
কত যে ঔষধ দু'বেলা খাও,
তথাপি আহার বিহারে সংযম
শুচিতার দিকে মন না দাও।
(আর) বেশী বলিবনা, মিঠেকড়া ভাল,
তিক্ত হইলে গিলেনা কেহ ;—
দেশের অবস্থা জানিতে হইলে
যুবকের দেখ জীর্ণ দেহ।

সব ব্যাপারে মুক্ত স্বাধীন নারী যদি হ'তে চায়,
স্নেহ-সুধা মাখি' কে গো ক্ষুধায় অন্ন দিবে বা হায়!!
বহুমূত্রী অম্লশূলী খেটে অস্থি চর্ম্ম সার,
ম্রিয়মাণ এই জাতিটাকে মা বিনে কে বাঁচাবে আর!!
হ'লে শুচি পিতা মাতা জ্ঞান শক্তি পুণ্যময়,
কার্ত্তিক গণেশ জন্মিবে রে পুনঃ দেশে সুনিশ্চয়।
মায়ের মত মা হবে রে যদি দেশে ভাল চাও ;—
সখের নারী কাচের পুতুল 'তাকে' তুলে ঘর সাজাও।
জাতিটা আগে রক্ষা কর—পল্লীগুলো বাঁচিয়ে যাও,
স্বাস্থ্যনীতি খাদ্যতত্বে কোমর বেঁধে লেগে যাও।
জোর কলমে লেখা লিখি চল্‌ছে যেরূপ দেশটা ময়,
রান্না ঘরে আঁতুড় ঘরেও মোদের বুঝি ঢুকতে হয়!
এখনো তো অনেক গৃহে পাচক ঠাকুর আসেনি,
মা সকলই কষ্টে সৃষ্টে ঝোল ভাতটা রাঁধেনই।
স্বাস্থ্যহীন এই 'মোরো' জাতির ভেজাল নোংরা খাদ্য খেয়ে
অম্ল শূল আর বুক জ্বালা যে, সারা দেশটা কে'ল্‌ল ছেয়ে।
যে দিন হ'তে বঙ্গনারী পরের হাতে রান্নাঘর
সঁপে দিয়ে কলম নিয়ে ব'সে গেলেন চেয়ার, পর,
সেই দিন হ'তে স্বামীপুত্রের ডিস্‌পেপসিয়া লেগেছে—
পরের জন্য প্রাণের দরদ দিয়ে কি কেউ রেঁধেছে?

মার্জ্জিতরুচি জ্ঞান বিজ্ঞান
সভ্যতালোকে ব্যভিচার,
উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা আর
স্বেচ্ছাচারিতা—পানাহার ;
নভেলি প্রণয় বাজারে পিরীত
হোটেলি মিলন উপহার,
উৎকট আদব কায়দা কানুন
কপট-দোকানি-শিষ্টাচার ;

পাপেরই স্রোতে পবিত্রতা
ভেসে গেছে অনেক দিন,
পচা, খিচুড়ি একাকার
এলোমেলো সংযম হীন।
সমাজ যদি আদর্শ হয়,
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই আমার ;—

প্রেমানন্দ শান্তি জ্ঞান
উন্নতিটি চাই গো আর ;
হ'লেই বাঁচি— হর্ষে বিষাদ,
শিব গ'ড়তে বানর না হয়,
জ্ঞান অজ্ঞান, আলোর আঁধার—
এই শুধু মোর আছে ভয়।

উড়ুম্বর।

(রিপোর্টারের পত্র)

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

—:০:—

১। শ্বাপদ বিষের মহৌষধ
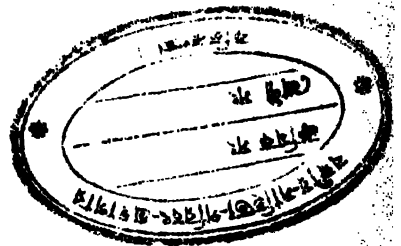
উড়ুম্বর পত্রের সার সেবনে কুকুর শিয়াল দংশন জনিত বিষ নষ্ট হইয়া দ্রংষ্ট ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়। হাজার হাজার রোগীর মধ্যে ২।১টী রোগীর বেলায় ইহা ব্যর্থ হইতে পারে।

২। বিষধর সর্প বিষের মহৌষধ।

সর্ব্বপ্রকার সর্পদংশন জনিত মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ।

আমি বহুবিধ বনস্পতি ও উদ্ভিদের সার নিকাশন করিয়াছি এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগে— প্রয়োগ করিয়া যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছি তন্মধ্যে উড়ুম্বরের (যজ্ঞ ডুমুরের) সার অমোঘ ও অব্যর্থ। আমার এই বিশ্বাস আছে, উড়ুম্বর সার হাজার হাজার রোগীকে ব্যবহার করাইলে একটীতেও ব্যর্থ হইবেনা। অতঃপর আমি এই সারের গুণ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব।

এই উড়ুম্বর সার শস্ত্রাঘাত জনিত সর্ব্ববিধ রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য অব্যর্থ ঔষধ। সংক্ষেপতঃ ইহা সক্ষত ও অক্ষত অভিঘাতের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। নূতন ও সাধারণ ব্রণ (ফোঁড়া) উঠিবার পূর্ব্বে ও পরে সমস্ত অবস্থায় ইহার প্রয়োগে অন্যান্য যাবতীয় ঔষধ অপেক্ষা বিশেষ কার্য্যকরী হয়। ফোড়া উঠিবার সময় যদি সার প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলে জ্বালা যন্ত্রণা ও শোথ (ফুলা) দূর হইয়া ফোড়া বসিয়া যায়। ফোড়া পাকাইবার জন্য ও এই সার ব্যবহার করিলে ফোড়া পাকিয়া আপনি কাটিয়া যায়। অস্ত্রোপচারের (operation) পর এই সার ব্রণের ভিতর প্রয়োগ করিলে Idnoform carbolic lotion প্রভৃতি প্রতিষেধক ঔষধের কাজ করে। যে সকল ডাক্তারী ঔষধে ক্ষত শুকাইতে ও ব্রণের পূরণ করিতে ৭।৮ দিন সময়

লাগে, সেক্ষেত্রে এই সার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নালী ঘা প্রভৃতির আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর করিয়া ক্ষত শুকাইয়া দেয় ও ব্রণ পূরণ করিয়া দেয়। ইহা রক্ত শোধক ও ব্রণ শোধক। চক্রব্রণে ও নাড়ী ব্রণে ইহার বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন সাংঘাতিক ক্ষত স্থানে কীট উৎপন্ন হইলেও এই সারের প্রয়োগে ঐসকল কীট মরিয়া যায় ও ক্ষত ক্রমে শুকাইয়া যায়। ভগন্দর প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগে ইহার প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। দুষ্ট প্রাণহারী জীবাণুর ধ্বংস সাধন করিতে এই সার অব্যর্থ।

আমার ঔষধালয়ের ম্যানেজার চণ্ডীচরণ শর্ম্মার অঙ্গুলীতে একপ্রকার ব্রণ হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর বৃশ্চিক দংশনবৎ অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ঔষধালয়ের প্রাঙ্গনে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিলেন তৎপর আমি উড়ুম্বরের পত্রের প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিয়াছিলাম। এরূপ বহুবিধ অবস্থায় উড়ুম্বর পত্রের প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

দদ্রুরোগে, পামা বিচর্চ্চিকা নেত্রাভিষ্যন্দে, যাবতীয় মুখরোগে, জিহ্বা ও দন্তাঘাতে, দন্তমূলে ঘা হইলে, গ্রীবাদেশে শোথ হইলে, কর্ণ রোগে, নাসিকা রোগে, চক্ষুর যাবতীয় জ্বালা যন্ত্রণায়, শ্লীপদ প্রভৃতি রোগে ইহার ফল প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে। ইহা ছাড়া কণ্ঠ রোগ (গ্রন্থি উদ্ভূত হইয়াছে অথচ পাকে নাই), গ্রহণী, মন্দাগ্নি, অতিসার, গণোরিয়া, সিফিলিস, রক্তপিত্ত, অসৃগ, প্রদর, প্রমেহ প্রভৃতিরোগে ইহা সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অস্থাদি পতনে দন্তাঘাতে যন্ত্রণা হইলে এই সারের ব্যবহারে উহা দূর হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একবার টম্‌টম্ গাড়ী হইতে পতিত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলাম; আমার সমস্ত অঙ্গে অসহ্য বেদনা—এমন কি কোন কোন স্থানে ক্ষত হইয়াছিল। এই উড়ুম্বর পত্র ব্যবহারে আমি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিলাম। একজন রাজমিস্ত্রী আমার বাড়ীতে দেওয়ালের উপরে কাজ করিতেছিল; সে হঠাৎ ঐরূপ উচ্চস্থান হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া সাংঘাতিক রূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাকেও এই সার ব্যবহার করাইয়া উহার অত্যাশ্চর্য্য ফল আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পদতল কাটিয়া গেলে এই সার প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ক্ষত ইত্যাদি দূরীকরণার্থ এই সার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আমার আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের একবার রান্না করিবার সময় ডালের ভাণ্ড হইতে উত্তপ্ত ডাল পায়ে পড়িয়া অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা হয়, ঐ সময়ও আমি এই সারের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমার জানুদেশে অসহ্য বেদনা হয়, বহু ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নানাপ্রকার তৈল মর্দ্দন করিয়াও কোন ফল পাই নাই; অবশেষে Electric Bettery প্রয়োগ করিয়াছিলাম—তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। আমি তখন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এই উড়ুম্বর পত্রের প্রলেপ দেওয়ায় ঐ স্থানের দূষিত রক্ত সংস্কৃত হওয়ার পর

সমুদয় যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়াছিল। একপ্রকার বায়ু বিকারেও ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া উড়ুম্বরের অত্যাশ্চর্য্যগুণ আপনাদের নিকট সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এই ঔষধ সর্ব্বত্র সুলভ ও ভূমগুণে অদ্বিতীয়। আপনারা ইহা ব্যবহার করিয়া যদি ফল পান, তাহা হইলে আমার আবিষ্কার সার্থক হইবে।

অতঃপর পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার হিন্দী বক্তৃতা সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় বুঝাইয়া দিয়া তৎপ্রসঙ্গে বলিলেন—"এই মহাত্মার একটা বিশেষত্ব এই, তিনি অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করেন না। স্বীয় পারিশ্রমিক লওয়া দূরের কথা, ঔষধের মূল্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। এজন্য বহু ক্ষেত্রে তিনি এই ঔষধ প্রয়োগের সুবিধা পাইয়া উহার গুণ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের নিঃস্বার্থ পরতাগুণে তিনি ভারতবর্ষে চিকিৎসক সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন।

নাত্মার্থং নাপি কামার্থং অত ভূতদয়াং প্রতি
কর্ত্তেতে যশ্চিকিৎসায়াং স সর্ব্বমতি বর্ত্ততে।

অর্থ বিনিময়ে চিকিৎসা না করিয়া রোগার্ত্ত জনের দুঃখ অপনোদন করিয়া তিনি যথার্থ চিকিৎসক চূড়ামণি হইয়াছেন। আর আমরা অর্থের বিনিময়ে চিকিৎসা করিয়া পারমার্থিক অমূল্য কাঞ্চন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূলিরাশি গ্রহণ করিতেছি, যথা—

'কুর্ব্বতে যে তু বৃত্ত্যর্থং চিকিৎসা পণ্য বিক্রয়ং।
তে হিত্বা কাঞ্চনং রাশিং পাংশু রাশি মুপাসতে।

পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমি পূর্ব্বেই যজ্ঞ ডুমুরের সারের গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছি এবং পরীক্ষার্থ অনেক স্থলে প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফলও পাইয়াছি। আমার নিজের বাড়ীতে আমার স্ত্রীর একবার চক্ষুর অভ্যন্তরে আঘাত লাগিয়া জ্বালা-যন্ত্রণা হয়; চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় এই উড়ুম্বর সার প্রয়োগ করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তিনি ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিয়া আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত বিদ্যার উদ্ধার করিবেন। আমি সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ মহাশয় নাতি দীর্ঘ সংস্কৃত ভাষায় উক্ত আবিষ্কারের জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম এ এম বি মহাশয় বলিলেন—"পণ্ডিত শ্রীযুত চন্দ্রশেখর ধর মিশ্র মহাশয়ের সহিত ইতিপূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়ের বাড়ীতে আমার পরিচয় হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার নিকট যজ্ঞডুমুরের গুণের কথা শ্রবণ করিয়া আমি বহুস্থলে উহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমরা এই যজ্ঞ ডুমুর একমাত্র অনুপান ও সহপান হিসাবে প্রয়োগ করিতাম, কিন্তু এই যজ্ঞডুমুরের সারের মধ্যে যে এরূপ অসাধারণ শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কোন দিন

...জানিতে পারি নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের আবিষ্কারের ফলে ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। আরও কত শত বনৌষধির মধ্যে এরূপ বহু রোগনাশক শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা কে জানে ? যদি সর্ব্ব চিকিৎসা বিদ্যার প্রসূতি আমাদের বৈদ্যক-বিদ্যার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য এই বৈদ্যকুলস্মারক পণ্ডিত মহাশয়কে আদর্শ করিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণ পূর্ব্বক বনৌষধি সমূহের গুণাবলীর উদ্ভাবনায় চেষ্টা করা। তাহার পর তিনি পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এ।

বহুমূত্রের নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

[ডাক্তার মৈত্র]

চিকিৎসা জগতে আজকাল বহুমূত্র রোগের যে নব চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে যতটুকু সঠিকভাবে জানিতে পারিয়াছি,—এখানে তাহারই অবতারণা করিব। ইহা "Insulin treatment" of Diabetes নামে পরিচিত এবং পেন্‌সিলভেনিয়া ও অন্যান্য আমেরিক্যান ইউনিভার্সিটির মেডিকেল ফেকাল্‌টি কর্ত্তৃক সাদরে অনুমোদিত হইয়াছে।

কথিত চিকিৎসা প্রথার প্রবর্ত্তক হইতেছেন Dr. F. C. Banting এবং তাঁহার সঙ্গী Dr. C. H. Best। উভয়েই টরেণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। বর্ত্তমান সনের বিগত জানুয়ারী মাস হইতে এই প্রথার চিকিৎসা অনেক ডায়বেটিস বা বহুমূত্র রোগীর উপর পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। Torrento জেনারল হাঁসপাতালে কয়েকটী সৈনিক ও গৃহস্থ ভদ্রলোকের উপর এই পরীক্ষা চলিয়াছিল, এই সকল চিকিৎসিত রোগীর মধ্যে কয়েক জনের পীড়ার অবস্থা খুব বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। Torrento বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ফিজিয়লজী বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ S. J. R. Macleod বলেন, এই চিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু হইতে দেখা যায় নাই এবং যাহারা ইহার প্রভাব দ্বারা চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল, তাহারা সর্ব্ববিধ প্রকারে স্বাস্থ্যে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল—(যথায় প্রকৃত ফিজিওলজীক এক্‌স্‌ট্রাক্ট সন্তোষজনক ভাবে পাওয়া গিয়াছিল)।

বহুমূত্র পীড়ায় উহা প্রকৃত আরোগ্যকারী চিকিৎসা কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—"এখনও ইহাকে ডায়াবিটিসের আরোগ্যকারী চিকিৎসা ঠিক্ বলিতে পারা যায় না। তবে থাইরইড গ্ল্যাণ্ডের পীড়াদিতে থাইরইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট যেরূপ কার্য্যকরী, ইহাও সেইরূপ জানিবে। যে পর্য্যন্ত ইহার প্রয়োগের ব্যবহার

---

* এ প্রবন্ধের লিখিত বিষয়ের সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তারের লেখা বলিয়া ইহা আমরা প্রকাশ করিলাম।—আঃ সং।

চলিবে, ততদিনই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে"। পরে ইহা প্রকৃত-কার্য্যকরী হইতে পারিবে কি না তাহা এখনও পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে আশা আছে যে, ভবিষ্যতে উহা ফলপ্রদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে। ম্যাক্লাউড বলেন, ইহাকে ঠিক "সিরাম চিকিৎসা" বলা যাইতে পারে না, কারণ যে পদার্থটি এই চিকিৎসায় ব্যবহার করা যাইতেছে, তাহাকে একষ্ট্রাক্ট বা সার পদার্থ মাত্র বলা যাইতে পারে (সিরাম নহে), মাত্র চর্ম্ম নিম্নে Subcutaneously হাইপোডার্ম্মিক ইনজেক্শনরূপে প্রয়োগের ব্যবহার সিরাম চিকিৎসার সহ প্রয়োগ আছে জানিবে।

কথিত সার পদার্থটি "ইনসুলিন" নামে পরিচিত, উহা প্যান্‌ক্রিয়াসের—আইল্যাণ্ড টিসু হইতে সংগৃহীত, এই জন্যই উক্ত চিকিৎসা-প্রণালী "ইনসুলার চিকিৎসা" আখ্যায় প্রচলিত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু কথিত ইনসুলিন পদার্থটি is not a substance which can be separated and to be had pure in fact বিশুদ্ধভাবে পাওয়া বড়ই সুকঠিন—যেহেতু উহার সহিত প্রায়ই অন্যান্য ক্ষরণাদি বিমিশ্রিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। প্রকৃতিতে ইহা একটি fermant ফারমেণ্ট বিশেষ। ইহার: ফিজিওলজী ম্যাস strength শক্তি বলিতে বুঝিতে হইবে যে, পরিমিত মাত্রায় বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্রিত উক্ত পদার্থ উহার কথিত সার পদার্থ মধ্যে বিদ্যমান আছে।

কথিত পদার্থ প্রয়োগে প্রকৃত আরোগ্য হইতে দেখা না যাইলেও উহার ব্যবহার কালে বিশেষ উপকার যে লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই। ডায়াবিটিস পীড়ায় বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শারীর বিধানে শর্করা বা চিনি পদার্থের সমীকরণ বা অক্সিডাইজ oxdise করিবার অক্ষমতা আনাইয়া দেয়, সুতরাং শর্করা এবং ষ্টার্চ starch বা শ্বেতসার পদার্থাদি সমন্বিত খাদ্য দ্রব্যাদি আর আহার করা চলে না।

ডায়াবিটিসের তীব্রতার নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি চিকিৎসা পুস্তকে বর্ণিত থাকিলেও অভিধান দৃষ্টে ইহার মেলিটাস বা সশর্কর বহুমূত্রই সাধারণতঃ fatal বিষম বলিয়া স্বীকৃত হয়। ক্যান্সার বা টুবারকুলোসিসের ন্যায় ইহা অতি মাত্রায় পাশ্চাত্য জগতে দৃষ্ট না হইলেও উহার বিদ্যমানতা নিতান্ত স্বল্পও নহে—একমাত্র টরেণ্টো সহরে ৬০০,০০০ বাসিন্দা মধ্যে ৫০০০ ব্যক্তিতে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে।

অধুনা ডায়াবিটিসের চিকিৎসায় প্রধানতঃ পথ্যাদির উপরই জোর দেওয়া হইয়া থাকে। মৃদু আক্রান্তির স্থলে এতাদৃশ পথ্য বিচারে সুফলও পাওয়া যায়, কিন্তু কঠিন স্থলে মাত্র উহার উপরে যে নির্ভর করা যাইতেই পারে না—তাহা ব্যাণ্টিং সাহেব বলেন। এতাদৃশ উপায়ে পথ্য-বিচার দ্বারা কোন কোন রোগীতে আহারের মাত্রা প্রত্যহ ১০০০ ক্যালরীতে calory দাঁড়াইয়া যায়, কিন্তু স্বভাবতঃ মনুষ্যের খাদ্য পরিমাণ নিত্য ২০০০ ২৫০০ ক্যালরী হওয়া আবশ্যক বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবে বুঝিতে পারা যায় যে, কথিত প্রকারের পথ্য বিচারে নির্ভরীকৃত রোগীগণ প্রায় নিরাহারের সীমানায় তখন আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

ইন্‌স্যুলিন ইন্‌জেক্‌শন চলিতে থাকার সময়ে কিন্তু কথিত রোগীগণকে স্বাভাবিক মাত্রায় আহার্য্য পদার্থাদি খাইতে দেওয়া হয়। একটি রোগী এতৎ চিকিৎসার সময় প্রায় ১১ গুণ অধিক শর্করা পদার্থ খাইয়াছিল— অথচ তৎফলে কোন প্রকার মন্দফল উদ্ভূত হইতে দেখা যায় নাই (পূর্ব্বে শর্করাজাত কোন পদার্থ বা শর্করা এত অধিক মাত্রায় খাইলে আদৌ সহ্য হইত না)।

১৯২০ সালে একদিন সন্ধ্যার সময় Iles of Lauguraas নামক প্রবন্ধ পাঠকালে কথিত চিকিৎসা প্রণালী ব্যান্টিং সাহেবের মনে ইঙ্গিতভাবে উদিত হইয়াছিল। ল্যাঙ্গারবান্স নামক এক জন জার্ম্মাণ পণ্ডিত 'আইল্‌স অব ল্যাঙ্গারবান্স' নাম দিয়া প্যান্‌ক্রিয়াসের (ক্লোম যন্ত্র) একটি অংশ বিশেষকে পরিচিত করিয়াছেন। কথিত উক্ত স্থান হইতেই শরীরস্থ রক্ত মধ্যে দেহস্থ শর্করার অক্‌সিজেশন জন্য আবশ্যকীয় তরল পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকার কথা তিনি বলেন। এতাদৃশ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে অপারগ হইলেই—ডায়াবিটিস বা বহুমূত্র (সশর্কর) পীড়া দেখা দেয় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

প্যান্‌ক্রিয়াসের কিন্তু আরও একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে জানিবে। অন্ত্রমধ্যে অন্য একটি দ্বিতীয় তরল পদার্থের নিঃসরণ দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য ইহাতে হইয়া থাকে। ব্যান্টিং সাহেব স্থির করিলেন যে, যদি কোন প্রাণীর দেহে অন্ত্রের সহিত প্যান্‌ক্রিয়াসের সংযোগ প্রণালী বা ডাক্টের duct প্রতিরোধ দ্বারা কোন প্রকারে উভয়ের মধ্যস্থ চলাচল ক্রিয়া স্থগিত করিতে পারা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে প্যান্‌ক্রিয়া যন্ত্রটির সম্পাদনীয় একটি কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় অন্যটির ক্রিয়ার উত্তেজনা পাইতে পারে অর্থাৎ শর্করা অক্‌সিডাইজ করিবার কার্য্যটি বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই প্রকারে কথিত সমধিক উত্তেজনা প্রাপ্তির ফলে ক্ষরিত পদার্থের surplus প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ সংগ্রহ করিতে পারা সম্ভবপর হইলে উহার সার পদার্থ extract লইয়া ডায়াবিটিস বা বহুমূত্রাক্রান্ত রোগীর শরীরে ইন্‌জেক্ট করিলে নিশ্চয়ই তৎ প্রভাবে দেহস্থ শর্করা অক্‌সিডাইজ্‌ড হইয়া রোগীকে উপশম প্রদান করিতে সক্ষম হইবে।

প্রথমে কুকুরের উপর ইহার ব্যবহারিক পরীক্ষা লওয়া যায়। কুকুরের প্যান্‌ক্রিয়াস হইতে এক্‌ষ্ট্রাক্ট বাহির করিয়া ডায়াবিটিক কুকুরের উপর উহার প্রয়োগ করা হয়। ডায়াবিটিক কুকুর বলিতে এই বুঝায় যে, তাহার শরীর হইতে প্যান্‌ক্রিয়াসটি কাটিয়া বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে (ডায়াবিটিস রিসার্চ ল্যাবরেটরীতে এতদর্থ সকলেই অবগত আছেন)। এতাদৃশ প্যান্‌ক্রিয়াস শূন্য কুকুর মাত্র ১৪ দিন জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু উহার শরীরে ইন্‌সুলার চিকিৎসা করার পর (১৯২০ সালের মে মাসে) কথিত কুকুরটি ৭০ দিবস পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল দেখা গিয়াছে।

তাহার পর বিগত ডিসেম্বর মাসে মনুষ্য শরীরে কথিত পদার্থ ইন্‌জেক্ট করার বিষময় ফল উদ্ভূত হইতে পারে কিনা তাহা দেখিবার জন্য উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু

সাহস করিয়া অন্য কাহারও উপর পরীক্ষা গ্রহণ করিতে প্রাণ চাহে নাই। পরিশেষে ব্যান্টিং নিজ দেহে উহা প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করিতে সম্মত হয়েন এবং প্রথম ইঞ্জেক্সন্ ডাক্তার বেষ্ট তাঁহার শরীরে প্রয়োগ করেন। ব্যান্টিং তৎপরে ডাক্তার বেষ্টের শরীরেও কথিত ইন্‌সুলিন ইনজেক্ট করিয়া দিলেন। এই পরীক্ষার সময়ে একটী ষাঁড়ের ox প্যাঙ্ক্রিয়াস হইতে একস্‌ট্রাক্ট লওয়া হইয়াছিল।

বিগত জানুয়ারী মাসে বহুমূত্র দ্বারা পীড়াগ্রস্থ কয়েকটী মনুষ্যের উপর এই চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, বিখ্যাত ক্যানাডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন জার্ণাল তাহা নিম্নলিখিত প্রকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন :—

(১) রক্তের মধ্যস্থ শর্করার অংশকে স্বাভাবিক মাত্রায় আনিতে পারা সম্ভব।

(২) মূত্রের মধ্য হইতে শর্করা চিহ্ন বিলোপ করা যাইতে পারে।

(৩) মূত্র হইতে "য়্যাসিটোন" পদার্থের বিদূরণ করা যাইতে পারে।

(৪) শ্বাস প্রশ্বাসে কার্ব্বো হাইড্রেটের ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ব্যবহারের চিহ্ন লক্ষিত হয়; রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ প্রকারে লক্ষিত ভাবে উন্নত হইতে দেখা গিয়াছে।

বর্ত্তমানে এই চিকিৎসা প্রণালীতে প্রতি দিবস দুই একবার করিয়া হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সন্ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে; একশত ইঞ্জেক্সন লইয়াও ডায়াবিটিক রোগীগণ এতৎ প্রভাব জনিত কোন প্রকার মন্দ ফল উৎপন্ন হইতে দেখেন নাই। যেহেতু এই চিকিৎসা-প্রণালীতে খাদ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বাধা নিষেধ না থাকায় রোগীগণের শরীরগত পরিপোষণের কোনই অভাব লক্ষিত হয় নাই; অথচ শরীরস্থ লুপ্ত শক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া পাইতে থাকায় দৈহিক কার্য্য প্রণালী নিয়মিত ভাবে চলিয়া ক্রমশঃ পীড়াটীকে অদূর ভবিষ্যতে আরোগ্য করিবারই সহায়তা করিয়া থাকে।

ডাক্তার ব্যান্টিং বলেন, কথিত ইন্‌সুলিন পদার্থটী সংগ্রহ করিবার সঠিক উপায় স্থিরীকৃত হইলে টরেন্টো ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল বিভাগের সাহায্যে যাহাতে উহা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে সহজেই প্রাপ্য হইয়া জগতে ডায়াবিটিস্ রোগগ্রস্থের প্রকৃত কল্যাণপ্রদ ভেষজরূপে পরিগণিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি উহার পেটেণ্ট স্বত্ব এবং তাহা হইতে প্রভূত অর্থ লাভের আশা সমুদয়ই ত্যাগ করিবেন।

মন্তব্য ঃ—নব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নামে ডায়াবিটিসের যে বিষয়টীর বর্ণনা প্রবন্ধান্তর হইতে উপরে অনুদিত করা হইল, তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত এলোপ্যাথির এণ্ডোক্রাইনস্ ভেষজাদিরই অন্তর্গত। বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থাদির একত্র সংমিশ্রনে নানা প্রকারের বিকট এবং উৎকট নামধারী ভেষজ পদার্থাদি ব্যবহারে কোন একটী রোগ দূরীকরণের নামে নূতন ১০টী রোগের সৃষ্টি হইতে দেখিয়া সুধীর ও ধীমান প্রকৃত রাসায়নিক চিকিৎসকবৃন্দ ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া বর্ত্তমান সময়ে এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে, দেহীগণ যখন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনই তাহার শরীরস্থ গ্ল্যাণ্ড সমুদয়ের ক্ষরণ কার্য্য বিকৃত, বাধাযুক্ত অথবা স্বাভাবিক অপেক্ষা মাত্রার বৃদ্ধিভাব বা স্বল্পতা প্রাপ্ত হয়।

দেহ মধ্যে ছোট বড় আকারের অসংখ্য গ্ল্যাণ্ড বিদ্যমান আছে। উহাদের মধ্যে প্রধানতম কয়েকটীর কার্য্য মাত্র ফিজিওলজী শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারিয়াছি। বিজ্ঞান যতই কেন উন্নত না হউক, দেহ মধ্যে পূর্ব্ব কথিত অসংখ্য গ্ল্যাণ্ডাদির অস্তিত্ব রাখায় সেই বিশ্বস্রষ্টার যে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, আজিও তাহা মানবের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গোচরীভূত হয় নাই। কথিত গ্ল্যাণ্ড আদির আভ্যন্তরীক পৃথক ও সমবায় করণ দ্বারা দেহীগণের আভ্যন্তরিক ক্ষয়াবস্থা যে পরিপূরিত ও স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হইবার পক্ষে সমূহ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। স্থির ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সহজেই ইহার উত্তর পাইতে পাইবে। ভাবিয়া দেখ, বিনা চিকিৎসাতেও কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগী সময়ে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। কি প্রকারে ইহা হওয়া সম্ভব? সকলেই বলিয়া থাকেন যে, প্রকৃতি Nautre সর্ব্বদাই তাহার বিকৃতি অবস্থার পরিপূরণ বা তাহার সংস্কার সাধনে নিত্য চেষ্টাবান্ আছে। ইহা সত্য, কিন্তু প্রকৃতির তো হাত পা নাই বা ভেষজ পদার্থ ও নাই। তবে কেমন করিয়া এতাদৃশ কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতে পারে? অনন্ত সৃষ্টি কৌশলী সেই পরম দয়াবান শাশ্বতঃ জগদীশ্বরেরই অনন্ত করুণারই ইহা একটি নিদর্শনমাত্র। অর্থ নাই বলিয়া দরিদ্র রোগে ভুগিয়া অকালে মারা যাইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। এই জন্যই দেহ মধ্যস্থ অস্থি, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, তন্তু, বায়ু রস, ইত্যাদি পৃথক সমবায় ক্রিয়া ফলে দেহস্থ বিকৃতাবস্থা স্বাভাবিকত্বে ফিরিয়া আসিতে পারার কল্পনা তিনিই করিয়া রাখিয়াছেন—যিনি উহাদিগকে জগতের আলোক দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সুমার্জ্জিত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানব এত দিন আত্ম জ্ঞান গরিমায় উৎফুল্ল থাকিয়া নিজ নিজ কল্পনাপ্রসূত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারে দেহস্থ বিকৃতাবস্থা বিদূরীত করিবার জন্যই সচেষ্ট ছিল; কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী এবম্প্রকারে পরীক্ষা লব্ধ ও কল্পিত জ্ঞানাদির প্রয়োগ প্রবর্ত্তনে যখন দেখিতে ও বুঝিতে পারিল যে, "অত্যুন্নত জ্ঞান শিখরে উন্নীত হইয়া রোগ নিরাময়ের চেষ্টায় যাইয়া ক্রমশঃ উহা বর্দ্ধিত করিয়াই দিতেছে"—তখন কয়েক জন শান্ত সুধীর ব্যক্তির মাথায় আসিল—"ব্যাধি হরণের প্রকৃত জিনিস নিশ্চয়ই অন্য কোথাও নাই, যদি কোথাও থাকে তবে তাহা ব্যাধিগ্রস্ত শরীরের মধ্যেই আছে। সুতরাং পীড়া নিরাময়ের জন্য পীড়িতের শরীরের পদার্থ বিশেষই প্রধান সাহায্যকারী—এই insqrition বা ইঙ্গীত হইতেই বর্ত্তমান সময়ের এণ্ডোক্রিয়ম্ বা হর্ম্মানিস জাতীয় পদার্থ দ্বারা চিকিৎসা প্রথা অবলম্বিত হইতেছে।

'চক্রদত্তে'র প্রথম শ্লোকের টীকা।*

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ)

"চক্রদত্ত" একখানি উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ। "শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী" ইত্যাদি উল্লেখে গ্রন্থকার তাহাতে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থের "তত্ত্ব চন্দ্রিকা" নাম্নী টীকা ধীমান্ শিবনাথ সেন কৃত।

মূলগ্রন্থের মঙ্গলাচরণে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায় :—

গুণত্রয়বিভেদেন মূর্ত্তিত্রয়মুপেয়ুষে।
ত্রয়ীভুবে ত্রিনেত্রায় ত্রিলোকীপতয়ে নমঃ॥

ইহার টীকায় উক্ত টীকাকার বলিতেছেন,—"গুণত্রয়ং সত্ত্বরজস্তমোরূপং মূর্ত্তিত্রয়ং ব্রহ্ম হরিহরস্বরূপম্।" পৌর্ব্বাপৌর্য্যানুসারে ইহাতে ব্রহ্মাকে সত্ত্বগুণাত্মক, হরিকে রজোগুণাত্মক এবং হরকে তমোগুণাত্মক বুঝায়। অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, "ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, হরি বা বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক এবং হর তমোগুণাত্মক ইহাই প্রসিদ্ধি; তবে টীকাকার অন্যরূপ বলেন কেন? এরূপ বলা তাঁহার ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে।" আমরা এই আপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমে, বিষ্ণুরজোগুণাত্মক হওয়া সম্ভব কিনা, তাহা দেখিব।

ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধে প্রথমতঃ কোন কোন পুরাণাদিতে শ্রীভগবানের কেবলমাত্র ত্রিতত্ত্ব (অর্থাৎ ত্রিগুণ-ভেদে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব, শিবত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে। সে সকলে তাঁহাদের "একেই তিন ও তিনেই এক" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কোথায়ও বা তাঁহাদের অতিরিক্ত এক স্বতন্ত্র ত্রিগুণাত্মক পরমেশ্বরের বিষয় উক্ত হইয়াছে। যেমন 'চণ্ডী'তে নারায়ণকে বলা হইয়াছে :—

—জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।

এখানে স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা—একাধারে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিব—নারায়ণই। তাঁহার কাছে ত্রিমূর্ত্তির ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের "কদর" কাজেই কম। আবার শিব পূজাকালে—

বিধিবিষ্ণুশিবস্তুত পাদযুগং।
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্॥

বলিয়া যে স্তব পাঠ করা হয়, তাহাতে তৎকালে পূজিত শিবকেই বিধি বিষ্ণু-শিব কর্ত্তৃক স্তুত বলা হইয়া থাকে। এত শিবেরই পূজা হইতেছে, তবে আবার কোন শিব তাঁহাকে স্তব করেন বলি? ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে শিব স্তব করেন বলা হয়, তিনি ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম—নামান্তর রুদ্র। তিনি ব্যষ্টি, আর পূজ্যমান্ শিব সমষ্টি। অর্থাৎ রুদ্র ত্রিগুণের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। কাজেই তাঁহার পক্ষে সমষ্টি-শিবকে স্তব করা অযৌক্তিক নহে। মঙ্গলাচরণের শ্লোক, যাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাও একপ্রকার ইহার দৃষ্টান্ত। এখন তন্ত্র হইতে এক স্থান উদ্ধৃত করি :—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে সর্ব্বে থুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকোঽস্ত পরঃশিবঃ।

* কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদসভায় সম্প্রতি লেখক কর্ত্তৃক পঠিত। আঃ সং।

এখানে ত্রিমূর্ত্তির অতিরিক্ত "ঈশ্বর," তদতিরিক্ত "সদাশিব," তদতিরিক্ত "পরমশিব," স্বীকার করা হইয়াছে। এই পরম শিবই এখানে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অবশ্য, এ সবলের বিশেষ অর্থ আছে, অন্য উদ্দেশ্যও আছে, কিন্তু সে সকল এখন আমাদের আলোচ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত দুই ভাবের ভগবত্তা নির্দ্দেশ ব্যতীত আরও এক ভাবে উহা নির্দ্দিষ্ট হইতে দেখা যায়। নারদ পঞ্চরাত্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণ (ইহা বৈষ্ণব-পুরাণ মধ্যে গণ্য) শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতিতে শ্রী ভগবানের চতুর্ব্ব্যূহের উল্লেখ আছে। এই চতুর্ব্ব্যূহের মধ্যে প্রথম, বাসুদেব; ইনি ত্রিগুণাতীত—সুতরাং অরূপ, ব্রহ্মস্থানীয়। দ্বিতীয়, সঙ্কর্ষণ; ইনি তমোগুণাত্মক (অবতারদিগের মধ্যে ইনিই বলদেব—তমোগুণের অনেক লক্ষণ, যথা অযথাক্রোধ, দম্ভ, পানদোষ প্রভৃতি ইহার চরিত্রে পরিস্ফুট দেখা যায়। পক্ষান্তরে, তমোগুণাত্মক রুদ্রতেও ঐরূপ বিশ্বসংহারক ক্রোধ ভাঙ্গ ধুতুরায় প্রবৃত্তি প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে) তৃতীয়, প্রদ্যুম্ন; ইনি সত্ত্বগুণাত্মক। চতুর্থ, অনিরুদ্ধ; ইনি রজোগুণাত্মক, শেষশয্যাশায়ী—সৃষ্টিকর্ত্তা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার মূর্ত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

চতুর্থী জলমধ্যস্থা শেতে পন্নগতল্পগা।
রজস্তস্যা গুণঃ সর্গং সা করোতি সদৈব হি॥

শেষোক্ত তিন ভাব অন্যত্রকথিত ত্রিমূর্ত্তিরই অনুরূপ। প্রদ্যুম্ন—বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ—ব্রহ্মা, এবং সঙ্কর্ষণ—রুদ্র। ইহাতে এই তর্ক হইতে পারে যে, যিনি শেষশায়ী অর্থাৎ অনিরুদ্ধ, তাঁহা হইতেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইয়াছে। তবে আবার তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা কিরূপে হইবেন? ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মা অব্যক্ত-জন্মা হইলেও একরূপ প্রথম সৃষ্ট—সৃষ্টির আদিভূত। মতবিশেষে তাঁহার ললাট হইতেই রুদ্রের উৎপত্তি। তাহা হইলে শেষ-শায়ীকেই সকল সৃষ্টির মূল বলিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে যে উপরের শ্লোকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে। আবার ব্রহ্মার মানসপুত্র প্রজাপতিরাই জীবাদি সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহারা আমাদের পিতৃস্থানীয় এবং ব্রহ্মা পিতামহ-স্থানীয়; সেইজন্য তাঁহাকে লোকপিতামহ বলে। যে কারণে তিনি আমাদের পিতামহ, সেই কারণেই নারায়ণ আমাদের প্রপিতামহ এবং শাস্ত্র সেই নামেই তাঁহাকে অনেক স্থানে অভিহিত করিয়াছেন। গীতায় একাদশে অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিতেছেন:—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

শঙ্কর বলেন,

"প্রপিতামহশ্চ পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহোব্রহ্মণোঽপি পিতা ইত্যর্থঃ"।

স্বামিপাদ এবং সরস্বতীও ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।

গয়াকৃত্যের মন্ত্রে ও তাঁহাকে বলা হয়:—

ওঁ কলৌ মহেশ্বরা লোকা
যেন তস্মাৎ গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপো ভবেদ্দেব
বন্দে শ্রীপ্রপিতামহম্।
ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবতেও পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্ব্যূহের উল্লেখ আছে। যথা:—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ॥
ইত্যাদি।

দেখা যায় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ-কথিত শেষশায়ী অনিরুদ্ধকেই সাধারণতঃ নারায়ণ বা হরি বলা হইয়া থাকে। দেখাইয়াছি, ইনি রজোগুণাত্মক এবং ত্রিমূর্ত্তির অন্যতমও বটেন। কাজেই তাঁহাকে "তত্ত্বচন্দ্রিকা" টীকাকারের রজোগুণাত্মক বলা অশাস্ত্রীয় হয় নাই। কৃষ্ণাবতার গ্রহণ করিবার জন্য এই শেষ শায়ীর নিকটেই দেবতাগণ আসিয়া স্তব করেন। আমরা দেখিব যে, তাঁহার সে অবতারও রজো গুণের। ভবিষ্যপুরাণে আছে :—

ঐশ্বরং তত্ত্বচঃ শ্রুত্বা গন্তুং প্রাক্রমতাত্মভূঃ।
ক্ষীরোদে যত্র বৈকুণ্ঠঃ সুপ্তঃ স ভুজগোপরি।
হংসপৃষ্ঠে সমারুহ্য হরেরন্তিকমাযযৌ ॥

এখন, কারণজলে—ক্ষীরোদ-সমুদ্রে—যিনি অনন্ত-শয্যাশায়ী হরি, তিনিই ভবিষ্যপুরাণে বৈকুণ্ঠনাথ বলিয়া কথিত হইয়াছেন এবং ক্ষীরোদেই বৈকুণ্ঠধাম উহাতে উক্ত হইয়াছে। আবার ভাগবতে দেখা যায় যে, শঙ্খচক্রাদিধারী চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠনাথই কংস-কারাগারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম হইলে ভাগবতে এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় :—

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্

এখন পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ বুদ্ধিতে একটি কথা বলা যায় যে, নারায়ণ যদি শুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্টই হইবেন, তবে তাঁহার হস্তে উদ্যত ভয়ঙ্কর গদা-চক্রাদি অস্ত্র কেন? কেবল সত্ত্বগুণে ত মারাকাটা সম্ভবে না? তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ হেন অস্ত্রধারী পুরুষের অন্ততঃ একটুও রজোগুণ আছে। আর যদি তিনি পালন-কর্ত্তাই (সত্ত্বগুণাত্মক) হন, তবে দুষ্টের দমন ভিন্ন পালন হইতেই পারে না। দমন রজোগুণের কার্য্য। অতএব সত্ত্বগুণাত্মক পালন-কর্ত্তাতে একটু রজোগুণ না থাকিলে পালন হইতেই পারে না। আবার দেখুন, সরস্বতী সত্ত্বগুণাত্মিকা; তথাপি তাঁহার দ্বারাই শুম্ভনিশুম্ভবধ সংঘটিত হইয়াছিল। তৎসম্বন্ধে 'বৈকৃতিক রহস্য' নামক তন্ত্রে লিখিত আছে :—

গৌরীদেহাৎ সমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া।
সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥

পাঠক, "সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া" পাঠের প্রতি লক্ষ করিবেন। তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, ঐ সত্ত্বগুণেও রজোগুণের আশ্রয়বশতঃ বধ-কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল; নতুবা তাহা অসম্ভব। জগদ্বরেণ্য নাগোজী ভট্ট "চণ্ডীর" টীকায় উপক্রমণিকায় বিষ্ণুসম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

বিষ্ণুঃ সরস্বতীজন্যত্বাৎ সাত্ত্বিকঃ কর্ম্মতঃ,+
+রূপতস্তমোময় ইতি। তত্র সত্ত্বতমসোঃ সমতা।

অর্থাৎ "প্রাধানিক রহস্য" তন্ত্রমতে বিষ্ণুর উৎপত্তি সরস্বতী হইতে। ঐ সরস্বতী সাত্ত্বিকী; সুতরাং পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও সাত্ত্বিক, ইহাই বলা নাগোজীর উদ্দেশ্য। অথচ বিষ্ণু অসুর নিধন করিয়াছেন। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে এমনটা কিরূপে হয়, তাহা বুঝিতে হইলে নাগোজীর "তত্র সত্ত্বতমসোঃ সমতা" এই কথা বুঝিলেই হইল। অর্থাৎ বিষ্ণুতে রজোগুণও আছে, কারণ সত্ত্ব ও তমোগুণের সমবায়েই রজোগুণ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণও ঠিক ঐ কথা বলেন; যথা :—

তিলেষু বা যথা তৈলং ঘৃতং পয়সি বা স্থিতম্।
তথা তমসি সত্ত্বে চ রজোপ্যনুস্যূতং স্থিতম্ ॥

ইহা অবশ্য একটি দার্শনিক সত্য।

আর এক কথা। শেষশায়ী নারায়ণ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া আদর্শকর্ম্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি সেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবল রজোগুণ ব্যতীত কি সম্ভব? রজোগুণই ত ক্রিয়াত্মক। কাজেই, 'চক্রদত্তে'র টীকাকারের হরিকে রজোগুণাত্মক বলা দোষের কিসে? পরন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিতও বটে। অবশ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণ শেষ-শয্যাশায়ীর কৃষ্ণাবতারত্ব স্বীকার করেন না, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁহাকে অবতারী-কৃষ্ণ বলেন না। তাঁহারা অনন্য-সাধারণ বিচারশক্তি দেখাইয়া বলেন:—

কৃষ্ণোঽন্যঃ যদুসম্ভূতো যস্ত গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি॥

কিন্তু কোনকোন পুরাণ যে শেষ শয্যা-শায়ীর কৃষ্ণাবতারত্ব স্বীকার করেন, তাহা আমরা ভবিষ্যপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

এখন হরির রজোগুণ প্রতিপাদক ভাবের আর এক দিক দেখি। তাঁহারই জন্মাষ্টমী-ব্রতানুষ্ঠানের একটি মন্ত্র এই:—

যং দেবং দেবকীদেবী বাসুদেবাদজীজনৎ।
ভৌমস্য ব্রহ্মণো গোপ্ত্রে তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ॥

"ভৌমস্য ব্রহ্মণো গোপ্ত্রে" এই পাঠের অর্থ এই:—ভৌম, মঙ্গল; তাঁহার ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা-কর্ত্তা যিনি, তাঁহাকে। এখন মঙ্গল হইতেছেন সাম-বেদাধিপ, তাঁহার ব্রাহ্মণ হইতেছেন সামবেদীয়গণ, আর পূর্ব্বকথিত মন্ত্রানুসারে, তাঁহাদের রক্ষা কর্ত্তা হইতেছেন হরি—নারায়ণ। গীতায় তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,:—

"'বেদানাং সামবেদোঽস্মি, আর, "গায়ন্তি যং সামগাঃ" ইত্যাদি কথাও শাস্ত্রে আছে, তদ্ভিন্ন উক্ত ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ দেওয়ার পর "এতৎ যজ্ঞোপবীতসূত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" এই উৎসর্গ মন্ত্র বলিয়া তাহা ব্যবহার করার বিধিও আছে। পরন্তু মঙ্গল রজোগুণাত্মক গ্রহ—তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাঁহার ধ্যানে আছে:—

"আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং" ইত্যাদি।

তাঁহার রক্তবর্ণে তাঁহার রজোগুণ বুঝাইতেছে। গুণ-ত্রয়ের বিভিন্ন বর্ণ-কল্পনার কথা আমরা পরে বলিব। তিনি ক্ষত্রিয় জাতি সুতরাং সত্ত্ব-রজোধর্ম্মাত্মক। শাস্ত্রে চতুর্ব্বর্ণের গুণ এইরূপ কথিত হইয়াছে; ব্রাহ্মণ সত্ত্ব অথবা সত্ত্ববহুল; ক্ষত্রিয় সত্ত্ব-রজঃ, অর্থাৎ রজোবহুল; বৈশ্য রজস্তমঃ, অর্থাৎ তমোবহুল; শূদ্র কেবল তমঃ। তাহা হইলে সত্ত্ব-রজোধর্ম্মী মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের একটু রজোগুণ থাকাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়—সেটা অন্য বেদীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাঁহাদের অভিচার-ক্রিয়া অভিসম্পাত ও আদি কার্য্যে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। এখন মঙ্গলের ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ গুণ হইলে তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা হরিও যে একেবারে রজোগুণ-বিবর্জ্জিত হইতে পারেন, এমনটা সম্ভব নহে। কারণ সাধক যেমন, সাধ্যও অনেকটা সেই রূপ না হইলে পরস্পর 'খাপ'খায় না।

অপিচ তাঁহাতে রজোগুণ আছে বলিয়াই মাংস দিয়া বিষ্ণুর ভোগ দেওয়ার বিধি পদ্ম-পুরাণে দেখা যায়। কারণ, সত্ত্বগুণে

ননাদি কার্য্য নাই; রজোগুণে তাহা আছে। সেই জন্য দুর্গোৎসবের সময় কোন কোন স্থানে সপ্তমী (সাত্বিকী তিথি) পূজায় বলিদান হয় না ; অষ্টমী (রাজসিকী তিথি) পূজায় ও নবমী (তামসী তিথি) পূজায় তাহা হইয়া থাকে। জগদ্ধাত্রী পূজাতেও প্রথম প্রহরের পূজাকালীন কোথাও কোথাও বলিদান হয় না ; অপর প্রহরদ্বয়ের পূজায় (রাজসী ও তামসী) তাহা হইয়া থাকে। এই প্রথম পূজা-সম্বন্ধে বিশ্বসার-তন্ত্র বলিয়াছেন,—"প্রথমে সাত্বিকী পূজা"।

পুনশ্চ, তিথি বিচারে সপ্তমী সাত্বিকী বলিয়া যাত্রিক, অষ্টমী রাজসী বলিয়া যাত্রা সম্বন্ধে প্রশস্তা নহে, আর নবমী তামসী বলিয়া উহা সর্ব্বকার্য্যে একেবারে পরিত্যজ্যা। এইবার দেখুন, শেষশায়ী নারায়ণ কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতেই কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; অতএব তাঁহাতে রজোগুণের কল্পনা অসম্ভব নহে।

এইবার আমাদের বক্তব্য অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদের মুখ চাহিয়া দুই একটি কথা বলিব। আমাদের বায়ু, পিত্ত, কফ বলিয়া যে তিন নাড়ী আছে, উহারাই এক একটি ত্রিগুণের ব্যষ্টিভাব, অর্থাৎ আমাদের দেহরূপ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডে উহারাই সেই পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তি। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমাদের প্রভাতে শ্লেষ্মার আধিক্য, মধ্যাহ্নে পিত্তাধিক্য ও সায়াহ্নে বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবের আয়ুষ্কালের যে প্রধান তিন ভাগ—বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য—বায়ু পিত্তাদিরও এক একটি তত্তৎভাগের এক এক ভাগে পর্য্যায়ক্রমে প্রবল হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্যে বায়ুর প্রাবল্য হয়। এই বায়ুকেই আমাদের শেষাস্তরণ-শায়ী নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে পারা যায়—যাঁহাকে মার্কণ্ডেয়-পুরাণে রজোগুণাত্মক বলা হইয়াছে, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই বায়ু-সম্বন্ধে সুশ্রুত লিখিয়াছেন :—

স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশব্দিতঃ।

* * * *

স্থিত্যুৎপত্তিবিনাশেষু ভূতানামেব কারণম্।

* * * *

তির্য্যগ্‌গো দ্বিগুণশ্চৈব রজোবহুল এবচ ।
অচিন্ত্যবীর্য্যো দোষাণাং নেতা রোগসমূহরাট্।

এখন দেখুন, এই বায়ুকেই "রজোবহুল" বলা হইয়াছে। ইহা সত্বগুণবিশিষ্ট বটে, কিন্তু তদপেক্ষা ইহাতে রজোগুণের আধিক্য ; অধিকন্তু ইহা প্রাণীদিগের সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশের কারণ, এবং তির্য্যগ্‌গামী (সর্প-গতি-বিশিষ্ট) অপিচ ইহা পিত্ত ও কফের পরিচালক রোগের প্রবর্ত্তকরূপে রোগ-সমূহের রাজা—অচিন্ত্যবীর্য্য। শেষশায়ী-সম্বন্ধেও এই সকল কথা ঠিক খাটে। তিনি রজোগুণাত্মক তাহা ত পুরাণেই দেখা যায়—সে সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি ; রজোগুণবিশিষ্ট বলিয়াই তিনি বায়ুর ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশেরও হেতুভূত। কারণ, আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে রজোগুণ সত্বেতেও আছে, তমোগুণেও আছে। এখানে একবার 'চণ্ডী'র নারায়ণ-সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত "জগৎস্রষ্টা জগৎ-পাতাত্তি যো জগৎ" এই শ্লোকাংশ মনে করিলেই আমাদের কথা বিশদ হইবে। আবার হরি দেবতাদিগের নেতাস্বরূপ ; দেবতাদিগের যত "আবদার," তাঁহারই কাছে,

"দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ", ইত্যাদি কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে দেখা যায়, হরব্রহ্ম-প্রমুখ দেবগণ তাঁহাকে ত্রিভুবনেশ্বরের পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ফলে, হর ও ব্রহ্মা (অপর দুই গুণের ব্যষ্টিভাব এবং নাড়ী-বিচারে অন্য নাড়ীদ্বয়) তাঁহার দ্বারা শাসিত বা পরিচালিত হইতেন। এই জন্য শাস্ত্রে তিনি "ত্রিভুবনাধীশ" বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। বায়ু যেমন "নেতা" ও "রোগ-সমূহ-রাট্, তিনিও তদ্রূপ নেতা, পরিচালক, শাসক, বা দেব-রাট পক্ষান্তরে তিনি জনার্দ্দন। এই "রোগ-সমূহরাট্" ও "জনার্দ্দন" কথার পার্থক্য কোথায়? রাজ সম্মানও নারায়ণের রজোগুণের পরিচায়ক; কারণ রাজা রজোগুণাত্মক, সত্ত্বগুণে শাসন কার্য্য চলিতেই পারে না। পুরাকালের শাস্ত্র বিধি-অনুসারে রজোগুণাত্মক ক্ষত্রিয়গণই রাজ-পদার্হ ছিলেন। এখনও এতদ্দেশে সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, কাহারও মাথার উপর সাপে ফণা ধরিলে সে রাজা হয়। রাজা নারায়ণের সর্পশয্যাই ঐরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি। অপিচ বায়ু যেমন তির্য্যগগ্, নারায়ণ ও সেইরূপ তির্য্যগগ্, কারণ তিনিও তির্য্যক্‌যোনি অনন্তরূপী সর্পশয্যায় শয়িত। এই অনন্ত-মূর্ত্তি-সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিয়াছেন :—

তামসী সা সমখ্যাতা তির্য্যক্‌ত্বং সমুপাশ্রিতা।

তদ্ভিন্ন শয়িতা-মূর্ত্তিকে (নারায়ণকে) উক্ত পুরাণ "পন্নগতল্পগা" বলিয়াছেন। সে শ্লোক আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনশ্চ, বায়ুকে সুশ্রুত যে "অচিন্ত্যবীর্য্য" বলিয়াছেন, শাস্ত্রে নারায়ণকে ঠিক তাহাই বলা হইয়া থাকে। "চণ্ডী"তে নারায়ণী-শক্তিকে

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা"

বলা হইয়াছে, সুতরাং বিষ্ণু বা নারায়ণও অনন্তবীর্য্য; এবং তাহা হইলে তিনি বায়ুর ন্যায় অচিন্ত্য-বীর্য্যও বটেন, কারণ অনন্তবীর্য্যের অনন্তভাবের চিন্তা হয় না—তাহা অচিন্ত্য।

মতান্তরে, এই শয়িত পুরুষ-শক্তি সরস্বতী-কেই ঋগ্বেদীয় সায়ং সন্ধ্যাকালীন

"ওঁ বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামাম্বরানু-লেপনস্রগাভিভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্র-গদাপদ্মাঙ্ক চতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণু দৈবতাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ।"

বলিয়া ধ্যান করিতে হয়। পাঠক দেখিবেন, জীবনের সন্ধ্যায় অর্থাৎ বার্দ্ধক্যে বায়ুর প্রাবল্য হয়, এবং সেই বায়ুই শেষ-শায়ী এবং শেষ-শায়ীই যে সামবেদের দেবতা তাহা আমরা বলিয়াছি। সেই জন্য দিবসের বার্দ্ধক্যে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে সেই সামবেদোচ্চারণকারিণী বৃদ্ধা সরস্বতী নাম্নী শেষশায়ীর শক্তিকে স্মরণ করিতে হয়। এ সকল কি আমাদের কথার পোষকে যায় না? স্মরণ রাখিতে হইবে, "শক্তি-শক্তয়োরভেদম্"। আর ঐ শক্তি যে বৃদ্ধা, তাহার অন্যতম কারণ, তিনি প্রপিতামহ-মহাশয়ের শক্তি—সাক্ষাৎ প্রপিতামহী।

আর এক কথা। যে সকল দেবমূর্ত্তি আমরা সর্প সংযুক্ত বা সর্পভূষিত দেখিতে পাই, সে সকল রাজসী বা তামসী। গুণত্রয়ের যে সকল বর্ণ শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে, তদনুসারে সাধারণতঃ সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণা, রাজসী রক্তবর্ণা এবং তামসী কৃষ্ণবর্ণা এবং প্রায়শই দিগম্বরা এবং মুণ্ডমালাধারিণা দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতী সাত্ত্বিকী, অতএব শ্বেতবর্ণা। জগদ্ধাত্রী দুর্গা রাজসী—অতএব রক্তবর্ণা, অধিকন্তু নাগযজ্ঞোপবীতিনী, আর সংহারিণী কালী তামসী—অতএব ঘোরকৃষ্ণবর্ণা, মহামেঘ-প্রভাশ্যামা, পরন্তু মুণ্ডমালাধারিণী ও দিগম্বরী। আমরা যে কথা বলিতেছি, তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শিবের নিম্নলিখিত শাস্ত্রোক্তধ্যানত্রয়ে স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

(সাত্ত্বিক ধ্যান)

বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসি বক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥

(রাজস-ধ্যান)

উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালাভয়ং শূলং দধানং করৈঃ
নীলগ্রীবমুদার ভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥

(তামস ধ্যান)

ধ্যায়েন্নীলাভ্রকান্তিং শশিকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গশূলা-ভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালিং কর-সরসিরুহৈ বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণী নূপুরাঢ্যম্॥

সাত্ত্বিক-ধ্যানলিখিত "স্ফটিকসদৃশম্" "বিশদবসনম্", রাজসধ্যানের "উদ্যদ্ভাস্কর-সন্নিভম্, "রক্তাঙ্গরাগস্রজম্" "কপালম্, "বন্ধূকারুণবাসসম্" এবং তামসধ্যান কথিত "নীলাভ্রকান্তিম্" "মুণ্ডমালম্" "দিগ্বস্ত্রম্" "নাগম্" "সর্পাকল্পম্" শব্দগুলির প্রতি আমরা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

এখন ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে নারায়ণের মস্তকোপরি-সহস্র শীর্ষ সর্প ছত্রধারীস্বরূপ ফণা উন্নত করিয়া আছে, অনন্ত রূপের ধ্যানে যাঁহাকে নাগ-যজ্ঞোপবীতি বলা হইয়াছে, আর যাঁহার বাহন গরুড়কেও শাস্ত্রে "দুষ্টাহিচ্ছেদীতুণ্ড" বলা হইয়াছে, সেই অনন্ত-নারায়ণরূপ ঠিক তমোগুণের হইতে পারে না, অথবা সত্ত্বগুণেরও হইতে পারে না—পরন্তু উহা এতদুভয়ের মধ্য-বর্ত্তী রজোগুণ-বিশিষ্ট হওয়াই সম্ভব। "অনন্ত-নারায়ণের" ধ্যান নিম্নে দেওয়া গেল; তাহা দেখিয়া পাঠক বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ণে তিনি সত্ত্বগুণাত্মক, আয়ুধে তাঁহার রজোগুণসূচিত এবং সর্প-সংযুক্ত ইত্যাদি কারণে তাঁহাতে তমোগুণও আছে বুঝা যায়। অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণাত্মক, অথবা এককথায় তিনি রজোগুণশালী। কারণ রজোগুণ সত্ত্বেও আছে, তমোগুণেও আছে। ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই নারায়ণের প্রকৃতি স্বয়ং দেবী দুর্গা—তিনিও ত্রিগুণাত্মিকা—রজো-প্রধানা। তাঁহাই তাহারা একটি নাম রাজসী। অনন্তের ধ্যান যথা :—

ওঁ দিব্যসিংহাসনাসীনং দেবেশং গরুড়ধ্বজম্।
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং পীতাম্বরং বিভুম্।
শ্রিয়া বাণ্যা চ সংশ্লিষ্টং কিরীটাদি সমুজ্জ্বলম্॥
ফণাশতসমাযুক্তং জগন্নাথং জগদ্গুরুম্।
অনন্তং চিন্তয়েদ্দেবং নারদাদ্যৈরুপস্তুতম্॥

এখন ব্রহ্মার সম্বন্ধে কিছু বলি। টীকাকার

ব্রহ্মাকে রজোগুণাত্মক না বলিয়া সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বলিয়াছেন। দেখা যায়, ব্রহ্মা অস্ত্রধারী নহেন, কাহাকেও দমন বা বধ করা তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি বেদ, জপমালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি লইয়া এক হিসাবে সত্ত্বগুণোচিত আচার-পরায়ণ। তাঁহা হইতে উদ্ভূত ব্রাহ্মণগণকে সাত্ত্বিক বলা হইয়া থাকে, তবে স্বয়ং তাঁহাকে সাত্ত্বিক ভাবিতে দোষ কি? "চণ্ডী"তে দেখা যায় যে, শুম্ভনিশুম্ভ-বধের সময় সকল দেবশক্তি মাতৃগণই অস্ত্রগ্রহণে সংহার-কার্য্যে ব্যাপৃতা, স্বয়ং বৈষ্ণবীশক্তিও সশস্ত্রা ছিলেন, কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণীই নিরায়ুধা। "চণ্ডীতে" সে কথা এইরূপ আছে :—

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥

এ ত দেখিতেছি অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীর জিনিস, এ কি যুদ্ধক্ষেত্রের ভরসা? তবে ব্রহ্মাণী যুদ্ধের কোন কার্য্যে লাগিলেন? "চণ্ডীতে" বলা হইয়াছে :—

কমণ্ডলু-জলাক্ষেপ হতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন যেন যেন স্ম ধাবতি॥

অর্থাৎ শত্রুগণের প্রতি কমণ্ডলু হইতে কেবল মন্ত্রপূত বারি-প্রক্ষেপ, ইহাই ব্রহ্মাণীর একমাত্র অস্ত্র। ইহা সত্ত্বগুণাত্মক ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য—অনেকটা অভিচার-ক্রিয়ার মত বটে। তাই ইহা সত্ত্বেও রজোগুণের আভাস দেয় বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ব্রহ্মাকে সত্ত্বগুণাত্মক ভাবিলে ক্ষতি কি? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্ত্বগুণেও রজোগুণ আছে। সুতরাং ব্রহ্মাকে এই দুই গুণের যে ভাবে বুঝ, তিনি অল্লাধিক তাহাই, ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে।

টীকায় উল্লেখিত হরসম্বন্ধে টীকাকারের সহিত সাধারণের মত-ভেদ নাই। সুতরাং আমাদের সে সম্বন্ধে বলিবার ও কিছু নাই।

উপসংহারে আবার বলি, টীকাকার কোন অশাস্ত্রীয় অসঙ্গত কথা আলোচ্য টীকা-সম্বন্ধে বলেন নাই। বলিলে এ টীকার এত কাল ধরিয়া আদর থাকিবে কেন? সাধকের প্রকৃতি অনুসারে তাহার ইষ্ট দেবতা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় একেশ্বর-সম্বন্ধে পুরাণাদিতে বহুমত দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাগোজী ভট্ট দেবী ভগবতী মহালক্ষ্মী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি "লিঙ্গংযোনিঞ্চ বিভ্রতী—ইত্যনেনাস্যাঃ পুংরূপত্বং স্ত্রীরূপত্বং চ ধ্বনিতম্। এতদেব রূপং শৈবাঃ সদাশিব ইত্যাহুঃ। বৈষ্ণবাঃ বাসুদেব ইতি শাক্তা মহালক্ষ্মীবীতি।* * এষা শৈবী বৈষ্ণবীচ।" সুতরাং আমাদের টীকাকার যদি কোন এক বিশেষ শাস্ত্রমত অনুসরণ করিয়া তাঁহার টীকা লিখিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম বলা যায় না। আর ত্রিগুণ যে পরস্পরকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, সে সম্বন্ধেও পুরাণে উল্লেখ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন :—

এত এব ত্রয়ো দেবা এত এব ত্রয়োগুণাঃ।
অন্যোন্য মিথুনাহ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা।
ক্ষণং বিয়োগো ন হ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরম্।

ইহাতে সব তর্ক এক কথায় চুকিয়া যায়। অর্থাৎ আমরা এখন যে কথা বলিলাম, তাহাতে ত্রিমূর্ত্তির প্রত্যেকটিতেই সবগুণ আছে, তবে তাঁহাদের এক একটিতে এক একটি বিশেষ গুণের আধিক্য আছে মাত্র, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। এখন সেই তিনেই এক, একেই তিন দাঁড়াইল। ত্রিমূর্ত্তির সম্বন্ধে ব্রহ্মা রজোগুণাত্মক, বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক

এবং হর তমোগুণাত্মক, ইহাই সাধারণতঃ পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে যে সে সম্বন্ধে অন্যরূপ লিখিত আছে, তাহাই আমরা এ প্রবন্ধে দেখাইলাম।

শিব-চতুর্দ্দশী।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)।

(১)

শুভ চতুর্দ্দশী তিথি লইয়া ভকতি প্রীতি,
পূজিতে এসেছি আজ, শঙ্কর! তোমারে,
এমন দেবতা আর দেখিনি সংসারে!
প্রেমময়—অনাসক্ত ভক্তের পরম-ভক্ত,
"পূজা"ভেবে তৃপ্ত কেবা দারুণ"প্রহারে?"
এমন উদার প্রাণ আছে কি সংসারে?

(২)

স্বর্গ মর্ত্ত্য সব খুঁজে, তেত্রিশ কোটীরে পূজে
দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি যত দয়া যা'র,
পবিত্র "দেবত্ব" আছে কোন্ দেবতার?
এত মায়া—এত স্নেহ,
জানেনা ত আর কেহ,
ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, কুবের, তপন,
দয়ার দেবতা—এরা নহে একজন!

(৩)

এ ভারত "আত্ম-ভোলা"
তুমিও যে'আত্ম-ভোলা,
ধ্যান-মগ্ন—মহাদেব—বাহ্যজ্ঞান হত।
ভারতের দেব, ঠিক্ ভারতেরই মত।
তাই এত ভালবাসি—
ঈশান—শ্মশান-বাসী,
গৃহে "অন্নপূর্ণা" যা'র কুবের ভাণ্ডারী,
কি ত্যাগ-স্বীকার, তবু সে শিব ভিখারী!

(৪)

কালসর্পে—কুতুহলে, জড়া'য়ে রেখেছ গলে,
শিরে—গঙ্গা-তরঙ্গের আতঙ্ক গর্জ্জন?
ভ্রূক্ষেপ নাহিক তা'য়, কি উদার মন!
নাহি মান—অপমান— সুস্থান কুস্থান জ্ঞান,
নাহি ভেদাভেদ, চির পান্থ উদাসীন!
কি অজ্ঞেয়—আপনাতে আপনি বিলীন!

(৫)

ভূত ও পিশাচে হায়! স্থান দে'ছ রাঙা পায়,
ভারতেরই মত তুমি বেদনা-বিধুর,
হে অব্যয়! হে স্বয়ম্ভু! হে চির মধুর!
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্তি করে কোটী কাম পুড়ে মরে,
আত্মজয়ী আশুতোষ! প্রভো! পঞ্চানন!
পঞ্চভাবে, পঞ্চপ্রাণে, তোমারি আসন।

(৬)

কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—আছে "কর্ম্ম,"
তথাপি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম,
শক্তি বুকে, শান্তি মুখে, হর দিগম্বর!
মৃত্যুর মুরতি তুমি—সার্থক সুন্দর।
সতী-দেহ—ল'য়ে স্কন্ধে,
কেবা মত্ত প্রেমানন্দে?

কোন্ দেব জানে এত সতীর আদর ?
ভারত-সতীর তেজে—মুগ্ধ চরাচর।

(৭)

সমুদ্র-মন্থনে—যবে, সম্পদ্ লভিল সবে,
তব ভাগ্যে কালকূট—বিধির লিখন—
সে বিষ, আকণ্ঠ ভ'রে ক'রেছ সেবন।
আমরাও, পেলে সুধা, বিষ খাই ভেবে সুধা,
আমাদেরও তমোগুণ—আলস্য জড়তা—
তাই তুমি ভারতের আরাধ্য দেবতা!

(৮)

'পোড়া হাড়'—'ভস্ম ছাই'—
মোদেরও সম্বল তাই,
আমারে অর্দ্ধেক দিয়ে "অর্দ্ধ নারীশ্বর"—
নারীর সম্মান জানে, ভারতেরও নর।
এ ম্যালেরিয়ার দেশে—
যেন "মৃত্যুঞ্জয়" বেশে
পর-হিতে, আপনার সর্ব্বস্ব বিলাই,
তোমার চরণে, প্রভো!! এই ভিক্ষা চাই॥

প্রাচীন চিকিৎসকের পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

[কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ্, এম্, বি]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭১) অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ /০ আনা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধসহ সেবনে হৃদ্‌রোগ ভাল হয়।

(৭২) হরিণের শৃঙ্গ পুটপাকে দগ্ধ করতঃ পেষণ করিয়া চার পাঁচ রতি মাত্রায় প্রত্যহ আহারের পর গরম জল অনুপানে সেবন করিলে হৃৎ বেদনা ও পৃষ্ঠ বেদনা শীঘ্র নষ্ট হয়।

(৭৩) অর্জ্জুন ছালের কাথে কিঞ্চিৎ কুড় চূর্ণ ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে হৃদ্‌রোগ ভাল হয়।

(৭৪) সোমরাজী ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

(৭৫) চিরতা, বাসক ছাল, কটুকী, পটল-পত্র, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও রক্তচন্দন ইহাদের ক্বাথ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

(৭৬) সোহাগার খৈ, কর্পূর ও ঘৃত দ্বারা অগ্নিতাপে মলম প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে কুষ্ঠরোগ ভাল হয়।

৭ম বর্ষ | চৈত্র, ১৩২৯ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

কবিরাজী ও ডাক্তারী মতে নাড়ী পরীক্ষার আলোচনা।

[ডাঃ পি, কে, রায় চৌধুরী এল্, এম্ এফ্]

রক্তপূর্ণ ধমনীতে যখন হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত ৩।৪ আউন্স রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে ধমনীর মধ্যে প্রেরিত হইয়া ধমনীতে যে স্পন্দন উৎপন্ন করে, সেই স্পন্দনই নাড়ী নামে অভিহিত হয়।

ডাক্তারীমতে নাড়ীর ছবি Sphygmograph (স্ফীগ্মোগ্রাফ) নামক যন্ত্রে তুলিলে চিত্রের প্রথম রেখাটী হঠাৎ সোজা হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ও পরে রেখাটী ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে নামিতে থাকে, কেবল মধ্যে দুইটী বক্রতা দেখিতে পাওয়া যায়, রেখার শৃঙ্গটীকে Percu sion wave (পারকাসান্ ওয়েভ্) বা বায়ুনাড়ী বলে। ঐ রেখাটী যখন ক্রমে নামিতে থাকে তখন প্রথম বক্রকে Tidal Wave বা পিত্তনাড়ী ও নীচের বক্রকে Dicratic Wave বা কফ নাড়ী বলে।

কিন্তু বায়ু অর্থে বাতাস, পিত্ত অর্থে যকৃত নিঃসৃত রস এবং কফ অর্থে থুথু বা গয়ার বুঝিলে হইবে না।

বায়ু বলিতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝায় এবং ঐ হৃৎপিণ্ড আবার মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং হৃৎপিণ্ড স্থিত স্নায়ু সকল হইতে Eneregy বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করে (Cantral and Sympathetic nervous systems and the gongliens of the heart)

পিত্তনাড়ী অর্থে যকৃত নিঃসৃত রস না বুঝিয়া (Toxin in Circulation) রক্তমধ্যে একটী বিষাক্ত পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে বুঝিতে হইবে।

কফনাড়ী অর্থে থুথু বা গয়ার না বুঝিয়া circulation of lymph) শ্লৈষ্মিক রস অবাধে শ্লৈষ্মিক নালীতে প্রবাহিত হইতে পারিতেছে কিনা বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেকটীর আলোচনা।

Percussion wave বা বায়ুনাড়ী ফিজিওলজিক্যাল কারণঃ—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) হৃৎপিণ্ডপ্রেরিত ৩।৪ আউন্স রক্ত ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই যে স্পন্দন উৎপন্ন করে তাহাকেই Percussion wave বা বায়ুনাড়ী বলে। Sphymograph নামক যন্ত্রে এই নাড়ীর গতি ছবি তুলিলে প্রথমেই যে রেখাটী সোজাসুজী উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, ঐ রেখার শৃঙ্গকেই Percussion wave এবং কবিরাজী মতে বায়ু নাড়ী বলা হয়। আবার হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক হইতে ভেগাস্ স্নায়ু দশম যুগ্ম স্নায়ু) মেরুদণ্ড হইতে সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ু এবং হৃৎপিণ্ডস্থিত গ্যাংগ্লিয়ন (ganglions) সকল হইতে Energy বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্কুচিত (Diastab) এবং প্রসারিত (Ditab কার্য্য করিয়া থাকে। মস্তিষ্ক হইতে উৎপন্ন ভেগাস স্নায়ু হইতে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বা স্পন্দন মৃদু হয়। মেরুদণ্ডস্থিত সিম্প্যাথিটিক্ স্নায়ু দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বা স্পন্দন বর্দ্ধিত হয় (accelaritary action) এবং হৃৎপিণ্ড স্থিত গ্যাংগ্লিয়ন (Ganglious) হইতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনকে (Augmentary action) বলশালী করে।

সুতরাং এই Percussion wave বা বায়ুনাড়ী পরীক্ষা কালীন নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

১। Rate per minute.—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রতিমিনিটে কতবার হইতেছে ইহার দ্বারা ভেগাস্ স্নায়ুও সিম্প্যাথিটিক স্নায়ুর ক্রিয়া বুঝায়।

২। Rhythm :—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কম গুলি যথাক্রমে পর পর হইতেছে কি না, ইহার দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গ্যাংগ্লিয়নের (Ganglions) ক্রিয়া কি প্রকার হইতেছে বুঝিতে হইবে।

৩। Volume :—হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড কি পরিমাণে রক্ত প্রেরণ করিতেছে অর্থাৎ ধমনী সকল রক্তপূর্ণ বা রক্তাল্পতার (Large or small) অবস্থা বুঝায়।

Tidal Wave:—বা পিত্তনাড়ী (Toxic in circulation) অর্থাৎ রক্তমধ্যে কোন রকম বিষাক্ত পদার্থ চলাচল করিতেছে বুঝিতে হইবে।

ফিজিওলজিক্যাল কারণঃ—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত ৩।৪ আউন্স রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) প্রবেশ করিয়া ধমনীতে যে আঘাত করিতেছে এবং এই আঘাত জনিত ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে Percussion Wave বা বায়ু নাড়ী বলা হয়। পরে হৃৎপিণ্ডের প্রসারিত (Diastab) হইবার সময় হৃৎপিণ্ডের সেমিলিউনার ভালভস্ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় ধমনীস্থিত রক্তকে পুনরায় হৃৎপিণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না; হৃৎপিণ্ডস্থিত সেমিলিউনার ভালভসেতে রক্ত প্রবাহের প্রতিঘাতজনিত ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হয় তাহাকেই Tiidal wave এবং কবিরাজী মতে পিত্তনাড়ী বলা হয়।

ভুক্তদ্রব্য আহারের পর পাকস্থলী ও অন্ত্রদ্বয় হইতে পাচক রস দ্বারা রূপান্তর ও

শোষিত হইয়া রক্তপ্রণালীমধ্যে রক্তে পরিণত হইয়া সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয়। এই রক্ত হইতে শরীরস্থ যাবতীয় কোষসকল (tissue cells) পোষণ গঠন ও কার্য্যক্ষম হয় এবং উক্ত কোষসকলের পরিত্যক্ত অনাবশ্যকীয় পদার্থকে বহন করিয়া শরীর মধ্য হইতে মূত্র ঘর্ম্ম ও শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা নির্গত হয়। ইহাকেই metabalism কহে। এবং উক্ত অনাবশ্যকীয় পদার্থকে টক্সিন্ (toxin) বা বিষাক্ত পদার্থ বলে। এই টক্সিন ভ্যাসোমোটর স্নায়ু (ধমনী সকলের উপর যে সমস্ত স্নায়ু ক্রিয়া করে) কে উত্তেজিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈরিক রক্তপ্রণালী সকলকে (cappilary blood vessels) সঙ্কুচিত করিয়া রক্তচাপ (Blood pressure) বৃদ্ধি করে। আবার যতই রক্তচাপ বৃদ্ধি হইবে, হৃৎপিণ্ড প্রেরিত রক্তের, রক্তপূর্ণ ধমনীতে যাইয়া হৃৎপিণ্ড প্রসারিত (Diastab) হইবার কালীন ধমনীস্থিত রক্তপ্রবাহের প্রতিঘাত যত জোরে হৃৎপিণ্ডস্থিত সেমিলিউনারভাল্‌ভ্ সেতে প্রতিহত হইবে; ধমনীর মধ্যে তত জোরে স্পন্দন হইবে, এই স্পন্দনই Tidal wave বা পিত্তনাড়ী। রক্তচাপ যতই বেশী হইবে প্রতিঘাতটীও ততই বেশী হইবে সুতরাং পিত্তনাড়ীও ততই প্রবল বা স্পষ্ট হইবে। রক্তচাপ যত কম হইবে প্রতিঘাতটীও ততই কম হইবে সুতরাং পিত্তনাড়ী ততই অস্পষ্ট বা অদৃশ্য হইবে। রক্তচাপ বৃদ্ধিহইলে শরীরের মধ্যে টক্সিন্ ও বেশী হইবে, আবার এই টক্সিন ভ্যাসোমোটর স্নায়ুকে সঙ্কুচিত করিবে, কাজেই রক্তপূর্ণ ধমনীতে যে পরিমাণে রক্ত প্রবেশ করিতেছে, তাহা অপেক্ষা কম রক্ত বাহির হইয়া যাওয়ায় রক্তচাপ বৃদ্ধি হইতেছে এবং পিত্তনাড়ী ততই প্রবল হইতেছে। শরীরের মধ্যে টক্সিন যতই কম হইবে, রক্তচাপ ততই কম হইবে পিত্তনাড়ী ততই অস্পষ্ট হইবে।

Dicratic wave বা কফনাড়ী। ফিজিওলজিক্যাল কারণঃ—রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড আবার প্রত্যেক সঙ্কোচনে (Systab) অতিরিক্ত ৩৪ আউন্স রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। উহাতে প্রথমে ধমনীর মধ্যে যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে percussoin weve বা বায়ুনাড়ী বলা হয়। দ্বিতীয়তঃ হৃৎপিণ্ড প্রসারিত (Diastab হইবার কালীন ধমনীস্থিত রক্তপ্রবাহ হৃৎপিণ্ডের সেমিলিউনার ভাল্‌ভ্ সেতে প্রতিহত হইয়া যে স্পন্দন হইতেছে তাহাকে tidat wave বা পিত্তনাড়ী বলা হয়। তৃতীয়তঃ রক্তপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড প্রেরিত অতিরিক্ত রক্ত ধমনীর স্থিতি স্থাপকতার Elasticity) গুণ থাকায়, ধমনী সকল প্রসারিত হইয়া অতিরিক্ত রক্তকে স্থান দিতেছে এবং ধমনীর সঙ্কোচনের (Contraction) অবস্থায় যে স্পন্দন ধমনীতে পাওয়া যায়, তাহাকে D'eratic wave এবং কবিরাজী মতে তাহাকে কফ নাড়ী বলা হয়।

থোরাসিক্ ডাক্ট এবং দক্ষিণ লিফক্যাটিক্ ডাক্ট্ নামক দুইটী প্রধান শ্লৈষ্মিক প্রণালী শরীরস্থ যাবতীয় শ্লৈষ্মিক রস লইয়া সাবক্লেভিয়ান্ ভেন এবং জুগুলার ভেনের সংযোগ স্থলে যথাক্রমে বামে ও দক্ষিণে আসিয়া রক্ত প্রবাহতে মিলিত হইতেছে। কিন্তু রক্তচাপ কম থাকিলে শ্লৈষ্মিক রস অবাধে শ্লৈষ্মিক প্রণালী হইতে রক্ত প্রণালীতে মিলিত হইতে

পারে না। রক্তচাপ বেশী হইলে হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক সঙ্কোচনেতে শ্লৈষ্মিক প্রণালীর পশ্চাৎদিক হইতে চাপদ্বারা back ward pressure শ্লৈষ্মিক রস অবাধে আসিতে থাকে অধিকন্তু রক্তচাপ বেশী থাকায় শিরার রক্তচাপ দ্বারা শ্লৈষ্মিক প্রণালী হইতে শ্লৈষ্মিক রস এ্যাস্‌পিরেটিঙের aspirating দ্বারা রক্ত প্রণালী মধ্যে অবাধে আসিতে থাকে। কফ-নাড়ী বলিতে শরীরস্থ শ্লৈষ্মিক রসের গতি বুঝায় অর্থাৎ যখন রক্তচাপ কম থাকে তখন শ্লৈষ্মিক রস অবাধে শিরাতে আসিয়া পড়িতে পারে না, আবার রক্ত চাপ কম থাকার জন্য ধমনীর স্থিতি স্থাপকতার গুণ থাকার জন্য বেশী সঙ্কোচন Contraction হয়, ধমনীর যত বেশী সঙ্কোচন হইবে, ততই স্পন্দনটীও বেশী স্পষ্ট হইবে। রক্তচাপ বেশী থাকিয়ে ধমনী সকল অত্যন্ত Tension এতে থাকায় উহার স্থিতিস্থাপকতার গুণ কম হইয়া যায়। স্থিতিস্থাপকতার গুণ কম থাকায় উহার সঙ্কোচনও কম হয়, সুতরাং স্পন্দনও হইবে অর্থাৎ রক্তচাপ বেশী হইলে শ্লৈষ্মিকরস অবাধে রক্ত প্রণালীতে আসিয়া পড়িতে পারে, সুতরাং এখানে কফ নাড়ী অস্পষ্ট বা অদৃশ্য হইবে। শ্লৈষ্মিক রস দ্বারা যাবতীয় শরীরস্থ সেলের গঠন, পোষণ ও কার্য্যক্ষম হয়। যখন ইহার শ্লেষ্মাধিক্য হয় তখন সেলের ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। যেখানে কফ-নাড়ী প্রবল সেখানে বুঝিতে হইবে যে শরীরস্থসেলের গঠন ও পোষণ ইত্যাদির ব্যাঘাত হইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ কি অবৈজ্ঞানিক?

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

পাশ্চাত্য দেশের শ্বেত ঋষিরা এবং তথাকথিত শ্বেত উচ্ছিষ্ট ভোজী কৃষ্ণাবতারেরা মনে করেন সারা ভারতটাই অবিজ্ঞানিক। বিজ্ঞান আসিল পশ্চিম হইতে, তবে ভারত বিজ্ঞানের ছোঁওয়া ধরা পাবে কোত্থেকে? ইত্যাদি কথার গঞ্জনা আমরা শুনে শুনে মনে করি "হাঁ, ঠিকই আমরা বুঝি অবৈজ্ঞানিক, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ও অবৈজ্ঞানিক।" সুধীসমাজে গিয়া, বসে আরো লজ্জা হয় যে, আমাদের আয়ুর্ব্বেদে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর চিকিৎসা নাই, আয়ুর্ব্বেদে শল্য বা অস্ত্র চিকিৎসা নাই। এই শল্য চিকিৎসার অভাবই আয়ুর্ব্বেদকে আরো কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। যখন পশ্চিমের সঙ্গে পূর্ব্বের তর্ক উপস্থিত হয়, তখন দূরের লোক আমরা এ ওর পানে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া তর্কের খতম করি।

বড় দুঃখ হয় আমাদের চরক, সুশ্রুত-নিদান কিছুই বিজ্ঞানের নাগ পায় নাই! আজ কাল দেশবাসীগণ একটু স্বাবলম্বন প্রয়াসী হইয়াছেন, তাই দেশবাসীরা একটু একটু চিকিৎসা বিজ্ঞানের তত্ত্ব অল্লাধিক পরিমাণে

রাখিতেছেন। পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের দেশে এম্, ডি, এম, বি, এল, এম, এস প্রভৃতি বহু চিকিৎসক খাড়া হইয়াছেন। কিন্তু তাঁরা যে সেই পাশ্চাত্য প্রসাদ প্রার্থী, যদি বিদেশ হইতে ঔষধ না আসিত তবে তাঁহারা অস্ত্রহীন সেনানীর ন্যায় রণ ক্ষেত্রে কেবল শোভা বর্দ্ধনই করিতেন। তাঁদের দ্বারা আর কি কাজ সম্ভব হইতে পারিত ?

দেশের লোক চিকিৎসা সম্বন্ধে একবারে উদাসীন, এই নন্‌কো অপারেশনের দিনে দেশের লোক অন্ন বস্ত্র দেশ হইতে সংস্থান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, কত দৌরাত্ম্য-অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহার সীমা নাই, কিন্তু কই তাঁহারাতো দেশের স্বাস্থ্য, আরোগ্য লাভের সর্ব্বপ্রধান উপায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার জন্য একটুও মাথা ঘামাইতেছেন না। বরং দেশের লোক এতটা উদাসীন যে, যে পাশ্চাত্য বিষে আমাদের দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, তাহারই পুষ্টি বর্দ্ধনার্থে চেষ্টা করিতেছেন! আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণয়নকারী ধন্বন্তরিগণ অনুমান, প্রত্যক্ষ, আপ্তবাক্য ও যুক্তি এই চারি প্রকার প্রমাণ লইয়া চিকিৎসার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদসৃষ্টির বহু সহস্র বৎসর গত হইলেও আয়ুর্ব্বেদের কোন কথাই অপ্রামাণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইবার যোগ্য হয় নহে। আয়ুর্ব্বেদ, দেহী মাত্রের বায়ু, পিত্ত, কফ তিনটী ধাতুকে সার ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী পাশ্চাত্য ঋষিগণ ইহা বুঝিতে পারেন না বলিয়াই আমাদের আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই ?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কীটাণুর দোহাই দিয়া থাকেন। কীটাণুই সর্ব্বরোগের কারণ তাই কীটাণুর দোষ দিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে মশক কুল সর্ব্বধ্বংসী। তাই কীটাণুর ধ্বংসোদ্দেশে কুইনাইন নামক পদার্থ গাদা গাদা খাওয়াইয়া রোগীকে আধমরা করিয়া ছাড়িতেছেন, অবশেষ আয়ুর্ব্বেদে তাহার চিকিৎসা হয়—ইহাই আধুনিক সনাতন প্রথা। "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" ইহা আয়ুর্ব্বেদের কথা। জ্বর হইলে প্রথমে লঙ্ঘন, দ্বারা দেহ রসহীন করা, স্নানাদি রসকর বিষয় বর্জ্জন করা। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ একবারেই কীটাণুর কথা ভাবে না। সুতরাং অনেকেই মনে করিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদে কীটাণুর কথা একবারেই নাই। মশক মারিবার জন্য সরকার নানা উপায়ে কামান পাতিয়াছেন, শিশি শিশি কুইনাইন দিয়া রোগীকে কীটাণু মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দু'দিন পরেই আবার জ্বর বাহির হইতেছে। এটা কি? দেহে যাহাতে কীটাণু প্রবেশ করিতে না পারে বা প্রবেশ করিলেও নির্ম্মূল হইয়া যায়—ইহাই হচ্ছে আয়ুর্ব্বেদের বিধান। কীটাণু যাহাতে আর দেহপ্রবিষ্ট হইতে না পারে, এইরূপ চিকিৎসাই সঙ্গত। দেহে কীটাণু প্রবেশ করিবেই, কিন্তু দেহটাকে এমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে যে, কীটাণু প্রবেশ মাত্রেই ধ্বংস হইয়া যাইবে—ইহাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। কোনটা করিব? শরীরকে ব্যাধির অনুপযুক্ত করিব—যাহাতে

কীটাণু প্রবেশ করিতে না পারে তাহা করিব—না যথেষ্ট অত্যাচার করিয়া শরীরে কীটাণু প্রবেশ করাইয়া তাহার চিকিৎসা করিবার জন্য কীটাণু ধ্বংস করিব—কোনটা ইহার সমীচীন ব্যবস্থা—বুঝিতে পারি না।

বিগত এক বৎসর যাবৎ আমি ভীষণ হৃদপিণ্ডের বেদনায় ভুগিতেছি। ময়মনসিংহে আমার বাড়ী, সহরে আমার বাসা বাড়ী। সেখানকার সহরের ছোট বড় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ আমায় দেখিতেছেন, অবৈজ্ঞানিক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণও সকলেই উপস্থিত থাকিতেছেন। এম, বি, এল, এম্, এস রা ত আছেনই, মাসে মাসে সিবিল সার্জ্জনও আসিয়া দেখিতেছেন রোগের কিনারা হইল না। ইঞ্জেকসনও কম হয় নাই। কিন্তু কষ্ট কিছুতেই উপশম হইল না, বুকের বেদনা জনিত কষ্ট এত বাড়িয়া গেল যে, দিবা রাত্রি নিদ্রা লোপ হইল, বসিতে বা শুইতে পারি না, সারা রাত্রি দুই জনের ঘাড়ে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকি। দিন মানেও বসিতে পারি না। প্রস্রাব করিলে, মলত্যাগ করিলে, আহার করিলে বেদনা প্রবলতর হইয়া যাতনা দেয়। মল মূত্র ত্যাগ করিতে হইলে অপরের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত ফিরিয়া আসিতে পারি না। মল, মূত্র ত্যাগ করিয়া ফিরিবার সময় একটা পিঁড়ি বা চৌকিতে করিয়া দুইজনকে ধরা ধরি করিয়া ঘরে আনিতে হয়। এই ত তখন আমার অবস্থা। তৎকালে একজন বলিষ্ঠ ভৃত্য আমার সহায়ক স্বরূপ থাকি।

এই অবস্থায় আমি আমারনানা স্থানের তার কয়জন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসক বন্ধুর শরণাপন্ন হই। সকলেই আমাকে অতি যত্নে অবিলম্বে ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন, এখানে বলিয়া রাখা ভাল, ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের চিকিৎসাধীন কিছুদিন থাকিয়া কোন ফল পাই নাই। তৎপরই অন্যান্য স্থানের ঔষধ আসিয়া পঁহুছিল, সকলের ঔষধই অতি বিশ্বাস সহকারে ক্রমে ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ভাগ্যক্রমে ইহাতেও বিশেষ ফল ফলিল না, তখন কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। ইহা যে চিকিৎসা যাত্রা তা' মনে করি নাই, গঙ্গা যাত্রাই ভাবিয়াছি, ময়মনসিংহের ডাক্তার কবিরাজগণ বলিলেন, "এরূপভাবে যাওয়া চলেনা, নড়া চাড়ায় পীড়া বাড়িবে, হয়ত বা পথেই প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে।' সুতরাং আপাততঃ বাহির হওয়া স্থগিত রাখা গেল, পরে পরামর্শ হইল—বাড়ীশুদ্ধ সকলকে লইয়াই কলিকাতা যাত্রা করিব। আমি ভাবিলাম ভালই হইল, গঙ্গা যাত্রা কালে সবটিকে দেখিয়া মরিতে পারিব। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়ার জন্য লিখিলাম, এক জন কবিরাজ বন্ধু লিখিলেন—', ভাড়ার বাড়ীর দরকার নাই, আমার বাড়ীতেই সপরিবারে উঠিবেন।" এই সময় হঠাৎ মনে হইল, রাজসাহীতে একজন কবিরাজকে পত্র লিখিয়া দেখিনা কেন? অবস্থা লিখিয়া পত্র দিলাম, তিনিও অতি সত্বর ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ঔষধ আসিল, পরে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা এ ঔষধ খাইতে নিষেধ করিলেন্। তাঁদের কথা এই—"আমরা রোগ ও রোগী দেখে ঔষধ দিয়ে কিছু কর্ত্তে

পারলেন না। আর তিনি রোগ ও রোগী না দেখে শুধু জল ঔষধ দিলেন, তা'তে কি ফল হ'বে ? তাঁরা ঔষধ খাইতে বারণ করিলেন, তদনুসারে রাজসাহীতে কবিরাজ মহাশয়কে লিখিলাম। তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—"আপনি ঔষধ খাউন, কাহারো কথা শুনিবেন না, অন্যে বুঝিতে পারেন নাই বলেই নানা কথা বলিতেছেন, এই ঔষধেই ফল পাইবেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়া ঔষধ খাইলাম, মন্ত্রশক্তির মত ফল পাইলাম, তিন মাস নিদ্রা কাহাকে বলে জানিতাম না। ঔষধ খাওয়ার প্রথম দিনই গভীর রাত্রে আমার নিদ্রা হইল, পরদিন এত সুখ পাইয়াছিলাম যে সাত রাজার ধন আনিয়া দিলেও এতটা সুখী হইতাম না। দ্বিতীয় দিন ঔষধ খাইয়া আরও খানিকটা বেশী ঘুমাইলাম, এসময় গাঢ় নিদ্রা হইল। শুশ্রূষা কারীর ধড়ী ধরাই ছিল। দ্বিতীয় দিন বসিয়া বসিয়া কাটাইতে পারিলাম। সামনে কয়েকটা বালিশ রাখিয়া নিদ্রা গেলাম, বেদনার বেগও অনেকটা প্রশমিত হইল, মনে হইল যেন রোগ অর্দ্ধেক হইয়াছে। ডাক্তারেরা পরদিন আসিয়া দেখিলেন, আমি চেয়ারে বসিয়া আছি, কোথায় আমি সর্ব্বদা দাঁড়াইয়া থাকিতাম, আজ কিনা বসিয়া আছি, তাঁহারা অবাক হইয়া কহিলেন. "এ কিসে হইল ? আমি কহিলাম "এ আমাদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার ফল।" তাঁহারা সব কথা শুনিয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

এবার তৃতীয় দিনের কথা, তৃতীয় দিন ঔষধ খাইয়া রাত্রে প্রায় তিন ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে পারিলাম। এদিন কিন্তু শুইয়াই নিদ্রা গেলাম। প্রাতে উঠিয়া ভাবিলাম যেন আমি সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়াছি, তাড়াতাড়ি মুখে জল দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। শুশ্রূষাকারীরা জাগিয়া উঠিয়া আমার পিছন ধরিল, আমি বলিলাম, "তোমরা কেন সঙ্গ লইতেছ, আমিত নীরোগ হইয়াছি মনে করিতেছি ?" তবুও তাহারা আমার পিছন ছাড়িল না। আমি একটু হাওয়ায় বেড়াইয়া গৃহে ফিরিলাম। আমার এই অবস্থা ঔষধ বা মন্ত্রবলে হইল তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না। এই সময় আবার সমস্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণকে ডাকিয়া পাঠাইলাম, সিবিল সার্জ্জনকেও ডাকিতে ভুলিলাম না। তাঁহারা আমাকে দেখিয়াত অবাক। তাহারা বলিলেন—"হায় আমরা কি অপদার্থ, এইরূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে আমরা আবার অবৈজ্ঞানিক বলিয়া নিন্দা করি, আমাদের মনে হয় আমাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ফেলে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের নিকট গিয়া অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসক হইয়া আসি। ছাই এ সব, ফেলে দিতে ইচ্ছা হয়।" আমি যে চিকিৎসকের কথা লিখিতেছি তিনি প্রায় অশীতিপর বৃদ্ধ, এযুগে ধন্বন্তরি সদৃশ। আমি তাঁহার ঔষধ এখনও খাইতেছি, সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলেও তাঁহারই ঔষধে বাঁচিয়া আছি, রোগের সামান্য মাত্র অবশিষ্ট আছে, একবার তাঁহাকে দেখাইয়া আসিয়া কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছু দিন বাস করিয়া আসিব।

পথ্য তিনি অভিনব প্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাত খাওয়া নিষেধ, ভাত খাইলেই বেদনা বাড়ে, তাই ভাত খাইনা, জল

একবারেই খাইতে নাই, পাতলা দুধ পরিত্যজ্য। কতকদিন জল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, জলের পরিবর্ত্তে ডাবের জল ও ছানার জল খাইতাম, এখনও প্রত্যহ লুচি খাইয়া আছি। ছানা ও ছানার জল নিত্য পথ্য। টক খাইতে নিষেধ নাই, প্রত্যহ দধি, ঘোল খাই। এখনও মল, মূত্র ত্যাগের পরও হাঁটিলে, পরিশ্রম করিলে বেদনা অনুভব করি। পেটে কিছু পড়িলেই বেদনা বাড়ে। ভুরি ভোজন করিলেত যাতনার সীমা থাকে না। কবিরাজ মহাশয় ধন্বন্তরি সদৃশ গঙ্গাধর কবিরাজের ছাত্র, তিনি শল্য বা অস্ত্র চিকিৎসা উত্তম রকম জানেন, চক্ষু চিকিৎসায় তিনি পারদর্শী, চক্ষুর অস্ত্র চিকিৎসা তিনি যেমন করেন এমন আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। কে বলে আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্র চিকিৎসায় নাই? তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী ও অন্যান্য অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা দেখিলে অবাক হইতে হয়। এইত আমাদের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও চিকিৎসকের অবস্থা।

আয়ুর্ব্বেদকে অবৈজ্ঞানিক বলিতে বিজ্ঞান অভিমানী চিকিৎসকদের লজ্জিত হওয়া উচিত। এই ঘোরতর ননকোঅপারেশনের দিনে আপন পর চিনিয়া লওয়া সকলেরই উচিত। আয়ুর্ব্বেদকে দেশের ফুলের মাল্য দিয়া সাজাইয়া তোল।

পরমায়ু-প্রসঙ্গ বা মানুষ মরে কেন?

[কবিরাজ শ্রীঅক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ, ধন্বন্তরি]

দারোপগমন-বিধি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।

জগদীশ্বর জগতে জীব-প্রবাহ প্রবহমান রাখিবার প্রয়োজনে জীবোৎপত্তির এক কৌশল পূর্ণ অতি চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণী জীবেই স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতি এই দুই প্রকার বিভাগ তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। সন্তানোৎপাদনের অনুকূল কতকগুলি ব্যাপার পুরুষ জাতিতে নিহিত এবং গর্ভ ধারণের উপযোগী কতকগুলি বিষয় স্ত্রীজাতিকে ন্যস্ত করিয়া উহাদের পরস্পর সংসর্গ দ্বারা বংশ-বর্দ্ধনের যে প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; সেই প্রথা যে অতীব সমীচীন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আবার উক্ত স্ত্রীপুরুষে যে সময়ে সময়ে রিরংসু হইবে, তন্নিমিত্ত উহাদিগের অন্তরে কামশক্তি প্রদান করিয়াছেন। সেই কামশক্তি

প্রণোদিত হইয়াই স্ত্রী পুরুষে মিথুবন ক্রিয়ায় নিরত হয়, এবং তদ্বারা গর্ভোৎপত্তি ও কামান্তরে অপত্যলাভ হইয়া থাকে।

যাবতীয় জরায়ুজ এবং দুই একটি ব্যতীত প্রায় সমগ্র অণ্ডজ জীবেরই মিথুন সংসর্গে সন্তানোৎপত্তি হয়। পশু পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী সকলকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কাম ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যে সময়ে গর্ভোৎপত্তির সম্ভাবনা, কেবল সেই সময়েই একজাতীয় স্ত্রী কামুকী হইয়া স্বজাতীয় পুরুষের সংঘর্ষ কামনা করে। তৎকালেই পুরুষজাতির স্ত্রীজাতির সহিত সঙ্গত হয়, অন্য কালে কখনই মিলিত হয় না। স্ত্রীজাতির গর্ভ গ্রহণের অযোগ্য সময়ে কিংবা তাহাদের কামনা-হীন অবস্থায় অন্যজ জাতীয়পুরুষ কদাপি স্ত্রীর নিকটবর্ত্তী হইতেও ইচ্ছা করে না; যদি দৈবাৎ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক আহত ও বিতাড়িত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যেতর নিখিল প্রাণী নিচয়কে তিনি একপ্রকার স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, তাহারা যাবজ্জীবন সেই প্রকৃতি সিদ্ধ জ্ঞানেরই বশবর্ত্তী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কদাচ সেই সহজ জ্ঞানের বহির্ভূত কর্ম্ম করে না। পরন্তু মনুষ্যবর্গকে তিনি হিতাহিত বোধাত্মকাশক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন; অথচ তাহারা নামে মাত্র মনুষ্য হইয়া কার্য্যে পশুবৎ কদাচারী না হয় এ বিষয়েও বিলক্ষণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আহার বিহারাদি দৈনন্দিন করণীয় কার্য্যে ভাব বর্জ্জন এবং শিবগ্রহণেই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মানব যে কোন কর্ম্মেরই আচরণ করুক না কেন, সর্ব্ববিষয়ে তাহাকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। সেই নিগড়চ্যুত হইলেই সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার সংঘটন হয়। জন্মমৃত্যু মানবের প্রত্যবায়ের পরিণতি। দারোপগমন সম্বন্ধেও সেই ন্যায়োপেত নিয়মের অন্যথা নাই। সহধর্ম্মিণী সংসর্গেও তাহাকে শাস্ত্রীয় শাসন সমূহ অবশ্যই শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা ইহকালে ও পরকালে তন্নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ভোগ অনিবার্য্য। নারী-জাতি কুললক্ষ্মী, সংসারে শ্রী ও সমাজের ভূষণ স্বরূপ। অথচ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সহায়। পক্ষান্তরে আবার সেই সীমন্তিনীগণই ঘোরতর অলক্ষ্মী, গৃহস্থাশ্রমের সুতীক্ষ্ণ কণ্টক। যাবতীয় অনর্থের মূল, বহুবিধ বিপত্তির আধার এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের সংহন্ত্রী। তজ্জন্য মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে।
দুনিয়া কা আদমী এ'সা বৌরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥

ইহার অর্থ এই রমণীগণ দিবা ভাগে মোহিনী মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকে বটে; কিন্তু রজনী যোগে তাহারা ব্যাঘ্রীর ন্যায় অল্প অল্প করিয়া মানবের শোণিত শোষণ করে।

মহাত্মা ও মহাসাধু তুলসী দাসের এই সদুক্তি যে মহা সত্য, এবিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ নাই।

আর একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে :—
রূপে তরুণ্যা ভয়ম্, কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ম্।

এই শ্লোকের সমগ্র ভাগ উদ্ধৃত করিলাম না। অভিপ্রেত অংশ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল। ইহার অর্থ এই—রূপের ভয় যুবতীর কাছে, আর শরীরের ভয় যমের কাছে। অর্থাৎ তুমি যত বড়ই রূপবান, বলবান্ ও জ্ঞানবান হও বা কেন, প্রমদা প্রসঙ্গে তোমার মাতঙ্গাকার পতঙ্গের আকারে পরিণত হইবেই হইবে। পরম সন্ন্যাসী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এক শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'গুরো দ্বারং কিমেতন্নরকস্য' ? অর্থাৎ গুরুদেব! নরকে যাইবার পথ কি ?

শঙ্করাচার্য্য উত্তর করিলেন—নারী, অর্থাৎ নারী জাতি নিরয় প্রাপ্তির সুপ্রশস্ত পথ।

শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—সংমোহয়ত্যেব সুরেয়া কা ?" অর্থাৎ মদিরার মত কে মনুষ্যকে জ্ঞান শূন্য করে ?

গুরু উত্তর করিলেন—'স্ত্রী' অর্থাৎ প্রাণপ্রিয়া শীঘ্রই মানবকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

শিষ্য পুনরপি প্রশ্ন করিলেন -'কিমত্র হেয়ম ?" অর্থাৎ এই পৃথিবীতে ত্যজ্য বস্তু কি ?

গুরু বলিলেন "কনককান্তা"—অর্থাৎ জগতে কামিনী ও কাঞ্চন এই দুইটি সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য। মহাজন রচিত একটি সঙ্গীতে আছে – "ছাড় কামিনী কাঞ্চনের মায়া কর হরিনাম সম্বল" ইহার ভাবার্থ এই যে, স্ত্রীপুত্রাদি ও অর্থাদির মায়া কাটাইতে না পারিলে ত আর উহাদের কোন উপায়ই নাই।

জিজ্ঞাসু শিষ্য পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন — "প্রভো ? এজগতে অতি বুদ্ধিমান ধীর প্রকৃতি ও প্রকৃত শান্ত ব্যক্তি কে ?

আচার্য্য সস্মিত বদনে উত্তর দিলেন—প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাক্ষৈ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি মনোমোহিনী মহিলার তির্য্যক দৃষ্টিতে কদাপি তির্য্যকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, সেই যথার্থ জ্ঞানী; সেই প্রকৃত ধীর এবং সেই বাস্তবিক প্রশান্ত চিত্ত।

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'জ্ঞাতু ন শক্যং চ কিমস্তি সর্ব্বৈঃ ?" —অর্থাৎ ভূলোকে লোকে কোন জিনিসটি ঠিক জানিতে পারে না ?

উপাধ্যায় উত্তর করিলেন—যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্'। অর্থাৎ অবনী মণ্ডলে অবলা জাতির অন্তঃকরণ অতি দুজ্ঞের্য়। জানা বড় কঠিন। তজ্জন্য মনুষ্য সহস্র প্রকারে আয়াস স্বীকার করিয়াও স্ত্রীজাতির মনের কথা কিছুতেই জানিতে পারে না। তাহাদিগের চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান দেবতাদিগের ও অসাধ্য। মানুষের ত কথাই নাই। তন্নিমিত্ত একজন কবি বলিয়াছেন—'পুরুষস্য ভাগ্যং স্ত্রিয়শ্চরিত্রং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। ইহার অর্থ এই—পুরুষের ভাগ্য এবং স্ত্রীর চরিত্র দেবতারাও জানিতে পারেন না, মানুস ত কোন্ ছার ?

আমরা এ পর্য্যন্ত সুধাভাণ্ড স্বরূপ অথচ হলাহল সদৃশ যোষা জাতির সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিলাম, পাঠকবর্গ তাহা অবশ্যই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তৃতীয়াশ্রমীদিগের ত তাহাদিগকে পরিত্যাগের কোন উপায় নাই। আরও এক কথাও ত আছে—'হাম তো ছোড়তা হৈ', লেকেন কম্‌লী তো] ছোড়তা নহি'। অর্থাৎ তুমিই না হয় ছাড়িলে, কিন্তু সে ছাড়িবে কেন ? ছাড়া ছাড়ি হইলেই বা সংসারের সত্তা থাকে কৈ ? এক্ষণে তবে

কর্ত্তব্য কি? তৎপক্ষে মৎপরামর্শ এই যে, তাহাদিগকে লইয়াও থাক, অথচ আত্মরক্ষণ বিষয়ে একেবারে 'ভেবা গঙ্গারাম' হইয়া থাকিও না। একটু যেন চৈতন্য থাকে। এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে অতি সামান্য গুটি কতক কথা বিবৃত করিব। কারণ স্থানা ভাব।

ভাই! মদালসাদিগকে লইয়া মদন মদিরায় একেবারে উন্মত্ত হইও না। কারণ যত্তপি সম্পূর্ণ বিভোর হইয়া আপনাকে অত্যধিক মাত্রায় কন্দর্পের শরে বিদ্ধ কর, তাহা হইলে পরমার্থের পথ তুমি নির্ণয় করিতে পারিবে না। ফলে তদ্দ্বারা অত্যধিক পরিমাণে শুক্রক্ষয় এবং তন্নিমিত্ত অতি মাত্রায় অসৃক্ ক্ষয় ও অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সুতরাং পুরুষগণ যাহাতে অনঙ্গ রঙ্গে মজিয়া অবশেষে আপনারাই অনঙ্গ না হয়, সে বিষয়ে তাহাদিগের বিবেক রাখা আবশ্যক। আবার এস্থলে এতদর্থ প্রতিপাদক কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধি নির্দ্দেশ করিতেছি।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—ঋতুর চতুর্থাদি রাত্রিতে ভার্য্যাতে উপগত হইবে, ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, মাসে একবার মাত্র দারোপগমন বা স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া উচিত।

একটি প্রচলিত কথা আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি:—

মাসে এক, বৎসরে বার।
এর কমেও যত পার॥

এই কথাটির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বৎসরে দ্বাদশ দিনেরও ন্যূন সংখ্যায় কামকুর্দ্দন করিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয়ঃ সাধন হয়। কিন্তু সাংসারিক দৃষ্ট শরীরির পক্ষে এও অসম্ভব। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ আরও কিঞ্চিৎ শিথিলতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মহাত্মা সুশ্রুত লিখিয়াছেন:—

গ্রীষ্মকালে পঞ্চদশ দিবস অন্তর এবং অপরাপর সময়ে রাসযাত্রায় বাসরত্রয় মানব প্রমদা গমন করিতে পারে।

মহোদয় চরকাচার্য্য আবার গ্রীষ্মচর্য্যায় লিখিয়াছেন:—

কাননানি চ শীতানি জলানি কুসুমানি চ।
গ্রীষ্মকালে নিষেবেত মৈথুনাদ্ বিরতো নরঃ॥

ইহার অর্থ এই—মর্ত্ত্যগণ গ্রীষ্মকালে মৈথুনে বিরত থাকিয়া নিকুঞ্জকানন, শীতল পানীয় এবং সুগন্ধি কুসুম উপভোগ করিবে।

মহানুভব চরকের উক্তিতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিদাঘে নিতম্বিনী সম্ভোগ না করা ভাল। কারণ আতপকালে সন্তাপাধিক্য বশতঃ প্রাণ আই চাই করিতে থাকে। তদুপরি নিধুবন সম্ভিত পরিশ্রমে কলেবর অতি স্নিগ্ধ হইলে প্রাণী সমূহ অধিকতর বিকল হইয়া উঠিবে। তন্নিমিত্ত আয়ুঃক্ষতির সমধিক সম্ভাবনা।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে:—

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদার নিরতঃ সদা।
পার্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাম্যয়া॥

ইহার অর্থ এই—পুরুষ অপত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঋতুর চতুর্থ্যাদি নিশায় সমীপে গমন করিলে নিজ জায়াতেই নিরত থাকিবে। যদি

সাতিশয় রাগ বশতঃ কদাচিৎ ঋতু ভিন্ন কালেও মানবের কান্তা গমনে কাঙ্ক্ষা জন্মে,তাহা হইলে, দুইটি অষ্টমী, দুইটি চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই বাসব সপ্তক বর্জ্জনপূর্ব্বক দারাভিগমন করিবে। উল্লিখিত বিধি বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, সম্ভোগবিষয়ে যতই স্বল্পতা অবলম্বন করিবে, ততই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিবে। ইহার ফলে স্বীয় স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ভাবী বংশধর সুস্থ সবল ও সুদীর্ঘজীবী হইয়া সংসারে সর্ব্ব সম্পদ সম্ভোগ করিতে পারিবে। আশা করি, পাঠকগণ ইহা অবশ্যই পালন করিতে পারিবেন। অতঃপর অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গের দোষ সকল সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

সুধীবর মহাত্মা সুশ্রুত লিখিয়াছেন :—

আত্মবান্ ব্যক্তি অতিরিক্ত যোষিৎসংসর্গ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। কারণ, উহাতে শূল, কাস, শ্বাস, জ্বর, পাণ্ডু, যক্ষ্মা এবং আক্ষেপাদি নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়। আবার উহা দ্বারা শরীর সাতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বকালে ব্রহ্মচর্য্যের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ বীর্য্য সংরক্ষণ, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আদৌ শক্তিক্ষয় না করা। বিশিষ্ট চেষ্টা এবং নিরন্তর সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় সংরক্ষণের জন্য শাস্ত্রকারগণ যে সমুদয় পীযূষোপম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ এ স্থলে বিবৃত হইতেছে।

সাক্ষাৎ প্রজাপতিকল্প মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন :—

সর্ব্বত্র একাকী অধঃশয্যায় শয়ন করিবে। কদাপি নিজ ইচ্ছায় রেতঃ স্খলন করিবে না। যে হেতু স্বেচ্ছায় বীর্য্য পাতনে স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়, এবং ইহার জন্য যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিবার পদ্ধতি আছে।

সেচ্ছায় রেতঃপাত করার নামান্তর হস্ত-মৈথুন, এবং অনিচ্ছায় সুপ্তিযোগে রেতঃচ্যুতি হইলে, তাহাকে সুপ্তিস্খলন বা স্বপ্নদোষ বলে। হস্ত মৈথুন প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ। উহার দোষ যে কত, এবং উহার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বাল্যকালে বালকেরা সঙ্গদোষে পড়িয়া এই কদভ্যাসে রত হয়, এবং যাবজ্জীবন শরীরকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। এই বীভৎস কদাচার সম্বন্ধে আর অধিক লেখনী চালনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; সংক্ষেপে যাহা কথিত হইল। তাহাতেই পাঠকগণ ইহার মারাত্মকত্ব প্রণিধান করিয়া সাবধান হইবেন।

এইবার সুপ্তিস্খলন বিষয়ে শাস্ত্রে কি প্রকার ব্যবস্থা আছে, উহাই উল্লিখিত হইতেছে।

মনু সংহিতায় লিখিত আছে :—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রহ্মচারীদিগের যদি সুপ্ত অবস্থায় রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে, স্নানান্তর 'পুনর্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ম্' অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনর্ব্বার আমাকে প্রাপ্ত হউক; এই মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

মুসলমানদিগের মধ্যে নিয়ম আছে, সুপ্তিস্খলন হইলে, তখনই (রাত্রিতেই) স্নান করিয়া যথাসাধ্য খোদাতালার নাম আওড়াইবে। পূর্ব্বে যাহা ব্যক্ত হইল, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে,

রেতঃ সংরক্ষণ ব্যাপারে মনুষ্যকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। তাহাতে বিশেষ ফল পাইবেন।

পাঠক, দেখুন, পরমায়ুর ক্ষতি বা বৃদ্ধি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, সেই গুলিই শরীর রক্ষার উপায়। এই নিয়মগুলি অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে। অন্যথা করিলে চলিবে না। যদ্যপি না মানেন, তাহা হইলে আপনাকে অকালে কালকবলে কবলিত হইতে হইবে। তাহাতে আর সংশয় থাকিবে না।

(ক্রমশঃ)

পিঁপুল।

পিপ্পলী, পিঁপুল, হিং পীপর্।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

পিপ্পলী চারি প্রকার, পিপ্পলী (পিঁপুল), গজ পিঁপুল, সিংহলী ও বন পিঁপুল। পল্লীগ্রামে বনপিঁপুল প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, উহার মূল ঔষধার্থ কাথে ব্যবহৃত হয়। মূলের গুণ বিরেচক।

যে পিঁপুল বেনের দোকানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই সর্ব্বদা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাসে পিঁপুল। গব্য ঘৃতে পিঁপুল ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ সেবন করিলে কাসের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। পিঁপুল চূর্ণ; সৈন্ধব লবণ ও কিঞ্চিৎ মিশ্রীর গুঁড়া একত্র মধুর সহিত অবলেহ করিলে কাসের উপশম হয়।

জ্বরে পিঁপুল। পিঁপুল জরঘ্ন; জ্বর রোগে পিঁপুল চূর্ণ সহপানে ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বরের লাঘব হইয়া থাকে। বালকের সর্দ্দিকাসি হইলে গব্য ঘৃতের সহিত একটী পিঁপুল জ্বাল দিবে, ঐ ঘৃত পানে সর্দ্দিকাসির উপকার দর্শে। বালকের উদরাময় রোগে ছাগ দুগ্ধের সহিত একটী পিঁপুল ও ২।৩টী মুথা একত্রে জ্বাল দিয়া ঐ দুগ্ধ সেবন করাইবে।

প্রবাহিকারোগে পিঁপুল। পিঁপুল চূর্ণ ঘোলের সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগের উপশম হয়।

ইক্ষুগুড়ের সহিত পিঁপুল চূর্ণ সেবন করিলে কাস, অজীর্ণ, শ্বাস, হৃদরোগ, কামলা, অজীর্ণ, অরোচক, পাণ্ডু ও পুরাতন জ্বর বিনষ্ট হয়। পিঁপুল চূর্ণ ৵৹ আনা, ইক্ষু গুড় চারি আনা।

প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধনার্থ পিঁপুল। গোলমরিচ এক আনা, পিঁপুল এক আনা, গব্য দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিলে স্তন্য দুগ্ধ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী প্লীহাজ্বর নাশক, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে "পিপ্পলী বর্দ্ধমান" ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা

আছে তাহা প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকারী।

রক্তপিত্তে পিপ্পলী। বাসক পাতার রসের সহিত পিপুল চূর্ণ ৪ রতি ও কয়েক ফোঁটা মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয়।

শোথে পিপ্পলী। সর্ব্বাঙ্গ বা একাঙ্গগত শোথ রোগে গব্য দুগ্ধের সহিত পিপ্পলী সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিবে।

অম্লপিত্তে পিপুল। প্রত্যহ মধুসহ পিপুল চূর্ণ দুইআনা সেবনই করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল মূল। পিপুল মূল ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

পিপুল পত্রের রস বোলতা ও বিছা দংশিত স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণার উপশম হয়। পরিণাম শূলে পিপুল—

পিপুলের কাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে পরিণাম শূল নিবৃত্ত হয়। ঐ ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ পান করিবে।

পিপ্পলী অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক বাত শ্লেষ্মা জ্বর নাশক।

ক্ষিপ্ত কুক্কুর দংশনের ঔষধ।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

১। কাল ধুতুরার পাতার রস (অভাবে সাদা অথবা কনক ধুতুরার পাতার রস) ১ তোলা, গব্য ঘৃত ।০ চারি আনা, কাশির চিনি ।০ চারি আনা, দধি ২ দুইতোলা একত্রে মিশাইয়া বৈকালে রোগীকে পান করাইতে হইবে। প্রাতঃকালে ভাত পাক করিয়া তাহাতে জল মিশাইয়া রাখিবে এবং ঐ জল দেওয়া ভাত যে পরিমাণে খাইতে পারে তাহাতে দধি মিশাইয়া সন্ধ্যার সময় খাইবে, কিন্তু লবণ মিশাইবে না। রাত্রে যে ঘরে রোগী শয়ন করিবে সেই ঘরে লোক থাকার প্রয়োজন ও নেশায় রোগী যেন ঘরের বাহির হইয়া যায় এবং কোন উপদ্রব না করে, সাবধানে থাকিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার ভয়ের কারণ নাই। তৎপর দিন রোগীকে স্নান করাইয়া দধি-ভাত খাইতে দিবে। বৈকালে খাওয়ার সম্বন্ধে কোন প্রকার নিয়মের আবশ্যক নাই। জলাতঙ্ক উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলেও এই ঔষধ তৎক্ষণাৎ খাওয়াইলে রোগী বাঁচিয়া যাইবে এবং দংশনের পর এই ঔষধ ব্যবহারে জলাতঙ্ক হইবে না। ঔষধ একবার খাইবার নিয়ম, কিন্তু ঔষধ খাইয়া বমন হইলে উহা দ্বিতীয়বার সেবন করাইতে হইবে। কুকুর কিম্বা শৃগাল দংশনের ৫।৭ দিন পরে এই ঔষধ ব্যবহার্য্য।

২। যে কোন ধুতুরার রস ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, খাঁটি কাঁচা দুগ্ধ ২ তোলা, খাঁটি গব্য ঘৃত ২ তোলা মোট ৮ তোলা।

একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। এই ঔষধ প্রাতে খালি পেটে সেবন করিতে হয়। সেবনে রোগীর মত্ততা জন্মে এবং তজ্জন্য সে পাগলের ন্যায় ব্যবহার করে। নিদ্রার পর রোগীর মত্ততা বিদূরিত হয়। ঔষধ সেবনের পর রোগীর অল্প মত্ততা হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া দুগ্ধের ঘোল ও ঘোল দিয়া ভাত খাওয়াইবে। রাত্রিতে রোগীকে ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, দুধ সকলই খাইতে দিবে। কেবল মত্ততা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে না। ধুতুরার পাতাগুলি ব্যবহারের পূর্ব্বে ধুইয়া শুষ্ক কাপড় দিয়া মুছিয়া লইবে এবং রস ছাঁকিয়া লইবে। ফল কথা ঔষধ সেবনের পর খুব মত্ততা জন্মিলেই বিষ নষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। প্রথম দিন ঔষধ সেবনের পর মত্ততা কম হইলে কয়েক দিন পর আর একবার ঔষধ সেবন করাইবে।

৩। শ্বেত আকন্দ পাতার রস ১ ঝিনুক, কাঁচা খাটি দুগ্ধ ৵০ পোয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইতে হইবে। বিষ থাকিলে বমি হইবে না। যে কয়দিন বমি না হয়, সে কয় দিন প্রাতঃকালে ১ বার করিয়া খাইবে, বমি হইলে বুঝিতে হইবে বিষ নাই, সুতরাং তখন ঔষধ সেবন অনাবশ্যক। এই স্থলে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে শয্যা হইতে উঠিয়া জল স্পর্শ না করিয়া উপরি উক্ত গাছের পাতা সংগ্রহ করিতে হইবে, রোগীও সেবনের পূর্ব্বে জল স্পর্শ করিবে না। উপরি উক্ত ১।২।৩ নং ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ইহা ফলপ্রদ।

৪। ধুতুরার মূল ।০ চারি আনা, আকোড় গাছের মূল ।০ আট আনা বা বাঁশের মূল ॥০ আট আনা দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রাতে খালি পেটে খাইলে কুকুর বিষ নষ্ট হয়।

৫। কুকুর কামড়াইবা মাত্র ধুতুরার শিকড় ।০ চারি আনা ২॥টা গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইবে।

৬। ধুতুরার মূল ২ রতি, সাদা পুনর্ণবার মূল ।০ চারি আনা বাটিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হয়। প্রাতঃকালে খালি পেটে খাইবে।

৭। আপাং গাছের মূলসহ অগ্রভাগ ৸০ বার আনা ওজনে লইয়া চিনিসহ বাটিয়া বড়ি করিবে ঐ বড়ি প্রাতঃকালে জল সহ সেবন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

৮। কুন্দুরকি (কুঁদুরি) লতার মূল ২ তোলা বাটিয়া আদার রসের সহিত ভক্ষণে কুকুর দংশন জনিত উন্মাদ আরোগ্য হয়।

৯। কুচলে ॥০ আট আনা, ময়ূরপুচ্ছ ।০ চারি আনা ও তামা বা পিত্তলের গায়ের যে সবুজ ময়লা জন্মে তাহা ৵০ দুই আনা একত্রে ঘুঁটের আগুনে পুটপাকে পোড়াইবে। পরে শীতল হইলে ঐ চূর্ণ ৬ ছয় রতি ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

১০। মৌরী—মধুর সহিত বাটিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনজনিত ঘায়ের উপকার হয়।

১১। কুকুর, বিড়াল, শিয়ালাদির দংশনে ঘা হইলে "কালীঝাঁপের" পাতা বেটে দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে ঘা আরোগ্য হয়।

১২। আকন্দ আটা, সরিষার তৈল, ইক্ষু গুড় সমভাবে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে ঘা শুকাইয়া যায়।

পথ্য। শুদ্ধ গব্য ঘৃত বা অল্প পরিমাণ অন্নের সহিত বেশী পরিমাণ গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হয়।

উপরি উক্ত ঔষধগুলির মাত্রা যুবক এবং বৃদ্ধদিগের জন্ম।০ অল্প বয়স্ক বালকদিগের জন্য অর্দ্ধ কিম্বা সিকি মাত্রা ঔষধ গ্রহণ করিবে।—হিতবাদী।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা

আয়ুর্ব্বেদ-মেডিকেল কলেজ।

১৭।১৯ শ্যামবাজার ব্রিজরোড, কলিকাতা।

আবেদন।

সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রীসাধন করে গত সাত বৎসর হইতে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন। এক সময়ে শারীর ও শল্য বিদ্যা (এনাটমী ও সার্জ্জারি) এই দেশে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এখন সে গৌরব নষ্টপ্রায়। এই বিলুপ্ত বিদ্যার অনুশীলন ও পুনরুদ্ধার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য; কিন্তু তাই বলিয়া প্রতীচ্যের শিক্ষা দীক্ষা আমরা উপেক্ষা করি নাই। আয়ুর্ব্বেদকে বিশেষভাবে পুষ্ট ও উজ্জ্বল করিবার সংকল্পে প্রতীচ্যের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট শিক্ষা—তাহাও সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। ভগবানের অপার করুণাবলে আমাদের সে উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধও হইয়াছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—এই উভয় শিক্ষার মিলন-মন্দির। গত তিন বৎসর যাবৎ বহুসংখ্যক ছাত্র আমাদের এই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহারা অস্ত্র-চিকিৎসার ক্ষেত্রে হটিয়া গিয়া ডাক্তারের হাতে রোগীকে সমর্পণ করেন না, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি আমাদের জাতীয় গৌরবের বিষয় হইয়াছে।

আমাদের এই অনুষ্ঠান ইহার মধ্যেই সফলতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহা সাধারণের অনুকূল দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়ে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকা দান করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া এই মহানগরীর উপকণ্ঠে শ্যামবাজারের বিস্তৃত পার্কের সম্মুখে এই বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে এক বিঘা এগার কাঠা জমি দান করিয়াছেন। মার্টিন কোম্পানি এই গৃহ-নির্ম্মাণের ব্যয় হিসাবে প্রায় তিন লক্ষ টাকার এষ্টিমেট দিয়াছেন, ইহা ছাড়া বিদ্যালয়ের সংশ্রবে একটি উপযুক্ত হাসপাতাল খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সর্ব্ব সাকুল্যে ব্যয় অনুমান ১০ লক্ষ টাকা। আমরা ইহার মধ্যেই ২ লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। যাহাতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উপাধি ও অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়, তজ্জন্য ও চেষ্টা চলিতেছে। মোট কথা বৃথা বাগাড়ম্বরে সময় ও উদাম নষ্ট না করিয়া এই বিদ্যা-বাটিকা ধীরে ধীরে শ্রীশালিনী হইয়া উঠিতেছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমরা কার্য্যক্ষেত্রে এতটা অগ্রসর হইয়া সাধারণের নিকট সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়াছি। আমরা অনেকটা সাহায্য পাইয়াছি, এখন সাধারণ আমাদের প্রয়োজনীয় আর আট লক্ষ টাকার ভার গ্রহণ করুন। রাজা মহারাজা ও দেশের অপরাপর বড় লোকের রাজপ্রাসাদের দ্বারে আমরা যেমন উপস্থিত হইতেছি, তেমনই সাধারণ গৃহস্থের কুটিরের পার্শ্বেও আমরা মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থনা করিতেছি। আমরা জানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু লইয়া সমুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ লইয়া বড় বোঝা হয়; ক্ষুদ্রের সমষ্টিতেই বৃহতের জন্ম। জাতীয় অনেক অর্থ নানা বৃথা কার্য্যে জলের মত ব্যয় হইয়া যাইতেছে। এই মহৎকার্য্যে—আয়ুর্ব্বেদের উদ্ধার কল্পে বঙ্গবাসী অগ্রদূত হইয়া ঋষিদের মহাবাক্য ঘোষণা করুন—ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অক্ষয় করুন।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকল্পে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি বটে, কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ইহা সাধারণের সম্পত্তি, সুতরাং ইহা আপনার নিজেরও সম্পত্তি। দেশের সকল বিষয়ের সংস্কারের সাড়া পড়িয়াছে, অধঃপতিত জাতির শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে তাহার জাতীয় চিকিৎসাকে সর্ব্বাগ্রে পুনরুদ্ধার করিবার আবশ্যক হইবে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা অগাধ সমুদ্র বিশেষ। এই মহা সমুদ্রে যে সকল কৌস্তভমণি লুক্কায়িত, তাহা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিলে বাঙ্গালী আবার যে স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জং তদৌষধং হিতম্।

যে দেশের প্রাণী তাহাদের রোগ নিবারণে সেই দেশজাত ঔষধই উপযোগী—ফলমূলাদি আর্য্য ঋষির ইহাই অমূল্য উপদেশ। আমরা এতদিন এ কথা বুঝি নাই বলিয়াই তো আমরা নানারূপ আধিব্যাধি প্রপীড়িত—নিত্য নূতন রোগাসুরগণকে বরণ করিয়া লইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য ও অল্পায়ু হইয়া

উঠিয়াছি। এখন এই জাতীয় জাগরণের দিনে আমরা যাহাতে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত কর্ম্মী হইতে পারি,—আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে জাতীয় চিকিৎসা বিদ্যায় কৃতবিদ্য করিয়া আসুন, তাহারই উপায় বিধানে—এই কলেজ ও হাঁসপাতালের গৃহ নির্ম্মাণে অগ্রসর হই।

এই জীবন বেদ—আয়ুর্ব্বেদকে রক্ষা করিতে পারিলে অক্ষয় শিব প্রতিষ্ঠার ফল হইবে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অজীর্ণ, যক্ষ্মা—এখনকার দিনে বাঙ্গালীর নিত্য সঙ্গী। সত্যের অপলাপ না করিলে এ কথা মুক্ত-কণ্ঠে বলিব—সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পুনঃ প্রচলিত হইলে এ রোগ কয়টি ব্যাপক-ভাবে তিষ্ঠিতে পারিবে না। কলেজ সংলগ্ন হাঁস্‌পাতালে মফঃস্বলবাসী দুরারোগ্য রোগী-মাত্রেই যাহাতে স্থান পাইয়া সুচিকিৎসিত হইতে পারেন তাঁহার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেশকে রক্ষা করিবার জন্য আসুন, আমরা এই মহদনুষ্ঠানে কায় মনপ্রাণ অর্পণ করি, যাহার যেমন শক্তি এই সৎকার্য্যে নিয়োগ করিয়া ধন্যমনা হইতে চেষ্টা করি। এক পয়সা হইতে এক লক্ষ টাকা সমান আদরে গৃহীত হইবে। আর বেশী কিছু বলিবার নাই। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি—সৎকার্য্যে বিঘ্ন অনেক; এই জন্য অতি সত্বর যাহাতে এই পরম কল্যাণকর কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয়, দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার জন্য ব্যবস্থা করুন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বোর্ড অব্ ট্রষ্টীর সভাপতি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কে, টি, সি, এস, আই এবং কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস ইহাও বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমরা অতি ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ দান—সকলই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

কবিরাজ—শ্রীযামিনীভূষণ রায়
কবিরত্ন, এম, এ, এম, বি।

বৈদ্য-চিকিৎসা।

চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইতে হইলে চিকিৎসক কাহাকে বলে—সেই কথাটি প্রত্যেক চিকিৎসকের মনে রাখা উচিত।

শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন—

চিকিৎসাং কুরুতে যস্তু স চিকিৎসক উচ্যতে।

অর্থাৎ যিনি চিকিৎসা করেন, তাঁহাকেই চিকিৎসক বলা যায়।

তা'র পরেই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

স চ যাদৃক্ সমীচীন স্তাদৃশোহপি
নিগদ্যতে ॥

সেইজন্য যেরূপ চিকিৎসক সমীচীন—অর্থাৎ প্রশস্ত—তাহা বলা যাইতেছে।

তত্ত্বাধিগত শাস্ত্রার্থো দৃষ্ট কর্ম্মা স্বয়ং
কৃতী

লঘু হস্তঃ শুচিঃ শূরঃ সদ্যোহপস্কর
ভেষজঃ।

প্রত্যুৎপন্নমতি ধীমান্ ব্যবসায়ী
প্রিয়ম্বদঃ।

সত্য ধর্ম্ম পরো যশ্চ বৈদ্য ঈদৃক্
প্রশস্যতে ॥

অর্থাৎ যিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল অধিগত অর্থাৎ আয়ত্ত করিয়াছেন,—দৃষ্টকর্ম্মা অর্থাৎ অন্যকৃত চিকিৎসা অনেক দেখিয়াছেন, স্বয়ং কৃতী অর্থাৎ নিজে চিকিৎসাকুশল হইয়াছেন, যিনি লঘু হস্ত, শুচি অর্থাৎ পবিত্রাচার সম্পন্ন, শূরঃ অর্থাৎ বলিষ্ঠ, যিনি নব প্রস্তুত ঔষধ সম্পন্ন, যিনি প্রত্যুৎপন্নমতি, যিনি ধীমান্, যিনি ব্যবসায়ী, যিনি প্রিয়ম্বদ এবং যিনি সত্য-পরায়ণ ও ধার্ম্মিক তিনিই চিকিৎসক পদ বাচ্য।

অতএব দেখা যাইতেছে—চিকিৎসক হইতে হইলে শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে চলিবে না, উপদেশ শুনিলে চলিবে না, চিকিৎসক হইবার জন্য কতকগুলি গুণ বিশিষ্ট হইলেও চলিবে না, সদ্যোহপস্কর ভেষজ" হওয়া চাই—ঔষধ প্রস্তুতে সক্ষম হওয়া চাই—ঔষধের দ্রব্য চেনা চাই—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মন্থন পূর্ব্বক সকল প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত হওয়া চাই—তবেই তিনি চিকিৎসক পদবাচ্য হইতে পারিবেন—নতুবা শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যিনি যত বড় অধ্যয়ন কুশল বলিয়া পরিগণিত হউন না কেন—যদি ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে অভিজ্ঞতা না থাকে তাহা হইলে প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া তিনি কখনই চিকিৎসক-সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিবেন না।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

যস্তু কেবল শাস্ত্রজ্ঞো ভেষজেষ্ব
বিচক্ষণঃ।

তং বৈদ্যং প্রাপ্য রোগীস্যাদ্
যথা নৌ নাবিকং বিনা ॥

অর্থাৎ যিনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে বিচক্ষণ নহেন, তিনি চিকিৎসা করিলে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকেন।

আবার শুধু ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানিলেও হইবে না—চিকিৎসা করিতে হইলে—চিকিৎসক হইতে হইলে—শাস্ত্র কুশলও হওয়া একান্ত আবশ্যক। শাস্ত্রকার এ সম্বন্ধে বলিয়া গিয়েছেন।

ভেষজং কেবলং কর্ত্তুং যো জানাতি ন
চাময়ম্।

বৈদ্য কর্ম্ম সচেদ্ কুর্য্যাদ বধম্ ইতি
রাজতঃ ॥

অর্থাৎ যিনি কেবল ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, কিন্তু শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই—তিনি যদি চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাণদণ্ডার্হ

অপরাধে অপরাধী হইবেন ;—ইহাই সেকালে রাজার আইন ছিল।

এখন দেশকাল রুচি অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে যে রাজকীয় আইন ও এখন প্রচলিত নাই সত্য এবং তাহারই ফলে ঔষধ প্রস্তুতে অভিজ্ঞ হইয়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখনকার দিনে সকল চিকিৎসক অবতীর্ণ হন না। হিন্দুর দেশে—হিন্দুর সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয়—আমাদের সনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির কারণ ইহাই। ইহারই জন্য বিলাস কামনা শূন্য টিকিধারী—ফোঁটা কাটা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সভ্যতায় পূর্ণমূর্ত্তি বিদেশীয় চিকিৎসকদিগের অনেকে পশ্চাতে আসন পাইয়া থাকেন। কি মান-সম্ভ্রম—কি অর্থ উপার্জ্জন—অনেক বিষয়েই যে এখন আমরা ডাক্তারদিগের সমকক্ষ হইতে সক্ষম হই না—ইহার কারণই আমরা যে ভাবে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষা করা উচিত—চিকিৎসার মত জীবন-মরণের দায়িত্ব পূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে যে সকল উপাদান ও উপকরণ সকল আয়ত্ত করিয়া এরূপ কঠিন ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত—শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রত্যেক অধ্যায়—প্রত্যেক ছত্র প্রত্যেক অক্ষরটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করিয়া, তাহার পর অভিজ্ঞ চিকিৎসার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে সম্পূর্ণ রূপে অভ্যস্ত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি না। হিন্দু রাজত্বের অবসানে—মুসলমান নরপতিদিগের প্রাদুর্ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতির সূত্রপাত এমনই করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল, সেই আরম্ভের পরিসমাপ্তিও সেই জন্য ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

যাক্—এসম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়, এখানে আর সে সকলের আলোচনার আবশ্যক নাই. কেবল এই কথাটা একান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন ক'রতে হইলে যেমন গ্রন্থ অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন, সেইরূপ ভেষজ কল্পনার শিক্ষাও একান্ত আবশ্যক। আমরা এইবার ভেষজ কল্পনার বিষয় কিছু আলোচনা করিব

ভেষজ লক্ষণে শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন,—

বৈদ্যো ব্যাধিং হরেদ যেন তদ্রবং প্রোক্ত মৌষধম্।

অর্থাৎ চিকিৎসক যে দ্রব্য দ্বারা ব্যাধি হরণ করেন, তাহার নাম ঔষধ।

তত্র, যাদৃশমবশ্যং স্যাদ্রোগঘ্নং তাদৃশং ব্রুবে।

তাহার মধ্যে যে সকল ঔষধ প্রশস্ত ও রোগঘ্ন অর্থাৎ রোগ নিবারণে সমর্থ সেই সকল বলা যাইতেছে।

প্রশস্ত দেশ সঞ্জাতং প্রশস্তেহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং বহুগুণং গন্ধবর্ণ রসান্বিতম্॥
দোষঘ্ন গ্লানিকরমধিকং ন বিকারি যৎ।
সমীক্ষ্যকালে দত্তঞ্চ ভেষজং স্যাদ গুণাবহম্॥

অর্থাৎ প্রশস্ত স্থানে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্পমাত্র অর্থাৎ অল্প পরিমিত, বহু গুণ বিশিষ্ট, উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রস যুক্ত, দোষঘ্ন, যাহা গ্লানিকর বা অধিক বিকৃতিজনক নহে এবং যাহা উপযুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ঔষধই বিশেষ ফলোপদায়ক হয়।

যে ঔষধ নিজের জানা নাই, সে ঔষধ কখনও ব্যবহার করিতে নাই, শাস্ত্রকার সে সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

যথা বিষং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধম বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম মৃতং যথা॥

অর্থাৎ যেরূপ বিষ, যেরূপ শস্ত্র, যেরূপ অগ্নি, যেরূপ অশনি—অজ্ঞাত ঔষধ সেইরূপ অনিষ্টকর এবং বিজ্ঞাত ঔষধ অমৃত সদৃশ।

যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ।
ভেষজং বাপি দুর্য্যুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিষম্॥

যথাবিহিত যোগের দ্বারা তীক্ষ্ণ বিষও উৎকৃষ্ট ঔষধ হয় এবং দুর্য্যুক্ত ঔষধও তীক্ষ্ণ; বিষ সদৃশ হইয়া থাকে।

এই জন্যই শাস্ত্রকার মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন চিকিৎসক পদবাচ্য দিগের নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণ করিতে একেবারে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন,

বরং দস্যো বরং ব্যালে বরং ঘোরে-
বিভীষণে।
সাগরে জীবনোৎসর্গঃ সুঘোরে বাপি
ধন্বনি॥
নাধীত শাস্ত্রেনাভ্যস্ত কর্ম্মণ্যখিল বৈরিণি।
ন কার্য্যং দুর্ম্মতৌ পাপে ভিষজ্যাত্ম
সমর্পণম্॥

বরং দস্যুর হস্তে, বরং হিংস্র জন্তুতে, বরং সর্পের মুখে; বরং নক্রাদি জলচর জন্তু সমাকুল ভীষণ সমুদ্রে অথবা ঘোরতর মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করাও কর্ত্তব্য, তথাপি অনধীত শাস্ত্র, অনভ্যস্ত কর্ম্মা, সর্ব্বজন বৈরী, দুর্ম্মতি ও পাপাত্মা চিকিৎসকের হস্তে আত্ম সমর্পণ করা কোনক্রমে বিহিত নহে।

পাচন চিকিৎসাও ভেষজ কল্পনার অন্তর্গত। পাচন চিকিৎসা চরকের চিকিৎসা। ইহা যেমন অল্পব্যয়সাপেক্ষ্য তেমনি সদ্য বিশেষ কার্য্যকরী। ভেষজ কল্পনা বলিলে অনন্ত আয়ুর্ব্বেদ জলধির তাবৎ ঔষধের কথাই বুঝায়, তাহাতে পাচনও বুঝায়, বটিকাও বুঝায়, চূর্ণও বুঝায়, অবলেহ ও বুঝায়, আসব ও বুঝায়, অরিষ্ট ও বুঝায়, প্রাশ ও বুঝায়, মোদকও বুঝায়, তৈলও বুঝায়, ঘৃত ও বুঝায়, কিন্তু পাচনের কথা বলিলে সেই ভেষজ সমষ্টির একটা অঙ্গের কথা বুঝায়। কিন্তু সেই ভেষজ সমষ্টির সকল অঙ্গগুলির মধ্যে পাচনের ব্যবহারে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, সেইরূপ ফল অনেক ক্ষেত্রে অনেক ঔষধেও হয় না। মুষ্টিযোগ ও টোটকা পাচনেরই অন্তর্গত। আমাদের ভারতবর্ষ স্বর্ণপ্রসবিনী আখ্যা সমন্বিতা হইলেও ভারত মাতার সন্তান সমষ্টির অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং দরিদ্রের রোগ নিবারণে ব্যয়ের লক্ষ্যও অল্প থাকা কর্ত্তব্য। একেতো পাচন-মুষ্টিযোগ ও টোটকার মত সদ্যফলপ্রদ ঔষধ আর, নাই তার উপর সেই সদ্যফলপ্রদ পাচন মুষ্টিযোগের ব্যয়ের পরিমাণ অতি সামান্য,—এমন কি অনেক সময় একটি পয়সা মাত্রও ব্যয় না করিয়া প্রত্যেক পল্লীবাসী গৃহস্থ পল্লী রত্ন প্রসূপ্রান্তর সকল হইতে সেই সকল পাচনের দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া অতি দুরারোগ্য ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। এক সময়ে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশের অবস্থা ইহাই ছিল। আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ বিকাশের যুগে দেশের এমন একটা অবস্থা

আসিয়াছিল যে, এখনকার শিশুদিগের প্লীহা যকৃতের বিবৃদ্ধিজন্য বড় বড় চিকিৎসক ডাকিবার প্রয়োজন হইত না, ষোল টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার মিকশ্চার ও তিনবার লোসন প্রয়োগের ব্যবহারও প্রয়োজন হইত না।

কালমেঘের রস, আলুইয়ের বটে—এইরূপ যা হয় একটা কিছু সেবন করানর ব্যবস্থা তখনকার স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত অবগত থাকিতেন। প্লীহায় চোনা খাওয়ান চোনার সেঁক দেওয়া—এসকল যে ব্যবস্থা ছিল—এখনকার বড় বড় ঔষধ তাহার কাছে হারি মানিয়া থাকে।

ফল কথা—সমস্ত ঔষধের মধ্যে পাচন মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ যেরূপ ফলপ্রদ অন্য কোন ঔষধই সেরূপ ফলদায়ক নহে।

সর্ব্বৌষধেষু পাচন মৃষিভিঃ শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।
যতো ব্যাধি প্রপীড়িতং স্বস্থং করোতি সত্বরম্॥

অর্থাৎ সকল প্রকার ঔষধের মধ্যে ঋষিগণ পাচনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ ব্যাধি প্রপীড়িতগণ পাচন সেবন করিলে যেমন সত্বর স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য ঔষধে তত শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই জন্যই পাচনের ব্যবহার জানা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এই পাচন চিকিৎসা অধুনা দেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইতেছে।

অস্ত্র চিকিৎসান্নোতি।

(ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার)

দেশের সম্রাট প্রণোদিত চিকিৎসা প্রণালী বলিয়া দেশীয় জন সাধারণ প্রগাঢ় রাজ ভক্তি প্রভাবে অবিচার্য্য ভাবে এক বাক্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। সে চিকিৎসার কুফল সহস্র বার উপভোগ করিলেও কেহই যে কোন রোগ হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে সাগ্রহে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে ইহার উপর আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ, তাহারও অনেক সন্ধান পাওয়া যায়; তথাপি তাঁহারা এলোপ্যাথিরই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকেন এবং রোগ হইলেই নিজের ইচ্ছায় বা আত্মীয় স্বজনগণের উত্তেজনায় সর্ব্ব প্রথমে এলোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতেও বাধ্য হন, এসব কথা সর্ব্বজন বিদিত। এটা যে কি মোহ তাহা বুঝিতে পারি না।

এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তি চিকিৎসা সেই প্রণালীতে করাইয়া বিফল মনোরথ হইলে পর আয়ুর্ব্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিক উভয়ের যে কোন একটি চিকিৎসার আশ্রয় লইয়া তবে রোগ মুক্ত হইয়া থাকেন। এই তো অবস্থা, কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ে সকলেই এলোপ্যাথির জয় ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গুণ কর্ম্মাদির আধিক্য দ্বারাই সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়। অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়টীর কি কি গুণ কর্ম্মের লক্ষণ দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা যাইবে? রোগ শব্দে

দুঃখজনক কারণকে বুঝায়। দুঃখ জনকত্বং ব্যাধিত্বং সুতরাং আরোগ্য শব্দে তদ্বিপরীত অর্থাৎ সুখ বুঝাইবে। তাহা হইলেই যে চিকিৎসায় রোগ সকল রোগীর সর্ব্ববিষয়ক সুখকর ভাবে (যাপ্য না হইয়া) প্রকৃত আরোগ্য সাধিত হয় তাহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে হইবে। কথাটা ভাল করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, সুখ সেব্য সুমিষ্ট ঔষধ দ্বারা অতীব সংক্ষিপ্ত ভাবে বিনা আড়ম্বড়ে ঠিক যেন মন্ত্রশক্তির ন্যায় দ্রুত গতিতে স্থায়ী আরোগ্যকারী চিকিৎসা-প্রণালী সেই চিকিৎসাকেই শ্রেষ্ঠতম আসন প্রদান করা উচিত।

অস্ত্র চিকিৎসা ব্যাপারটীর বিশদ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, "অস্ত্র করাই একান্ত প্রয়োজন"—এই কথাটী শ্রবণ মাত্রেই রোগীর আত্মা উড়িয়া যায়। তারপর সেই বিষম ক্রিয়ার সময় নিরূপিত হইলে সেই অস্ত্রধারী প্রভু কখন যে তাঁহার ঘাতন যন্ত্র হস্তে লইয়া ভীষণ মূর্ত্তিতে সমাগত হইবেন, কখন বা আমাকে সেই প্রাণান্তকর অস্ত্র যাতনা সহ্য করিতে বাধ্য করিবেন এইরূপ নানা বিভীষিকায় রোগীর মন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অনন্তর যেই অস্ত্রধারী মহাপুরুষ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন—এই সংবাদ রোগীর কর্ণগোচর হইবামাত্র হৃৎকম্পের সূচনা হইতে লাগিল। এ অবস্থায় কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। অস্ত্রের আনুষ্ঠানিক ব্যাপার সম্পন্ন হইলে তদ্দর্শনে রোগীর পঞ্চাত্মা যে বিশুষ্ক হইয়া উঠে—পাত্রের রক্ত পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়—মুখের বিশুষ্কতাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তৎপর অস্ত্রধারীর গৃহ প্রবেশ এবং রোগীকে ধর পাকর করিয়া অস্ত্র ক্রিয়ার স্থানে আনয়ন করা হয়, তখনকার অন্তর্যাতনা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। অনন্তর যখন সেই বীর পুরুষ অস্ত্র ধারণ করিয়া সমীপবর্ত্তী হন তখন রোগীর আত্মার সন্ধানই নাই। পরিশেষে যখন ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন দাঁত মুখ সিটকাইয়া তীব্র চিৎকার ও উচ্চক্রন্দন সহ ত্রাহি মধুসূদন রব আরম্ভ হয়। তাই কি অব্যাহতি আছে? তৎপর আবার ড্রেসিং ক্রিয়া! এই ভীষণ ক্রিয়া ক্ষত আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সমানভাবে দুইবেলা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে" গোছের ব্যাপার সহ্য করিয়া দিন কাটাইতে হইবে। তা' ছাড়া বাহ্য প্রযুক্ত ঔষধের অসহ্য যন্ত্রণা তো আছেই। রোগীকে এতাদৃশ দুঃসহ কষ্ট প্রদানই কি চিকিৎসার সুসঙ্গত ও সমীচীন উপায়? ইহা ভিন্ন কি আর কোন সুখকর উপায়ই জগতে নাই? এই ত গেল অস্ত্র ক্রিয়া ব্যাপার। তারপর অস্ত্র ক্রিয়াতেও চিকিৎসা সমাধা হইবে না। ক্ষত চিকিৎসা করিয়া প্রকৃত নিরাময় সাধন করা চাই। কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক প্রণালীর ভেষজ চিকিৎসা (*medical Treatment*) যে কতদূর আরোগ্যকর তাহার আভাসতো পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি সেই ঔষধ প্রকৃত নিরাময়কারী না হয় তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসা স্থলেই বা তদ্বিপরীত কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে?

অধিকাংশ ক্ষত চিকিৎসার পরিণামে উহা সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য না হইয়া যাপ্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু কোন স্থানের ক্ষত এলোপ্যাথিক ঔষধে শুষ্ক হইলে সে স্থানের অল্প অল্প বেদনা এবং স্ফীতি বহুদিন স্থায়ী হওয়া প্রায় স্বাভাবিক।

ফল কথা যে চিকিৎসার আদ্যন্ত দুঃখজনক অশান্তিকর এবং অনেক সময় জীবননাশক সে চিকিৎসা কখনই সুখজনক নহে।

যে দেশে কবিরাজী ও হোমিওপথিকই দুইটী বিজ্ঞানযুক্ত চিকিৎসা বর্ত্তমান, আমি ডাক্তার হইয়াও বলিতেছি, আমাদের দেশবাসীর সেই দুইটি চিকিৎসারই শরণ গ্রহণ আমাদের পক্ষে একান্তই মঙ্গলজনক। দেশীয় কবিরাজদিগের গাছ গাছড়া দ্বারা আসুরী অস্ত্র চিকিৎসার কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পরিদর্শন। সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত আয়ুর্ব্বেদ কমিটি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটির অন্যতম সদস্য মেজর গেল সাহেব ঐ দিন সকলের সহিত আসিতে না পারায়—তিনি তাহার পর আর একদিন একাকী আসিয়াছিলেন। কমিটির সকল সদস্যই এই বিদ্যালয় ও হাসপাতালের সমস্ত তথ্য অবগত হইয়া প্রীতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের আশা আছে, এই কমিটি হইতে এই বিদ্যালয় মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হইবে।

বৈদ্য বান্ধব সমিতি। গত ২৬শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলুটোলার সেন মহাশয়দিগের ভবনে এই সমিতির অষ্টম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মহাসমারোহে হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম-এ. এল, এম, এস মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভায় কয়েকজন বক্তাও বক্তৃতা করিয়া সকলকে পুলকিত করিয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির সংক্রামক রোগ পণ প্রথা নিবারণের জন্য কিন্তু সেদিন কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই—বৈদ্য বান্ধব সমিতি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হউন—ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

মধ্য ভারতে আয়ুর্ব্বেদ। মধ্য ভারত না সি, পি, গবর্ণমেণ্ট এক সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে, ২ জন গ্রাজুয়েট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হইলে প্রত্যেককে মাসিক একশত টাকা করিয়া দুই বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রদান করিবেন। অতি সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসায় শিক্ষিত তিনজন কবিরাজ ও তাঁহারা এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ঐ চিকিৎসক তিনজন সেণ্ট্রাল প্রভিন্সের তিনটি স্থানের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভার প্রাপ্ত চিকিৎসক হইবেন। মধ্যভারতের দৃষ্টান্ত সকল প্রদেশের কর্তৃপক্ষগণেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

অবকাশ। অতিরিক্ত গরম পড়ার জন্য এবার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ একটু আগেই প্রদান করা হইল। ২৫শে চৈত্র হইতে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এই উপলক্ষে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। এবার এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার দিন স্থির হইয়াছে আগামী ৫ই আষাঢ়।

কলিকাতার স্বাস্থ্য। কলিকাতার স্বাস্থ্য মোটের উপর এ সময় ভালই দেখা যাইতেছে কিন্তু বড়বাজার অঞ্চলে প্লেগের আক্রমণ দেখা দিয়াছে। হাম বসন্তও সর্ব্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কলিকাতা শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত
ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭ম বর্ষ | বৈশাখ ১৩৩০ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

চরক ও সুশ্রুত।

(কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত এইচ, এম্, বি)

—:•:—

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে সকল প্রকার চিকিৎসার মূল, ইহা বড় বড় সাহেব ডাক্তারেরাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সে কথা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন নাই। সত্য ও ত্রেতার সন্ধিক্ষণে প্রাণী সকল যখন রোগ পীড়িত হইতে লাগিল, মহর্ষি ভরদ্বাজ সেই সময় অমরনাথ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসিলেন। ত্রিকালদর্শী অন্যান্য ঋষিগণও, প্রকৃতিপুঞ্জের দীর্ঘায়ু কামনায় ভরদ্বাজের নিকট হইতে উহার শিক্ষা আয়ত্ত করিলেন। "চরক সংহিতা" এই সময় রচিত হইয়াছিল। এজন্য "চরক"—ঋষিযুগের আয়ুর্ব্বেদের আদি গ্রন্থ। আরবীয়েরা এই চরকের অনুবাদ করিয়া নামকরণ করিয়াছিলেন—সরক।"

সুশ্রুত সংহিতা চরকের অনেক পরে বিরচিত। মহর্ষি ভরদ্বাজ যেমন ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ধন্বন্তরিরও সেইরূপ উপদেষ্টা বা গুরু—দেবরাজ ইন্দ্র। ধন্বন্তরিই এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেবগণের জরাব্যাধি ও মৃত্যু নিবারণ করিয়াছিলেন এবং শল্য তন্ত্রাদি অষ্টাঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়া মানব রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র সুশ্রুত এবং অন্যান্য আর্য্যঋষি এই বিদ্যা দিবোদাস বা ধন্বন্তরির নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহর্ষি সুশ্রুত প্রণীত "সুশ্রুত সংহিতা" তন্মধ্যে অন্যতম। বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক দিগের শল্যবিদ্যা শিক্ষা করিবার ইহাই প্রধান গ্রন্থ। এই মহাগ্রন্থও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অধুনা শল্যবিদ্যার চরমোন্নতি সাধন করিয়া অগ্রণী ব্যক্তিবৃন্দকে

চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে—তাহার মূল ভিত্তি হইল এই সুশ্রুতসংহিতা। কিঞ্চিদধিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মহাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

চরক ও সুশ্রুত—দুইখানি মহাগ্রন্থই আয়ুর্ব্বেদ জলধির অত্যুজ্জল রত্ন। যিনি এই দুই খানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনি কখনই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। অধুনা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ঐ দুইখানি মহাগ্রন্থের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া চিকিৎসা করা দেশ হইতে একরূপ লোক পাইয়াছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল—যেদিন এই দুইখানি মহাগ্রন্থের অমৃতাস্বাদ পাইবার জন্য সমগ্র বিশ্ব উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আরব দেশের অধিবাসী বৃন্দ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

চরক ও সুশ্রুত উভয় সংহিতা পাঠেই অবগত হওয়া যায়,—শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার পরস্পর সংযোগকে আয়ু বলে। এই আয়ুর হিতাহিত, ব্যাধির নিদান ও প্রশমনের উপায় যে শাস্ত্রে বর্ণিত, তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুর হিতাহিত—কথাটির বিশ্লেষণ করিবার জন্য চরক এবং সুশ্রুত উভয় সংহিতাকারকেই আগম, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমানের বহুল প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। উভয় সংহিতাকার স্ব স্ব সংহিতায় পুরুষ কি,—ব্যাধি কি,—স্থাবর কি,—জঙ্গম কি,—আগ্নেয় পদার্থ, সৌম্য পদার্থ, ঔষধি বিবরণ, ব্যাধি সঙ্ক্ষয়াদির হেতু অনেক কথারই বিশদভাবে মীমাংসা করিয়া দিয়া তাহার পর চিকিৎসার সূত্রের প্রাঞ্জল ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এক কথায় চরক ও সুশ্রুত কেবল চিকিৎসার গ্রন্থ নহে, বিশ্ববাসীর সার্ব্বজনীন শিক্ষা এই দুই খানি মহাগ্রন্থে নিহিত। আমাদের মনে হয়, কাহারও চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্য না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদের অত্যুজ্জল রত্ন এই দুইখানি মহা গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়িয়া রাখিলে, তাঁহাকে আর সংসার ধর্ম্ম পরিচালনায় কোনোরূপ কষ্ট পাইতে হয় না।

বায়ু, পিত্ত ও কফ আয়ুর্ব্বেদের মূলভিত্তি। দেহোৎপত্তির কারণও এই তিনটি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"বাত পিত্ত শ্লেষ্মাণি এব দেহ সম্ভব হেতবঃ। তৈরেবাব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধ সন্নিবিষ্টৈঃশরীরমিদং ধার্য্যতেহগারমিব স্থূণাভিস্তি সৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এবচ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবস্তদেভিরেব শোণিত চতুর্থৈঃ সম্ভব স্থিতি প্রলয়েষপ্য বিরহিতং শরীরং ভবতি। ভবতি চাত্র। নর্ত্তে দেহঃকফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ। শোণিতা দপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে। সুশ্রুত সূত্র স্থান একবিংশতিতমোহধ্যায়।

অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি দেহোৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে। অব্যাপন্ন(অবিকৃত) বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনটি দেহের অধঃ মধ্য ও উর্দ্ধদেশে অবস্থিত হইয়া তিনটি স্থূণ অর্থাৎ স্তম্ভ দ্বারা সংস্থিত গৃহের ন্যায় শরীরকে ধারণ করিয়া রাখে। এই নিমিত্ত কেহ কেহ এই দেহকে ত্রিস্থূণ আগার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বায়ু, পিত্ত কফ ব্যাপন্ন অর্থাৎ বিকৃত হইলে দেহ প্রলয়ের অর্থাৎ বিনাশের হেতু হইয়া থাকে। পরন্ত

এই দোষত্রয় অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ এবং শোণিত এই চারিটি পদার্থ উৎপত্তি, স্থিতি প্রলয়কালেও অবিরহিত ভাবে দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে জানিবে। সুতরাং বাত, পিত্ত, কফ ও রক্ত—এই দ্রব্য চতুষ্টয় ব্যতীত কিছুতেই শরীর রক্ষিত হইতে পারেনা বলিয়া উহারা নিয়ত এই দেহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কিরূপে শরীরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিয়াছেন,—

"বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা।
ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা তথা॥"

অর্থাৎ যেমন চন্দ্র স্বীয় শীত কিরণ অর্থাৎ শীতলতা প্রদান করিয়াও সূর্য্য আপনার উষ্ণরশ্মি দ্বারা চন্দ্রের শীতলতা আকর্ষণ (গ্রহণ) পূর্ব্বক উষ্ণতা প্রদান করিয়া এবং বায়ু ঐ উভয়ের সঞ্চালন দ্বারা জগতকে ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ কফ— শৈত্য দ্বারা শরীরকে আর্দ্র করে ও পিত্ত— উষ্ণতা দ্বারা শুষ্ক করে এবং বায়ু স্বীয় গতি প্রবাহ দ্বারা উক্ত শীতোষ্ণাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক দেহকে রক্ষা করিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মূল সূত্র এই বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রত্যেকটি আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। বায়ুর শ্রেণী বিভাগে ইহাদিগের নামকরণ হইয়াছে প্রাণ, অপান সমান, উদান ও ব্যান। পিত্তের নাম করণে উহাদিগের সংজ্ঞা হইয়াছে পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক এবং কফের সংজ্ঞা নির্ণয়ে উহাদিগকে বলা হইয়াছে ক্লেদক, অবলম্বক, বোধক, তর্পক ও শ্লেষক। বায়ুর এক কথায় পরিচয় উহা গমনাদি শারীর চেষ্টা সমূহের প্রবর্ত্তক। শরীরের উচ্চাবচ স্থান সমূহের নিয়ন্তা, মনের প্রণেতা, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের উদ্যোগকারক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অভিবাহক, সর্ব্ব শরীরস্থ ধাতু দিগের বাহক, শরীরের সন্ধান কারক, বাক্যের প্রবর্ত্তক, কর্ণের শব্দ বোধ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্পর্শবোধের মূল, হর্ষ ও উৎসাহের যোনি, জঠরাগ্নির দোষ নাশক, মল সমূহের নিষ্কাশক, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় বিধ মার্গের ভেদকারী, গর্ভাকৃতির কর্ত্তা এবং আয়ুর আধারীভূত। বায়ু শরীরে কুপিত হইলে শরীরকে নানাবিধ রোগ দ্বারা ক্লেশিত করে। এই বায়ুই উৎপত্তির কারণ, আবার ও ভূতগণের সৃষ্টি সংহার কারক।

পিত্তের পরিচয়ে আমরা জানিতে পারি, প্রাণীদিগের দেহ মধ্যে যে অগ্নি বিদ্যমান, পিত্ত তাহারই নামান্তর। এই পিত্তই জীব দেহে দাহন ও পাচন প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। এই পিত্ত ক্ষীণ হইলে অগ্নি গুণবিশিষ্ট তীক্ষ্ণ ও উষ্ণাদিতে পিত্তের সমান গুণান্বিত দ্রব্য দ্বারা উহা বর্দ্ধিত হয়, পিত্ত অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে শীতল ক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়।

কফ—পিত্তের বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট। পিত্তের গতি জীব দেহে উর্দ্ধদিকে ধাবমান হইয়া থাকে, এই জন্যই কফের আশ্রয়— আমাশয়—পিত্তাশয়ের উপরি সংস্থিত। যেরূপ দিক দর্শনে সূর্য্যের উপরি চন্দ্র অবস্থিত থাকায় সূর্য্যের উষ্ণ কিরণের আধার স্বরূপ, সেই প্রকার আমাশয় পিত্তের তেজঃ ক্রিয়ার আধারস্থল হেতু ভোজ্য, ভক্ষ্য, লেহ্য ও পেয়

এই চতুর্ব্বিধ আহারেরও আধার বলিয়া জানিবে। এই চতুর্ব্বিধ আহার দ্রব্য উদক গুণ অর্থাৎ দ্রব স্নেহাদি দ্রব গুণ যুক্ত, আমাশয়িক রস দ্বারা ক্লেদ ভাবাপন্ন ও শিথিল সংযোগ হইয়া সুখে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে জানিবে।

উপরে অতি সংক্ষেপে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিচয় প্রদত্ত হইল মাত্র, নতুবা এই তিনটির বিশদ পরিচয় দিতে হইলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা এই বায়ু, পিত্ত ও কফের উপরই সংস্থিত। এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইলেই প্রাণীদিগকে রোগগ্রস্ত হইতে হইবে—ইহাই আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশ। মহর্ষি সুশ্রুত, এই বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষের সঞ্চয়, প্রকোপ ও প্রশমনের বিষয় বুঝাইবার জন্ত দোষ ও সঞ্চয়াদি ভেদে ঋতুবিভাগ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ী কেন, সকল গৃহস্থেরই পাঠ করা উচিত। পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি সকল এরূপভাবে সুবিন্যস্ত আছে কিনা জানিনা। ঐ উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিতে পারিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয়।

ঋষির উপদেশের কোন্ কথাটা স্বাস্থ্য রক্ষায় বিহিত বলিব না? চরক ও সুশ্রুতের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক ছত্রই স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ প্রদানের জন্ত লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বায়ু প্রকোপের কারণে সুশ্রুত বলিয়াছেন,—বলবান ব্যক্তি দিগের সহিত অতিরিক্ত ভাবে কুস্তি করিলে, অত্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ করিলে, অধিক অধ্যয়ন করিলে, উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে, অতি দ্রুত দৌড়াইলে, অতিশয় শরীর মর্দ্দন করিলে, লগুড়াদি, আঘাত প্রাপ্ত হইলে, বেগের সহিত গর্ত্তাদি অতিক্রমণ করিলে, লাফাইয়া লাফাইয়া চলিলে, অতিরিক্ত সন্তরণ প্রদান করিলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, ভারবহন করিলে, হস্তী, অশ্ব, গাড়ী ও পদদ্বারা অধিক গমন করিলে, কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, শীতল, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, বন্য কোদোধান্য প্রভৃতি ভোজন করিলে, অল্প ভোজন বা উপবাস করিলে, বহু ভোজন বা অকালে ভোজন করিলে, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন করিলে, অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, বমি, হাঁচি, উদগার ও ক্রন্দন এই সকলের বেগ ধারণ করিলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকোপের কারণে ঋষি বলিয়াছেন,—ক্রোধ, শোক, ভয়, পরিশ্রম, উপবাস, বিদগ্ধ (ভুক্ত দ্রব্য অম্লপাক হেতু কষ্টে জীর্ণ হওয়া) মৈথুন, উপগমন, কটু, অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল তৈল, তিল বাটা, ছাগমাংস, মেষ মাংস, দধি, তক্র, সুরা সেবন ও আতপ সেবনে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

শ্লেষ্মা প্রকোপের কারণ-নির্ণয়ে ঋষির মীমাংসা—দিবা নিদ্রা, আদৌ পরিশ্রম না করা, অলসতা, মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, ক্লেদজনক, গোধূম, তিল, পিষ্ট বিকৃতি (চাউলের পিঠা), দধি, দুগ্ধ, পায়স, ইক্ষু বিকার (গুড় প্রভৃতি) মহিষ, বরাহাদি মাংস, কচ্ছপ মাংস, কেশুর, পানিফল, তাল, নারিকেলাদি, লাউ, কুমড়া এই সকল দ্রব্য নিত্য সমানভাবে ভোজন এবং অজীর্ণ সত্বে ভোজনে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহাতে আয়ুর কথা বর্ণিত থাকে তাহারই নাম আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুর হিতাহিত বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি চরক ও সুশ্রুতের এত কথা বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম চরক ও সুশ্রুত শুধু চিকিৎসা গ্রন্থ নহে, গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় সকল সংসারেই ইহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

শরীরের মূল কি—ইহা বুঝাইবার জন্য সুশ্রুত বলিয়াছেন, যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি, জীবন ও বিনাশের পক্ষে মূলই প্রধান, সেই রূপ প্রাণীগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংসের পক্ষে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু এবং পুরীষাদি মল—শরীরের মূল জানিবে। বায়ু, পিত্ত, কফের দ্বারা দেহীদিগের কি কার্য্য সাধিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। রস ধাতুর দ্বারা শরীরের প্রীণন অর্থাৎ স্নিগ্ধতা প্রভৃতি কার্য্য ও রক্তের পোষণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছে। রক্তের দ্বারা বর্ণের প্রসন্নতা, মাংসের পোষণ ও জীবন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মাংসের দ্বারা শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টি সাধিত হইতেছে। মেদের দ্বারা স্নেহ ও স্বেদের পোষণ ও অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে। অস্থির দ্বারা দেহ ধারণ ও মজ্জার পোষণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মজ্জার দ্বারা প্রীতি, স্নেহ, বল ও শুক্রের পোষণ এবং পূর্ণতা নির্ব্বাহিত হইতেছে। শুক্রের দ্বারা ধৈর্য্য, স্খলন, প্রীতি, দেহের বল, হর্ষ ও বীজার্থ অর্থাৎ গর্ভের প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইতেছে। পুরীষের দ্বারা—শরীর ধারণ এবং বায়ু ও অগ্নি ধারণক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। মুত্রের দ্বারা বস্তির পূরণ ও আহারাদির ক্লেদ নিঃসরণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। চরকের চিকিৎসা স্থানের রসায়ন অধ্যায় ইহারই ভিত্তির উপর লিখিত। চরক বলিয়াছেন,—

"লাভো পায়োহি শস্তানাং রসাদীনাং
রসায়নম্।

অর্থাৎ রসাদি ধাতু সমূহ লাভ করিবার উপায় স্বরূপ বলিয়াই ইহার নাম রসায়ন। রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে—

দীর্ঘমায়ু স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং
বয়ঃ।
প্রভাবর্ণ স্বরৌদার্য্যং দেহেন্দ্রিয় বলং
পরম।"

অর্থাৎ দীর্ঘ আয়ু স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য তরুণতা, প্রভা, বর্ণ ও স্বরের পুষ্টি, দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের বল, বাকসিদ্ধি, প্রণতি ও কান্তি লাভ হইয়া থাকে। রোগ-বিশেষে আক্রান্ত হওয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও নানা কারণে মানবের ষড় ধাতুর ক্ষয় সর্ব্বদাই হইতেছে, আর্য্য ঋষি তাহা চিন্তা করিয়াই চিকিৎসা স্থানের প্রথমেই রসায়ন চিকিৎসার কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই রসায়ন চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের মহান্ গৌরব। এরূপ চিকিৎসাও অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র এখনও অধিগত করিতে সমর্থ হয় নাই।

অপত্য কামী পুরুষ ও স্ত্রীলোক মাত্রেরই শুক্র ও শোণিতের বিশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সুশ্রুতের অমূল্য উপদেশে এ সকল কথাও বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতুমতী নারীর কর্ত্তব্য, ঐ সময়ে পুরুষের কর্ত্তব্য,—কিরূপ নিয়মে থাকিলে সুসন্তানোৎ

পস্তি হইয়া থাকে—এসব কথাও মহর্ষি সুশ্রুত অতি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন। এসব উপদেশ পালন করিয়া চলিলে পৃথিবী হইতে যেমন রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া থাকে, সেইরূপ অল্পায়ুর সংখ্যাও কমিয়া যায়। আমরা এ সকল উপদেশ পালন করিতে জানি না বলিয়াই তো এখন আমাদের এই দুর্গতির চরম অবস্থা। শুধু রোগ রোগ করিয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন, রোগ না হইবার যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আর্য্য ঋষি দিয়া গিয়াছেন, তাহা অব্যাহত ভাবে পালন কর; দেখিবে, তোমার সংসারে রোগের প্রাদুর্ভাব সত্য সত্যই অনেক কম পড়িয়া গিয়াছে। ঋষি উপদেশ মানি না বলিয়াই আজ আমাদের এত দুঃখ। হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুর স্বাস্থ্যের সহিত জড়িত—এ কথাটি আমরা যত দিন না বুঝিতে পারিব আর্য্যঋষির অমূল্য উপদেশাবলী যে পর্য্যন্ত না আমরা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে শিখিব, সমগ্র চিকিৎসার মূল গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুতকে যে পর্য্যন্ত না আমরা সমাদর করিয়া সর্ব্ব সময়ে বরণ করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত যে আমাদের কল্যাণ নাই একথা বলিতে পারা যায়।

"যস্য দেশস্য যো জন্তু তজ্জং তস্যৌষধম্ হিতম্।'

এই প্রসঙ্গে একথাটিও আমাদের স্মরণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার অর্থ—যে দেশের প্রাণী, তাহার পক্ষে সেই দেশের ঔষধই হিতকর। আমরা যে কারণেই হউক—এ কথাটির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অধুনা প্রস্তুত নহি। আমরা জানি, ম্যালেরিয়া জ্বরে এলোপাথিক চিকিৎসা করাইলে শীঘ্র উপকার হইবে। কিন্তু সেই উপকারের পরিণতি যে কোথায়—তাহা তো আমরা ভাবিয়া দেখি না। ঋষি, বায়ুপিত্তকফের উপর নির্ভর করিয়া তাবৎ রোগেরই চিকিৎসা কর—উপদেশ দিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে উঁহাদিগের ভোগকালেরও যে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃত আরোগ্যকামী ব্যক্তির সেই ভোগকালের অপেক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিদেরা সে ভোগ কালের যে অপেক্ষা করেন না, তাহার ফলে তাঁহাদের চিকিৎসায় আশু রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেও উহার দ্বারা অন্য ব্যাধি কর্ত্তৃক যে আক্রান্ত হইতে হয়—এ কথা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমরা এ সকল বিষয় ক্রমশঃ বুঝাইব।

ব্রহ্মচর্য্য।

[কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন]

যতগুলি কারণে বাঙ্গালীর দৈহিক অবঅবনতি ঘটিয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যহীনতা তাহাদিগের অন্যতম। যে সময়ে বাঙ্গালী জাতি এই ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে জানিত রাজ পুত্রই হউন, আর সামান্য গৃহস্থের পুত্রই হউন, যে সময়ে বালক নির্ব্বিশেষে সকলকেই গুরুগৃহে পঠদ্দশা অতিবাহিত করিয়া উপযুক্ত বয়সে, সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইত, পঞ্চবিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে পুরুষের এবং ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে যখন স্ত্রী পুরুষের

মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা, তখন বাঙ্গালী জাতি যে এত রোগপ্রবণ হইত না,—তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন বাল্য বিবাহ—বাঙ্গালী সমাজে প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু যথাযোগ্য কাল উপস্থিত না হইলে স্ত্রী পুরুষের মিলিত হইবার উপায় ছিল না। বিবাহের উদ্দেশ্য কাম প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সম্পাদন নহে। স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু সন্তান লাভই যৌন সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া তখনকার দিনে সকলে জানিত। এখন সে প্রথা যে দেশ হইতে লোপ পাইয়াছে, দেশের দুর্গতির তাহাই আমরা সর্ব্ব প্রধান কারণ বলিয়া মনে করি।

ব্রহ্মচর্য্য বলিলে থান কাপড় পড়িতে হইবে, আতপ চাউল খাইতে হইবে,মাছ মাংস ত্যাগ করিতে হইবে—এমন অর্থ করিলে চলিবে না। বীর্য্যরক্ষাই ব্রহ্মচর্য্য শব্দের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু আমরা এ অর্থ ভুলিয়াছি। বিধবারা সাদা কাপড় পড়েন, এক বেলা আতপান্ন ভোজন করেন—তাঁহাদিগকে নিরামিষ খাইতে হয়—সুতরাং তাঁহারাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন—ইহাতেই আমরা স্থির করিয়া লইয়াছি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে বুঝি ঐরূপ আচরণই করিতে হইবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য উহা নহে, বাহ্যিক এবং মানসিক—সর্ব্ব প্রকারে ইন্দ্রিয় সংযমের নামান্তরই হইল ব্রহ্মচর্য্য। অধুনা এ ব্রহ্মচর্য্য—দেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অন্যায় বলা হইবে না।

আগে পঠদ্দশায় গুরুগৃহে অবস্থিতির যেরূপ প্রথা ছিল, সেইরূপ শিক্ষণীয় বিষয় গুলিও ছিল ধর্ম্মমূলক। এখন সে গুরু গৃহও নাই সে ধর্ম্মমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা নাই। ফলে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই সঙ্গদোষে অনেক বালকই অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্র ব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। বাঙ্গালী বালকের স্বাস্থ্য এমনই করিয়া যে নষ্ট হইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য দেশের মনীষীরা চিন্তা করিতেছেন কি?

"মরণং বিন্দু পাতেন
জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"

বিন্দু অর্থাৎ শুক্রের ব্যয়ই মরণের কারণ এবং শুক্র সংরক্ষণই দীর্ঘায়ু লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বাঙ্গালী বালককে এ কথা শিখাইবে কে? যতদিন না লজ্জা ছাড়িয়া দেশের কোমলমতি বালকদিগকে এ কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে—ততদিন যে আমাদের সমাজের মঙ্গল নাই—ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া যতদূর বুঝিয়াছি—তাহাতে বাল্যের এইরূপ অযথা অত্যাচারের ফলেই বহু সংখ্যক বাঙ্গালীকে জীবন্মৃত করিয়া—তুলিয়াছে। ইহার পরিণতি বাঙ্গালীর অকাল মৃত্যু। কলিকাতায় যক্ষ্মা বা থাইসিসে যে বহু সংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে বাল্য জীবনে অস্বাভাবিক শুক্র ক্ষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া—কালাজ্বরের মূলেও এই পাপ নিহিত। বাঙ্গালীর শিশু মৃত্যুর কারণেও আমরা এই শ্রেণীর অযথা শুক্রব্যয়ী পুরুষদিগকে দায়ী করিতে পারি।

শুক্রই মানবের প্রাণ, শুক্রই পুরুষের

পুরুষত্ব। ভুক্ত পদার্থের রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র জন্মিয়া থাকে। ইহারা শরীর ধারণের প্রধান উপকরণ বলিয়া ইহাদিগের নাম ধাতু। ইহাদিগের মধ্যে আবার শুক্রধাতু শরীর ধারণের পক্ষে কতটা উপযোগী, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফল মানুষের ধৃতি, স্মৃতি, শক্তি, সামর্থ্য, উৎসাহ, অধ্যবসায় সমস্তই লুপ্ত হইয়া মানুষকে অন্তঃসার শূন্য ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। এইরূপ অবস্থায় জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে এইরূপ অত্যাচারী পুরুষেরা শুধু যে নিজেরাই সংসারের যাবতীয় সুখৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া থাকে এমন নহে, তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অর্জ্জিত কষ্টের ফলভোগী হইয়া থাকে। এখনকার দিনে ডিস্‌পেপটিক বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহাদের আগন্ত ইতিহাসের পরিচয় লইলে তাহার মূলে অবৈধ উপায়ে শুক্রক্ষয়ই সর্ব্বপ্রধান কারণ জানিতে পারা যায়। সমাজ হইতে এই ঘোরতর সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে সমূলে ধ্বংস হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা প্রত্যেক সমাজ হিতৈষীর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই সর্ব্বনাশকর ব্যাধি দূর করিতে হইলে দেশে আবার ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই গুরুগৃহে অবস্থিতি—সেই ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন—সেই সর্ব্বপ্রকারে চিত্ত সংযমের সুব্যবস্থা—সেই বিলাস-বাসনার লেশ মাত্রও যাহাতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না তুলে—তাহার উপায় সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষমণ্ডলী এই প্রধান প্রয়োজনীয় কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন কি?

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশের অধিবাসীদিগকে আবার কর্ম্মী করিয়া তুলিবার আবশ্যক হইলে আবার যাহাতে ছাত্রজীবনে সেকালের মত ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা করিতেই হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষা শুধু শারীরিক শাসন দ্বারা লাভ করা যায় না, মনের পবিত্রতাই ইহার প্রধান অবলম্বন। মনের পবিত্রতা ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযম হইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয় সংযম করিবার অভ্যাস—ছাত্রজীবনে শিক্ষা করিলে, তবে বিবাহিত জীবনে উহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন তত কঠিন নহে, কিন্তু বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন বড়ই কঠিন। বাল্যে সদুপদেশ না পাইলে যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। যদি বাল্যে সুশিক্ষা পাইয়া বিবাহিত জীবনে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার ফলে তিনি যে ভাবী সন্তানের কৃতজ্ঞতা ও সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শুক্র ধারণই যখন ব্রহ্মচর্য্যের সর্ব্বপ্রধান বিষয়, তখন শুক্র জিনিসটা কি,—উহাদের স্থান কোথায় এবং উহার প্রকৃতি ও ক্রিয়া কি—সকলেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পুরুষের মুষ্ক বা কোষদ্বয় শুক্রোৎপত্তির স্থান। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্র পরীক্ষা করিলে ওজঃ পদার্থে বেঙাচির আকৃতি বিশিষ্ট বহু সংখ্যক জীবাণু

পরিবেষ্টিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে কেবল জীবনীশক্তি সম্পন্ন এমন নহে, অত্যন্ত বিচরণশীলতাও ইহাদের প্রকৃতির বিশেষত্ব। এই বিচরণশীলতারও আবার বিশেষত্ব যে, ইহারা রন্ধ্রপথে প্রবেশ করিতে ভাল বসিয়া থাকে। এই বিশেষত্বের ফলেই ইহারা যোনিদ্বার দিয়া মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া সন্তানের জীবাণু সঞ্চার করে। পঁচিশ বৎসরের বয়সের পূর্ব্বে পূর্ণ শক্তিশালী শুক্র উৎপন্ন হয় না বলিয়াই উহার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সহিত সম্মিলিত হইতে আর্য্য ঋষি নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত শরীরের গঠন ক্রিয়া —বিশেষত্ব অস্থি ও মস্তিষ্কের গঠন অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন হইতে থাকে। ঐ সময় রক্ত এই গঠন কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত থাকায় জন্য জননেন্দ্রিয়ের দিকে মনোযোগ দিতে পারে না। পঁচিশ বৎসরের পরে শরীর গঠনের এই ক্ষিপ্রতা অপসারিত হয় এবং শরীরের অন্যত্র রক্তের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয় বলিয়া রক্ত যেন অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া জননেন্দ্রিয়গুলির পুষ্টির প্রতি সমুচিত মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। ইহাই হইল প্রকৃতির বিচিত্র নিয়ম, কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চৌদ্দ বা পনের বৎসর বয়সেও যৌবনে পদার্পণ করিতে পারা যায়। এই অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে ষোল বৎসরের বালকও সন্তানের পিতা হইতে পারে।

শুক্র-জীবাণুর সহিত ডিম্বাণুর সম্মিলনই সন্তানের জীবন প্রতিষ্ঠার কারণ। ডিম্বাণুর উৎপত্তি স্থান মাতৃগর্ভ, এই মাতৃগর্ভস্থ ডিম্বাণু হইতেই জীব শরীরের উৎপত্তি। এই ডিম্বাণুর জীবন অনেকটা উদ্ভিদ জীবনের অনুরূপ। এই ডিম্বাণুতে জীবন সঞ্চার করিতে বহু পরিমাণে শুক্র-জীবাণু প্রবেশের আবশ্যক। শুক্রজীবাণুগুলি মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এই ডিম্বাণুর সহিত যখন মিলিত হয়, তখনই ডিম্বাণু—উদ্ভিদের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া জীবপ্রকৃতি অবলম্বন করে। সংক্ষেপে ইহাই হইল জীবসৃষ্টির অপূর্ব্ব রহস্য।

এই রহস্য অবগত হইলে সহজেই প্রমাণিত হইবে যে, অসময়ে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রব্যয়ের পরিণতি যেমন স্বকীয় স্বাস্থ্যহানি, সেইরূপ উহার ফলে অনেক শুক্র-জীবাণুরও ধ্বংস সাধন অনিবার্য্য। কিন্তু তাহা যখন স্থূলদৃষ্টির গোচরীভূত নহে, তখন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই সংযমহীনতার ফলে ঘুণ ধরা বাঁশের মত বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অকালমৃত্যুকে বরণ করিয়া আনিতেছে ইহা অবিসংবাদিত কথা, ইহার প্রতিকূলে বলিবার কিছুই নাই।

আসল কথা, ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া বাঙ্গালী অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অধঃপতিত জাতির পুনরায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আবার তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে হইবে। বাঙ্গালী-বালকই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধর। সেই বংশধরদিগকে রক্ষা করিবার জন্য—বাঙ্গালীর সমাজকে আবার কর্ম্মীরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য—বাঙ্গালীর শরীরে আবার অদম্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আবার বাঙ্গালীকে ইন্দ্রিয় সংযমের অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে কালের মত গুরুগৃহের ব্যবস্থা করিতে না পার,

বাঙ্গালী কর্ম্মীপুরুষ! এমন বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা কর, যে বিদ্যালয়ে ত্যাগের শিক্ষা ও ভোগের বৈরাগ্য লাভ করিয়া জ্ঞানের উন্মেষ সহজেই হইতে পারে, যে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ সুকুমার মতি বয়সেই উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত কর্ম্মী হইতে পারা যায়। এইরূপভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হইলে বাঙ্গালী-বালককে আর ব্রহ্মচর্য্যের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাদানের আবশ্যক হইবে না, তাহার পরিণত বয়সে তাহাকে অনাঘ্রাত কুসুম বিবেচনা করিয়া তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে দেবীর অর্ঘ্য প্রদানে হৃষ্টমনা হইতে পারিবেন।

গর্ভাবস্থায় চিকিৎসা।

(কবিরাজ শ্রীরাখাল দাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ)

—:•:—

প্রথম মাসে—যদি গর্ভিণীর রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহা হইলে, যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু—এই সকল দ্রব্যের ক্বাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

দ্বিতীয় মাসে,—রক্তস্রাব হইলে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী, এই এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ—দুগ্ধ সহ খাইতে দিবে।

তৃতীয় মাসে,—রক্তস্রাব হইলে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া খাইতে দিবে।

পঞ্চম মাসে—রক্তস্রাব হইলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীর বৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

ষষ্ঠমাসে,—রক্তস্রাব হইলে, চাকুলে, বেড়েলা, সজিনাবীজ, গোক্ষুর, যষ্টিমধু—ইহাদের ক্বাথ, দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

সপ্তম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, পাণিফল, মৃণাল, কিসমিস, কেশুর ও যষ্টিমধু—এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

অষ্টম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, কয়েদ বেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কণ্টকারী—ইহাদের মূল এবং পলতা, এক পোয়া দুগ্ধ ও এক সের জলসহ পাক করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে।

নবম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে, অনন্তমূল, যষ্টিমধু, ক্ষীর কাকোলী ও শ্যামালতা—এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধসহ—পাক করিয়া সেই দুগ্ধপান করিতে দিবে।

দশম মাসে,—রক্তস্রাব হইলে,

শুঠীসহ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে অথবা শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেব দারুর সহিত পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পাক করিয়া খাইতে দিবে।

উপরি উক্ত পাচন গুলি প্রস্তুতের নিয়ম পাচনগুলির মিলিত পরিমাণ দুই তোলা, জল অর্দ্ধ সের। শেষ অর্দ্ধ পোয়া।

গর্ভ বেদনারপ্রতীকার।

প্রথম মাসে,—যদি গর্ভিণীর বেদনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, শ্বেত চন্দন, শুলফা, চিনি ও ময়না ফল সমপরিমাণে, চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ শালুক ও শালিতণ্ডুল দুগ্ধসহ পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে এবং ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে।

দ্বিতীয় মাসে,—পদ্ম, পাণিফল ও কেশুর,—চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

তৃতীয় মাসে,-গর্ভ বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী ও আমলকী, পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিতে দিবে। অথবা পদ্ম নীলোৎপল, কুড় ও শালুক সম পরিমাণে চিনির জলে বাটিয়া খাইতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন।

চতুর্থ মাসে, গর্ভ বেদনায়, উৎপল, শালুক, কণ্টকারী, গোক্ষুর অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে।

পঞ্চম মাসে,—গর্ভ বেদনায় নীলোৎপল ও ক্ষীর কাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুসহ—অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাকোলী সম পরিমাণে পেষণ করিয়া শীতল জলসহ পান করিতে দিবে।

ষষ্ঠ মাসে,—গর্ভ বেদনায়, টাবা লেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল, দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া অথবা পিয়াস বীজ, দ্রাক্ষা ও খৈচূর্ণ, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া খাইতে দিবে।

সপ্তম মাসে,—গর্ভ বেদনায়, শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ অথবা কয়েদ বেল, সুপারি মূল, খৈ ও চিনি—শীতল জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

অষ্টম মাসে,—গর্ভ বেদনায় ধনে বাটিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত অথবা পলাশ পত্র শীতল জলে বাটিয়া পান করিতে দিবে।

নবম মাসে,—গর্ভ বেদনায়, এরণ্ড মূল ও কাকোলী, শীতল জলে বাটিয়া অথবা পলাশ বীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল, কাঁজির সহিত বাটিয়া খাইতে দিবে।

দশম মাসে,—গর্ভ বেদনায়, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি—জলে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে।

গর্ভিণীর জ্বর চিকিৎসা।

গর্ভিণীর জ্বর বা অন্য কোনো প্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইলে, বিশেষ বিবেচনার সহিত চিকিৎসা করা উচিত। যাহাতে গর্ভের কোনোরূপ বাধা না জন্মায়, তাদৃশ মৃদু, মধুর, শিশির, সুখসেব্য, সুকুমারপ্রায় ঔষধ ও

অন্ন পানাদির ব্যবস্থা করিবে। বমন, বিরেচন ও শিরো বিরেচন কদাচ প্রয়োগ করিবে না।

গর্ভিণীর জ্বর নিবারণের জন্য যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা এখানে লিখিত হইতেছে, সে সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়, ইহাদের দ্বারা গর্ভিণীর কোনো প্রকার আশঙ্কা নাই।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণার মূল, অনন্ত মূল, পদ্মকাষ্ঠ—এই সকল দ্রব্য মোট দুই তোলা পরিমাণে লইয়া আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চিনি ও মধু সহ পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা গর্ভিণীর জ্বর শান্তি হয়।

রক্ত চন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা—ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা অর্থাৎ প্রত্যেক দ্রব্যটি আধতোলা পরিমাণে লইয়া আধ সের জলে সিদ্ধ করিবে। শেষ আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর ভাল হইবে।

অতিসার চিকিৎসা।

১। শুঁঠ, আতইচ, মুতা অথবা ধনে ও শুঁঠ মিলিত দুই তোলা, আধসের জলে পাক করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা প্রবল অতিসার ও তৃষ্ণা, শূল প্রভৃতি উপসর্গ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা পাচক, অগ্নি উদ্দীপক ও লঘু।

২। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, বেড়েলা মূল, শুঁঠ, ধনে, নীলোৎপল ও বেল-শুঁঠ—ইহাদের মিলিত ওজন দুই তোলা, জল একসের ও তক্র এক পোয়া পরিমাণে দিয়া পাক করিয়া এবং এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ পান করিতে দিবে। ইহার দ্বারা বাত প্রধান অতিসারের শান্তি হয়।

৩। কঞ্চটক (কাঁচড়া পাতা), জামপাতা, দাড়িমপাতা, পাণিফল পাতা, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা ও শুঁঠ—প্রত্যেকটি চারি আনা পরিমাণে লইয়া যথারীতি কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহার কাথে প্রবল অতিসারের শান্তি হইয়া থাকে।

৪। ইন্দ্রযব, দাড়িম ছাল, আকনাদি, বেলশুঁঠ এবং আম অথবা জামের কচিপাতা—ইহাদের মধ্যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, বাটিয়া, দধি ও চিনির সহিত, খাইলে গর্ভিণীর অতিসার ভাল হয়।

গ্রহণী চিকিৎসা।

আমছাল ও জামছালের কাথে খৈ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া লেহন করিলে অতি সত্বর গর্ভিণীর গ্রহণী নিবারিত হয়।

শ্বাস কাসাদি চিকিৎসা। দারুচিনি চূর্ণ এক ভাগ, বড় এলাইচ চূর্ণ দুই ভাগ। পিপুল চূর্ণ চারি ভাগ, বংশলোচন আট ভাগ—এবং চিনি ষোল ভাগ—একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। এই চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে শ্বাস, কাস, অরুচি, মন্দাগ্নি প্রভৃতির শান্তির হইয়া থাকে।

রোগতত্ত্ব।

(কবিরাজ শ্রীদীননাথ কবিরত্ন শাস্ত্রী)

"তদ্দুঃখ সংযোগা ব্যাধয় ইতি"—সুশ্রুত।
"বিকারো ধাতু বৈষম্যং, বিকারো
দুঃখ মেবচ"—চরক।

রোগ কি ? ইহার স্থূল জ্ঞান প্রায় সকলের মনে নিহিত আছে। কেননা প্রায় সকল রোগেই কোন না কোন যাতনা অনুভূত হয়। রোগ উপস্থিত হইয়াছে অথচ যন্ত্রণা বোধ নাই, এরূপ স্থল অতি বিরল। কখনও কোনো রোগ ভোগ করেন নাই—এরূপ লোকের সংখ্যাও অত্যধিক অল্প। সুতরাং রোগ বলিলেই প্রধানতঃ আমাদের প্রতীতি হয় যে, কোন প্রকার যাতনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞান সাধারণতঃ অনুভূতি মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা দ্বারা কোন রোগেরই যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হয় না। যেহেতু জ্বরের যেরূপ আকার, উদরাময়ের সেরূপ আকার নয়। উদরাময়ের যেরূপ আকার, অর্শোরোগের সেরূপ আকার নয়। এক রোগও নানা আকার ধারণ করে। অনেক রোগও এক প্রকার আকারে আবির্ভূত হয়। কতকগুলি রোগের আকার আবার সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এই সকল কারণে রোগ নির্ণয় এত দুরূহ ব্যাপার। এই হেতুবাদ নিবন্ধন চিকিৎসা শাস্ত্রেও অনেক মতভেদ লক্ষিত হয়।

পরন্তু রোগের আকৃতিগত পার্থক্যাদি থাকিলেও এমন অনেকগুলি ধর্ম্ম আছে, সেগুলি প্রায়শঃ সকল রোগেই বিদ্যমান থাকে। সেই ধর্ম্মগুলিকে সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়াই ঋষিগণ সমুদয় রোগের ব্যাপক লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রস্তাবের শিরোদেশে যে সূত্র দুইটি বিন্যস্ত হইল, সেগুলি রোগের সাধারণ স্বরূপ বোধক। অথবা রোগের সাধারণ ধর্ম্ম বা লক্ষণজ্ঞাপক। উহাদিগের ব্যাখ্যা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে আমরা ঋষিদিগের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হইব। উক্ত সূত্র দুইটীর অর্থ এই যে যাহা দ্বারা পুরুষের ব্যক্তিগত দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকেই রোগ বলে। সুতরাং দুঃখজনক মাত্রেই রোগ বলিয়া গণ্য। কথাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহার অর্থ বহুদূর বিসর্পী, এমন কি অধ্যাত্ম প্রকরণ পর্য্যন্ত ইহার স্পর্শের আয়ত্ত। কেননা জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ প্রভৃতি দেহের স্বাভাবিক সমগ্র ব্যাপারই রোগের অন্তর্ভূত। যেহেতু ইহা-দ্বারা পুরুষের যে দুঃখ উপস্থিত হয়; সে দুঃখের অভিঘাতে পুরুষ সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত, সর্ব্বদাই ব্যাকুল। অধ্যাত্ম পণ্ডিতগণ ইহা-দিগের নিকট জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহকে অতি সামান্যই মনে করেন। তাঁহারা বলেন, জ্বরাদি রোগ লৌকিক চেষ্টাতেই প্রশমিত হইতে পারে; কিন্তু জরা, মৃত্যু, শোক, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি স্বাভাবিক রোগ সকল

সামান্য চেষ্টার আয়ত্ত নহে। তুমি যত বড় পণ্ডিত— যত বড় বুদ্ধিমান, যত বড় চেষ্টাশীল হওনা কেন, স্বাভাবিক রোগের হস্ত হইতে কিছুতেই তোমার নিষ্কৃতি নাই। শৈশবের পশ্চাদ্‌গামিনী জরা তোমাকে আক্রমণ করিবেই করিবে। জীবনের সহচর মৃত্যু নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রাস করিবে। প্রকৃতির এই সকল স্বাভাবিক নিয়ম কর্ম্মময় জীবনে মানবের অলঙ্ঘনীয়। যাহা হউক পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্রদ্বয়ের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে,—মানবের যে কোনরূপ দুঃখপ্রদ অবস্থা বিশেষ উপস্থিত হইলেই, ঋষিগণ তাহাকে ব্যাধি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেন। কিন্তু আমরা সংসারী বিষয়ী, ঐহিক সুখই আমাদিগের সর্ব্বস্ব। ঋষিগণের নিকট সংসার বিষময় হইলেও আমাদিগের পক্ষে ইহা সুখের প্রস্রবণ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাঁহাদিগের বৈরাগ্য বুদ্ধিতে রোগ বলিয়া গণ্য হইলেও আমাদিগের নিকট সর্ব্বথা প্রার্থনীয় সুখ। সুতরাং ততদূর ব্যাপক লক্ষণ আমাদিগের মনঃপূত হয় না। তাই আমরা আর একটী সূত্র প্রথমোক্ত সূত্রদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেছি। উহার অর্থ এই যে,—ধাতুগণের বৈষম্যই রোগ*। শরীরের বিধান, ধারণ বা পোষণের উপযুক্ত পদার্থ মাত্রেই ধাতু। সুতরাং শরীরের উপাদানে জীবক সমুদয় দ্রব্যকেই রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থ এবং যকৃত প্লীহাদি অস্ত্র মাত্রকেই ধাতু বলা যায়। তাহাদের কোন বৈষম্য বা অন্যথা ভাব ঘটিলেই রোগ বলা যাইতে পারে। জীবিত শরীরে যে সকল অস্ত্র যে ভাবে থাকিয়া যেরূপ কাজ করিতেছে এবং যে যে পদার্থে যে পরিমাণে ও যে ভাবে থাকা আবশ্যক তাহার বিকৃতিকেই রোগ বলে।

বৈষম্য শব্দে উল্লিখিত পদার্থ সকলের দ্রব্যগত, গুণগত ও ক্রিয়াগত হ্রাস অথবা বৃদ্ধি এবং অস্ত্রাদির নির্ম্মাণগত অন্যথা ভাব বুঝিতে হইবে। কাহারও, কাহারও মতে অন্যথাভাব চারি প্রকার। ১ম প্রকোপ, ২য় আশয়াপকর্ষ কোন তরল অথবা লঘু পদার্থ অর্থাৎ শরীর গত বায়ু, পিত্ত, কফ, রস, রক্ত প্রভৃতি পদার্থের—কোন বলবান অন্য ধাতুর আকর্ষণে স্বকীয় আশয় পরিত্যাগ করিয়া বিকৃত ভাবে অন্য আশয়ে গমন করাকে বুঝিতে হইবে। হীনতা শব্দের দ্রব্যগত হ্রাস এবং বৃদ্ধি শব্দে দ্রব্যগত পরিমাণ আধিক্য।

আপাততঃ বোধ হইতে পারে যে, উল্লিখিত লক্ষণ দ্বারা শারীরিক রোগের কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মানসিক রোগের বিষয় অস্পষ্ট রহিল। শারীরধাতুর বৈষম্য বশতঃ যেরূপ জ্বর প্রভৃতি জন্মে, মানস ধাতুর বৈষম্য বশতঃ সেরূপ মূর্চ্ছা, কাম, ক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। শারীর রোগের চিকিৎসা করাও আয়ুর্ব্বেদের যেরূপ একটী লক্ষ্য, মানস রোগের চিকিৎসা করাও আর একটী লক্ষ্য। সুতরাং মানসিক রোগের বিষয়েও এস্থলে স্থূলতঃ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পরন্তু ধাতু শব্দের আর একটী অর্থের প্রতি অভিনিবেশ করিলেই মানসিক রোগের স্বরূপতঃ সামান্য আকার জ্ঞান উপলব্ধি করা

---

* শারীরং দধাতি বিধত্তে ধারয়তি পুষ্ণাতি বা ইতি ধাতুঃ।

যাইতে পারে।*– ধাতু শব্দে যেমন শারীরিক ধাতু রস, প্রভৃতি বুঝায়, তেমনি মানসিক ধাতু বলিলে সত্ত্বগুণ প্রভৃতি বুঝাইয়া থাকে। এই সত্ত্বগুণ প্রভৃতির বৈষম্য বশতঃ উন্মাদাদি মনোবিকার উপস্থিত হয়। সুতরাং ধাতু-বৈষম্য বলিলে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ রোগেরই লক্ষণ যুগপৎ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে।

উক্ত কথা গুলির বিবৃতি এই— আমাদিগের শরীরে আমাশয়ে (যে অন্ত্রে আহারীয় দ্রব্য প্রথমে উপস্থিত হয়) পক্বাশয়ে (ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশগুলি যে অন্ত্রে মূত্র ও মলরূপে পরিণত হয়), বক্তশিরা প্রভৃতি অন্ত্র সকল নিয়ত আপন আপন কাজ করিতেছে। আহারীয় দ্রব্য হইতে রস, তাহা হইতে রক্ত এবং রক্ত হইতে মাংসাদি উৎপন্ন হইয়া শারীরিক পদার্থ সকলের ক্ষতিপূরণ ও পুষ্টি-সাধন করিতেছে। বাত, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ শারীর পদার্থ এবং সত্ত্ব রজঃ তমঃ আপন আপন শিরা ধমনীপথে গতায়াত করিয়া জীবন ক্রিয়ার সহায়তা করিতেছে। এই নিমিত্ত আমরা স্বচ্ছন্দ শরীরে ও সুস্থ মনে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি. শৈশব হইতে বাল্যে, বাল্য হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ়তা হইতেই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইতেছি। এ সকল পদার্থের ও এ সকল কর্ম্মের কোনরূপ অন্যথা ভাব ঘটিলেই আমরা পীড়িত বা রোগগ্রস্ত বলিয়া গণ্য হই। জগতে বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদিগের শরীর ও মনের নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জল, বায়ু, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, আহার-বিহার-শয়ন উপবেশন প্রভৃতি দৈহিক ব্যাপার, বাগবিতণ্ডা প্রভৃতি বাচনিক কার্য্য, কাম-ক্রোধাদি মানসিক উত্তেজনা, অথবা চিন্তন, অনুধ্যান প্রভৃতি মনোবৃত্তি নিষ্ঠ কর্ম্মের আমাদিগের আত্মা মনের সহিত ওতোপ্রোত ভাবে সম্বন্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও ঘটনার অনুষ্ঠান বিবিধ কারণে প্রয়োজন মত হইয়া উঠে না। কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত কখনও বা প্রয়োজন অপেক্ষা ন্যূন হইয়া থাকে। ঈদৃশ হেতু বশতঃই আমাদিগের জীবিত শরীরে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঘটনাগুলির অন্যথাভাব ঘটিয়া তাহা রোগ নামে আখ্যাত হয়। বিষমতা প্রাপ্ত বাত পিত্তাদি হইতেও কতকগুলি রোগের উৎপত্তি হয়। ঐ রোগগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—অমিশ্র ও মিশ্র। বাতের প্রকোপাদি জন্য যে রোগ উৎপন্ন হয় তাহা-দিগকে বাতজন্য অমিশ্র রোগ বলা যায়। পিত্তের প্রকোপাদি জন্য যে রোগ জন্মে তাহা-দিগকে পিত্ত জন্য অমিশ্ররোগ, শ্লেষ্মার প্রকোপাদি বশতঃ উৎপন্ন রোগগুলি শ্লেষ্মা জন্য অবিমিশ্র রোগ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন যে, বাত জন্য নখ ভেদ (কোন স্থানে বিদারণ করিলে যেরূপ বেদনা অনুভব হয় সেইরূপ বেদনা) পাদশূল (গোড়ালির নিম্নদেশে বেদনা প্রভৃতি আশী প্রকার এবং পিত্ত জন্য দোষ (পার্শ্বে অগ্নি থাকিলে যেরূপ তাপ অনুভব হয় সেইরূপ অনুভব) প্লোষ (কিঞ্চিদ্দগ্ধ করিলে যেরূপ ক্লেশ অনুভব হয় সেরূপ

---

* ধাতবো বাতাদয়ো রসাদ্যশ্চ তথা রজঃ প্রভৃতয়ঃ। চক্রপাণি।

অনুভব) প্রভৃতি ৪০ (চল্লিশ) প্রকার। ও শ্লেষ্ম জন্য তৃপ্তি (সর্ব্বদা ক্ষুধা ও আহার প্রবৃত্তির অভাব বোধ) তন্দ্রা, গুরুতা প্রভৃতি কুড়ি প্রকার অবিমিশ্র রোগ বলা যায়। এই রোগগুলির কোনটি বাত জন্য কোন পিত্ত জন্য ও কোনটী শ্লেষ্ম জন্য, তাহা বহুকালে বহু পরীক্ষার দ্বারা স্থিরিকৃত হইয়াছে। অবিমিশ্র রোগগুলির মিশ্রনে অপর কতকগুলি রোগ উৎপন্ন হয়। উহাদিগকে মিশ্র রোগ বলা যাইতে পারে। যথা জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, অর্শঃ প্রভৃতি যে সময়ে বাত পিত্তাদির বিষমতা হইতে জন্মিয়া থাকে, সেই সময়েই ঐ বাতাদির বৈষম্য হইতে কম্প, দাহ, গাত্র গৌরব প্রভৃতি অপর কতকগুলি অবিমিশ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া জ্বর প্রভৃতি রোগের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে ইহা স্থির কথা। শেষোক্ত রোগগুলিকে প্রথমোক্ত রোগের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বলে।

জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ সকল উৎপন্ন হইবার পর রোগীর অত্যাচার বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত বাতপিত্তাদি প্রকোপের আধিক্য হওয়ায় অপর কতকগুলি অমিশ্র রোগের উদ্ভব হয় ও উহারা প্রথমোক্ত রোগের সহিত মিলিত হইয়া যায়। শেষোক্ত রোগ গুলিকে প্রথমোক্ত রোগের উপদ্রব বলে। কোন্ কোন্ রোগের সহিত কোন্ কোন্ রোগের উপদ্রব ঘটিয়া থাকে—আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতরা তাহা এক প্রকার নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন। অপর এক শ্রেণী রোগ আছে, তাহাতে * প্রথমে বাত, পিত্ত বা কফের প্রকোপাদি হয় না অথচ অন্যরূপে ধাতু বৈষম্য ঘটে। * পশ্চাৎ বাতাদি প্রকোপাদি উপস্থিত হয়। অনন্তর বেদানা দাহ প্রভৃতি অবিমিশ্র রোগ, তদনন্তর ব্রণ প্রভৃতি মিশ্র রোগ আবির্ভূত হয়। ইহাদিগকে আগন্তুক রোগ বলে। তরবারী দ্বারা কোন ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ হানিরূপ ধাতু বৈষম্য ঘটিল। পরক্ষণেই আঘাত জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাত প্রকোপ এবং পরম্পরা সম্বন্ধে পিত্তাদির প্রকোপ। অনন্তর বেদনাদাহ প্রভৃতি ব্রণ ক্ষত রূপ রোগ ঘটিয়া থাকে। মানব শরীরে রোগের সংখ্যা কত তাহা স্থির করা কাহার ও শক্তিসাধ্য নহে। রোগ অসংখ্য হইলেও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে তাহার কতগুলি পরিগণনা নির্দ্দেশ করিয়া আমরা নিম্নে তাহারই কিছু উল্লেখ করিতেছি।

প্রথমতঃ যাবতীয় রোগকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম আধ্যাত্মিক, ২য়

জ্ঞানার্থং যানি চোক্তানি ব্যাধি
লিঙ্গানি সংগ্রহে।
ব্যাধয়স্তে তদাত্বেতু লিঙ্গানীমানি
নামশঃ ॥ চরক।

* ঔপসর্গিকো নাম যঃ পূর্ব্বোৎপন্ন ব্যাধিং জঘন্য কাল যাতো ব্যাধি রূপস্বজতি, শতমূল এব উপদ্রবসংজ্ঞঃ। সুশ্রুত।

স্বধাতু ধাতু বৈষম্য নিমিত্ত বিকার সম্ভ বহবঃ শরীরে নতে পৃথক্ পিত্ত কফাদি লেভ্যা আগন্তবস্তেতু ততো বিশিষ্টাঃ॥ আগন্ত রবেতি নিজং বিকারং নিজ স্তথাগন্তমতি প্রবৃদ্ধঃ (চরক)। তে পূর্ব্বং কেবলাঃ পশ্চাৎ নিজের্ব্যামিশ্র লক্ষণা, হেত্বৌষধি বিশিষ্টাশ্চ ভবন্ত্যাগন্তবো জ্বরাঃ। চরক

আধিভৌতিক, ৩য় আধিদৈবিক, এস্থলে আত্মা বলিতে মন ও শরীর উভয়কেই এক সঙ্গে বুঝিতে হইবে। ভূত শব্দে অশ্ব শস্ত্র প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ, দেব শব্দে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ প্রভৃতি এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু,গ্রহ, কাল ঘটিত প্রাকৃত নিয়ম। আত্মা অর্থাৎ মন ও শরীর ঘটিত যে সকল রোগ আহার বিহারাদির অনিয়ম জন্য উৎপন্ন হয়—তাহার নাম আধ্যাত্মিক। ভূত পদার্থ হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আধিভৌতিক। দেব হইতে যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত,১ম আদিবলপ্রবৃত্ত, ২য় জন্ম-বল প্রবৃত্ত, ৩য় দোষবল-প্রবৃত্ত। মানব শরীরে আদি উপাদান স্বরূপ শুক্র শোণিত বিকৃত থাকিলে তদুৎপন্ন শরীরে তজ্জন্য যে সকল রোগ জন্মে তাহাদিগের নাম আদিবল প্রবৃত্ত। যথা, জাত কুষ্ঠ, সহজাত অর্শঃ, সহজাত প্রমেহ প্রভৃতি। আদিবলপ্রবৃত্ত রোগ আবার দুই প্রকার, প্রথমতঃ মাতৃজাত, দ্বিতীয়তঃ পিতৃজাত। মাতৃ শরীরের রজো বিকৃতিতে সন্তানের যে রোগ জন্মে, তাহার নাম মাতৃজাত। পিতার শুক্র দোষ জন্য সন্তানের যে রোগ জন্মে তাহার নাম পিতৃজাত। অবিকৃত শুক্র শোণিত হইতে মানবদেহের অঙ্কুরোৎপত্তি হইবার পর মাতৃ গর্ভস্থ তাহার অঙ্কুরের পরিপোষণ কালে গর্ভস্থ শিশুর যে রোগ জন্মে তাহার নাম জন্মবল প্রবৃত্ত। জন্মবল প্রবৃত্ত রোগও দুই প্রকার, ১ম রস কৃত, ২য় দৌহৃদোপচার কৃত। জরায়ুস্থিত সন্তান মাতৃ শরীরে আহার জনিত রস ধাতুর দ্বারা জীবিত থাকে এবং পরিপুষ্ট হয়। যদি তদবস্থায় মাতার আহার বিহারাদির অত্যাচার ঘটে,তাহা হইলে রস ধাতুর বিকৃতি জন্মে। তাদৃশ বিকৃত রসের দ্বারা পরিপোষিত হইয়া উদরস্থিত সন্তানের রোগ জন্মিয়া থাকে। ঐ রোগকে রসকৃত রোগ বলে, যথা সন্তানের অতি ক্ষীণতা প্রকৃতি। গর্ভ ৪র্থ মাসে উপনীত হইলে জরায়ুস্থ সন্তানের হৃদয়দেশের গঠন সম্পন্ন হয় এবং চেতনা ধাতু ব্যক্ত হইয়া উঠে। তখনই সন্তানের আহারের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ঐ প্রবৃত্তি গর্ভিণীর মনোরথের দ্বারা প্রকাশ পায়। এইরূপে একাধারে ২টী হৃদয়ের অবস্থা প্রযুক্ত ঐ সময় গর্ভিণীকে দ্বি-হৃদয়া এবং গর্ভবতীর ঐরূপ আহারাদির অভিলাসকে দৌহৃদ বলে। ঐ দৌহৃদের পূরণ না হইলে ক্ষোভ বশতঃ গর্ভিণীর বাত প্রকোপ হয়। তজ্জন্য জরায়ুস্থ সন্তান কুব্জ, পঙ্গু, মূক (বোবা) ইত্যাদি বিকৃতাবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ রোগকে দৌহৃদাপচারজনিত ব্যাধি বলে। *

---

* মাতুস্থ খলু রস বহায়াং নাড্যাং গর্ভবহা নাড়ী প্রতিবদ্ধাসাস্তামাতুরাহার রসবীর্য্য মভি ভবতে। তেনোপ স্নেহে নাস্তাপ বৃদ্ধির্ভবতি। সুশ্রুত।

সুশ্রুতের মতে ৪র্থ মাসে এবং চরকের মতে ৩য় মাসে দৌহৃদ উপস্থিত হয়।

দ্বিহৃদয়াস্তনারীং দৌহৃদিনীমাচক্ষতে।

সুশ্রুত।

গর্ভোবাত প্রকোপেণ দৌহৃদেচাবমানিতে
ভবেৎ কুব্জঃ কুনিঃ পঙ্গু মূর্ক মিন্ মিন এব।

সুশ্রুত।

শরীরস্থ বায়ু পিত্ত এবং কফ এবং মানসিক রজঃ, তম এই পাচটীকে বিকৃত অবস্থায় দোষ বলে। *

এই দোষদিগের প্রবলতা প্রযুক্ত যে সকল রোগ জন্মে তাহাদের দোষবল প্রবৃত্ত রোগ বলে। যথা জ্বর, অতিসার, উন্মাদ ইত্যাদি। ঐ সকল দোষবল প্রবৃত্ত রোগ ২টী শ্রেণীতে পরিগণিত। ১ম শারীর, ২য় মানস। যে রোগ মনকে আক্রমণ না করিয়া শরীরকে অধিক মাত্রায় আক্রমণ করে তাহার নাম শারীর। যথা জ্বর,অতিসার প্রভৃতি। যে রোগ শরীরকে অধিক মাত্রায় আক্রমণ না করিয়া মনকে সমধিক রূপে আক্রমণ করে তাহার নাম মানস। যথা উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি। শারীর রোগও স্থূলতঃ ২ শ্রেণীতে গণ্য হইয়া থাকে। যথা ১ম আমাশয়োৎপন্ন, ২য় পক্বাশয়োৎপন্ন অর্থাৎ অপক্ক বস্তুর পরিপাকের প্রাণাধার বলিয়া আমাশয় বলিয়া থাকে। *

নাভির নিম্ন স্থানে অগ্নে পাচকাগ্নির দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত বস্তুর অসারাংশ গুলি যাহা পরিশেষে পুরীষ মূত্র রূপে পরিগণিত হয়, এই স্থানকে পক্কাশয় বলে। যে রোগে আমাশয়স্থ ক্লেদক শ্লেষ্মা পাচকাগ্নির বিকৃতি প্রযুক্ত প্রাদুর্ভূত হয় তাহার নাম আমাশয়োৎপন্ন রোগ, যথা জ্বর বমন ইত্যাদি। পক্কাশয় দূষিত করিয়া যে রোগ প্রাদুর্ভূত হয় তাহার নাম পক্কাশয়োৎপন্ন, যথা গ্রহণী অতিসার ইত্যাদি। অতি বলিষ্ঠের সহিত দুর্ব্বলের বাহু যুদ্ধাদিবশতঃ শারীর যন্ত্রাদির বিলোড়ন ক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিনাশ বা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি যে সমস্ত আগন্তুক পীড়া উপস্থিত হয় তাহাদিগকে সংঘাতবল-প্রবৃত্ত বলে। এই শ্রেণীর পীড়া সমূহ আদিভৌতিক রোগ বলিয়া গণ্য। ইহাও স্থূলতঃ দুই প্রকার, ১ম শস্ত্রাদি কৃত, ২য় ব্যাঘ্রাদি প্রাণীকৃত। তরবারী বর্ষা প্রভৃতি শস্ত্রঘাতীর গুলি, লাঠী প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা আঘাত বা পর্ব্বত বৃক্ষাদি অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতন ইত্যাদি কারণে শারীর যন্ত্রাদি অতিশয় আহত হওয়ায়, আংশিক বিকৃতি প্রাপ্ত বা বিপর্য্যস্ত এবং বাতাদি দোষ পদার্থের প্রকৃতির অন্যথাভাব ঘটিলে তাহাকে শস্ত্রাদি-কৃত আগন্তুক রোগ বলে। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুক্কুর, সর্প প্রভৃতি জন্তুতে দংশন করিয়া কোন স্থান ক্ষত করিলে, তদ্দ্বারা শরীরের বিকৃতি এবং তাহাদিগের বিষ দ্বারা দেহের যে অন্যথাভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে এস্থলে ব্যাঘ্রাদিকৃত আগন্তুক রোগ বলা হইয়াছে।

---

* বাতঃপিত্তং কফঃ প্রোক্তঃশারীরো দোষ সংগ্রহঃ মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টৈ। রজশ্চ তম এব চ শরীর দূষণাৎ দোষঃ—বাগ্‌ভটঃ।

নাভেঃ স্তনান্তরং জন্তোরামাশয় ইতিস্মৃতঃ।

ভাবপ্রকাশ

চুলের কলপ।

(কবিরাজ শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ)

শিয়ালদহ ষ্টেশনের ১নং প্ল্যাটফর্ম্মে—অপরাহ্ণের "রাণাঘাট লোকালে", এক খানা দেড়া মাশুলের গাড়ীতে বসিয়াছিলাম। কামরায় ৬ খানি বেঞ্চ—তাহাতে আরোহীর সংখ্যা ১৮ জন। আমার ঠিক সম্মুখে—এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বিনোদ বিহারী বিদ্যাবিনোদের বিরাট বপু। তিনি হতাশ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছিলেন এবং পৌষ সংক্রান্তির জড়তাময়ী হিমানীর মধ্যেও শিথিল হস্তে কপালের ঘাম মুছিতেছিলেন।

আমিই প্রথমে কথা আরম্ভ করিলাম। কথা—প্রত্নতত্ত্বের। ক্রমে বিদ্যাবিনোদের মুখে প্রকাশ পাইল—নৈহাটীর শাস্ত্রী নাকি বৃদ্ধ বয়সে হিন্দুর চির উপাস্য শিব সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; তাঁহার গুরু গম্ভীর গবেষণায় সপ্রমাণ হইয়াছে—মহাযোগী মহাদেব সভ্যদেবতার স্বজাতি নহেন, তিনি একজন শক্তিশালী অনার্য্য পুরুষ। এরূপ অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত যে স্থবির ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীর লেখনী প্রসব করিতে পারে—এ ধারণা—আমার একেবারেই ছিলনা। আমি কোনও তর্ক করিলাম না। সহৃদয় শ্রোতার মত কেবল শুনিতেই লাগিলাম। একা বিদ্যা বিনোদ আর কতক্ষণ বকিবেন? সুতরাং তাঁহার আলোচনা—সমুদ্র শুক্ত বন্যার বারিকল্লোলের মত মন্দীভূত হইয়া পড়িল।

আমার পার্শ্বে বসিয়া এক ভদ্রলোক বিকট দাড়ীযুক্ত মুখে "চীনা বাদাম" চিবাইতেছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী। আমাকে আয়ুর্ব্বেদ কলেজের একজন অধ্যাপক জানিতে পারিয়া লোকটী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার "চর্ব্বের ব্যায়রাম আছে, যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়—আমি এমন কোন মুষ্টিযোগ জানি কি না? তাঁহার চীনা-বাদাম চর্ব্বণের ক্ষিপ্রতা দেখিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম—এ ভাবে চীনাবাদামের জোলাপ লইলে "চর্ব্বের ব্যায়রাম"—বিষাদের ব্যায়রামে পরিণত হইবে। তখন তাঁহার অবস্থাটা কৌরবনাথ দুর্য্যোধনের মত না হইয়া দাঁড়ায়।

এই সময় ট্রেণ আগড়-পাড়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ভাগ্যগুণে যে কয়জন আরোহী নামিয়া গেলেন, তাহার তিন গুণ লোক আমাদের কামরায় উঠিল। আমি রেল কোম্পানীর নিয়ম নির্দ্দেশের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। গাড়ীর গাত্রের কাষ্ঠফলকে শুভ্রোজ্জ্বল-হরপে লেখা ছিল—৩০ জন বসিবে। এত ভিড়েও কেহ আইন অমান্য করে নাই। ৩০ জন লোকই বসিয়াছিল, বাকী যাহারা উঠিয়াছিল—তাহারা বসিবার চেষ্টা না করিয়া—একবার

হইতে অন্দ্দার পর্য্যন্ত 'ঠেল মারিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। এই দণ্ডায়মান মানব-মহা-মণ্ডলের ভিতর আমি একখানি পরিচিত মুখ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই বহু পুরাতন ও সনাতন পুরুষের সঙ্গে সহসা কথা কহিবার আমার সাহস হইল না। এইখানে—ইঁহার একটু পরিচয় দিব। ইনি আমাদের চুঁচুড়া সহরের একজন সম্রান্ত ধনী অধিবাসী। বয়স—বৎসর তিরাশী; দাদা দীননাথ ধরের ভাষায় বলিতে হইলে—ইঁহার দেহের অবস্থা-এখন "তীরে—আসি"। তিন বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক দ্বাদশী দরিদ্র বালিকার কর ক্রয় করিয়াছিলেন। ভদ্র লোকটীর নাম আমি বলিব না। পাঠক! ইসারায় বুঝিয়া লউন। ইনি একজন প্রবীন লেখক। সমাজপতির "সাহিত্যে" ইঁহার রচনা একদিন সগৌরবে স্থান পাইত। "সাহিত্যপরিষদের" ত্রৈমাসিক পত্রে—প্রত্নতত্ত্ববিদ্রূপে এই বিশালকায় বৃদ্ধের আবির্ভাব। আগন্তুককে আমি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। চিনি চিনি করিয়াও যে চিনিতে পারি না—তুমি কে বট হে? তুমি কি আমাদের সেই! তবে কি আমি আজ আমার দীপ্ততার স্থির চক্ষুকেও অবিশ্বাস করিব? হায় বৃদ্ধ! তিন মাস পূর্ব্বে আমি যে তোমার উত্তমাঙ্গে—শারদ-শোভন শুভ্র কাশ-স্তবকের মত পক্ককেশ দেখিয়াছিলাম,—কে তাহাতে আজ প্রাবৃট্—কাদম্বিনীর গাঢ়-কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে? বৃদ্ধ আমার মনের ভাব বুঝিলেন, তাঁহার মুখে নিদাঘ-সন্ধ্যায় দিকচক্রবালে—বিদ্যুৎ বিকাশের ন্যায়—হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া—বৃদ্ধ বলিয়া ফেলিলেন—"আমি চুলে কলপ লাগাইয়াছি। অনেক কবিরাজের শরণাগত হইয়াছিলাম,—জলের মত টাকা খরচ করিয়াছিলাম,—কিন্তু কোন কবিরাজই আমায় ভাল কলপ দিতে পারেন নাই। শেষে—একখানা ইংরাজী খবরের কাগজে—এই কলপটীর বিজ্ঞাপন পড়িয়া কিনিয়া আনাই। ইহাতেই আমার শাদা চুল কালো হইয়া গিয়াছে। এখন আমি বোধ হয় জোর গলায় বলিতে পারি—আয়ুর্ব্বেদে এমন উৎকৃষ্ট কলপ নাই। এই বিলাতী কলপটীর নাম—'মর্ণিংষ্টার, আপনি লিখিয়া রাখুন, অনেক সময় কাজে লাগিবে।"

আমি আজীবন আয়ুর্ব্বেদের উপাসক, আয়ুর্ব্বেদের অনন্ত মহিমায়—বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান আমার কাছে এক হইয়া গিয়াছে। আমার সেই সব সুখ দুঃখ মন্থন ধন আয়ুর্ব্বেদকে—এই স্বর্গমোক্ষ বৃদ্ধ—আজ আমারই সম্মুখে উপহাস করিতেছে? মরণোন্মুখের মাথার শাদা চুল কাল হয় নাই বলিয়া—সনাতন আয়ুর্ব্বেদের অপূর্ণতা দেখাইয়া দিয়েছে? মূঢ়তার এতস্পর্দ্ধা! রোষে-ক্ষোভে—আমার হৃদয় ফাটিয়া গেল। দেশের উপর অভিমান হইল। কলপের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিল, যে কলপ অবিষ্কার করিয়াছে—তাহার প্রতিও মনে একটা বিজাতীয় ঘৃণা আসিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—মানুষের জীবনে যে এত কুহক, এত মায়া, এত সৌন্দর্য্য, তাহার পরিণাম কি? মৃত্যু। মরণের সম্মুখে জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইবে। আমরা হিন্দু,।

মৃত্যু আমাদের পক্ষে ভয়াবহ নহে, ঔৎসুক্যপূরণীয় কৌতূহল লইয়া—হিন্দু বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতে চাহেনা। হিন্দু চায়—মৃত্যু, অনিত্যের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যের ক্রোড়ে স্থান। হায়! জীবনের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা যেন মরণের ভাবনা ভুলিয়া না যাই। কক্ষ হইতে যেন কক্ষান্তরে না নিক্ষিপ্ত হই। কেন্দ্রস্থ হইয়া যেন স্থির থাকিতে পারি। আমাদের বিজ্ঞান যতক্ষণ ছিল—ততক্ষণই জীবন; মৃত্যু আসিলে, রাত্রি আসিবে। "জীব জগৎ" বলিয়া এই বিরাট বিশ্ব প্রদর্শনী ক্ষেত্রে—বয়সের স্বতন্ত্র বিভাগ—ক্রমস্তর আছে। হিন্দু ইহা চিরদিন বুঝে,—এমন হিন্দুর দেশে—কোন্ সৃষ্টি কুশলী প্রতিভা কলপের আবিষ্কার করিবে? হিন্দুর কর্ম্মক্ষেত্রে—চুলের কলপে কাজ কি? মানুষ চুলে কলপ দেয় কেন? কলপের অর্থ কি শাদাকে কাল করা, বয়সকে গোপন করা, যৌবনাতীতের পক্ষে যৌবনে ভাণ করা। অতএব কপটতাই কলপের মূল! গৃহে—কিশোরী বধূ বিবাজিতা, হৃদয়ে—যৌবনের সুখ লালসা বর্ত্তমান, অথচ বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়; এই জন্যই চুলে কলপ দিবার প্রয়োজন। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লোকে যেন ত্রিশের বেশী বলিয়া ধরিতে না পারে। যৌবন নাই; যৌবনের উদ্দাম তেজ উন্মাদনাও নাই, তথাপি বার্দ্ধক্য স্বীকারে অসম্মতি, এরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই চুলে কলপ লাগাইবে। উপস্থিত জরা ত্যাগ করিয়া বিগত যৌবনের জন্য লালায়িত—কলপ তাহারই বিকাশ মাত্র। সংসারের ছায়ান্ধকারে—আপনার সঙ্গেও লুকোচুরি খেলা!

দাঁত পড়িয়া গেলে—দাঁত বাঁধাইবার কারণ কতকটা বুঝিতে পারা যায়। চর্ব্বণের সুবিধা হয়, কথাবার্ত্তা কহিবার ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু চুলে কলপ দিবার সার্থকতা কি? কেবল প্রবঞ্চনা! আপনাকে প্রবঞ্চনা, পরকেও প্রবঞ্চনা। কলপের একমাত্র উদ্দেশ্য—প্রবঞ্চনা। হায় বৃদ্ধ! আজ তুমি পক্ক কেশে কলপ মাখিয়াছ, কিন্তু যম তাহাতে ভুলিবে কি? যৌবন আর ফিরিবে কি? বয়স স্থির হইয়া থাকিবে কি? তবে শুভ্র কেশ দেখাইতে তুমি কুণ্ঠিত হও কেন? শাদা চুলের কি শোভা নাই? শ্বেত কি সৌন্দর্য্য হীন? আমাদের ভারতবর্ষে—প্রাচীন ব্যক্তি সকলেরই পূজনীয়। প্রাচীনের পরামর্শে—সংসারের সর্ব্ববিঘ্ন বিনষ্ট হয়, প্রাচীনের পদপ্রান্তে যুবক মাথা হেঁট করে,—আমাদের আবার পাকাচুল ঢাকিবার চেষ্টা কেন? এ দেশে কলপের আদর কখনই ছিল না। যযাতির উপাখ্যান পড়িয়া দেখ—চিরযৌবন চিরসুখের উপায় নহে। যযাতি বৃদ্ধ হইলেও চুলে কলপ দেন নাই, লোল চর্ম্মে—অনুলেপন মাখেন নাই, আস্য গহ্বরে কৃত্রিম দন্ত ধারণ করেন নাই,—তবুও প্রকৃত যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সে যৌবন সহস্র বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। যৌবনে তৃপ্তি কোথায়? তৃষা—কখনও শান্ত হয় না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না। জরা—যৌবনের স্বাভাবিক নিবৃত্তি। যৌবনের সমস্ত অশান্তি উপদ্রব অপনীত হইয়া বার্দ্ধক্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা

আনিয়া দেয়। চাঞ্চল্য—স্থৈর্য্যে পরিণত হয়। কালের নিয়ম কি কলপে ফিরিতে পারে?

জগতে যখন সত্যের সমাদর ছিল, সরলতার সম্মান ছিল, তখন কেহ কেশে কলপ দিত না। যৌবন গেলে তখন যৌবনের সুখলালসাও তিরোহিত হইত, বার্দ্ধক্যের সঙ্গে অনাবিল শুচিতা দেখা দিত, বিশ্বব্যাপ্ত দুরতিক্রম্য প্রলোভন রাশির মধ্যে আপনার পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য শাদা চুলে কেহ কালি লেপিত না। পাকাচুল মানুষকে পরিপূর্ণ এবং পবিত্র করে। জীবনের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ আনিয়া দেয়। পাকাচুলে—হৃদয় তাহার অন্ধ রুদ্ধ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিশ্ব চরাচরে ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত সৃষ্টির ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া যায়। পাকা চুলে—প্রেমের প্রগাঢ় নিবিড় অনুভব, তাহাতে তাহাতে আড়ম্বর বা ভঙ্গী নাই পুণ্যের পবিত্রতায় তাহা উন্মুক্ত উদার আনন্দ ময়। কাঁচাচুলের শোভা মাধুর্য্য মদিরতায় মিশ্রিতঃ—বসন্তের উৎফুল্ল কোলাহলে ক্লান্ত। পাকাচুলের সৌন্দর্য্যে সমস্ত শরতের জ্যোৎস্না ঢালা, কামনা করের আয় প্রকাশ! সমাজ যখন স্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইত, লোকে তখন বয়স বা বার্দ্ধক্য গোপন করিবার কল্পনাও করিত না। বাল্যে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে সংসারাশ্রম, বার্দ্ধক্যে বিষয় বুদ্ধির বিরাম, তখন ছলনা প্রবঞ্চনার আবশ্যকতাই ছিল না। ক্রমে সমাজ ও জীবন সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের প্রতি আস্থা শিথিল হইতে লাগিল, ভোগ লালসা প্রবল হইল, ষোড়শোপচারে পঞ্চবাণের পূজা আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ বালিকা ভার্য্যা গৃহে আনিল, পলিতকেশ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিল, তাহার মনে প্রশ্ন উঠিল, শাদাচুল কি কাল করা যায় না? যায় বই কি। চুলের কলপ অমনি আবিষ্কৃত হইল। সংসারে ও সমাজে কৃত্রিমতা ও কপটতা আসর জাঁকাইয়া বসিল।

তখন চুলের কলপ গোপনে বিক্রয় হইত। অনেক অর্থব্যয় করিয়া শাদাকে কাল করিতে হইত। এখন কাগজে কাগজে কলপের প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন, গলিতে গলিতে অনায়াস লভ্য কলপের দোকান। ক্রেতা বিক্রেতা কাহারও লজ্জা নাই! লোক বুঝিতে পারিল যে দেশে বাহাত্তুরে বুড়ার জন্য বালিকা বধূ পাওয়া যায়—সেদেশে কলপ পাওয়া যাইবে না কেন?

দুঃখের বিষয়—যে সকল দেশের অনুকরণে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে এত বিলাসিতা বাড়িয়াছে, সে সকল দেশে বার্দ্ধক্যে কেবল যৌবনের ইন্দ্রিয় প্রবণতাই নাই, আরও অনেক জিনিস আছে। যৌবনের উদ্যম আছে, উৎসাহ আছে, একাগ্রতা আছে, স্বার্থশূন্য পরিশ্রমের আদর্শ দৃষ্টান্তও আছে। আমাদের দেশে কি আছে? কেবল পাকাচুলে কলপ দেওয়ার প্রথা আর মিথ্যা প্রবঞ্চনা ভণ্ডামী ও কপটতা। হায় প্রতারণা পরায়ণ প্রেম পিয়াসু বৃদ্ধ! তোমরা শাদা চুলকে যেমন কাল করিবার কৌশল শিখিয়াছ, কাল মুখকে তেমনি শাদা করিতে শিখিলেনা কেন? তাহা হইলে যে অনেক লাভ ছিল। কিন্তু কৈ, সে যে, অসম্ভব; কত সাবান কত পাউডার, কত ডায়মেটোন মিল্ক অফ্ রোজ কিছুতেই ত কাল মুখ শাদা হইল না। ক্যান্থিডরও কোন কাজে আসিল না।

আমাদের এক জনের মুখ ও গোঁবার মুখের মত হইল না। হইবে কেন? এ মুখ যে আগুণে পুড়িয়া কাল হইয়াছে। শত্রুর সোণার লঙ্কা দগ্ধ করিয়া এ মুখ তো কাল হয় নাই, আত্মগৃহদাহের কলঙ্ক কালি এ মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। বল দেখি ভাই! চুলের কলপ মুখে মাখিলে কেমন হয়? তাহাতে কি জাতীয় প্রাচীনতা বজায় থাকে?

আমার মনে অহঙ্কার আছে—আমরা অন্যের চেয়ে সনাতন ও প্রাচীন। কিন্তু সে অহঙ্কার টুকুও বুঝি ঘুচিয়া যায়। আমাদের মধ্যে যাঁরা বড়, তাঁরা যে যৌবনের ভাণ ধরিয়াছেন। শুভ্রকেশ লইয়া, বার্দ্ধক্যের বিজ্ঞতা বহুদর্শিতায় তন্ময় হইয়া আর যে কেহ শেষ জীবন শান্তিতে কাটাইতে সম্মত নহেন। এখন যে দিকে যাই—সেই দিকেই দেখি গত যৌবনের জন্য অনুশোচনা। যৌবন নাই, যৌবনের প্রাণশূন্য প্রতিমূর্ত্তি আছে। যৌবনের বল নাই, বিভ্রম আছে। যৌবনের দৃঢ়তা নাই, চাঞ্চল্য আছে; যৌবনের উৎসাহ নাই, লালসা আছে। চারিদিকেই দেখি চুলের কলপ; সব ঝুটা, সব মিথ্যা, সব প্রবঞ্চনা, সব অসার। বিলাসের দাস। যদি সময় থাকিতে একটু সতর্ক হইতে, যদি যৌবনের চিহ্ন থাকিতে থাকিতে আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন তন্ত্রের শরণ লইতে, তাহা হইলে যে তোমার যৌবন স্থির থাকিত, অকাল বার্দ্ধক্যে কখনও তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িতে না। শাদা মাথায় কলপ মাখিয়া—দিনের আলোয় সঙ্ সাজিতে না। আয়ুর্ব্বেদে এমন ঔষধ আছে—যাহার প্রসাদে তোমার দেহে জরা আক্রমণ করিত না। বিশ্বামিত্রের ত্রিবিদ্যা সাধনের মত—অনায়াসেই তুমি ঘরের তৃতীয় পক্ষকে শাসন করিতে পারিতে।

যে ভ্রম করিয়াছ, তাহা তো সংশোধন করিতে চাও না। তবে চালাও। কলপ দিয়া শাদা চুলকে কালো কর, বাঁধানো দাঁত বাহির করিয়া—যুবকের মাঝে বসিয়া কৌতুক হাস্যে মত্ত হও, বর্ষীয়সী বনিতার বিয়োগান্তে—বংশধর বর্ত্তমানেও বালিকা বিবাহ কর, সংসারের চ'খে ভেল্কী লাগাও, যমকেও ফাঁকি দাও, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ বড় তমসাচ্ছন্ন। কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই! শমন তোমায় ছাড়িবে না, প্রতারক বলিয়া আমরাও তোমায় গালি দিব। অস্তের সূর্য্যে কি উদয়ের আলোক শোভা পায়? গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই তুমি নিজে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছ। এই কি তোমার কলপের মহিমা? ঐ শুন কবি তোমায় সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন।

"—ওরে স্থবির! দুঃখ কেন, এলো যা হয় জরা
ভেবে দেখ, বাঁচার চেয়ে কত সহজ মরা।"

আর্য্য চিকিৎসা।

[শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, চট্টোপাধ্যায় বি-এল]

ভারতের এই ঘোর অন্নবস্ত্রের কষ্টের দিনেও মহার্ঘতা'র দিনে চিকিৎসা বিরাট এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ের প্রতীকারের বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে না।

রোগ আমাদের দেশে বড় বেশী বেশী হইয়াছে এমনকি আহার্য্য সংগ্রহ যেমন দৈনিক কার্য্যের মধ্যে প্রয়োজন, চিকিৎসক দেখান ও ঔষধ সংগ্রহ করাও সেইরূপ বা তদপেক্ষা বেশী আবশ্যকীয় কার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশ যেরূপ দরিদ্রতার চরম সীমায় আসিয়াছে ও লোক যেরূপ স্বাস্থ্যহীন হইতেছে তাহাতে চিকিৎসা—স্বাস্থ্যের উপযোগী ও অল্পব্যয়ে প্রাপ্য না হইলে যে আমাদের জাতির লোপ অনিবার্য্য সে বিষয় কেহ চিন্তা করেন না। পূর্ব্বের ন্যায় চিকিৎসক নির্লোভী নন। এখন ডাক্তার কবিরাজ হাকিমের কলিকাতার সৌধে বিলাস বাসের খরচ, মোটর গাড়ীর খরচ—সবই রোগীর উপর নানারূপে আসিয়া পড়িতেছে, সেই জন্য অনেক গরীব চিকিৎসা করাইতে না পারিয়া অকালে কালকবলে পড়িতেছে। পল্লীগ্রামেত চিকিৎসক নাই বলিলেই হয়। হাতুড়ে বৈদ্য ত আরও ভীষণ, কালের দ্বিতীয় মূর্ত্তি ধরিয়া অকালে বহু লোককে যম সদনে প্রেরণ করিতেছে। এখনও অনেক সুচিকিৎসকের আবশ্যক। সকলেরই ইংরাজী চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি। কিন্তু সে শিক্ষা কোথায় পাওয়া যায়। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল কলেজে, ক্যাম্বেল স্কুল প্রভৃতিতে প্রবেশ করা কি ব্যাপার তাহা অনেকেই জানেন। বি, এস সি, এম, এস, সি, —ভাল ভাল মুরুব্বি, এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয়ে তাহার পর কাহারও ভাগ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিল কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। যাহার ঘটিল না তিনি হতাশ হইয়া চিকিৎসা শিক্ষা ত্যাগ করিলেন আর যাহার ভাগ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিল তাহার বিপুল অর্থব্যয়, শারীরিক পরিশ্রম ৬ বৎসরের স্থানে কাহারও ৮ বৎসর কাল শিক্ষালাভ, ব্যাপারতো এই, তাহার পর কেহ পাশ হইয়া বাহির হইলেন, আর যিনি মধ্যেই বহিষ্কৃত হইলেন তিনি ষাঁড়ের গোবর হইয়া আসিলেন ঐ সব দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের দেশের লোক ইংরাজি চিকিৎসার পক্ষপাতী। দেশের বড় লোকেরাও দু চারটি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপনও উহার সুচারুরূপে সঞ্চালনও করিতেছেন না ও কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজগণ নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছাত্রগণকে সংশিক্ষা নিজের অভিজ্ঞতার ফল জানাইতেছেন না। ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্দ্দশা কি হইতে পারে। যাহারা ইংরাজী চিকিৎসাগারে স্থান না পান তাঁহারা কেন যে আয়ুর্ব্বেদোক্ত বা হাকিমী চিকিৎসা শিক্ষা করিতে

প্রয়াস পান না তাহা আমি এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একজন কলিকাতা প্রবাসী আমেরিকান বলিয়াছেন যে, ভারতের অভ্যুদয় দুইটি কার্য্যের দ্বারা হইবে; প্রথম কৃষিকার্য্যের উন্নতি, দ্বিতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রচলন। আমাদের দেশে দুইটীর প্রতিই লোকের দৃষ্টি নাই। তাহার নানা কারণ। চিকিৎসক পাইলেও ঠিক ঔষধ মিলে না, ঔষধ পাইলেও রোগী বা তাহার আত্মীয়স্বজন সহজপ্রাপ্য বহু মূল্য ঔষধ বরং দিবে কিন্তু একটু পরিশ্রম দ্বারা অল্প মূল্য বা বিনামূল্যে প্রাপ্য ঔষধ দিবেনা। একবার আমার কোন বন্ধুর পুত্রের সর্দ্দি কাশী হওয়ায় আমি তাঁহাকে বলি যে, আপনার পুত্রকে বাসকপাতার রস মধু দিয়া প্রাতে খাওয়ান, সর্দ্দি কাশী ভাল হইয়া যাইবে। তিনি অত কষ্ট কে করে বলিয়া এক শিশি সিরাপ অফ্ বাকস্ ৸৹ আনা দিয়া কিনিয়া আনিয়া পুত্রকে সেবন করাইতে লাগিলেন; তাহাতে বড় ফল হইল না, কিন্তু আর একটি লোক এই কথা শুনিয়া বাকস পাতার রস ও মধু সেবন করাইয়া তাঁহার কন্যার সর্দ্দি কাশীর উপশম করান। ফল কথা এ দোষ আমাদের খুব যে, আমরা দুই আনা পয়সা খরচ করিয়া ৭ দিনের পাঁচন সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হই, কিন্তু দুই টাকা দিয়া শিশির তৈয়ারী ঔষধ কিনিতে কুণ্ঠিত নহি।

এখন দেখিতে হইবে কোন প্রকার চিকিৎসা আমাদের দেশের উপযোগী? আমি যদি বলি যে, কবিরাজী বা হাকিমী চিকিৎসাই ভাল, অমনি আমাকে অনেক লোক গালাগালি করিবেন, কিন্তু সেই গালাগালি দিবার পূর্ব্বে একবার বিচার করিয়া পাঠক মহাশয় দেখুন দেখি, কোন্ চিকিৎসা আমাদের উপযোগী? অনেক বলিবেন, ম্যালেরিয়া হইয়াছে কুইনাইন না দিলে কি করিবে? আমি জিজ্ঞাসা করি, কুইনাইন দিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ নষ্ট করিলেন, কিন্তু কুইনাইন দ্বারা শরীরের যে অনিষ্ট হইল, তাহা যায় কিসে? কুইনাইন সেবনের অনিষ্টকারিতা কিঞ্চিৎ পাচন ভিন্ন নষ্ট হয় না ইহা বহুবার দেখা গিয়াছে ও অনেকের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও আছে, সেই জন্য এ বিষয় আর বেশী বলিলাম না। আমাদের শাস্ত্রে আছে:—

"যস্য দেশস্য যো জন্তু-তজ্জং তদৌষধম্ হিতম্"

যে ব্যক্তি যে দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন সেই দেশ জাত ঔষধই তাঁহার পক্ষে হিতকর। ডাক্তারি ঔষধ অধিকাংশই ইয়োরোপে প্রস্তুত। তাহা শীতপ্রধান দেশে ও সেই দেশের লোকের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। তাহার পরিমাণও সেই দেশের লোকের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত। কাজেই উহা আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশের লোকের নিকট উগ্রবীর্য্য হইয়া উঠে ও তাহাতে উপকারের সহিত অনিষ্ট সাধনও করে। মনে করুন, আপনার দেহে একটি মশক বসিয়া দংশন করিতেছে। আপনি তাহাকে তিন উপায়ে নষ্ট করিয়া আপনাকে দংশন জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে পারেন। একটি সূচি লইয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সূচিটি ঠিক না লাগিলে শরীরে আঘাত লাগিতে পারে। ইহার সহিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনা হইতে পারে, অনেক পড়িয়া অনেক ভাবিয়া ঠিক রোগ নির্ণয় করিয়া যে

ঔষধে ঐ সকল রোগের লক্ষণ মিলে তাহার প্রয়োগে ঐ রোগ উপশমিত হইতে পারে। এক বিন্দু ঔষধে মন্ত্রের ন্যায় রোগ সারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু সূচি লইয়া ক্ষুদ্র মশকের দেহ বিদ্ধ করা যেমন সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক সেই প্রকার রোগ নির্ণয় ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্ব্বাচন করাও বিশেষ পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার আবশ্যক। আবার ঔষধও ঠিক মত তৈয়ার ও ঠিক ক্রম ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়াও আবশ্যক। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন আমার হাতে, কিন্তু উহার প্রস্তুত ও অবিকৃত অবস্থায় রাখা অন্যের হাতে ও সম্পূর্ণ আমার অজ্ঞাত। দ্বিতীয় উপায় মশককে এক চপেটাঘাত করা, উহাতে মশক ত মরিবেই, কিন্তু যাহার উপর ঐ চপেটাঘাত পড়িবে তাহারও মশক দংশন অপেক্ষা যাতনা অত্যধিক হইবে। মশকের দেহস্থ বিষও আমার শরীরে লাগিয়া লোমকূপদ্বারা শরীরে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই উপায়ের সহিত এলোপ্যাথিক চিকিৎসার তুলনা হইতে পারে। এলোপ্যাথিক ঔষধ যদি বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের দেশের লোকের উপযোগী মাত্রায় প্রয়োগ করেন, তবে অনেক ব্যাধির ভীষণ প্রকোপ অবস্থায় খুব ক্রিয়া করে, তবে সেই ক্রিয়ার স্থায়িত্ব বিবেচ্য। বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক ইংজেকসান-চিকিৎসা অত্যন্ত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত প্রযুক্ত না হইলে অনেক সময় বিপরীত ফল প্রদান করে। তৃতীয় উপায় মশক নিরাকরণের জন্য কোন বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতাক্ত তুলার গুলি দ্বারা মশককে আবৃত করা, উহাতে মশকটি ঐ তুলায় লাগিয়া যায় ও তুলার সহিত যে ঘৃত থাকে তাহাতে উহার দংশন জনিত জ্বালা ও বিষ নিবারণ করে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধও সেই প্রকার রোগ নিরাময় করে এবং ঔষধ জনিত কষ্টও হয় না। তবে ইহাতেও বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। রোগ নির্ণয় ও ঔষধ নির্ব্বাচন ও উপযুক্ত ঔষধও ইহাতে তদ্রূপই অত্যাবশ্যক।

এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে রোগের প্রবলাবস্থায় হোমিওপ্যাথিক বা এলোপ্যাথিক ঔষধ ও ইনজেকসান উপযোগী হইলেও কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা যে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী ও সস্তা সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় উপযুক্ত ডাক্তারগণ তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত ঔষধ না পাইলে কিছুই করিতে পারেন না। ঔষধের জন্য তাঁহারা অন্যের মুখাপেক্ষী ও ঔষধ ঠিক প্রস্তুত হইল কিনা ও তাহা পুরাতন হওয়ায় হীনবীর্য্য হইল কিনা, জানিবার উপায় একরকম নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কবিরাজ বা হাকিমগণকে চিকিৎসা শিক্ষা কালেই গাছ গাছড়া চেনা ও ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা করিতে হয়। তাহার পর চিকিৎসা—শাস্ত্রমত অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে নিজে কতকগুলি প্রচলিত ঔষধ তৈয়ার করিয়া চিকিৎসা করিতে বসিতে হয়। চিকিৎসায় ঔষধের উপকারিতার হ্রাসবৃদ্ধি যেমন রোগীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তেমনি চিকিৎসকের রোগ

নিবারণের ইচ্ছা—শক্তির উপর নির্ভর করে। দ্রব্যগুণের সঙ্গে যে আর একটা আভ্যন্তরিক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। যে ঔষধ ধাতুভস্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মসলাদি চূর্ণ করিয়া পাককার্য্য পর্য্যন্ত নিজ হস্তে শুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিতে হয় তাহার ফল যে কত সুন্দর তাহা কি আর বলিতে হইবে? এল, এম, এস; এম, বি; এম ডি; পাশ করিয়া ডাক্তার বাবু হ্যাটকোট লাগাইয়া মোটরে চড়িয়া চিকিৎসা করিতে গেলেন। খুব আড়ম্বর করিয়া শরীরের যথা স্থানে ষ্টেথেসকোপ প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া দেখিয়া রোগীর জন্য প্রেসক্রিপসান লিখিয়া দিলেন, কিন্তু এমন ঔষধ দিলেন যে সহজে বা বাথগেট ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া গেল না বা কোথাও পাওয়া গেল না, কেহ বলিলেন,—উহা নূতন ঔষধ। বিলাত হইতে আসিতেছে, এখনও পৌঁছায় নাই, অমনি ডাক্তার বাবুর বাহাদুরির সুনাম পড়িয়া গেল, এ দিকে রোগী রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের লোক এমনিই মূর্খ যে, একজন বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকিমকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকটে যে ঔষধ আছে বা ঘরের পাশে যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা দিবার কোন চেষ্টা করিলেন না।

এ বিষয়ে একটি ঘটনা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না। আমাদের গ্রামের নিকট একটি গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বিরাম জ্বর হয়, সেই জ্বর ১৭ দিন ভোগ করার পর তাঁহার প্রস্রাব রোধ হইয়া যায়। একজন ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রস্রাব রোধের পর সেই রোগী কতকটা অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ডাক্তার বাবু আসিয়া বলিলেন যে ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইতে হইবে, কিন্তু রোগী খুব দুর্ব্বল, এবং প্রবল ও তাঁহার নিকট তেমন ক্যাথিটার নাই, তখন রোগীকে অতিকষ্টে সামান্য মত ঔষধ খাওয়ান চলিতেছে। তিনি এক রকম জবাব দিয়া চলিয়া গেলে একজন কবিরাজকে ডাকা হইল। তিনি সব দেখিয়া শুনিয়া পুকুর হইতে একটী ব্যাং ধরিয়া আনিতে বলিলেন। সেই ব্যাংটি রোগীর নাভির নীচে রাখিয়া তাহার উপর একটা বাটি চাপা দিয়া কবিরাজ মহাশয় রাখিলেন, কিছুক্ষণ পরে রোগী প্রচুর প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া ফেলিল ও জ্ঞান আসিল ও ক্রমশঃ সেই কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিল। এখন পাঠক মহাশয় বুঝিয়া দেখুন কোন্ চিকিৎসা আমাদের বিশেষ উপযোগী?

আমার একজন বন্ধু ডাক্তার এম, বি পাশ। খুব ভাল চিকিৎসক বলিয়া খ্যাত ও গভর্ণমেণ্ট পেন্‌সনার, তাঁহার পা মচকাইয়া যায়, তাহাতে খুব কষ্ট পান, আমার বাড়ীতে রোগী দেখিতে অতিকষ্টে আসেন, আমি বলিলাম, আমার নিকট মহামাষ তৈল আছে, আজ রাত্রে শুইবার সময় বেশ করিয়া মালিশ করাইয়া আকন্দ পাতা দ্বারা সেঁক করাইয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া দিবেন। তিনি তদ্রূপ করায় বলিলেন যে "আমার পায়ের ব্যথা একদিনে অর্দ্ধেক সারিয়া গিয়াছে। উক্ত তৈল for Superior to my Echthiol Belledona ointment মলম হইতে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। ঐ তৈলে যে কেবল

আমার বেদনা নিবারণ হইতেছে তাহা নহে, শুইবার সময় আমার এত পা জ্বালা করে ভিজা গামছা পায়ে জড়াইয়া শুইতে হয়। উক্ত তৈল পায়ে মালিশ করার বেদনার উপশম ও জ্বালার শান্তি উভয়ই হইয়াছে।

আমার আর একটি ডাক্তার বন্ধু এল, এম, এস ৩৪ দিন গৃধ্রসী-বাতে শয্যাশায়ী অবস্থায় নানাপ্রকার ঔষধ ইন্‌জেক্‌সানাদিতে উপকার না পাইয়া আমার নিকট মহামাষ তৈলের সন্ধান পাইয়া উহার কিঞ্চিৎ লইয়া কোমরে দুই দিন মালিস ও সেকের পর এক মাইল পথ হাঁটিয়া যাইতে সক্ষম হন।

কবিরাজি তৈলের যে কি গুণ তাহা যিনি যথার্থ শাস্ত্রীয় মতে প্রস্তুত তৈল ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন। তৈলে ও ঘৃতে পাককৃত ঔষধের কিছু অংশও থাকে বলিয়া বোধ হয় না, কেবল সকল দ্রব্যের শক্তি গ্রহণ করিয়া লোমকূপ দ্বারা শরীরে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত উপকার হইয়া থাকে। এমন ঔষধ কি আর পাওয়া যায়?

আমাদের শরীরে অহরহঃ ক্ষয় কার্য্য চলিতেছে, উহা পূরণ না হইলেই আমাদের আয়ুক্ষয় এবং অকালমৃত্যু হয়। সহজ শরীরে যে ক্ষয় সাধিত হয় রোগের শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ ও ঘন ঘন হওয়ায় ঐ ক্ষয় ক্রিয়া আরও বেশী হয়। সেই জন্য রোগের ঔষধের সঙ্গে ঐ ক্ষয় ক্রিয়ার হ্রাস করার চেষ্টা না করিলে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয়। হোমিওপ্যাথিক বা অ্যালোপাথিক ঔষধে উহার পূরণ হয় না বলিয়া ডাক্তারেরা নানা প্রকার তৈয়ারী খাদ্যের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাহাতে কখনও কখনও অনিষ্টও হয়। রোগের সময় যেমন ঔষধের আবশ্যক, তেমনি সুপথ্যও আবশ্যক। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে রোগ নিবারণের শক্তি ও আহার্য্য ক্রিয়া দ্বারা শরীরের ক্ষয় পোষণের ক্রিয়া যুগপৎ সাধিত হয়। অধিকাংশ লৌহ ঘটিত ঔষধ এই কার্য্য সাধন করে। ডাক্তারি লৌহে কোষ্ঠকাঠিন্য করে, কেবল ferration Albuminatedtror বলিয়া ততটা করে না, কিন্তু কবিরাজী শোধিত লৌহ অমৃত তুল্য। উহাতে কোষ্ঠ কাঠিন্য না হইয়া কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। তাহা ছাড়া স্বর্ণ ঘটিত ঔষধে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত তৈলে রোগ নিবারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় নিবারণ যুগপৎ হইয়া থাকে। অনেক পাচনে খাদ্যের কার্য্যও করিয়া থাকে। চ্যবনপ্রাশ, অমৃতপ্রাশ ঘৃত, অশ্বগন্ধাঘৃত বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত—গরম দুগ্ধ সহ সেবনে কি সুস্বাদু যাঁহারা সেবন করিয়াছেন তাঁহারাই বলেন এবং তাহাতে রোগ নিবারণ ও শরীরের পুষ্টিসাধন যে পরিমাণে করে, তেমনটি বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন ঔষধে করিতে পারে না। কড্‌লিভার অয়েল খাইতে কত দুর্গন্ধ; তাহার সহিত চ্যবনপ্রাশের স্বাদের ও গুণের তুলনা হয় না।

ধনী-নির্ধন, রোগী-নীরোগ—সকলের নিকট আমার প্রার্থনা যে, যাহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের বহু প্রচলন হইয়া দেশকে দুঃখ দারিদ্রতা হইতে রক্ষা করে তাহার জন্য চেষ্টা করুন। যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে শবব্যবচ্ছেদ, শস্ত্র চিকিৎসা, শল্য চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, ছাত্রদিগকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। আর

মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতিতে যাঁহারা স্থান না পাইয়া হতাশ হইয়াছেন তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত ও চকিত দেশকে প্রাচ্য চিকিৎসা বিদ্যায় পুনরায় উন্নত করিয়া লুপ্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করুন। আমাদের যে সব বিদ্যা লোপ হইয়াছে পাশ্চাত্যশাস্ত্র হইতে তাহা লইয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানকে পূর্ণ করিয়া দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য উন্নতি কল্পে ছাত্রগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। একলব্যের পণের দিকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য কলেজে প্রবেশে ভগ্নমনোরথ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করুন। ফল কথা যিনি যত রকমে পারেন, যাহাতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেশের রোগ নিবারণে সক্ষম হয় তাহার চেষ্টা করুন। ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা, গোপালন, গোসেবা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জীবনকে সুখী করিয়া "ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণাং আরোগ্যমূলমুত্তমম্" এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করুন ও আপন আপন গৃহের নিকট বা বাগানে বা কলিকাতার ছাদের উপরে টবে টবে ভেষজ দ্রব্য সকল যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিয়া রাখুন। করজোড়ে সকলের নিকট আমার এই অনুরোধ।

মোদক রহস্য।

(সম্পাদকীয়)

শ্রীমদনানন্দ মোদক নামক ঔষধটি বিজ্ঞাপনের মাহাত্ম্যে অধুনা সর্ব্বজন পরিচিত। বহু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা খুলিলেই এই মোদকটির পরিচয় পাওয়া যায়। কেহ কেহ চারি টাকা, তিন টাকা সেরেও ইহা বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, কলিকাতা সহরের রাজপথে, ফিরিওয়ালার কল্যাণে সাধারণে দুই চারটি পয়সা দিয়াও ইহা কিনিতে পাইতেছেন। পানের দোকানে, মনিহারি দোকানেও ইহা দুই চারিটি পয়সা দিলে পাওয়া যায়। ফলে আয়ুর্ব্বেদের এরূপ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে যেরূপ অর্থাগমের পথ পরিষ্কৃত করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ ইহার অবাধ প্রচলনের জন্য ইহা দ্বারা সাধারণের অনিষ্ট ও হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই জন্য এই ঔষধটির সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিব।

এই ঔষধটীর প্রধান উপাদান হইল সিদ্ধিবীজ। এই ঔষধটি প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির প্রয়োজন হয়—পারদ, গন্ধক ও লৌহ—ইহাদের প্রত্যেকটি ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, আমলকী, ছোট এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামনহাটি, শুঁঠ, নাগেশ্বর,

কাঁকড়াশৃঙ্গী, তালিশপত্র, কিসমিস, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারু-চিনি, ধনে, গজ পিপুল, শঠী, বালা মুতা, গন্ধ ভাদুলে, ভূমি কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দ মূল, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর বীজ বৃদ্ধদারক বীজ ও সিদ্ধি বীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া শতমূলীর রস দ্বারা বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করত পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে, তৎপর তাহার সহিত শিমুল মূল চূর্ণ ১২৮০ তোলা এবং সিদ্ধি চূর্ণ ৩১৮৵০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিবে, তদনন্তর সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি লইয়া প্রথমতঃ ছাগদুগ্ধ সহ উক্ত চিনি যথা নিয়মে পাক করিয়া লইবে। তৎপরে নামাইয়া উপরোক্ত চূর্ণ ঔষধ গুলি তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পশ্চাৎ দারু-চিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ এবং ঘৃত ও মধু অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে।

উপরে যে দ্রব্য গুলির ফর্দ্দ দেওয়া হইল, তাহার মূল্য কত পাঠক যদি বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এই মোদক তিনটাকা, চারি টাকা সেরে এবং ফিরিওয়ালার হাতে দুইচারি পয়সায় কিরূপ ভাবে বিক্রয় হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিবেন। এখন অন্যান্য জিনিসের মত কবিরাজী জিনিসেরও যে দাম বাড়িয়াছে, সে কথা বোধ হয় না বলিলেও চলিবে। সর্ব্বাপেক্ষা এই মোদকের প্রধান উপাদান সিদ্ধির মূল্য আগে ছিল তিনটাকা চারিটাকা সের, এখন সেই সিদ্ধির মূল্য দাঁড়াইয়াছে ২০৲ কুড়ি টাকা সের। এ অবস্থায় ইহা ফিরিওয়ালারা নাম মাত্র মূল্যে কেমন করিয়া বিক্রয় করিতে পারে তাহা পাঠকই অনুমান করুন।

তা' ছাড়া এই মোদক প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থায় শাস্ত্রে লিখিত আছে—

ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈবচ।
হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চর্য্য হুতাশনে সমর্পয়েৎ॥
ততোঽভিমন্ত্রিতং। ওঁং হ্রীং শং সং অমৃতং
কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং
অমৃতং কুরুকুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওঁং স্বাহা।
ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে
স্থাপয়েৎ॥

অর্থাৎ ভূতনাথ, সুরনাথ, রতিনাথ এবং গণ-নাথকে ইহার অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হুতাশনকে সমর্পণ করিবে। সত্য করিয়া বলিলে, এরূপভাবে অভিমন্ত্রিত করিয়া, ফিরিওয়ালার হস্তে ইহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা কথনই হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নেশা করিবার উদ্দেশ্যে ইহা ক্রয় করিবার সময় সে সকল কথা বিচার করিবার কাহারও আবশ্যক হয় না।

এই মোদকটি আয়ুর্ব্বেদের রসায়ন ও বাজীকরণ অধিকারোক্ত ঔষধ। শাস্ত্র ইহার ফলশ্রুতিতে বলিয়াছেন,—

বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন কামাঙ্কো জায়তে নরঃ।
কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ।
খগতুল্য ভবেদ্ দৃষ্টি বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
বীর্য্য বৃদ্ধি করং শ্রেষ্ঠং জরা মৃত্যু বিনাশনম্।
অপস্মার জরোন্মাদ ভয়ানিল গদাপহম্॥

কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দর গুদাময়ম্।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণী গদম্॥
বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্॥

অর্থাৎ ইহা দ্বারা জরা ও বার্দ্ধক্য জনিত নানাবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে। কথিত আছে, লঙ্কানাথ রাবণের মঙ্গল কামনায় দেবাদিদেব মহাদেব এই পরম কল্যাণকর মহৌষধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি, যদি খাঁটি ভাবে এই মহৌষধ প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় ফল অনুযায়ী বহুবিধ ব্যাধিই ইহা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে, কিন্তু যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করিলে ইহা যে স্বল্প মূল্যে—নাম মাত্র মূল্যে, দুই পয়সা চারিপয়সা করিয়া বিক্রয় করা যায় না, তাহা অবিসংবাদিত সত্য।

আয়ুর্ব্বেদে শ্রীমদনানন্দ মোদক ভিন্ন কামেশ্বর মোদক এবং আরও অনেক প্রকার সিদ্ধি ঘটিত মোদক আছে। উহাদিগের প্রস্তুতের ব্যয় শ্রীমদনানন্দ মোদক অপেক্ষা অনেক কম। ঐ সকল মোদক প্রস্তুতে পরিশ্রমও কম হইয়া থাকে। বাজারের অনেক স্থলে কামেশ্বর মোদক বা ঐ জাতীয় কোনো মোদক শ্রীমদনানন্দের নামেও ফেরিওয়ালাদের হস্তে বিক্রয় হইয়া থাকে—এমন কথাও আমরা অবগত আছি। শ্রীমদনানন্দ মোদকের গুণের সহিত কামেশ্বর বা অন্য মোদকের গুণের যথেষ্ট পার্থক্যও বিদ্যমান। শ্রীমদনানন্দ অপেক্ষা ঐ সকল মোদকে মাদকতার শক্তি অনেক অধিক। সে জন্যও বটে এবং ব্যয়ের সঙ্কোচের জন্যও বটে—অনেক ব্যবসায়ী কামেশ্বর বা ঐ জাতীয় মোদককে শ্রীমদনানন্দ বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। ফলে ঐ সকল মোদকে সিদ্ধির মাত্রা অধিক থাকায় আপাত মধুর সুখ বোধ হইলেও ইহার পরিণতি স্বাস্থ্য হানি। সর্ব্ব সময়েই মনে রাখা উচিত, যাহা উত্তেজক তাহাই পরিশেষে অবসাদক হইয়া থাকে। তা'ছাড়া বিনাকারণে সাধ করিয়াও ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য নহে। জরা এবং বার্দ্ধক্যে যথাশাস্ত্র প্রস্তুত শ্রীমদনানন্দ মোদক সেবন কর—যথেষ্ট ফল পাইবে, কিন্তু যুবা বয়সে সখ করিয়া নেশার উদ্দেশ্যে ইহা কোনো ক্রমেই সেবন করা সমীচীন নহে; যিনি সে উদ্দেশ্যে ইহা সেবন করিবেন—তাঁহাকে যে পরিণামে অনুতাপ করিতে হইবে—সে কথা আমরা জোর করিয়াই বলিয়া রাখিতেছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

দেশীয় চিকিৎসা।—দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি কল্পে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মহম্মদ ওসমান সাহেবের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সংপ্রতি ঐ কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। কমিটির সভ্যগণ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তথ্য সকল সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন

যে, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিই ভারতবাসিগণের পক্ষে একান্ত উপযোগী। এই চিকিৎসা দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তিরা যাহাতে অল্প মূল্যে ঔষধ পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শল্য বিভাগেও যাহাতে ভারতীয় ঔষধ কার্য্যকারী হইতে পারে তজ্জন্য কমিটি গবর্ণমেণ্টকে চেষ্টাশীল হইতে বলিয়াছেন। কমিটির প্রস্তাব—লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে দেশীয় ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করুন।

ক্যানসারে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।—হায়দারাবাদের শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র বিলাতে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা করিয়া থাকেন। তিনি বিলাতের "বোরেন মাউথ ডেলি একো" নামক পত্রে লিখিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ক্যানসার রোগ অসাধ্য নহে, ইহা এই চিকিৎসায় সহজ সাধ্য এবং কোনোরূপ যন্ত্রণাদায়ক নহে। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা এই রোগে বহুস্থলে ফল পাইয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, যদি কোনো ডাক্তার আয়ুর্ব্বেদ মতে এই রোগের ঔষধের তথ্য অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার শিক্ষা দানে প্রস্তুত আছেন।

সর্প দংশনের ঔষধ।—"হিতবাদীতে প্রকাশ,—রিঠা নামক যে ফল বাজারে কাপড় কাচিবার জন্য বিক্রীত হয়, সর্প দষ্ট রোগীকে সেই রিঠা খাওয়াইয়া ঘুমাইতে না দিলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। যে পর্য্যন্ত রিঠার আস্বাদ মিষ্ট বলিয়া বোধ হইবে, সে পর্য্যন্ত শরীরে সর্পবিষ আছে বুঝিতে হইবে। রিঠার প্রকৃত আস্বাদ বোধ হইলেই বুঝিতে হইবে, শরীরে আর সর্প বিষ নাই। একটী শিমুল ফুল বৃন্ত সহিত খাওয়াইলেও নাক সর্প বিষ নষ্ট হয়। যখন রোগী অচেতন হইয়া পড়ে, খাইবার সামর্থ্য থাকে না, তখনও যদি উক্ত শিমুল ফুল বৃন্ত সমেত কাটিয়া মলদ্বার দিয়া যন্ত্র যোগে (Injection) শরীরে যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে রোগী অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে।

দীর্ঘজীবী বাঙ্গালী।—বঙ্গের বারভূঁইয়ার অন্তর্গত বিক্রমপুরের স্বনামধন্য চাঁদরায়ের অনেক বংশধর ঢাকা-তাজপুর নিবাসী অভয়াচরণ ভৌমিক মহাশয় ১১৯ বৎসর বয়সে গত ২রা চৈত্র তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। এ দীর্ঘ বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল। মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া গীতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ বহু নরনারী এ দীর্ঘজীবীর শবদেহ দেখিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ সুস্থ শরীরে দীর্ঘ-জীবন লাভ করা প্রায়ই ঘটে না।—সম্মিলনী।

ছাত্রগণের স্বাস্থ্য।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফলে প্রকাশ পাইয়াছে, শতকরা ৭১ জন ছাত্র কোনো না কোনো রোগে ভুগিতেছে। তাঁহারা স্কটিশচার্চ্চ, ইউনিভারসিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সী, বিদ্যাসাগর, সি, এম, এস এবং বঙ্গবাসী কলেজের ছয় হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহা হইতেই দেশের অবস্থা অনুমান করিয়া লউন।
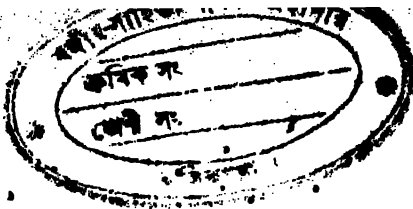
আয়ুর্বেদ

৭ম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

বসন্ত-প্রতিকার।

(কবিরাজ শ্রী[illegible] মজুমদার,
কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি)

—:o:—

(১) লক্ষণ ও প্রকার ভেদ

বসন্ত অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি। এই রোগের প্রতিকার কল্পে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আর্য্য ঋষিদের যে সকল সত্যলব্ধ নিরাময় ও আশু ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ উপনিবদ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এস্থলে তাহা পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ বিবৃত করা যাইতেছে। শরীর যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকের সমুৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহারই নাম বসন্ত বা মসূরিকা। হাম বা খুস্তি এবং জল বা পানি বসন্তও এই ভীষণ বসন্তরোগেরই অবান্তর ভেদ মাত্র।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বসন্তরোগের উৎপত্তির কারণ বলিয়া যাহা যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই কারণ পরম্পরার মধ্যে কফ ও বায়ু অপেক্ষা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ সংঘটিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু বসন্তের নিদানের অন্তর্ভুক্ত সেই সেই পিত্তপ্রকোপকারক আহার ও ব্যবহার দ্বারা শরীরের রক্তেরও প্রদুষ্টি ঘটিয়া থাকে। এই সকল অনিবার্য্য কারণপ্রাচুর্য্য বশতই ভীষণ বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব-কালে পিত্ত ও রক্তদুষ্টিকারক আহার ও ব্যবহার হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রতি-নিবৃত্ত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

পিত্ত বা রক্তদুষ্টি হইতে যে বসন্তরোগ জন্মিয়া থাকে, সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গসেন প্রণীত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থে তাহা এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—

"পিত্তং শোণিতসংস্পৃষ্টং যদা দূষয়তি ত্বচম্
তদা প্রায়ন্তে পিড়কাঃ সর্ব্বগাত্রেষু দেহিনাম্‌" ॥

রক্তের সহিত মিলিত পিত্ত ত্বক্ দুষ্ট করিয়া সকল শরীরে পিড়কা (স্ফোটক) জন্মাইয়া থাকে ও উহারই নাম বসন্ত বা মসূরিকা।

আয়ুর্বেদে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ ও সান্নিপাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের প্রধানতঃ সমুল্লেখ করা হইয়াছে। রোমান্তি (হাম

বা লুঙ্গি) কফ ও পিত্তবাত। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র সমাশ্রয় করিয়া, বাত, পিত্ত, ও কফ কর্ত্তৃক বসন্তরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও সকল প্রকার বসন্তে পিত্ত বা রক্তের প্রকোপই মুখ্য কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং উপরে তাহার প্রমাণ ও সমুল্লেখ করা গিয়াছে। এইরূপ রসকে সমাশ্রয় করিয়া যে নাতিভয় ও যন্ত্রণা-প্রদ সুখসাধ্য বসন্তরোগ উৎপন্ন হয়, সাধারণ্যে তাহাই "পান বা জল বসন্ত" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

উল্লিখিত সকল প্রকার বসন্তের মধ্যে রসগত, রক্তজ-পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও পিত্ত-শ্লেষ্ম-জাত বসন্ত সুখসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। বাতজ, বাতপিত্তজ ও বাতশ্লেষ্মজ বসন্ত কষ্টসাধ্য অর্থাৎ কেবল সুচিকিৎসকের হাতে পড়িলেই এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সন্নিপাত বশতঃ সঞ্জাত বসন্ত এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও শুক্রগত বসন্তরোগ একেবারেই অসাধ্য—অর্থাৎ এই সকল বসন্তরোগে যথারীতি সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিলেও কিছুতেই রোগের উপশম হয় না, প্রত্যুত রোগীর জীবনান্তই ঘটিয়া থাকে।

বসন্ত অতি ভয়ানক জীবনহন্তারক ব্যাধি বলিয়া ইহার চিকিৎসা বিষয়ে প্রসিদ্ধ ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

'বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি।
কেচিৎ প্রযোজয়ন্ত্যেব........ ....॥'

সাধ্য ও অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বসন্ত রোগে ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে চিকিৎসকবৃন্দের মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। একশ্রেণীর চিকিৎসক বলেন, এই রোগে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। আবার অপর চিকিৎসকেরা বলেন, যখন মানবের মঙ্গল সাধন সমুদ্দেশেই রোগে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রকটিত হইয়াছে, পরিণামে শুভ বা অশুভ—যেরূপই ঘটুক না কেন, রোগে অবশ্যই তাহার চিকিৎসা যথাবিধি করা আবশ্যক। এই মতই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আরও সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে,—

কশ্চিদ্বিনাপি যত্নেন সিদ্ধ্যন্ত্যাশু মসূরিকাঃ।
দৃষ্টাঃ কৃচ্ছ্রতরাঃ কশ্চিৎ কশ্চিৎ
সিদ্ধ্যন্তি বা ন বা।
কশ্চিন্নৈব তু সিধ্যন্তি সাধ্যমানাঃ প্রযত্নতঃ॥'

কোন কোন প্রকার বসন্ত বিনা চিকিৎসাতেও আপনি শীঘ্র উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন বসন্ত কখনও বা উপশম প্রাপ্ত হয়, আবার কখনও বা কিছুতেই শান্তি প্রাপ্ত হয় না আবার কোন কোন বসন্ত যথারীতি চিকিৎসিত হইলেও কিছুতেই উপশমিত হয় না।

শাস্ত্রে রোগের চিকিৎসা বিষয়ে যে প্রকার ভেদ বর্ণিত হইয়াছে কার্য্যতও সেই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন চিকিৎসক বসন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন ; আবার কেহ কেহ বা ঐ রোগের নিকটে অবস্থিতি করাও বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। অপরদিকেও দেখা যায়, অনেক বসন্তরোগ বিনা ঔষধে আপনা আপনিই অতি অল্প দিন মধ্যে উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাগ্য-ক্রমে এই শ্রেণীর কোন বসন্ত রোগীকে

আপনার অধিকার মধ্যে পাইয়া, তাহার চিকিৎসক লোকসমাজ হইতে অতিরিক্ত ধন্যবাদ লাভ করিয়া আপনাকে বাস্তবিক কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন।

বসন্তরোগ আরোগ্য হওয়ার পরেও যদি সেই ব্যক্তির কূর্পর মণিবন্ধ অথবা অংশফলকে শোথ জন্মে, তবে তাহাও অসাধ্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে।

এস্থলে মোটামুটিভাবে লক্ষণ ও সাধ্যাসাধ্যের কথা উল্লেখ করিয়া মুষ্টিযোগ মতে সংক্ষেপে রোগের চিকিৎসা বিবৃত করা যাইতেছে।

(২) অনাগত প্রতিষেধ

যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান রোগ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে করিলে আর শরীরে ব্যাধির (এস্থলে বসন্তরোগের) আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইয়া যায়, তাহারই নাম অনাগত প্রতিষেধ।

(ক) 'শিবাস্থি' ধারণ করা—এই শ্রেণীর উপদেশ। এস্থলে শিবাস্থি শব্দে কেহ কেহ বলেন, শিবা অর্থাৎ হরীতকী, তাহার অস্থি বা আঁটি,—তাহাই ধারণ করা বিধেয়। বসন্তরোগের নিবারণ কল্পে হরীতকীর আঁটি ধারণ করিতে বৃদ্ধ বৈদ্যগণের উপদেশ প্রসিদ্ধ আছে। আবার অন্য কেহ বলেন, শিবাস্থি শব্দে শৃগালের অস্থি। রুদ্রাক্ষও বসন্তরোগের প্রতিষেধক, এই জন্য কেহ কেহ বলেন, শিবাস্থি নহে শিবাক্ষ অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ, ইহার ধারণও বসন্তরোগের প্রতিষেধক। সুতরাং এইরূপ ব্যবহারও সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

(খ) ভাবের জলে আতপ চাউলের ভাত খুব বিশুদ্ধভাবে রান্না করিয়া উহার দুই তিন গ্রাস তিন বা সাত দিন কাল—আহার করিবার ব্যবস্থা। প্রথমে উহা খাইবার জন্য একটি সাধু জনৈক ভদ্র বর্ষীয়ান মহিলাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐরূপ ব্যবহার সেই বংশে প্রচলিত থাকিতে দেখা গিয়াছে।

(গ) চৈত্র মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে একটি নূতন মাটির কলসীতে চূণ মাখাইয়া রক্তবর্ণ পতাকার সহিত তাহাতে সুহী (মনসাসিজ) বৃক্ষ রোপন করিয়া রাখিয়া দিলে, বসন্তরোগের বা অন্য সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ নিবারিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঐরূপ সুহী বৃক্ষ রোপণ করিতে এখনও দেখা গিয়া থাকে। দ্রব্যে অন্তর্নিহিত কি অলৌকিক শক্তি বর্ত্তমান, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এইরূপ ব্যবহার যে সুপ্রাচীন ঋষিযুগেও বর্ত্তমান ছিল, প্রসিদ্ধ চরকসংহিতায় দ্রব্যের প্রভাব শক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—

'বিষং বিষঘ্নমুক্তং যৎ প্রভাবস্তত্র কারণম্।
ঊর্দ্ধানুলোমনং যচ্চ তৎপ্রাভবপ্রভাবিতম্॥
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্ বিবিধাত্মকম্।
তৎপ্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে

কোন দ্রব্যের যে সকল গুণ বর্ত্তমান আছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত শক্তি সেই দ্রব্যের না থাকিলেও যেখানে অচিন্ত্য দ্রব্য-শক্তি বশতঃ সেইরূপ কার্য্যান্তরের সংঘটন হইতে দেখা যায়, তাহাকেই ঐ দ্রব্যের 'প্রভাব' বলিয়া

শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে। এক বিন্দু যে শক্তি বলে অনুবিদ্ধ বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় এবং উর্দ্ধগামীও হয়, উহাই তাহার প্রভাবকৃত বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। মণি বিশেষ ধারণ বশতঃ যে নানা বিধ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাও প্রভাবের প্রভাব বশতই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৩) সংশোধন ক্রিয়া

বসন্তরোগ উৎপন্ন হইলে, রোগীর ও রোগের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক, অগ্রেই সংশোধন ক্রিয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বমন ও বিরেচন প্রভৃতি ক্রিয়াকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সংশোধন ক্রিয়া বলা হইয়া থাকে। রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও নিজ শরীরের অবস্থা ভালরূপে বুঝিয়া জোলাপ নিলে, আর রোগ হওয়ার ভয় থাকে না।

বসন্তের প্রথম অবস্থাতে পলতা, নিমছাল বাসক পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও ময়নাফল চূর্ণ যথোচিত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে বমন হইয়া শরীরের দোষ কমিয়া থাকে।

বমন করাইলেও যদি এইরূপ বুঝা যায় যে, রোগীর শরীর হইতে দোষ সমূহ সম্পূর্ণরূপে নিঃসারিত হইয়া যায় নাই, সেই অবস্থাতেই তাহা হইলে তাহাকে যথোপযুক্ত বিরেচন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, সংশোধক ঔষধ অর্থাৎ বমন বিরেচক ঔষধ না দিয়া, তাহাকে অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক দোষের অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফের শমনকারক ঔষধ প্রদান করিতে হইবে। সংশোধন ক্রিয়ার দ্বারা দোষের লাঘব হইয়া পড়িলে, বসন্তে কোনরূপ বিকার থাকে না, বেদনার লাঘব হয়, ব্রণ সমূহ শীঘ্রই পাকিয়া উঠে তাহাতে অল্প পরিমাণ পূয জন্মিয়া থাকে।

(৪) রোগের উপক্রমে

বসন্তরোগের প্রথম অবস্থাতে কুমরিয়া লতার কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে দুই আনা মাত্রা হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করা কর্ত্তব্য। শেয়াল কাঁটার মূল বাসি জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করাইলেও বসন্তের প্রতিকার হইয়া থাকে।

হলুদের পাতা যথোপযুক্ত মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলেও রোগের উপকার হয়।

(৫) রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা পরিহার—

শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, শরীরে সর্ব্ব প্রথমে বসন্তরোগ উৎপন্ন হওয়া মাত্র, সেই অবস্থাতে যে কয়েকটি বসন্তের স্ফোটক দৃষ্ট হইবে, পীড়িত ব্যক্তির নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই কয়েকটি চালিতা পাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, আর বেশী ফোড়া হইবার আশঙ্কা থাকে না।

(৬) বসন্তে রস প্রয়োগ

শোধিত গন্ধক দুইভাগ এবং শোধিত রস একভাগ দ্বারা কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপযুক্ত মাত্রায় পানের রস সহ সেবন করাইলে বসন্তের প্রতিকার হইয়া থাকে।

(৭) বসন্তে দাহ নিবারণ

বসন্তরোগ নিবন্ধন শরীরের দাহ উপস্থিত হইলে, বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, দাহ নিবারিত হইবে। অধিকন্তু এই মধু মিশ্রিত

জল পান করা. বসন্তরোগেরও উপশম হইয়া থাকে।

(৮) কাথ শোধন

চালিতার ছাল দ্বারা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া ঐ কাথ দ্বারা শরীর ধৌত করিলে, বসন্তের ক্লেদ বিদূরিত হইবে। পাচন প্রস্তুত করার নিয়মে পূর্ব্বদিনে কষায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া পরদিন, উহা ব্যবহার করিতে হয়। একরূপ কাথকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে শীতকষায় বলা হইয়া থাকে। এস্থলে শুদ্ধ পানীয় বিধানেই ধৌত করাইবার জন্য শীতকষায় প্রস্তুত করা বিধেয়।

(৯) ধূপ

বচ, বাঁশের নেলি, যব, বাসকমূলের ছাল, কাপাস বীজ, ব্রাহ্মীশাক, তুলসীপাতা, আপাংবীজ, লাক্ষা ও ঘৃত-সংযোগে ধূপ প্রদান করিলে, সকল প্রকার বসন্ত ও অন্যবিধ ব্রণরোগেরও উপশম হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে এস্থলে ধূপদ্রব্যের সহিত বিষ প্রদান করাও কর্ত্তব্য ;—কিন্তু বিজ্ঞ প্রবীণ আয়ুর্ব্বেদাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বসন্তরোগের সকল অবস্থাতেই কোন প্রকারে বিষের সম্পর্ক রাখা—রোগীর জীবনের অহিতজনক নহে, এই কথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গিয়াছেন।

(১০) জ্বরার্থ পাচন ব্যবস্থা

নিমছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, কটকি, পলতা, বাসকমূলের ছাল, দুরালভা, আমলা, বেণার মূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন,—এই সকল দ্রব্য যথোপযুক্ত মাত্রায় সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, জ্বর ও বিসর্পযুক্ত ত্রিদোষ জাত বসন্তরোগেরও শান্তি হইয়া থাকে। বসন্তের গুটি বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা পুনরায় বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পাচনটি সকল প্রকার বসন্তরোগেই বিশেষ ফলপ্রদ ও নিরাপদ বলিয়া আমাদের অধ্যাপক পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺দ্বারকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয় ইহা বিশেষরূপে ব্যবহার করাইতেন।

(১১) শীঘ্র পাকাইবার উপায়—

টাবা লেবুর কেশর কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিয়া উঠে, এবং উহাতে দাহও নিবারিত হইয়া থাকে।

(১২) পাদদাহ নিবারণ।

পদদ্বয়ে উৎপন্ন বসন্তসমূহ অত্যন্ত দাহ জন্মাইয়া থাকে। চেলোনি জল দ্বারা বারংবার পা ধুইলে, সেই দাহ দূর হয়।

(১৩) পকাবস্থায় ব্যবস্থা।

বসন্তের পকাবস্থায় বায়ুর প্রকোপ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, এইজন্য বসন্তের এই অবস্থাতে বিশোধন অর্থাৎ রুক্ষক্রিয়া করা কোনমতেই এই রোগ নিপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুভজনক হয় না ;—প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে সংবৃংহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই পীড়িত ব্যক্তির জীবন কামনায় সুচিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

এই পক অবস্থাতে গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ইক্ষুমূল ও দাড়িমছালের কাথে উপযুক্তরূপে ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে শীঘ্রই বসন্তের স্ফোটকগুলি পাকিয়া উঠে এবং বায়ুরও শান্তি হইয়া থাকে।

(১৪) মাংসরস ব্যবস্থা।

বসন্তের পক্ব অবস্থাতে কফক্রিয়া নিবন্ধন বায়ুর অত্যন্ত প্রকোপ হইয়া পড়িলে, সেই অবস্থাতে পীড়িত ব্যক্তির শূলবেদনা, আধ্মান (পেটফাঁপা) এবং কম্প প্রভৃতি বায়ুজাত উপদ্রবসমূহ জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থাতে চাতক ও তিত্তির প্রভৃতি পাখীর মাংসরস অল্পমাত্রায় সৈন্ধব সহযোগে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(১৫) অরুচি।

বসন্তরোগে অরুচি হইলে, অম্লদাড়িমের রসের সহিত মুগ, বা মসুরির যূষ পান করিলে, বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। খয়ের এবং পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতলকাথ পানেও অরুচি দূর হয়।

(১৬) শৌচ।

খয়ের কাঠ ও চালিতাছালের ষড়ঙ্গপানীয় বিধানে অর্দ্ধেক জল শুকাইয়া সেই কাথ বসন্তরোগে শৌচক্রিয়ার জন্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(১৭) মুখ ও কণ্ঠরোগে।

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীকাঠ, আমলা ও যষ্টিমধু দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল অবস্থাতে তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, মুখ ও কণ্ঠরোগে গণ্ডুষ ধারণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

(১৮) চক্ষুঃ রোগে—

গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু জলের সহিত বাটিয়া লইয়া, বস্ত্রদ্বারা পুটলি বাঁধিতে হইবে। ঐ পুটলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চক্ষুতে সেক দেওয়া কর্ত্তব্য।

যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, সূচমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল (শুঁদি) বেণারমূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে এক একটির যথালাভ গ্রহণ করিয়া প্রলেপ অথবা কাথ দ্বারা অভিষেক করিলে নয়নগত বসন্তের উপশম হয় এবং ফোড়া গলিয়া গিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার কোন আশঙ্কা হইতে পারে না।

(১৯) পুঁয হইলে তাহার প্রতিকার—

বসন্তের স্ফোটকে পুঁয হইলে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে ব্যবহার করা বিধেয়। ঘুঁটের ছাই অথবা শুষ্ক গোবর চূর্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে ক্লেদ নিবারণের জন্য প্রয়োগ করা বিহিত।

(২০) ক্রিমি নিবারণ—

বসন্তের স্ফোটকে ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের জন্য সরল, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতি দ্বারা বেশ ধূপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। কারণ এইরূপ ধূপ ব্যবহার দ্বারা আতুরের বেদনা ও দাহের শান্তি হয় এবং পুঁয নির্গত হইয়া স্ফোটকগুলিও বিশুদ্ধ হয়, অধিকন্তু ক্রিমি জন্মিতে পারে না এবং শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

(২১)। কণ্ঠশুদ্ধি

এই রোগে গলার শ্লেষ্মার প্রকোপ দৃষ্ট হইলে পিপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। কণ্ঠশুদ্ধির জন্য অষ্টাঙ্গাবলেহ অথবা আদার কবল ব্যবহার করাও বিহিত।

(২২) স্নেহ প্রয়োগ

বসন্তরোগের পান, অভ্যঞ্জন ও ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবহার করা

কর্ত্তব্য। ব্রণরোগে অন্ত যে সকল প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে। ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করা আবশ্যক, কিন্তু বসন্ত রোগে তৈলের ব্যবহার সর্ব্বথা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন ও প্রবীণ বিচক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ আচার্য্যগণ সকলেই একবাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, যথা,—

'পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্॥'

অধিকন্তু—

বাতং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্।
কট্বন্নং বেগরোধঞ্চ মসূরিগদবাংস্ত্যজেৎ॥

মসূরিপীড়াক্রান্ত ব্যক্তি (বাহিরের) বাতাস বর্জ্জন করিবে; কোনরূপ স্বেদ (অগ্নির উত্তাপ) ও আতপ (রৌদ্র) গ্রহণ করিবে না; তৈল ব্যবহার করিবে না; গুরুপাক, কটু (ঝাল) বা অম্লদ্রব্য আহার করিবে না; ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

(২৩) রক্ত মোক্ষণ।

বসন্তরোগে রক্তের বিকৃতি পরিলক্ষিত হইলে, অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ করাও বিহিত।

(২৪) গাত্রের দুর্গন্ধ নিবারণ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, শিরিষ-পুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর— উপযুক্ত মাত্রায় সমান ভাগে লইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে বসন্তের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। এই প্রয়োগটির দ্বারা বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠ, ও গাত্র দুর্গন্ধ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে।

(২৫) পথ্য ও অপথ্য

ভাব প্রকাশ বলেন;—

মসূরিকাসু ভুঞ্জীত শালীন্ ষষ্টিকমসূরিকান্।
রসং মধুরমেবাল্পাৎ সৈন্ধবং চাল্পমাত্রকম্॥'

বসন্তরোগে হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও মসূর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে।

অধিকন্তু বাত, পিত্ত ও কফের সংশ্রব অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয়া নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলিও পথ্যস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে, বসন্তরোগের উপশম হইয়া থাকে।

পুরাতন ষেটে ধান, আমন ধান, যব, ছোলা, মুগ, মসূর ডাইল; প্রতুদ জাতীয় অর্থাৎ পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, জলকুক্কুট ও ডাহুক প্রভৃতির মাংস, করলা, উচ্ছে, নিম, কাকরোল, সজিনা ও পটোল প্রভৃতি তরকারি কুল, কিস্‌মিস্ ও ডালিম এবং এতদ্ভিন্ন মেধাবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক অন্ন ও পানীয় অন্যান্ত দ্রব্য বসন্তরোগে সুপথ্য।

সংক্ষেপে বসন্তরোগের প্রতিকার কারক কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করার জন্য চেষ্টা করা গিয়াছে। ইহাদ্বারা মানবের জীবন সুরক্ষিত হইলেই সেই প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করিবে। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান সকলেরই মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই প্রবন্ধ লেখকের আত্মনিবেদন।

বৃশ্চিক দংশন চিকিৎসা।

(শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

পল্লীগ্রামে সর্পভয় যেমন, বৃশ্চিক দংশনের ভয়ও তদ্রূপ আছে। কলিকাতা সহরেও বৃশ্চিক দংশনের ভয় অধিক পরিলক্ষিত হয়। বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

বৃশ্চিকের বিষ প্রথমে অগ্নির ন্যায় দাহ এবং বিদারণবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া দ্রুতবেগে উর্দ্ধে গমন করে। তৎপরে দষ্টস্থানে প্রত্যাগত হইয়া অবস্থিত করিয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহর বৃশ্চিকে দংশন করিলে, মানবজনের নাসিকার ও জিহ্বার কার্য্য রহিত হয়। দষ্টস্থানের মাংস খসিয়া পড়ে।

"তেঁতুলে বিছা" কামড়াইলে দুইটি মাত্র দন্তচিহ্ন, "কাঁকড়া বিছা" কামড়াইলে একটিমাত্র দংশন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় সর্পাঘাত এবং বিছার দংশন প্রভেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। সর্প ছোবল মারিয়া দংশন করে, বিছায় ছোবল মারিতে পারে না, তবে কোন উচ্চস্থান হইতে পড়িয়াই কামড়াইতে পারে।

বিছা অত্যন্ত জোরে কামড়াইলে রক্ত পড়িতে পারে, সর্পদংশনে প্রায়ই রক্তপাত হয় না। বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে কোন প্রকার লালা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায় না, সর্পদষ্ট স্থানের চতুষ্পার্শ্বে সর্পমুখনিঃসৃত লালা লাগিয়া থাকিতে পারে। সর্প বৃহৎ হইলে উহার দন্তক্ষত যেরূপ বৃহৎ ও গভীর হয়, বৃশ্চিক দংশনাঘাত তদ্রূপ গভীর হওয়া অসম্ভব। বিছা কামড়াইলে দন্তাঘাত অত্যল্পকাল মধ্যে মিলাইয়া যায়, সাপে কামড়াইলে দষ্ট স্থানের চারি পার্শ্ব নীলারক্ত হয় এবং তাহা অল্প পরিমাণে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহা আবার কমিয়া যায়। বিছা কামড়াইলে শীঘ্রই সেই স্থান অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চতুর্দ্দিক লালাযুক্ত হইয়া থাকে।

ক্ষতস্থানে হুল বিঁধিয়া থাকিলে নখ বা সূক্ষ্মমুখ (সোন্না) অথবা চাবিকাঠি বা লৌহ চোঙ্গ চাপ দ্বারা তাহা তুলিয়া ফেলিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

১। বৃশ্চিকদষ্টস্থানে অগ্রে গুগগুলুর ধূম লাগাইয়া, পরে তাহাতে আকন্দপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে কিংবা উহার আঠা লেপন করিবে।

২। কালকাসুন্দার ডাটার নল নির্ম্মাণ করিয়া কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নিবারিত হয়।

৩। উষ্ণ গব্যঘৃত, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

৪। কৃষ্ণ তুলসীর মূল বাটিয়া গুড়িকা করিবে। পরে সেই গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৫। জীরা বাটিয়া ঘৃত ও সৈন্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মধুর সহিত দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

৬। হাতিশুঁড়া গাছের রস—বাহ্য ও আভ্যন্তর প্রয়োগে বিষ নিবারিত হয়। এক ছটাক সেব্য।

৭। হড়হড়ে গাছের পাতা মর্দ্দন করিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হয়।

৮। পাকা কাঁঠালি কলা চটকাইয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে অভাবে কাঁচাকাঁঠালি কলা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

৯। বকুল বীজ—জলসহ পাথরে ঘর্ষণ করিয়া চন্দনবৎ হইলে দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা-যন্ত্রণার নাশ হয়।

১০। শুণ্ঠী (শুঁঠ) পেষণ করিয়া নস্য লইলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

১১। আমড়া ছাল বা উহার কচিপাতা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে কিম্বা ঐ গাছের পাতার রস ছাঁচি গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১২। সাদা ভেরেণ্ডার আঠা দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়। উক্ত আঠা পুষ্করিণীর ঝিনুকে বা কাল কচুপাতায় রাখিবে, অন্য পাত্রে রাখিবেনা। ইহা পরীক্ষিত।

১৩। কাঁটা শাকের শিকড়ের রস পুনঃ পুনঃ লাগাইলে সত্বর জ্বালা উপশমিত হয়।

১৪। তামাকের গুল দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

১৫। বুড়িগোপন (মুষাকানী) পাতার রস দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

১৬। ছোট পেঁয়াজের রস দষ্টস্থানে বারম্বার লাগাইলে "বিছুর" দংশন জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হয়।

১৭। আলকুশী বীজ জলে ঘসিয়া দষ্টস্থানে দিলে "কাঁকড়া বিছার"কামড়ের জ্বালা-যন্ত্রণা ও বিষ নষ্ট হয়।

১৮। হুঁকার কাইট (তামাক খাইলে নলিচার মধ্যে যে ময়লা হয়) দষ্টস্থানে পুনঃ পুনঃ লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১৯। তার্পিন তৈল দষ্টস্থানে বারম্বার লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

২০। হিং—জলে গুলিয়া চন্দনবৎ হইলে দষ্ট স্থানে বারম্বার লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়।

২১। ছাগল নাদি জলে গুলিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২২। পাথুরিয়া কয়লা জল দিয়া ঘসিয়া চন্দনের মত হইলে দষ্টস্থানে লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৩ গোময় (গোবর) উষ্ণ করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয় ও জ্বালা নিবারিত হয়।

২৪। লবণ—জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে ফুটাইয়া ঐ জল দ্বারা প্রদাহিত স্থানে ফোমেণ্টেশন করিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৫। ফটকিরি ১ খণ্ড—চিমটা দ্বারা

অগ্নি শিখায় ধারণে গলিয়া উঠিবে, সেই সময় দষ্টস্থানে ঐ উত্তপ্ত কটকিরির ছাঁকা প্রদান মাত্র প্রাণ বিয়োগ সদৃশী যাতনা হইলেও তৎক্ষণাৎ নিবারিত হইবে, পুনঃ পুনঃ ছাঁকা দিবে। ইহা পরীক্ষিত; "কাঁকড়া বিছা" দংশনের যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয়।

২৭। হরিদ্রা বাটা—দষ্টস্থানে প্রলেপ ও গাত্রে মাখিলে বিছার কামড়ানির জ্বালা নিবারিত হয়।

২৮। কর্ক বা ছিপী ভস্ম করিয়া তাহাতে চুণ মিশ্রিত করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২৯। ধুনো—সরিষা তৈলের সহিত উত্তমরূপে ফেনাইয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে জ্বালা নিবারিত হয়।

৩০। কালকচুর আঠা বা ঐ পাতার রস দষ্ট স্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়। বস্ত্র ওলের পুলটিশ লাগাইলে জ্বালার উপশম হয়।

৩১। কেঁচোর মাটি দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৩২। খাঁটি শুভুক তামাক—জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে রোগীর যে অঙ্গে বিছা কামড়াইয়াছে সেই অঙ্গের বিপরীত কর্ণের মধ্যে উক্ত দ্রব্য ৪।৫ ফোঁটা দিলে জ্বালা-যন্ত্রণার নিবারণ হয়। ইহা পরীক্ষিত।

৩৩। কচি কয়েতবেলের পাতা বাটিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

৩৪। পুকুরের বড় পানা বাটিয়া দষ্টস্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

৩৫। ইংরাজী ১৮৪০ সালের রাণীমুখ টাকা—মুখের লালা (থুঁতু) দিয়া দষ্টস্থানে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে জ্বালা যন্ত্রণা ও বিষ নিবারিত হইবে। ইহা পরীক্ষিত।

বৈদ্যরাজ।

[শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ]

প্রবন্ধের শিরোভাগে নাম দেখিয়াই অনেকে হয়ত মনে করিবেন, আমি কোন বৈদ্যকুলশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবনী লিখিতেছি, ফলে তাহা নহে। "বৈদ্যরাজ" নামে কোন বৃক্ষ আছে, তাহা জঙ্গলে অযত্নে বৃদ্ধি পায়, ইহা ঔষধ ও অন্যপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বনজ অনেক পদার্থ আছে—যাহার ব্যবহার বা উপকারিতা আমরা অবগত নহি।

বৈদ্যরাজ নামক যে এক প্রকার গাছ আছে তাহা নাম 'ভেদে' সর্ব্বত্র পরিচিত, 'কোথাও ইহা পীতরাজ, রয়না, রণা প্রভৃতি নামে প্রদেশ-বিশেষে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা গ্রামের সাধারণ জঙ্গলে জন্মিয়া থাকে, ইহা কেবল ক্ষুদ্র বৃক্ষ নহে, ইহার বড় গাছগুলি দ্বারা গৃহের সরঞ্জাম, চৌকী, আলমারা, চেয়ার টেবল ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ইহার ছোট ছোট গাছ ও ডালপালা জ্বালানী কাষ্ঠ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার একপ্রকার বীজ হয়, সেই বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত হয়, এই তৈল কেরোসিনের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে জ্বালানীরূপে ব্যবহার হইত। এই তৈল কোন ঔষধ বা ঔষধরূপে ব্যবহারের কথা জানিনা। এই তৈল বেশ ঘন ও পরিষ্কার, আস্তে আস্ত জ্বলে, ইহার আস্বাদ তিক্ত, এখন আর কোন গৃহস্থ ইহার বীজ সংগ্রহ করে না, বীজগুলি জমিতে পড়িয়া থাকে ও গাছের নীচে প্রচুর চারা জন্মে।

ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় সে কথা না জানিলেও ইহা জন্তু বিশেষের রোগ বিশেষে ব্যবহারের ফল দেখিয়াছি। একবার আমার একটী হাতীর পীঠে প্রকাণ্ড ঘা হয়, চিকিৎসক আনাইয়া নিযুক্ত করি। কিন্তু আমার কেমন এক খেয়াল হইল জানিনা, এই বীজের তৈল প্রস্তুত করিলাম,, শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর স্বর্গীয় বিরজাচরণ গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় আমাকে "বনৌষধি দর্পণ" উপহার দিয়া ছিলেন, আমি তাহা দেখিয়া ইহার রোগ আরোগ্যের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হই। বীজগুলি দিয়া তৈল প্রস্তুত হইলে সর্ব্বাগ্রে আমি জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহার করি, পরে এই তৈল ও তৎসহ বিষকচু এবং আর একটী বনজ পদার্থ তাহাতে মিশাইয়া ঘায়ে ন্যাকড়া দ্বারা ভরিয়া দিতে থাকি, কয়েক দিন পর ঘা লাল হইয়া ভরিয়া শুকাইতে লাগিল, অবশেষে এই ঔষধেই হাতী আরোগ্য লাভ করিল। আমার বিশ্বাস, ঠিক এই তৈল অথবা ইহার অন্তবিধ সহকারী ঔষধেই হাতীটির রোগ আরোগ্য হইয়াছে। আমার একটী গাভীর শরীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়, বোধ হয় তাহাই সংক্রামিত হইয়া ঘোড়াতেও আসে, আমি কেবল এই তৈল গরু ও ঘোড়াকে ব্যবহার করিতে দিয়া ফল পাইয়াছিলাম। তাহারা এই ঔষধে রোগমুক্ত হইল। উহাদের সকল স্থল ফুলিয়াছিল, তাহাতেও এই তৈল মালিস করিয়া দিতে লাগিলাম, অবশেষে ফুলা স্থানগুলিও আরোগ্য হইলে বুঝিলাম এই তৈলেরই এইরূপ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে।

আমিত এইরূপ ফল পাইয়াছি। মানুষের রোগে পরীক্ষা করিবার সাহস পাই নাই। আমার অভিজ্ঞতার সামান্য কথা বিবৃত করিলাম, আশা করি চিকিৎসকগণ ইহাকে ঔষধ রূপে ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। সর্ব্বত্র প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। আর যদি কেহ ইহা ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে না চাহেন, তাহা হইলেও জ্বালানী তৈলরূপে যদি ব্যবহার করেন, তবে নবাগত কেরোসিনকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে পারা যায়। তাহা হইলেও দেশের একটা কাজ হইল মনে করিতে পারিবেন।

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা।+

(কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত)

কাটাকাটি বা ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইলে।—

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া বা ছেঁচিয়া রক্ত বাহির হইলে তৎক্ষণাৎ কুকসিমা পাতার রস সেইস্থানে দিলে রক্ত বন্ধ হইবে ও বেদনা ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া যাইবে।

বৃশ্চিক দংশনে।—বৃশ্চিক দষ্টস্থানে মাছের ঝোল দিয়া ২।৪ বার ধুইয়া ফেলিলে জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

সর্দ্দিতে।—

বুড়ি পান ও কাঁচাসুপারির রস ২।৪।বার মস্তকে দিলে এবং খুদ-কেশুরিয়ার রস কর্ণের মধ্যে দিলে সর্দ্দি নিবারিত হয়।

মূত্রকৃচ্ছে।—(ক)

খুদেনোনা, মাখন ও সোরা সমপরিমাণে একত্র করিয়া তলপেটের নিম্নভাগে প্রলেপ দিলে যে কোন প্রকারের বন্ধপ্রস্রাব সরল হইবে।

(খ) তাজা চুণ, পচা আমপাতা এবং সোরা সমপরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করিয়া নাভি স্থলে প্রলেপ দিলে সরল প্রস্রাব হয়। কলেরা রোগের প্রস্রাব করাইবার জন্য ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনে।—হরিদ্রা, বচ, কুড় (শোধিত) পিপুল, শুঁঠ, জীরা, যমানী, যষ্টিমধু, ও সৈন্ধব প্রত্যেকের সম পরিমাণ চূর্ণ লইয়া (১০ রতি) ঘৃতের সহিত ২১ দিন সেবন করিলে স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

পোড়া ঘা এবং অন্যান্য ক্ষতে।—সর্ষপ তৈল ⁄।০, কেলেকড়ার মূলের ছাল ২ তোলা। অনন্তমূল ১ তোলা, অপামার্গমূল ১ তোলা। প্রথমে সর্ষপতৈল একটী পিত্তলের বাটীতে জ্বাল দিয়া ফেনা রহিত হইলে, ঐ দ্রব্যগুলি ছেঁচিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং ভালরূপ ভর্জ্জিত হইলে নামাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ছাঁকিয়া লইবে; ইহাতে পোড়া ঘা, বিষাক্ত ঘা ও দুষ্টব্রণ আদি শান্তি হয়।

নাসারোগে।—খাঁটি সরিসার তৈল ও কাঁচা দুর্ব্বার রস—সম পরিমাণ লইয়া ক্রমে ২।৩ দিবস নাকে টানিলে যন্ত্রণাদায়ক পুরাতন নাসা রোগের আশুফল হয়।

অম্লপিত্তে।—(ক) ত্রিফলা, পটোলপত্র (পল্‌তা) কটুকী সমান ভাগে লইয়া কাথ করিয়া সম পরিমাণ ইক্ষুচিনি দিয়া খাইলে পুরাতন অম্লপিত্ত আশু বিনষ্ট হয়। কাথ করিবার নিয়ম —প্রত্যেক দ্রব্য ॥⁄০, জল ⁄॥০ সের শেষ ৴০ পোয়া।

(খ) বাসক, গুলঞ্চ ও কন্টিকারির কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

বায়ুবিকারে।—কেলেজীরা ।০ তোলা,

+ এই পরীক্ষিত মুষ্টি যোগাদি বজরাপুর নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় নবরচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্নের স্বহস্ত লিখিত জীর্ণ পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছি।—লেখক।

নিসিন্দার কচিপাতা ৶০, আনা ও পিপুলের মূল।০, জল ⁄॥০ সের, শেষ আধপোয়া এই কাথ প্রত্যহ দু'বেলা পান করিলে বায়ুরোগ নষ্ট হয়।

ফোঁড়া বসানয়—মহা সমুদ্রের পাতা ২টা, গোলমরিচ ২টা, কটুহঁকার জলে বাটিয়া ফোঁড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া বসিয়া যাইবে।

গোদে—শোধিত মিঠাবিষ, হড়হড়ের মূল ও ছাল, হরীতকী, অনন্ত মূল ও তেঁতুলের বীজের শাঁস ও শিরিষ ছাল—সমান ভাগে লইয়া সিজের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইলে বহুদিনের গোদ রোগ ভাল হয়।

গণ্ডমালায়—কনকধুতুরার মূলের ছাল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দার পাতা, শ্বেত পুনর্ণবা ও সজিনার মূলের ছাল—সমভাগে লইয়া সরিষার তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে গণ্ডমালা ভাল হয়।

বহুমূত্রে।—গেঁটেদূর্ব্বা।০ আনা, চেঁচোর মূল, বজ্ডুমুর, আমলা, হরীতকী, ধনে ও গন্ধ মুথা, সমান ভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া ৭ দিন দুবেলা খাইলে সকল প্রকারের বহুমূত্রের যন্ত্রণা ও মুহুর্মুহু প্রস্রাব নির্গত, নিশ্চয়ই আশু উপশমিত হইয়া থাকে। পাঠকগণের নিকট নিবেদন, এই মুষ্টিযোগটী তাঁহারা যেন অবশ্য অবশ্য পরীক্ষা করেন।

সান্নিপাত জ্বরে নস্য—সৈন্ধব ১ ভাগ, সজিনা বীজ ১ ভাগ, সরিষা ১ ভাগ, কুড় ১ ভাগ—ছাগী মূত্রের সহিত মাড়িয়া ঐ রসের নাস করিতে হইবে—এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

শরীরের যে কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ ঘৃতকুমারীর শাঁস ও রস সেই স্থলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়, ও ফোস্কা হয় না।

ঘোর সন্নিপাতে অঞ্জন—তেলাপোকার নাদি ৶০ আনা পরিমাণ লইয়া মধুর সহিত ঘসিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সান্নিপাতে চক্ষু দূষিত হইলে চক্ষু ভাল হয় এবং ব্যারামও ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

ক্রিমি রোগে :—দাড়িম ছালের কাথ ⁄০ একছটাক ও তিল তৈল ৶০ আনা (ওজন) মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে পান করিলে কোষ্ঠস্থ সমস্ত ক্রিমি নিঃসৃত হইয়া যায়।

তমক শ্বাস কাসে পার্শ্ব বেদনায় প্রলেপ—রাস্না ॥০ তোলা, হরিদ্রা ⁄০ আনা, দারুহরিদ্রা ⁄০ আনা, শুল্‌ফা ⁄০ আনা, দেবদারু ⁄০ আনা, জীবন্তী ৶০ আনা, ও মিছরি ৶০ আনা একত্র জলে মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে পুরাতন ঘৃত ও তিল তৈল ২ তোলা পরিমাণ মিশাইয়া ঈষৎ গরম করিয়া বেদনাস্থলে পুরুভাবে প্রলেপ দিয়া কলার মাজপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, এইরূপে ৩।৪ দিন ব্যবহার করিলে পার্শ্ববেদনার বিশেষ শান্তি হইবে।

মুথা, ক্ষেত্রপর্পটী, কেশুর ও চন্দন সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দিয়া ১ প্রহর কাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ঐ জল পান করিলে তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয়।

মৃগী রোগে নাসিকা হইতে পোকা বাহির করিবার ব্যবস্থা :—

লাল বর্ণের পদ্মের মূল ও হিঙ্গুল সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া চারি অঙ্গুলী প্রমাণ

বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে ঐ বাতিতে টাটকা গব্য ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ২ নাকে ২টী বাতি আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে ঐ বর্ত্তিকার আকর্ষণে নাসারন্ধ্র হইতে পোকা বাহির হইয়া ঐ বাতিতে কামড়াইয়া ধরিলে ঐ বাতি টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ করিলে কৃমীরোগ শান্তি হয়।

মতান্তরে প্রলেপ :—

কাল মুরগীর ডিমের কুসুম, ময়দা, মেটে সিন্দুর, ও গব্যঘৃত সম পরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি নেকড়ায় মাখাইয়া ঘাড়ে বাঁধিয়া দিতে হইবে—৩।৪ দিন ব্যবহার করিলে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।

[কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি]

—:o:—

প্রতিষ্ঠার কথা।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের শ্রীসাধনকল্পে গত আট বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন প্রথিত নামা কবিরাজের চেষ্টায় এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন।

উদ্দেশ্য।

হিন্দু রাজত্বের পরে, এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময়ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ বড় বড় উদ্যান-বাটিকায় নানাবিধ ভেষজগুল্ম লতাদি উৎপন্ন করাইয়া সর্ব্বদা পরীক্ষা করিতেন। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কতক সংখ্যক ব্যক্তিকে রাজা বিশিষ্ট চিকিৎসকদিগকে দান করিতেন। তাঁহারা উহাদের উপর বিষ প্রয়োগ এবং অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ব্যবস্থা করিতেন। এ প্রথা হয় ত নিষ্ঠুর ছিল, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যে নানা দিক দিয়া উন্নতি সাধিত হইতেছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। যে বিদ্যা উন্নতিশালিনী, তাহা কখনও বাহিরের বিরুদ্ধে অর্গল বন্ধ করিয়া রাখে না। মহানদী, মহাসমুদ্র, পৃথিবীর যাবতীয় আবর্জ্জনা বহন করিয়াও আত্মবলে পুষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু কূপোদক পাছে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহাকে সর্ব্বদা বাহির হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন হয়। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্র এখন সেই কূপোদকে পরিণত হইয়াছে।

এদিকে প্রতীচ্য দেশ সমূহে, জীবন পণ করিয়া বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। আমরা আমাদের চিকিৎসা

শাস্ত্রকে, তাঁহাদিগের নিকট হইতেও বাঁচাইয়া চলিতেছি। অধুনা শল্যবিদ্যা ও শারীর বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূতরূপে অগ্রসর হইয়াছেন, হিন্দুরা এক সময়ে এই সকল বিদ্যার আবিষ্কার কর্ত্তা হইলেও এখন নিতান্ত পশ্চাদপদ হইয়া, নিম্নশ্রেণীর উপর ঐ বিদ্যার অতি সামান্য আলোচনার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, সুতরাং সুশ্রুতের নানারূপ সূক্ষ্ম অস্ত্র ও যন্ত্রাদির স্থলে এখন নরসুন্দরের নরুণই এক মাত্র আশ্রয় স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের শারীর ও অস্ত্রবিদ্যা যাহা এখন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহার উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ ডাক্তারদিগের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের অর্গলবদ্ধ না করিয়া, তাঁহাদিগকেও আমাদের আয়ুর্ব্বেদের শ্রীসাধনের সাহায্যার্থ সমাদরে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের ছাত্রগণ এখন আর ক্ষত চিকিৎসার ভয়ে ডাক্তারকে ডাকিয়া নিজেরা সরিয়া পড়েন না। কবিরাজি ঔষধাদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া আমরা সাধ্যানুসারে নব আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি। বিদ্যালয়ে শবচ্ছেদের ব্যবস্থারও আয়োজন চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত বহু চিকিৎসক আমাদের বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছেন। এলোপ্যাথি প্রভৃতির যাহা কিছু গৌরব,—আমদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র তাহা আয়ত্ত করিবে, অথচ আমাদের দেশীয় চিকিৎসার গৌরব ও বিশেষত্ব নষ্ট হইবে না—এই পণ করিয়া বিদ্যালয়ের হিতৈষিগণ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

ইতিহাস।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গত আট বৎসর পূর্ব্বে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন ইহার ছাত্র সংখ্যা সামান্যই ছিল। অধ্যাপকও সেই হিসাবে অল্প সংখ্যকই ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাগণ নানারূপ ভেষজ গুল্ম লতা ও জীব কঙ্কালাদি এতদর্থে সংগ্রহ করিয়া পাঠার্থী দিগের কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারণ করেন। অধুনা ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়াছে, অধ্যাপকও ১৭।১৮ জন নিযুক্ত হইয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি ছাত্র আমাদের বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অধীনে আয়ুর্ব্বেদীয় উপায়ে চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করিয়া, মাসিক ৪।৫ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমাদের ছাত্র যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে এই বিদ্যালয় যে বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদচর্চ্চারকেন্দ্র স্বরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিদ্যালয়ের গণ্ডী শুধু বঙ্গদেশে আবদ্ধ নহে। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর এমন কি স্বাধীন নেপাল ও সুদূরস্থিত সিংহল প্রভৃতি স্থান হইতেও বন্যার মত ছাত্র প্রবাহ এই বিদ্যালয়ে আসিতেছে। দিল্লী ও লাহোরের আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সমূহের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহাদের শিক্ষা সমাধানের জন্য তদ্দেশীয় ছাত্রগণ এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। আমাদের এই বিদ্যালয়ে —বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ এবং এম, এ, পাস করিয়া বহু কৃতবিদ্য ছাত্র পড়িতেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই মিলন-মন্দিরে, আয়ু-

র্ব্বেদ বিদ্যা প্রভূত শ্রীশালিনী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছেন। আশা করা যায়, অচিরে এই বিদ্যাচর্চ্চাসভ্ব বহুসংখ্যক ভারতীয় যুবকের কর্ম্মক্ষেত্রের ভিত্তি ও জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইবে।

প্রার্থনা।

এ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় লইয়া খুব জোরে ঢেঁড়ি পিটান হয় নাই। কর্ম্মিগণ অনেকটা নিঃশব্দেই কাজ করিয়া আসিতেছিলেন, এখন আমাদের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের নিকট আমাদের উপস্থিত হইবারও সময় হইয়াছে। আমাদের দেশে কোনও সুবোধ উদ্যম হইলে, সাহায্য করিবার লোকের অভাব হয় না। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আমাদিগকে বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন। সম্ভবতঃ এই দানের পরিমাণ তাঁহারা বাড়াইয়া দিবেন। কলিকাতার উপকণ্ঠে বিস্তৃত শ্যামবাজার পার্কের সম্মুখে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি আমাদিগকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এক বিঘা এগারো কাঠা জমি দান করিয়াছেন, কয়েক দিবসের মধ্যেই আমাদের হিতৈষিগণ দুইলক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু আরও অনেক চাই, শুধু অধ্যয়ন ও ছাত্র নিবাসের জন্য নহে, আমরা বিস্তৃত ভাবে যে হাসপাতাল স্থাপন করার পরিকল্পনা করিয়াছি ও শারীর বিদ্যা চর্চ্চার জন্য কর্ম্মশালার আয়োজন করিতেছি তাহাতে প্রভূত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের দরকার। মার্টিন কোম্পানি এতদর্থে প্রায় তিন লক্ষ টাকার এষ্টিমেট দিয়াছেন, এ শুধু বিদ্যালয়ের জন্য। হাসপাতালাদির জন্য আরও ২।৩ লক্ষ টাকার দরকার। আমরা ভিক্ষার ঝুলি লইয়া এতদর্থে সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমাদের কর্ম্মে বিশ্বাস আছে ও সাধারণের অনুকম্পায়ও আস্থা আছে। আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করি, আমাদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম, এই কর্ম্মক্ষেত্রকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইবে এবং ইহার শুভ পরিণাম অব্যাহত থাকিবে। বিন্দু বিন্দু লইয়াই সমুদ্র। আমরা ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিব না। আমরা যেরূপ রাজা মহারাজা ও অপরাপর বড়লোকদিগের দ্বারস্থ, সেইরূপ সামান্য গৃহস্থের নিকটও সাহায্যপ্রার্থী। আশা করি, এই মহৎ অনুষ্ঠানে যিনি যাহা পারেন, তিনি সাধ্যানুসারে তাহা দান করিয়া এই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবেন।

আমাদের কাণ্ডারী।

শ্রীযুক্ত অনরেবল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কে, টি, সি, এস, আই মহোদয় এই বিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাষ্টির এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস মহাশয় কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি। প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট—প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সাহায্যপ্রার্থী। সশ্রদ্ধ ভাবে অতি সামান্য দানও আমরা কৃতার্থ হইয়া গ্রহণ করিব।

দুইটি বনৌষধি।

পর্প্পট—ক্ষেৎপাঁপড়া, হিং—পীৎপাঁপড়া

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

ক্ষেৎপাঁপড়া বর্ষা শেষে জন্মিয়া শরতকালে পুষ্ট হয় এবং গ্রীষ্মকালে মরিয়া যায়। ইহা কিঞ্চিৎ আর্দ্র ভূমিতে জন্মে। মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহার লতাগুলি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, জমির সহিত লতাগুলি সংলগ্ন থাকে, পত্রগুলির আকৃতি, তেঁতুলের পত্রের ন্যায় তেতুল পত্র হইতে কিঞ্চিৎ লম্বা ও কোমল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত বর্ণের পুষ্প হইয়া থাকে।

ক্ষেৎপাঁপড়া—পুরাতন জ্বরের একটা মহৌষধ। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহা নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাচন, স্বরস ঘুসুড়া ও ঔষধের সহপানে প্রয়োজ্য।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ক্ষেৎপাঁপড়া—ক্ষেৎপাঁপড়া, গুলঞ্চ, কটকী ও হরীতকী সমভাগে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে জ্বাল দিবে, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঐ কাথ প্রত্যহ প্রাতে পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাঁপড়া, আদা, পান, সেফালিকা পত্র—প্রত্যেক সম পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শিলায় কুট্টিত করিবে, একখান কলা পাতায় উহা মোড়ক করিয়া কাঠকয়লার অগ্নির উত্তাপে সেঁকিয়া লইবে, ঐ পাতড়া খানি রাত্রিতে অনাবৃত স্থানে বাহিরে রাখিয়া দিবে, পর দিবস প্রত্যুষে ঐ কুট্টিত দ্রব্যগুলি পেষণ করিয়া উহার রস বহির্গত করতঃ ঐ রস সহপানে অবস্থা দৃষ্টে "চন্দনাদি লৌহ", পুট পাক বিষম জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি পুরাতন জ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন পুরাতন জ্বরের উপশম হইয়া থাকে। ইহাকে "ঘুসুড়া" সহপান বলে।

রক্তপিত্তে—ক্ষেৎপাঁপড়া

ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ, স্বরস, কল্ক শীত কষায় রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকারী।

পিত্ত প্রধান জ্বরে ক্ষেৎপাঁপড়াঃ—পৈত্তিক জ্বরে একমাত্র ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ জ্বরনাশক।

বমন রোগে ক্ষেৎপাঁপড়া—জ্বরে বমন হইলে ক্ষেৎপাঁপড়ার কাথ মধু সহযোগে পান করিলে বমন নিবৃত্তি হয়।

আকনাদি, হিং পাড়,

অতিসারে আকনাদি.

গোদুগ্ধ জাত দধির সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া প্রাতে সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। আকনাদি মূলের পরিমাণ চারি আনা ওজনে গ্রহণ করিবে।

অর্শে আকনাদি—ঘোলের সহিত আকনাদির মূল পেষণ করিয়া সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

লবণ মেহে আকনাদি

যাহার লবণ মেহ হইয়াছে তাহার পক্ষে আকনাদির মূল ও অগুরুর কাথ বিশেষ উপযোগী।

আকনাদি জ্বর রোগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা মূত্রকারক, অতিসার নাশক, মূত্রাশয়ের প্রদাহ নিবারক।

অন্তর্বিদ্রধির অপক্ক অবস্থায় আকনাদির মূল মধুর সহিত পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্বিদ্রধি পাকিয়া বিলীন প্রাপ্ত হয়।

সুখ প্রসবে আকনাদি—গর্ভস্থ সন্তানের মস্তক যোনিমুখে আগত হইয়াও যদি অবিলম্বে প্রসব না হয়, তাহা হইলে আকনাদির মূল পেষণ করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে অনতিবিলম্বে সন্তান ভূমিষ্ট হইবে।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বৃদ্ধের বচন।

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি-এ]

—:০:—

একদিকে গো রোগের জ্বালায়,
 অর্দ্ধমৃত গরীব দেশ ;
অন্যদিকে ধর্ম্মনীতি,
 শুচিসংযম নাহি লেশ।
এই ত মোদের অকাল বিয়োগ—
 প্রবল কারণ দেখ্‌ছি ভাই,—
কুনীতি করে মনটী নরক,
 পচায় দেহ ভস্ম ছাই।
মাথার খাটুনি বেড়ে গেছে
 পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণ,—
বাল্য হ'তে কদভ্যাসে
 কাঁচা বাঁশে লাগে ঘুণ।
দেশে যে নাই ভাল খাবার,
 ঘৃত, দুগ্ধ, মৎস্য, ফল—
কি ক'রে হবে দীর্ঘ জীবন ?
 কি ক'রে হ'বে বীর্য্যবল ?
পুঁজি মূলধন জমার খবর
 রাখ্‌লিনা রে মূঢ় দীন!

তাইত তোরা স্বাস্থ্য শক্তি—
 তেজকান্তি মেধাহীন॥
আয় বুঝে না ক'র্‌লে রে ব্যয়
 ক'দিন পুঁজি থা'ক্‌বে তোর,
বেহুঁস হ'য়ে খরচ করিস,
 ঠিক যেন রে নেশাখোর!
শক্তি বলের অপচয়টি
 সইতে নারেন ভগবান্‌ ;
তাইত তোদের অকাল মরণ—
 এ যে তাঁরই শাস্তিদান।
এম্নি খাওয়া পরার উপর
 অতিরিক্ত শ্বাসের ব্যয় ;—
অজপা যে ফুরিয়ে এল,
 জীবন-কোষটা কিসে রয় ?
ঘোড়ার মুখেও দানা দেবে,
 তবেই তো সে ছুটবে ভাই,
দেহবাজীর খোরাক বিনা
 দেহের সুখটা কিসে চাই ?

ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়াও যারা
তারাও বিরাম খানিক লয়,
তোমার যে ভাই নাহিক বিরাম
কিসে তোমার দেহ রয়?.

মাথার খাটুনি কমিয়ে দিয়ে
দেহের দিকে নজর দাও,
জ্ঞানের মূলে প্রেমের বারি
ঢালো,—যদি স্বাস্থ্য চাও।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

হৃদযন্ত্রের কার্য্য।

মানুষ যদি তাহার হৃদযন্ত্রের কার্য্য সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিত ও বুঝিত তাহা হইলে মানুষের জীবন দীর্ঘ হইত। প্রত্যেক মানুষের নিজের হস্তের মুষ্টি অপেক্ষা হৃদযন্ত্রের আকার বড় নহে। ফুসফুসের পার্শ্বে বুকের সম্মুখ ভাগে দুইটি থলিয়ার মধ্যে হৃদযন্ত্র অবস্থিত।

হৃদযন্ত্রের প্রায় সমস্ত অংশই আঁশযুক্ত পেশী দ্বারা প্রস্তুত। কিন্তু ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, মধ্যে গহ্বর আছে। অন্যান্য পেশীর ন্যায় ইহাও সঙ্কুচিত হয় কিন্তু এই পেশীর মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহার জন্য ইহার নানা অংশ নির্দ্দিষ্ট সময়ে এবং ঠিক পরে পরে উহাদিগের সঙ্কোচন হয়। দেখা গিয়াছে যে যদি কোন জীবন্ত প্রাণীর হৃদযন্ত্র তাহার শরীর হইতে বাহির করিয়া লওয়া হয়, তবে কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য ঐ হৃদযন্ত্র শরীরের অভ্যন্তরে যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকে।

এই নিয়মিত সঙ্কোচনের ফলে হৃদযন্ত্র হইতে চাপ প্রাপ্ত হইয়া দুই দিকে রক্ত প্রবা-হিত হয়। একদিকের রক্ত বড় ধমনী সকলের দিকে যায়। তথায় ইহা বাধা প্রাপ্ত হয় এবং অপরদিকের রক্ত হৃদযন্ত্রের অপর ভাগে যায়। তথায় অল্পই বাধা পায়। তথা হইতে রক্ত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয় এবং এইরূপে শরীরকে খাদ্য প্রদান ও পুষ্ট করে।

যে সকল স্থিতিস্থাপক নল দিয়া রক্ত গমনাগমন করে তাহাদিগকে ক্ষুদ্র ধমনী ও শিরা বলে। উহার রক্তে পূর্ণ থাকায় হৃদযন্ত্র যখন নূতন রক্ত তথায় প্রবা-হিত করে তখন উহা তথায় প্রবাহিত করিবার জন্য হৃদযন্ত্রকে জোরে চাপ দিতে হয়। এই রক্ত হৃদযন্ত্র কর্ত্তৃক একবার চাপ পাইয়া বাধা পাইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ ধমনীতে রক্ত ফিরিয়া যাহাতে আসিতে না পারে সেজন্য বাধা দিবার যন্ত্র আছে। হাতের কব্জীর নাড়ীতে হাত দিলেই হৃদযন্ত্র কিরূপভাবে কার্য্য করিতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইস্থানে যে নাড়ী অনুভূত হয় তাহা হৃদযন্ত্রের চাপের দ্বারা প্রবাহিত রক্তের জন্য। হৃদযন্ত্র হইতে চাপ প্রাপ্ত রক্ত বহির্গত হইয়া ধমনী দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তের নলে যায় এবং তাহা হইতে শিরা বাহিয়া পুনরায় হৃদযন্ত্রে পৌছে। আমরা হৃদযন্ত্রের চলা এবং নাড়ীর গতি বুঝিতে পারি,

এমন কি শুনিতেও পাই। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ঘোড়ার মত প্রাণীর শরীরে হৃদযন্ত্র হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যাইয়া পুনবায় হৃদযন্ত্রে প্রবেশ করিতে অর্দ্ধমিনিট সময় লাগে।

হৃদযন্ত্র কিরূপ আশ্চর্য্যজনক কার্য্য করে তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। প্রত্যেক মানুষের বুকের অভ্যন্তরে গড় পড়তায় এই যন্ত্র মিনিটে ৭৫ বার চলে অর্থাৎ ঘণ্টায় ৪৫০০ বার চলে। হিসাব করিলেই দেখা যাইবে যে দৈনিক ১০৮০০০ বার কিম্বা বৎসরে ৩৯০০০০০০ বার চলে এবং যদি মানুষ ৭০ বৎসর বাঁচে তবে ২০৭০০০০০০০০০ বার হৃদস্পন্দন হয়। পৃথিবীর মানুষের সমষ্টি ১,৭০০০০০০০০ হইলে সমস্ত মানবগণের হৃদযন্ত্র প্রতি মিনিটে ১২৭০০০,০০০,০০০ বার চলে অর্থাৎ এই বৃহৎ মানবজাতির হৃদযন্ত্র সকল প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০০০০০০০০ বার চলে।

আমাদিগের হৃদযন্ত্র চারটি বিভাগে বিভক্ত। ইহার দুইটিতে রক্ত জমে, তাহা হইতে রক্ত বাহির হইয়া অপর দুই বিভাগে আসে, তথা হইতে চাপ পাইয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। যখন এই দুইটি বিভাগ সঙ্কুচিত হয় তখন ইহার প্রথম বিভাগের অপরিস্কৃত রক্ত চাপদ্বারা ফুসফুসে প্রবাহিত করে, তথায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া রক্ত পরিস্কৃত হয় এবং অপর বিভাগ এই পরিস্কৃত রক্ত সমগ্র শরীরে প্রবাহিত করে। যখন হৃদযন্ত্র চলে তখন দশ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত হৃদযন্ত্র কর্ত্তৃক চাপ প্রাপ্ত হইয়া তীরবেগে বহির্ভূত হয়।"

এই হিসাবে এক মিনিটে ৭৫ বার হৃদযন্ত্র চলিলে ৭৫০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত করে। অর্থাৎ প্রতিঘণ্টায় ৪৫০০০ ঘন ইঞ্চি প্রতিদিন ১,০০০,০০০ ঘন ইঞ্চি ও বৎসরে ২২৫০০০ ঘন ফুট পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃদযন্ত্র যদি জল তুলিবার জন্য পম্প হইত তাহা হইলে এক বৎসরে ১৯৬০০০ মণ জল উপরে তুলিত। মাত্র মুষ্টির মত বড় একটি ক্ষুদ্র পেশীর দ্বারা এতটা কার্য্য হয় ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। বৎসরে যতটা রক্ত হৃদযন্ত্র কর্ত্তৃক পাম্প করা হয়, তাহা যদি একটা জলাধারে রাখা যাইত তবে তাহা ৬১ ফুট লম্বা ৬১ ফুট চওড়া এবং ৬১ ফুট উঁচু হইত অথবা বৃত্তাকার কোন জলাধারে রক্ত রাখিবার ইচ্ছা করিলে ৫০ ফিট ব্যাস, ১১৫ ফিট উচ্চ জলাধারের প্রয়োজন হইত এবং তাহাতে ১,৭০০,০০০ গ্যালন জল ধরিত। (প্রতি গ্যালন প্রায় তিন সের দশ ছটাক) পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হৃদযন্ত্র একত্র করিলে ৪৮১ ফুট উঁচু হয়,—ইজিপ্টের পিরামিডও এত উঁচু। সকল মানবের হৃদযন্ত্র একবৎসর একত্রে যে কার্য্য করে তাহাতে ৭২'৯৪০ ফুট উচ্চ, ৭২৮৪০ ফুট লম্বা ও ৭২,৮৪০ ফুট চওড়া এক বৃহৎ পুষ্করিণী জলে পূর্ণ করা যায়। হিমালয়ের গৌরীশৃঙ্গ ২৯০০০ ফুট উচ্চ, সেই হিসাবে ঐ পুষ্করিণী গৌরী শৃঙ্গের আড়াই গুণ বেশী উচ্চ হইবে। সঞ্জীবনী।

বঙ্গে লোকক্ষয়।

(১৩২১ সালের আদমসুমারী অনুসারে)

জেলার নাম	জেলার পরিমাপ বর্গমাইল হিসাবে	প্রতি বর্গ-মাইলে লোকের বসতি	প্রতি জেলায় গ্রামের সংখ্যা	প্রতি শত স্ত্রীলোকের জন্মে পুরুষের জন্মের হার	প্রতি শত স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা	প্রতি সহস্র লোকের মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হারের আধিক্য
বর্দ্ধমান	২৭০৬	৫২২ জন	২৮১৭	১০৭	১০৯	৭'১
বীরভূম	১৭৫৩	৪৮৩ ,,	২৫০২	১০৬	১১১	৫'০
বাঁকুড়া	২৬২৫	৩৮৮ ,,	৪০০৩	১০৬	১০৬	৬'৮
মেদিনীপুর	৫০৫৫	৫২৮ ,,	১০৩৫১	১০৫	১০৩	৪'৪
হুগলী	১১৮৮	৯০৯ ,,	২১৯৭	১০৯	১০৭	৬'০৯
হাবড়া	৫৩০	১৮৮২ ,,	৮৬৩	১১১	১১২	২'২
২৪ পরগণা	৪৮৫৬	৫৪১ ,,	৩৪২৭	১১০	১১৭	৭'৩
কলিকাতা	২১	৪৩২৩১ ,,	১	১১৬	১০৭	১৪'৪
নদীয়া	২৭৭৮	৫৩৫ ,,	২৩১৩	১০৬	১০৯	১০'৫
মুর্শিদাবাদ	২১২১	৫৯৫ ,,	১৯৭৪	১০৬	১১০	×
যশোহর	২৯০৪	৫৮৩ ,,	৩৬১৩	১০৫	১০৮	১১'৭
খুলনা	৪৭৩০	৩০৭ ,,	২০১১	১০৭	১১১	×
রাজসাহী	২৬২০	৫৬৯ ,,	২৪৪৮৭	১০৫	১০৬	৯'২
দিনাজপুর	৩৯৪৬	৪৩২ ,,	৬৬১২	১০৬	১১১	×
জলপাইগুড়ি	২৯৩১	৩১৯ ,,	৭২২	১০৬	১১১	×
দার্জ্জিলিং	১১৬৪	২৪৩ ,,	৩০৪	১০১	১০৮	১৩'৫
রঙ্গপুর	৩৪৯৬	৭১৭ ,,	৪১০২	১০৪	১০৭	×
বগুড়া	১৫৪৯	৭৬০ ,,	২৭৮০	১০৯	১১০	৯'৭
পাবনা	৬৭৮	৮২৮ ,,	২৫৩৯	১০৫	১১৫	৬'৩
মালদহ	১৮৯৩	৫৩৮ ,,	২২৩৯	১০৪	১১৯	×
ঢাকা	২৭২৩	১১৪৮ ,,	৪৭৩৭	১০৮	১০৯	২'৮
ময়মনসিংহ	৬২৩৮০	৭৭ ,,	৭৩৫৪	১০৮	১০৯	×
ফরিদপুর	২৩৭১	৯২৯ ,,	৩৩৬৩	১০৯	১০৬	৮'৪
বাখরগঞ্জ	৩৪৯০	৭৫২ ,,	২৯৯০	১০৮	১১৫	×
চট্টগ্রাম	২৪৯৭	৬৪৫ ,,	৮৭০	১১০	১০৩	×
নোয়াখালী	১৫১৫	৯৭২ ,,	১৭১৯	১১০	১০৫	×
ত্রিপুরা	২৫৬০	১০৭২ ,,	৪০১৮	১০৯	১১৩	×
সমগ্রবঙ্গ	৭১১০৫	৬৪৮ ,,	৮৪৭২৪৮	১০৭	১১০	২'১

—"সঞ্জীবনী।"

আয়ুর্ব্বেদে হাতুড়িয়া।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

অনেকেই দেখিয়া শুনিয়া কবিরাজ; তাঁহারাই হাতুড়িয়া নামে অভিহিত। আর এক শ্রেণীর কবিরাজ আছেন তাঁহাদিগকে "পাজড়ার কবিরাজ" বলিয়া থাকে, ইঁহারা কবিরাজের কাছে থাকিয়া কেবল পুঁথির পাতা উল্টাইয়া থাকেন, ইঁহারা সংস্কৃত জানেন না, বাঙ্গালা বা অন্যান্য ভাষাও কিছু যে জানেন তাহাও মনে হয় না। ইঁহারা পাড়াগাঁয় গিয়া স্বীয় বাক্য বলে দু'পয়সা রোজগার করিয়া খান। আজকাল এইরূপ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক গ্রামে গ্রামে পাওয়া যায়। একটী হোমিওপ্যাথিক বাক্স ও একখানা পুঁথি হইলেই তাঁহারা ডাক্তার সাজেন, পল্লীগ্রামে এইরূপ চিকিৎসকের অভাব নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত কবিরাজের স্থান তাঁহারা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। চিকিৎসা একবারে না করিলে যে সকল রোগী বাঁচে, ইঁহাদের চিকিৎসায় সেই সকল রোগীই বাঁচে, কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রমও যে না হয় এমন নহে। কোন কোন স্থলে এইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চিকিৎসকেরা এইরূপ ভাবে সমাজ মধ্যে প্রতিভাশালী হইয়া উঠেন, এসম্বন্ধে একটী প্রাচীন গল্প মনে পড়িল :—

কোন কবিরাজের এক পুত্র। তাহাকে পিতা শাস্ত্র পড়াইয়া কবিরাজ করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যুকালে তাহাকে কিছু কিছু ঔষধ বলিয়া যাইবেন ভরসায় কবিরাজ—পুত্রকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি "কালা দানা ও সোণামুখী" বলিতেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া গেল—অন্য কিছু বলিতে পারিলেন না। পুত্র মনে করিলেন আমি মস্ত কবিরাজ হইয়াছি। বাবা এই ঔষধ বাটিয়া রোগীকে খাইতে দিতেন। আমাকেও তাহাই দিয়া গিয়াছেন।

কিছুদিন পরে আর কেহ তাহাকে ডাকে না। একদা একব্যক্তি তাহার গরু হারানর জন্য কবিরাজ পুত্রের নিকট উপায় করিতে আসিল। কবিরাজ মহাশয় কোন কোন স্থলে জ্যোতিষের কথা আলোচনা করিয়া গণিয়া অনেক কথা বলিতেন। কবিরাজ-পুত্র তাহাকে কালাদানা ও সোণামুখী খাইতে দিয়া কহিলেন "তোমার গরু পাইবে, তোমার বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে গিয়াছে। সে বাড়ী যাইতে না যাইতে এই ঔষধ খাইয়া তাহার দাস্ত হইল, সে বটী লইয়া মলত্যাগে বসিয়াই দেখিতে পাইল তাহার গরু বেতাল ঝোপে রশি জড়াইয়া আটক রহিয়াছে। গরু পাইয়া গৃহস্থ মনে করিল কবিরাজ অপেক্ষা কবিরাজ পুত্র ভাল, কবিরাজ পুত্রের অপূর্ব্ব ক্ষমতা, ক্ষণ বিলম্বেই ইহা সেই গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ক্রমে এ সংবাদ রাজ বাড়ীতে পঁহুছিল, রাণীর সুবর্ণ হার সেই সময় হারাইয়াছে। কবিরাজ পুত্রের নিকট সংবাদ পঁহুছিলে তিনি তাহার ঐ অপূর্ব্ব ঔষধ খাইতে দিলেন, রাজা সেই ঔষধ খাইয়া পায়খানায় গেলেন, দৌড়িয়া যাইতে যাইতে ভৃত্যকে জল লইয়া আনিতে কহিলেন কিন্তু ভৃত্য জল আনিতে বিলম্ব করায়

তিনি তাহাকে পাদুকা দেখাইয়া ভয় দেখাইলেন। ভৃত্য মনে করিল "এইরে এইবার সেরেছে, আমি যে হার চুরী করিয়াছি তা বুঝি জান্তে পেরেছে।" ভৃত্য প্রণিপাত করিয়া কহিল, "হুজুর এ যাত্রা মাপ করুন, আমি এখনই হার আনিয়া দিতেছি।" কবিরাজ পুত্রের নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চারি দিকেই তা'র ডাক, তা'র ঔষধও সেই একমাত্র সধন কালাদানা ও সোনামুখী—জোলাপের ঔষধ।

এক দিন সংবাদ আসিল, যুদ্ধ প্রয়াসী হইয়া রাজার রাজ্য দখল করিতে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজার ঐ কবিরাজ পুত্রের কথা মনে হইল, তিনি তাহাকে ডাকিলেন। কবিরাজ পুত্র আসিয়া তাহার ঐ অব্যর্থ মহৌষধের ব্যবস্থা করিলেন। গাড়ীগাড়ী কালাদানা ও সোণামুখী আসিয়া হাজির হইল, ঢেকিতে কুটিয়া তাঁহার সৈন্য দিগকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, প্রতিপক্ষকে বলিয়া দেওয়া হইল, আমাদের সৈন্যগণের প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ হইলেই যুদ্ধারম্ভ হইবে।

এদিকে এ পক্ষের অল্প সংখ্যক সৈন্য হইলেও তাহারা অতি প্রাতঃকাল হইতেই ক্রমে পায়খানায় যাইতে থাকিল, এবং দুইপ্রহর অতীত হইলেও তাহাদের এই কর্ম্ম চলিতে লাগিল, অপর পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য হইলেও তাহারা ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল, ভাবিল না জানি ইহাদের কত সৈন্য। জোর কপালে থাকিলে এইরূপই হয়। লোকে বলে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহন করেন।

আর এক শ্রেণীর হাতুড়িয়া আছেন, তাঁহারা কবিরাজের নিকট থাকিয়া অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসক হইতে চাহেন। রোগীর যেরূপ অবস্থায় যে ঔষধ কবিরাজ দেন বা যেরূপ অনুমান করিয়া ঔষধ দেন তাঁহারাও সেইরূপ করেন।

আর একটী গল্প মনে পড়িল :—

একদা কোন কবিরাজের কোন রাজ বাড়ীতে ডাক পড়িল, সঙ্গে তাঁহার ছাত্র। কবিরাজ মহাশয় রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলিলেন "আপনি কুপথ্য করিয়াছেন।" রোগী বলিল "না কই?" কবিরাজ ঘরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "আজ্ঞে আপনি কমলা খাইয়াছেন।" পরে রোগী বলিল, "হাঁ তাই।" রোগীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলে ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল "কেমন করিয়া নাড়ী ধরিয়াই বুঝিলেন যে রোগী কমলা খাইয়াছে?" কবিরাজ বলিলেন "ইহা অনুমান চিকিৎসা, আমি রোগীর ঘরে কমলার বাকল দেখিয়াই এইরূপ অনুমান করিয়াছি।" ছাত্র মনে করিল "তবে আমি অনুমান চিকিৎসায় প্রাজ্ঞ হইয়াছি।" ইহার পর কবিরাজ সেই রোগী দেখিতে একদিন ছাত্রকে পাঠাইলেন। সেই দিন তদ্রূপ ভাবে রোগীর নাড়ী টিপিয়া ছাত্র বলিলেন "আপনি কুপথ্য করিয়াছেন।" রোগী বলিল "না কই?" ছাত্র, রোগীর ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া জুতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া কহিলেন—"আপনি জুতা খাইয়াছেন।" ইহার পর রোগীর গৃহ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। ফলে বুদ্ধি না থাকিলে সংসার ক্ষেত্রে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া যায় না।

আর এক প্রকার হাতুড়িয়া আছেন তাঁহারা কেবলই শিক্ষা দাতার অনুকরণ করেন, বুদ্ধি না থাকিলে অনেক সময় সমূহ কুফল জন্মে। একদা এক চিকিৎসকের সঙ্গে ছাত্র চলিয়াছে, এক গ্রামে এক গৃহস্থের নিকট গিয়া কবিরাজ এক গলা ফুলা উট্র পাইলেন। গৃহস্থ কবিরাজকে সে উট দেখাইলে তিনি কহিলেন "আমি ভাল করিতে পারিব।" তার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "উট কাহা গিয়া'? গৃহস্থ উত্তর করিল "জঙ্গলমে গিয়া।" কবিরাজ বলিলেন "ক্যা খায়া"? গৃহস্থ কহিল "কাটা কুটা খায়া।" কবিরাজ বলিলেন "ল্যাও একঠু শীল", তখনই একটী শীল আনা হইল।

কবিরাজ খুব জোরে উটের গলায় ঘা দেওয়ায় অপরদিক দিয়া কাঁটা বাহির হইয়া গেলে উট ভাল হইল। ইহা দেখিয়া ছাত্র মনে করিল, "কবিরাজ মহাশয়ের এই চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছি।" এই ভাবিয়া ছাত্রটী এক গ্রামে গিয়া একটী গলা ফুলা স্ত্রীলোক দেখিয়া মনে করিল, এই আমার উপযুক্ত সুযোগ হইয়াছে। "ছাত্র গৃহস্থকে বলিল "আমি এই রোগী আরাম করিতে পারিব, কতকগুলি মন্ত্র বলা বলির পর একটী শীল আনিয়া দিলেই রোগী আরাম করিয়া দিব।" ইহার পর ঐরূপ মাত্র বলাবলি করিয়া যখন "ল্যাও একঠো শীল"—বলিল, তখনই শীল আসিল, তাহার পর সজোরে আঘাত করিতেই রোগিণী পঞ্চত্ব পাইল। তার পর চিকিৎসকের উপর কি ব্যবস্থা হইল বুঝিতেই পারেন। বুদ্ধি না থাকিলে এইরূপ কবিরাজের অনুকরণ করিতে গেলে ঘোর বিপদ সর্ব্বদাই ঘটে।

একদা এক চক্ষুরোগী কবিরাজের অনুপস্থিতিতে আসিয়া উপস্থিত, রোগী আসিলেই ছাত্র পুস্তক দেখিতে লাগিল এক স্থানে দেখিতে পাইল "চক্ষুরোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্বা কটিং দহেৎ। " ইহা দেখিয়াই ছাত্র লাফাইয়া উঠিল, এইত আমার সুযোগ উপস্থিত, অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত থাকিলেত আর হইবে না, এই বেলা চিকিৎসা করিয়া ফেলি। ছাত্র ভৃত্যকে ডাকিয়া একটা কাঁচি আনিতে ও কয়েকটা টিকা জ্বালাইয়া আনিতে কহিয়া দিল। অনুজ্ঞা মত কাজ হইলে রোগীকে গৃহে নিয়া জোর করিয়া দুই কর্ণ কাটিয়া ফেলিল, রোগীর চীৎকারে গ্রামময় সাড়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কটি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। এই কার্য্যের অব্যবহিত পরেই অধ্যাপক কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন হায়, কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। ছাত্র কহিল, "আমি পুস্তকে ঐ বচন দেখিয়াই করিয়াছি।" কবিরাজ পুস্তক আনাইয়া পুস্তক দেখাইয়া বলিলেন, "অনুধাবন কর নাই বলিয়াই বিপদ ঘটিয়াছে। বচনটীর পরেই ক্ষুদ্রাক্ষরে "ইতি অশ্ব চিকিৎসা" লিখা রহিয়াছে, তাহা না দেখাতেই সর্ব্বনাশ হইয়াছে।" ফলে যে সকল ছাত্র কবিরাজী পড়িতে যান অনেকেই বচনের অর্থ বোধ করেন না আর ভাব ও বুঝেন না। সুতরাং তাহারাই এক করিতে আর করেন, শিব গড়িতে বানর গড়েন। এই সকল চিকিৎসকের সংখ্যা লোপ না পাইলে আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। এসকলের জন্য ছাত্রেরা যত অপরাধী, দেশের লোক ও অধ্যাপকগণ ততোধিক অপরাধী। অতএব আয়ুর্ব্বেদের মান রক্ষা করিতে হইলে সকলকেই সাবধান হইতে হইবে। ব্যবসায়ী লোকের স্বীয় ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ততোধিক সাবধান হইতে হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ | আষাঢ় ১৩৩০ সাল। | ১০ম সংখ্যা।

সোমরস ও তাহার সেবন বিধি।

—:o:—

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে "সোমরস" নামে একপ্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে "সোমরস" শব্দের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে এরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপন্যাস লেখক, নাটককার, কবি, এমন কি ইতিহাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি এবং কোথায় পাওয়া যায়—এ বিষয় লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ সমাজে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মণি এবং কলিকাতা ও বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ৫।৭ বৎসরকাল ক্রমিক তর্কবিতর্ক করেন এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বহুস্থানে পর্য্যটন করেন। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদও করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ঐ সোসাইটির সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল*।

সে যাহা হউক আমরা বহুদিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে বর্ত্তমান প্রস্তাবে তাহা বিশেষ করিয়া প্রতিপাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুদিনের অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অর্থ বলের পর সোমরস সম্বন্ধ আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকটই উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে—এই ভরসায় আমরা এই গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

* Journal of the Asiatic Socicty Bengal.

সোমরস, আর্য্য ঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহা সকল শ্রেণীর লোকদিগেরই সেব্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণই ইহা পান করিত। সংসার ত্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিলনা, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল, যথা—

"যুগে যুগেঽপি কর্ত্তব্যে যোগিনো যোগ সাধনে। পিবেৎ সোমরসং ভদ্রে আয়ুর্ম্মেধা বলপ্রদং।" শিবসংহিতা।

পূর্ব্বকালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত। সোমরস কাহারও গৃহে পান করিবার নিয়ম ছিল না। দেবতা মন্দিরে, কোন পীঠস্থানে না হয় যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্যত্রে পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোনস্থলে সোমরস পান করিবার জন্য অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেইস্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অথবা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত। যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রধান ছিল। অগ্রে সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না। সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমন নহে, কোন কোন যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে দেখা যায়, প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল। সেই সকল যজ্ঞ আবার ১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম ছিল ব্রত। এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, যথা এক কোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্ট কোণী, বৃত্তা এবং দন্তী। বেদীর আকার এই ৬ প্রকার। ইহার মধ্যে এক কোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দন্তী—এই চারি প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নির্ম্মিত হইত, সেইগুলিতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ইহা ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড রাখা হইত। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর একপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সর্ব্ব প্রথমে প্রজ্জলিত অগ্নিমধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোম দেবতার আরাধনা করিবার জন্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইলে, আর্য্যগণ সকলে মিলিয়া সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ ভস্মাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে সোমরস নিক্ষিপ্ত করিয়া সোম দেবতার আরাধনা করিতেন এবং অপরাপর দেবতার নামোল্লেখ করিতেন। "কোন দেবতার উদ্দেশে—যে উপাসনা করা হইত, তাহার অর্থ এইরূপ "হে সোম, তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিব্যরথ সহ উপস্থিত হও। আমরা সোমরস গ্রহণ করি ইত্যাদি।" এই সকল ছন্দোবদ্ধ ঋক্ বা উপাসনার শ্লোক ভক্তি রসার্দ্রচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপগীয়মান স্বর গ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

অতি শুদ্ধ স্বর সংযোগে 'উচ্চারণ বৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রণষ্টশক্তি মনে করিতেন এবং তদ্ধেতু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না।* এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক স্বর ব্যবহার করিতেন, তাহা এই,—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এখনকার উদারা, মুদারা ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিওগ, অনুদাত্ত—ঋওগ এবং স্বরিত কখন কখন ষড়জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের মন্ত্রের উপরে থাকে, তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় তৎকালীন মহর্ষিরা সোমরস আরাধনা কালীন এবং সোমরস পান কালীন পুলকিত চিত্তে গীতবাদ্য করিতেন। বৈদিক বাদ্যের তালের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি। যথা হা, হী হী হা, হা হী হী হী হী হা, হাং হীং বুহা। পম্‌পশো পাং পং হাং উং হুং ইত্যাদি। এই প্রকার গীতবাদ্য করিতে করিতে আমোদে সোমরস পান করা হইত।

যাহা হউক এক্ষণে সোমরস জিনিসটা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়, দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ ইউরোপীয় কুল ও স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। আবার কেহ কেহ বা একেবারে হাস্যকর মতাবলীর সৃষ্টি করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। যাহা হউক সোমরস সম্বন্ধে কতিপয় সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের মত এস্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিলে বোধ হয় অযুক্তি সঙ্গত হইবে না।

পণ্ডিতবর সার উইলিয়ম জোন্স ও হোরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস একপ্রকার বৃক্ষের পাতার রস। সুপ্রসিদ্ধ রাজস্থান ইতিহাস লেখক টড সাহেব নির্দ্দেশ করেন যে, ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূলের রস **। মান্দ্রাজবাসী জনৈক তৈলঙ্গী পণ্ডিত বলিয়াছেন—'গুড়ুচী'—প্রাচীনকালে 'সোমরস' বলিয়া অভিহিত হইত। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধানে, 'বামনহাটী' অথবা 'ব্রাহ্মীশাক'—'সোমলতা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে 'সোমরস' ফল বিশেষের রস মাত্র। ইংলিসম্যান সম্পাদক বলেন, রক্তবর্ণের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, সুগন্ধ এবং অম্ল মধুর †।

---

* Mulrs Sanskrit text,

* ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড—১৮ পৃষ্ঠা।

† The "some" Plant of vedas was the Asclepias Acid of Roxborgh, now known as the twining Plant with few leaves; and with clusters of small and fragrant flowers, It yields a mild acid milky juice and grows in various parts of India." The Englishman, 23nd July 18/8. And also vids Lecture on the Religious suts of India" P 32 by R. N, Datta.

** Greens vedie litereraturе V. I P. 2.

অধ্যাপক গ্রিপ সাহেব গ্রীস দেশীয় সূর্য্যলতার (Sunplant) সহিত এই সোমলতা ও সোম রসের তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ন্যায় কার্য্য করে। এক জন অধ্যাপক বলিয়াছেন—সোমরস কল্পিত দ্রব্য মাত্র। আর একজন মহাত্মা বলেন;—সোমরস চন্দ্র কিরণ!! বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষ জনক, পুষ্টিকারক, রোগনাশক এবং সুমিষ্ট। যথা,—

(ক) প্রবোমিয়ন্ত ইদং বোমৎসরা মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মুষদঃ।

(খ) গয়স্ফানো অমিহা বসু বিৎ পুষ্টি-বর্দ্ধনঃ।

পণ্ডিত কালীবমল সর্ব্বভৌম বলেন,—সোমলতা নামক লতা বিশেষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত ও তরল। * * * ইহা রীতিমত সেবন করিলে মনুষ্য লাবণ্যযুক্ত ও দীর্ঘজীবি হয় এবং প্রভুত ক্ষমতাশালী ও পুষ্টকায় হয়। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন,—"রীতিমত ঔষধের ন্যায় সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ধারণ করে এবং শরীরে প্রকৃত বল হয়। একবার সোমরস সেবন করিয়া একদমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া যায়। * বেদ পাঠে জানা যায়, সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় তরল এবং দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়। বেদের "সন্তে পয়াংসি সমুযন্তু রাজা এবং রাজসুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহস্পতে বৎ তব সোমধাম"—প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়ত্ব এবং জলের ন্যায় তরলত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সোমরস যে সোম নামধেয় এক প্রকার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই লতা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বেদেও ইহা পার্ব্বতীয় বলিয়া কথিত আছে যথা,—"বৎসানোঃ সান্বাকহৎ ভূর্য্য স্পষ্ট কর্ত্ত্বং। তদিন্দ্রোর্থং চেতন্তি যূথেন বৃষ্টি রেজতি। এই সোমরস উজ্জ্বল (Spraking) এবং দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাল্মিকী রাম চন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন, সোম বৎ প্রিয় দর্শনঃ। অর্থাৎ সোমের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্বারা সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর শ্রীত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ অমৃত, মর্ত্ত্যে সেইরূপ সোমরস। যোগ শাস্ত্রে আছে, "পবনাভ্যাস যোগ সাধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়।"

কোন কোনও পণ্ডিত বলেন, 'সোমলতা বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সোমাভাবে পার্থিবামৃতকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।" এই পার্থিবামৃত কি দেখা উচিত। পার্থিবামৃত শব্দে জল বলিয়া লিখিত আছে। অমর কোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) "পয়ঃ কিলালমমৃত মিত্যমর কোষঃ। (খ) অপস্বন্তর মৃতমপসু ভেষজ মপসু তেজঃ প্রশস্ত য়ে দেবঃ ভবতবাজিনঃ। ঋগ্বেদ ১।২৩।১৯ (গ) অপসুমে সোমো অব্রবীদন্ত বিশ্বানি ভৈষজ্যা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং

* Vedio India No IX PP 17-28

আপশ্চ বিশ্ব দৈবজীঃ। '১।২৩।২০ ঋগ্বেদ।" তবে এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল! ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু সোমরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। "সোমাভাবে জলের ব্যবহারের কথাও কোথাও দেখি নাই। অতএব এমনটি বিশ্বাস্য বা যুক্তি সঙ্গত নহে।

জর্ম্মন দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Aseipas Acidia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা কতদূর বিশ্বাস যোগ্য বলিতে পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে পুঁইশাক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথিবীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য দ্রব্যকে ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে হয়। শ্রুতিগ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকা (পুঁই) শাকের বিধি আছে। যথা—"সোমাভাবে পুতিকামভি সুনুয়াৎ।" ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকা বিধানের অনেক শ্লোক আছে। অথর্ব্ববেদের একস্থলে 'পুতিকরঞ্জলতা' সোমলতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে সোমলতার আকার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ বিশ্বাস জন্মে। পুতিকা শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে, সোমলতার তাহাই ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে, যথা, "অপ্যায়স্বমন্দিতম সাম বিশ্বে ভিরৎ ভুভিঃ। ভবানঃ সুশ্রবস্তনঃ সখাবৃধে।" (১৪ অধ্যায়। ১০ সূক্ত) অধ্যাপক হাগ সাহেব পুনা হইতে যে সোমলতা আনিয়াছিলেন তাহার আকার পুতিকা শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আস্বাদ অতীব তিক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। * অনেকে বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা নহে * *।

সে যাহাহউক আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সোমলতার আকার পুঁই শাকের ন্যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কতিপয় পণ্ডিতের সহিত বেলগেছিয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে বানিয়ালাল বাজি নামধেয় জনৈক পার্ব্বত্য দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে কোমল পুতিকা শাকের মত। আমরা ৪।। জনে উহা আস্বাদন করিয়া ছিলাম। তাহার স্বাদ, ঈষৎ অম্ল মধুর বলিয়া বোধ হইল। উহার পত্র পুতিকা শাকের পাতার মত, কিন্তু তত বৃহৎ নহে। আমি ভ্রম বশতঃ উহাকে প্রথমে পুঁইশাক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা পুঁই জাতীয় বটে, বন পুঁয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। * ঐ মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় এক ছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে উহার নেশা হয়। তিনি পূর্ব্বে গাঁজা, চরস এবং অহিফেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা

* Aid Br val 11 P 439

* * Edinburgh Revew val LX No IV.

* History of Thibet by colonel Rayse P. 86 and Buddha in Thibet P. 17.

অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় নাই। মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন আমি তাহা ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষোৎসুতি সভার (* *) বিলাতস্থ পৃষ্ঠ পোষক শ্রীযুক্ত মে সুয়ার্দ হইটলি বড় এবং কোম্পানীকে লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা বটে। (**) সংপ্রতি পাণ্ডুয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী এদিনা মসজিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তিব্বৎ দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তিব্বৎ দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিব্বৎ দেশে ঐ লতার নাম "মানীর"

তত্রত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানীরের যেরূপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুয়ার প্রাপ্য লতা অনেকাংশে তদ্রূপ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জনৈক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া স্বদীয় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অম্ল মধুর। ইহা মাদক, ক্ষুৎ পিপাসোদ্দীপক, উদরের পীড়ানাশক বিষঘ্ন এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে Semila Genia কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আস্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে Genus moilatee বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই মানিবা লাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা-হউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বন পুঁইয়ের মত সে বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল। একণে যত দূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অন্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম অংশুমান, মুঞ্জমান, চন্দ্রমা, রাজত প্রভা, দূর্ব্বাসোম, কনীয়ান, শ্বেতাক্ষ, কণক প্রভা, প্রতানবান, তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গারুড়াহৃত, গায়ত্রাইষ্ট্রৈষ্টুভ, পাঙ্ক্ত, জাগত, শঙ্কর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, ত্রিপদীযুক্তা, গায়ত্রী, উড়ুপাতি। এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না। লতা ও আকারে বড় দীর্ঘ নহে, কিন্তু বড় স্থূল ও সরস। "মহাসোম" নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে। এই সকল লতার পাতা শুক্ল পক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। অমাবস্যাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবলমাত্র লতাবশিষ্ট থাকে। এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রখর হয়।

শাস্ত্রে আছে, হিমালয়, সহ্য, মাহেন্দ্র, মলয়, শ্রী, দেবগিরি, পারিপাত্র, বিন্ধ্য এবং বিতস্তা নাম্নী নদীর উত্তরে যে সকল পর্ব্বত আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায়। সিন্ধু নামক মহানদে কাশ্মীরের মানস সরোবরে, দেবশৃঙ্গ নামক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার

(* *) সোমপ্রকাশ ৯ আশ্বিন ১২৮৪।

(* * *) ভারতীয় গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা।

কথা অথর্ব্ব বেদে দেখা যায়। তবে আছে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বিশেষ মহাবনে কিম্বা কোন বনময় প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোমলতা জন্মায়। পশ্চিম ভারতে সোমতীর্থ নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় সোমলতা জল এবং স্থল উভয় স্থানেই জন্মায়।

জ্বরের কথা।

(শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস)

:o:

"জ্বর" কি? অনেকেরই ধারণা আছে যে, জ্বর একটা ব্যারাম। কিন্তু বাস্তবিক কথা জ্বর ব্যারাম নয়। জ্বর একটা লক্ষণ মাত্র। জ্বর তবে কিসের লক্ষণ? জ্বর দুইটী জিনিষের লক্ষণ—প্রথমতঃ, শরীরের মধ্যে কোনও বিজাতীয় বিষ প্রবেশের লক্ষণ। দৃষ্টান্ত যথা,—হাতে যদি কিছু ফুটিয়া গেল ও ও সে জায়গাটা পাকিল, ত অম্‌নি জ্বর হইবে। পেটের মধ্যে আমাশয় বা গর-হজম বা অপর কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলেই জ্বর হয়। বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া হইলেই জ্বর হয়। দ্বিতীয়তঃ—শরীরে প্রবিষ্ট বিষের প্রতিক্রিয়ার দরুণ যেমন জ্বর হয়, তেমনি মানসিক উদ্বেগ বা উত্তেজনার ফলেও জ্বর হইতে পারে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা, প্রবল ক্রোধ বা দুঃখ, ভয় প্রভৃতির ফলেও, জ্বর হইতে পারে।

আমাদের দেহ সুস্থ অবস্থায় সর্ব্বদাই একই উত্তাপ রক্ষা করিতেছে। অনেকের ধারণা যে, সে উত্তাপটি ৯৮'৪ ফারেন্‌হাইট্। দেশভেদে এই স্বাভাবিক উত্তাপের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশ অপেক্ষা বিলাত অনেক উচ্চে অবস্থিত;—কাজেই বিলাতের উচ্চতা এবং তথাকার বায়ু চাপ বাঙ্গালাদেশের উচ্চতা ও বায়ু-চাপের সঙ্গে সমান নহে। এইজন্য বিলাতের লোকদের স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ ৯৮'৪ হইলেও, এদেশের লোকদের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৬'৪ হইতে ৯৮' এই সংখ্যার মধ্যে। জ্বর হইলে, গা গরম হয়; অথচ, সুস্থদেহে, আমাদের সকলেরই দেহের উত্তাপ একটা নির্দ্দিষ্ট উত্তাপের বেশীও হয় না, কম ও হয় না—৯৬'৪ হইতে ৯৮' এর মধ্যেই থাকে। তবে জ্বরের সময়ে এ অতিরিক্ত উত্তাপ আসে কোথা হইতে? ইহার উত্তরে বলিব—এই নরদেহ আজব কারখানা। এখানে কত কি যে কাজ হয়, কত কি যে সৃষ্ট হয়, তাহা ভাবিলেও অজ্ঞান হইতে হয়। শরীর খুব

গরম বোধ হইলে, আমরা গা খুলিয়া দিই, এবং গায়ে অজস্র ঘাম হইতে থাকে—যেন দেহের সমস্ত জলের কলের মুখগুলিকে এক সঙ্গে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে! আবার শীত বোধ হইলে, আমরা খুব মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকি; অথবা যদি জামা না জোটে, তবে খুব হাত পা নাড়িয়া বা খানিকটা দৌড়িয়া দেহকে গরম করি—অর্থাৎ যেন মাংসপেশী গুলিকে খুব খাটাইয়া উত্তাপের সৃষ্টি করি। এই যে ঘাম দ্বারা দৈহিক উষ্ণতার হ্রাস ও মাংসপেশীকে খাটাইয়া উষ্ণতার সৃষ্টি—এ সবই এই দেহের কাজ। সমস্ত দেহের তাবৎ কাজই মস্তিষ্ক দ্বারা পরিচালিত হয়। আমাদের মস্তিষ্কে তিনটি জায়গা আছে—একটির কাজ, যে যে দৈহিক প্রক্রিয়ায় উত্তাপাধিক্যের সৃষ্টি হয়, তাহাদিগকে খাটান; অপরটির কাজ হইতেছে, সেই সমস্ত উত্তাপকে বাহির করিবার চেষ্টা; তৃতীয়টীর কাজ—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটান। এই দুইয়ের মধ্যে (উত্তাপ জমা ও খরচের মধ্যে) তৃতীয়াংশটি তাপ-সামঞ্জস্য ঘটাইতেছে। এই উত্তাপ-সামঞ্জস্যের ফলে, আমাদের দেহের উত্তাপ সদাসর্ব্বদাই একই থাকিয়া যাইতেছে। মস্তিষ্কস্থ এই উত্তাপ-সামঞ্জস্য-বিধায়িনী কেন্দ্রের গোলযোগ উপস্থিত হইলেই, জ্বর হয়।

জ্বরে কি কি বিপদ হইতে পারে—জনসাধারণের সেগুলি বেশ করিয়া জানা থাকা উচিত। জ্বর হইলেই শরীরে উত্তাপ বাড়ে। অধিক উত্তাপের ফলে, দেহের সুকুমার সকল জিনিসই ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে;—কাজেই জ্বরের প্রথম কুফল—দেহ-ক্ষয় এবং দেহের সমস্ত যন্ত্রের বিকলতা প্রাপ্তি। জ্বর হইলেই মাথায়, যকৃতে (লিভারে), বুকে অত্যন্ত রক্তাধিক্য হয়। মাথায় রক্ত "চড়ার" ফল—এলোমেলো বকুনি (বিকার); বুকে রক্ত জমার ফল, নিউমোনিয়া ইত্যাদি; লিভারে রক্ত জমার ফল—লিভার বড় হইয়া যাওয়া। এইগুলি জ্বরের দ্বিতীয় কুফল। জ্বরের তৃতীয় কুফল—দেহের কোনও কোনও যন্ত্রের কার্য্য ভার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া; অথবা কিয়ৎকালের জন্য একরকম বন্ধ থাকা। জ্বরে শরীরের ক্ষয় হয়; সেই দ্রুত-ক্ষয়িত পদার্থগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিতে যাইয়া, প্রস্রাবের যন্ত্র (Kidney) অনেক সময়ে বিকল হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের যন্ত্র বিকল হইলে, প্রাণনাশের ভয় থাকে। জ্বরের চতুর্থ কুফল—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা। প্লেগ, নিউমোনিয়া প্রভৃতি জ্বরে, হৃৎপিণ্ড সহজেই ভীষণভাবে জর্জ্জরিত হইয়াই প্রাণনাশ ঘটায়। একশো পাঁচের উপরে তাপ উঠিয়া বেশীক্ষণ থাকিলে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে এই ভয়টি খুব বেশী। কচিছেলেদের ও দুর্ব্বল লোকদের পক্ষে, পাঁচ ছয় ঘণ্টা স্থায়ী ১০৬° কি ১০৭° জ্বর প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে। আমি দীর্ঘস্থায়ী, প্রাণান্তক ১০৮ ডিগ্রি জ্বর পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। ম্যালেরিয়া, বাতজ্বর, প্লেগ প্রভৃতিতে, অকস্মাৎ ১০৬ বা ১০৭ ডিগ্রিজ্বর হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

জ্বরের "অপকারিতা" বলিলাম। জ্বরের "উপকারিতা" কিছু আছে কি? আছে বৈ কি। জ্বরই প্রকৃতির প্রধান চেষ্টা—দেহের মধ্যে আগন্তুক জীবাণুগুলিকে পোড়াইয়া মারিবার জন্য। অধিকাংশস্থলেই, দেহের মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করিয়াই জ্বরের উৎপত্তি ঘটায়।

উৎপত্তি ঘটায়, অধিকাংশ জ্বরই জীবাণুজ। জ্বরের জ্বালায় জীবাণুরাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভগবানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! দেহকে বিষ মুক্ত করিবার জন্যই জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব জ্বর দেখিলেই, তাড়াতাড়ি, তাহাকে কমাইতে সকল সময়ে চেষ্টা করা উচিত নয়। কতকগুলি জ্বর আবার "মেয়াদী"—অর্থাৎ নির্দ্দিষ্টকাল স্থায়ী। ম্যালেরিয়া জ্বর সাধারণতঃ ৮।১০ ঘণ্টার বেশী থাকে না; নিউমোনিয়া জ্বর সাধারণতঃ ৫ম, ৭ম, ৯ম, অথবা ১১শ দিবসে আপনিই মগ্ন হয়। টাইফয়েড জ্বর সাধারণতঃ ২১ দিনে ছাড়ে; ডেঙ্গু প্রভৃতি কতকগুলি জ্বর আছে তাহারা কেহ ৩য়, কেহ ৭ম, কেহ ১০ম দিনে ছাড়ে। চিকিৎসা কর আর না কর, ঐ সকল "মেয়াদী" জ্বর আপনার মেয়াদ লইবেই লইবে। জবরদস্তী করিয়া ছাড়াইতে যাইলে, অনিষ্ট হয়। এই জন্য, সুচিকিৎসকগণ সকল সময়ে ঔষধ দিবার জন্য ব্যস্ত হন না। তাঁহারা খালি নজর করিয়া যান—প্রকৃতি দেবী কোন পথে যাইতেছেন। জ্বর আপনিই আপনার কারণ ধ্বংস করে—এই মূলমন্ত্র ধরিয়াই বর্ত্তমান সুচিকিৎসকেরা যা-তা করিয়া বসেন না।

এক্ষণে জ্বরে গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি? জ্বর হইলেই প্রথম কর্ত্তব্য—গোড়া হইতেই রোগীকে শয্যা গ্রহণ করান। জ্বর-রোগী যত গোড়া হইতে শয্যার আশ্রয় লইবে, ততই তাহার জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইবে, অবশ্য মেয়াদী জ্বরের কথা স্বতন্ত্র। গোড়া হইতেই কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া, ভাবনা চিন্তাকে ত্যাগ করিয়া, বিছানায় শুইয়া থাকিলে, জ্বরের প্রকোপ ও স্থায়ীত্ব যেমন কম হইবার কথা, উপসর্গাদি তেমন না হইবার কথা। জ্বর গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইলে বা পরিশ্রম করিলে, জ্বর ছাড়িতে চায় না। (ক্ষয়কাস রোগীর জ্বর সম্বন্ধে এই কথাটী খাটে)।

জ্বরে গৃহস্থের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—গোড়ায় পথ্য লঙ্ঘন দেওয়া। আমরা পুরাতন জ্বরের কথা বলিতেছি না—তরুণ জ্বরের কথাই বলিতেছি। জ্বরে শরীরের ক্ষয় হয় বলিয়া, যদি রোগীকে ভোগসর্ব্বস্ব ইংরাজের মতে তাড়াতাড়ি "পুষ্টিকর" খাদ্য দিতে যাই, তবে কুফল হইবে। কারণ, প্রথমতঃ, জ্বরের প্রকৃতিই এই যে, রোগীর ক্ষুধা থাকে না; দ্বিতীয়তঃ, জ্বরে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, এমন কি পরিপাক যন্ত্রের এত বৈকল্য ঘটে যে, রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ হয়, ক্ষুধা নষ্ট হয়, জিহ্বা ময়লায় ঢাকিয়া যায়, গা-বমি করে। সে রকম অবস্থায়, পাছে রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এই অমূলক আশঙ্কায় তাহাকে কতকগুলা খাবার দেওয়া বড়ই ভুল। ডাক্তারেরা সে ভুল পদে পদে করেন। রোগীত দুর্ব্বল হইবেই—সে দৌর্ব্বল্য—জ্বরের বিষক্রিয়ার ফল—শরীর ক্ষয়ের ফল নয়। এমন অবস্থায়, তুমি পুষ্টিকর খাদ্য দিলেও খাইবে কে, বা হজম করিবে কে? লাভের মধ্যে, গরহজম হইয়া বমি, দৌর্ব্বল্য ও জ্বর বাড়াইয়া দিবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কবিরাজ মহাশয়দের পন্থা বড়ই সুখ্যাতির যোগ্য। জ্বরের অবস্থায়, রোগীরা আপনাআপনিই দুধ পান করিতে চাহেনা, অথচ ডাক্তারেরা চক্ষু বুজিয়া দুধ দিবার ব্যবস্থা করেন। একটু ভাবিয়া

দেখিলে, বাহির হইতে দেখিলে দুধকে যত সহজপাচ্য, তরল ও লঘু পথ্য মনে করা যায়; দুধ ত তাহা নয়,—দুধ যে ডেলা-ডেলা ছানার সমষ্টি! যদি কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করা যায়—"জ্বর হইয়াছে, রোগী ছানা খাইবে কি?" তখনই তিনি শিহরিয়া উঠিয়া, তাহা নিষেধ করিবেন. কিন্তু দুধ পান করিতে বলিবার সময়ে, চিকিৎসকও ভাবেন না, যে, দুধ ছানার সমষ্টি। তরুণ এবং প্রবল জ্বরে দুধ বিষবৎ। আসল কথা এই যে, ডাক্তারেরা যে পাশ্চাত্য-গুরুর নিকট দুধ-পথ্যের গুণাগুণ শিক্ষা করেন, তাঁহারা প্রতি গ্রাসে মাংসপিণ্ড গলাধঃকরণ করেন এবং তিন বেলায় তাঁহাদের ভোজন পাত্রের কাছে তাগাকের ক্ষুদ্র সংস্করণ জমায়েৎ হয়! কাজেই, সে জাতির পক্ষে, দুধ ও ভাত অতি লঘু পথ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ এই খানেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে, দেশী পথ্যাপথ্যকে আমরা অসার মনে করিয়া শ্লাঘা অনুভব করি। দেশী পথ্যাপথ্যের দোষগুণ বিচার করিবার ক্ষমতা না থাকায় লজ্জিত হই না এবং রন্ধন বিষয়ে মূর্খতা বশতঃ দেশী পথ্যকে উড়াইয়া দেওয়াই পরমার্থ জ্ঞান করি। ইংরাজী কেতাবে যে-যে পথ্যের কথা লেখা নাই, বা ইংরাজী কেতাবে যে-যে ভাবে পথ্যাপথ্য ইংরাজ তাহার নিজ দেশকালপাত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে, এ দেশীয় ডাক্তার মহাপ্রভুরা এদেশীয় হইলেও, সে-সে গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারেন না—অন্ততঃ, তাঁহাদের চিন্তা-শক্তি এত পঙ্গু হইয়া যায়, বা মানব-প্রাণটাকে তাঁহারা এত তুচ্ছ সামগ্রী মনে করেন যে, বিনা চিন্তাতেই সকল জ্বরেই "দুধ সাগুর" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তরুণ ও প্রবল জ্বরে, দুধ না দেওয়াই উচিত। জল সাগু, জল বার্লি, টাট্‌কা আমানি, যব, চিঁড়া বা খৈ-মণ্ড, পাণিফলের বা শঠির পালো, দৈএর ঘোল, জলের মিছরি ফুটান জল, ডাবের জল, গরমদুধে নেবুর রস দিয়া প্রস্তুত করা "ছানার জল" "চা" শুধু পানীয় শীতল বা গরম জল, সোডা-লেমনেড প্রভৃতিই প্রবল ও তরুণ জ্বরে উৎকৃষ্ট পথ্য। প্রবৃত্তি হইলে, বাসী বিলাতী "ফুড" গুলিকে খুব পাতলা করিয়া তৈয়ারি করিয়াও দেওয়া যায়। যে রোগীর জ্বর তরুণ ও প্রবল নয়, দুধ পান করিলে যাহার পেট হুড় হুড় করে না, বা ফাঁপে না, বা ভার বোধ হয় না, তাহাকে সাগু, বার্লি, এরোরুট বা শঠির বা পাণিফলের পালোর সঙ্গে মিশাইয়া দুধ পান করিতে দিতে পারা যায়। জ্বরে দুধ দিতে হইলে, কখনো খাঁটি দুধ দিতে নাই—জল অথবা সাগু, বার্লি, শঠি, এরোরুট—ইহাদের মধ্যে যেটা হউক একটা মিশাইয়া দিতে হয়। খাদ্য হিসাবে, সাগু, বার্লি, এরোরুট, পাণিফল বা শঠি প্রায় একই গুণাত্মক। জ্বর যেমন-যেমন বাড়িতে থাকে, দুধের পরিমাণ সেই অনুপাতে কমান উচিত—আবার জ্বর কম হইলে, দুধের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়ান যায়। ডালিম, বেদানা, আঙ্গুর জামরুল, গোলাপজাম, কমলালেবু, মিষ্ট বাতাবী লেবু, মিষ্ট আনারস, ইক্ষু, নাশপাতি, কিস্‌মিস্‌, খেজুর, মিছরি, বাতাসা এলাচদানা প্রভৃতিও অল্প বিস্তর দেওয়া যায়। প্রত্যেক ফলের সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, উহার রস গ্রহণ করিয়া, "ছিবড়া" ফেলিয়া দিতে হইবে। টাইফয়েড্ জ্বর সন্দেহ হইলে বা উদরাময়

বা পেট ফাঁপা থাকিলে, আনারস, নাশপাতি, কিস্‌মিস্, খেজুর দেওয়া উচিত নয়।

জ্বরে তৃতীয় কর্ত্তব্য,—রোগীর স্বচ্ছন্দতা বিধান করা। রোগীর গায়ের উপর দিয়া সজোরে হাওয়া না বহে, তাহা করা উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া, সমস্ত ঘরদ্বার বন্ধ করা কোন মতেই উচিত নয়। তোমার—আমার শয়ন ঘরের চেয়ে, রোগীর ঘরে বেশী ভাল বাতাস বহা উচিত। "ঠাণ্ডা লাগা"-জুজুর ভয়ে, রোগীর ঘরের "অন্ধি—সন্ধি" বন্ধ করিও না। বড়—বড় জানালা বা দরজা না খুলিলে, ঘরে হাওয়া খেলিতে পায় না। রোগীকে গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া, অবাধে ঘরে হাওয়া খেলিতে দিতে হয়। রোগীর ঘরে ছাড়ান ফল, খাওয়ার—এঁটো বাসন, অভুক্ত দুধ ইত্যাদি, বা মল, মূত্র, থুথু—গয়ার জমাইয়া রাখা অন্যায়। বরঞ্চ রোগীর ঘরে সুগন্ধি ফুল রাখা উচিত।

জ্বরে চতুর্থ কর্ত্তব্য—রোগীর মাথা ঠাণ্ডা রাখা। মাথায় জল, অডিকলোন মিশ্রিত জল, নিশাদল বা শির্কা মিশ্রিত জল বা বরফ দিয়া রোগীর মাথা ঠাণ্ডা রাখিবে। মাথা ঠাণ্ডা না রাখিলে, রোগী প্রলাপ বকে, বিনিদ্র হয়, ঝাঁকি মারিয়া উঠিতে চায় মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পায়। কচি ছেলেদের মাথায় রক্ত উঠিলে, তাহাদিগের "তড়কা" হয়। কাজেই জ্বরে মাথা ঠাণ্ডা রাখায় লাভ ষোল আনা, লোকসান মোটেই নাই। মাথায় জল বা বরফ দিলে, বুকে সর্দ্দি বসিবার কোনও আশঙ্কা নাই। এমন কি, নিউমোনিয়াতেও মাথায় নিরাপদে বরফ দেওয়া চলে। বিজ্বরে অথবা অল্প জ্বরে, মাথায় বরফ দিলে, রোগীর কোনও অনিষ্ট হয় না। কাজেই, যে কোনও জ্বরে (টেম্পাচারে), রোগীর মাথায় বরফ দেওয়া যায়। ১০৪ এর উপরে জ্বর উঠিলে, বরফ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং সাধারণতঃ জ্বর ১০১ নামিলে বরফ তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। কখনো বরফ দিতে দিতে, তাহা মাঝে মাঝে উঠাইয়া লইতে নাই—তাহা করিলে, হঠাৎ খুব বেশী রক্ত মাথায় চড়ে—কাজেই, রোগী বেশী কষ্ট পায় বা প্রলাপ বকে। মাথা না কামাইয়া বরফ দিলে, তেমন কাজ হয় না—যত বেশী চুলের উপরে বরফ দেওয়া যায় ততই তাহা দেওয়া বৃথা হয়। মাথায় বরফ দিতে হইলে, থলি বা ব্যাগে করিয়া তাহা দেওয়াই ভাল—নতুবা বিছানা বালিশ ভিজিয়া যায় এবং বেশীক্ষণ ভিজা বালিশে শুইলে ঘাড়ে ব্যাথা হইতে পারে। কচিছেলেদের মাথায় বরফের ব্যাগ বসাইতে হইলে, প্রথমে খানিকক্ষণের জন্য ২।৪ পাট কাপড়ের উপরেই তাহা বসান উচিত—নতুবা অত্যন্ত ঠাণ্ডায় মাথা জ্বালাকরে। খানিকক্ষণ কাপড় বা তোয়ালের উপরে ব্যাগটিকে ধরিয়া, পরে তোয়ালে তুলিয়ে ফেলিতে হয়। কাপড়ের টুকরায় বরফ জড়াইয়া, তাহা মাথায় দিলে, মাথার চুল, বালিশ প্রভৃতি ভিজিয়া যায় এবং মাথার অতি সামান্য অংশেই বরফ লাগে। এই জন্য, মাথার "চাঁদির" উপরে একটা বড় ব্যাগ এবং ঘাড়ের পিছনে (যেখানে চুল শেষ হইয়াছে, সেখানে) ছোট একটি ব্যাগে করিয়া—এই দুই যায়গায়, একত্রে বরফ দেওয়া উচিত। শুধু জলের চেয়ে, নিশাদ, শির্কা বা স্পিরিট বা অডিকলোন মিশান

জল এবং তাহার চেয়ে বরফ জল, এবং সব চেয়ে শুধু বরফ বেশী মাথা ঠাণ্ডা করে। কপালে জলের পটি দিলে মন বুঝান হয় বটে কিন্তু কোনও বিশেষ উপকার করেনা। "জল পটি" দিতে হইলে, খুব পাতলা এবং একপুরু কাপড়ের টুকরা দিতে হয়, এবং অনবরত তাহাকে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। জর রোগীর মাথায় জল বা বরফ, পৌষমাসের মাঝরাত্রেও দিতে বাধা নাই।

জরে পঞ্চম কর্ত্তব্য—যাহাতে ঘাম হয়, তাহা করা মল মূত্র ও ঘর্ম্ম, এই তিনটির সাহায্যে আমাদের দেহ হইতে অতিরিক্ত উত্তাপ বাহির হইয়া যায়। বারংবার, অতিমাত্রায় দাস্ত হইলে, রোগী কাবু হইয়া পড়ে;—কাজেই দাস্ত করাইয়া কেহ জর কমাইতে খুঁজে না। ঔষধের দ্বারা অধিক প্রস্রাব করানও নিরাপদ কাজ নয়—বিশেষতঃ যে যন্ত্রটি প্রস্রাব সৃষ্টি করে—সেটি অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র বিধায়ে তাহাকেও পর্য্যুদস্ত বা জখম করা বোকামী। যেহেতু সে যন্ত্রটি জরের জ্বালায় সহজেই জখম হইয়া আছে, এবং সে যন্ত্রটিরই উপরে শরীরের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের প্রধান ভার, অতএব প্রস্রাবকারক ঔষধের দ্বারা "চাবুক মারিয়া" তাহার নিকট হইতে, তদবস্থায়, বেশী কাজ আদায় করার চেয়ে, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ জল, চা, ডাবের জল; বার্লি, মিছরির জল, সোডা, লেমনেড, ডালিম, বেদানা, প্রভৃতি খাওয়াইয়া প্রস্রাবকে বাড়াইয়া, শরীরের দূষিত পদার্থকে পাতলা করিয়া বাহির করানর চেষ্টাই সমীচীন। ম্যালেরিয়ায়, অথবা শীত করে এমন জরে কম্পের সময়ে গরমজল পান করাইলে শীত ও কম্প কমিয়া যায়। রোগীর যদি শীত বা কম্প না থাকে, এবং গলায় ব্যথা না থাকে, তবে যে রোগেই হউক না কেন, দিনে রাত্রে শীত গ্রীষ্মে, সকল সময়েই জর-রোগীকে শীতল পানীয় দিতে পারা যায়। শীতকালে বা রাত্রে ঠাণ্ডা জল বা ডাবের জল পান করিলে, রোগীর শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয় বলিয়া যে ধারণাটী আছে, তাহার মূলে সত্য নাই। শীতল পানীয় পাইলে রোগীর তৃপ্তি হয় বলিয়া জরে বারম্বার বরফ খাইতে নাই। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ে সামান্য বরফ দেওয়া জল এক-আধবার দেওয়া যায়, কিন্তু শীতল পানীয় অপেক্ষা গরম জল বা চা পান করিলে ঘর্ম্মও বাড়ে এবং তৃষ্ণাও কমে। জর রোগীকে একেবারে অনেকটা জল দিতে নাই। জরে গা-বমি করিলে, এক-পেট কুসুম কুসুম গরম জল বা সোডাওয়াটার খাইলে বিবমিষা দূর হয় এবং সমস্ত পেট ধুইয়া "ঝাড়িয়া" বমি হওয়ায় রোগী ও সুস্থ বোধ করে।

প্রস্রাব ও মল বাদ দিলে, ঘাম করান বাকী থাকে। ঘাম করাইলে রোগীর জরও কমে, এবং সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। অথচ অধিকাংশ জর রোগেই রোগীর ঘর্ম্ম প্রায় হয় না, গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। সাধারণের বোধ হয় জানা নাই যে, পৌষ মাসেও সুস্থ শরীরে সকলেরই ঘাম হয়—যদিও সে ঘাম আমরা দেখিতে পাই না। এইজন্য দৃশ্যতঃ ঘাম দেখা না যাইলেও, যে "অদৃশ্য ঘাম" হয়, তাহাকেও বাড়ান উচিত। গায়ের ঘামে বাতাস লাগিয়া সে ঘাম উপিয়া যাইলে, তবে শরীর ঠাণ্ডা হয়। অতএব ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে, সেই ঘামকে উপিয়া যাইবার অবসর

দেওয়া চাই। ঘাম শুকাইতে যাইয়া যেন ঠাণ্ডা লাগান না হয়, সে দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

জ্বর রোগীর পক্ষে, এই নিয়মগুলি খাটাইয়া চলিলে রোগীর যথেষ্ট উপকার হয়। প্রথমতঃ রোগীকে বহু জামা কাপড় জড়াইয়া ঘর দ্বার খুব বন্ধ করিয়া না রাখিয়া, এমন ভাবে জামা কাপড় পরাইয়া রাখা উচিত, যাহাতে তাহার "গায়ের গরম" গায়ে লাগিয়া না থাকে, গা ঠাণ্ডা হইবার অবসর পায়—যাহাতে অদৃশ্য ঘাম সহজে উপিয়া যাইবার অবসর পায়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে, অনেকে জামার উপরে জামা জড়াইয়া রাখেন—ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা রোগীর গায়ের উত্তাপ "তাড়াইতে" চান—গায়ের উত্তাপকে গায়ে "জড়াইয়া" রাখার ঠিক উল্টাই করিতে চান। অথচ কথায় ও কাজে এমন উলটা ভাব ঘরে ঘরে দেখা যায়। রোগীর গাত্রদাহ উপস্থিত, সে বেচারী এতটুকু ঠাণ্ডা হাওয়া চায়—আর তাহার আত্মীয় স্বজনেরা ঘরদ্বার বন্ধ করিয়া, পাখার হাওয়াটুকু পর্য্যন্ত না দিয়া, রোগীকে ৪।৫দফা জামা কাপড়ে জড়াইয়া রাখেন—যাহাতে রোগীর গায়ের অদৃশ্য ও দৃশ্য ঘাম মৃদু মৃদু উপিয়া যাইতে পারে, সে ব্যবস্থা করাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ আবশ্যক হইলে, শীতল জলের সাহায্যে রোগীর দেহের উত্তাপ কমান উচিত। যেখানে জ্বর ১০৫ হইতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, এমন অবস্থায় এবং ১০৬ বা তদূর্দ্ধে জ্বর উঠিলে "আইস-প্যাকিং" করা উচিত। ১০১ হইতে ১০৫ এর মধ্যে জ্বর থাকিলে, "স্পঞ্জ" করানই বিধেয়। এই দুইটি কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি। সাধারণের মধ্যে ধারণা আছে যে, স্পঞ্জ করান, শুধু জ্বর কমাইবারই জন্য। কিন্তু জ্বর কমান ছাড়াও, উহার অপর একটি উদ্দেশ্য আছে; সেটি—রোগীর দেহে আরাম আনার জন্য। "শরীর গরম," "মাথা গরম" বিনিদ্র অবস্থা, প্রভৃতি উপসর্গের শান্তি বিধান করাও স্পঞ্জ করার উদ্দেশ্য।

"আইস প্যাকিং"—একখানি ওয়েল ক্লথ পাতিয়া, তাহার উপরে রোগীকে প্রায় উলঙ্গ করিয়া শোয়াইতে হইবে। ঘরের সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরে আলো জ্বালিয়া লইবে। মাথায় বরফের থলি বসাইয়া দিবে। আবশ্যক হইলে (অর্থাৎ রোগী দুর্ব্বল হইলে) পূর্ব্বেই কতকটা ব্রাণ্ডি সেবন করাইয়া লইবে। বরফ জলে একখানা প্রমাণ বিছানার চাদর নিংড়াইয়া গলা হইতে পা পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা রোগীকে জড়াইয়া দিবে—দেহের উঁচু-নীচু, খাঁজে খাঁজে চাদরখানিকে চাপিয়া বসাইয়া দিবে। ঐ চাদরের উপর একখানা মোটা কম্বল জড়াইয়া দিয়া, দশ পনর মিনিট অন্তর রোগীর জ্বর কত নামিল, তাহা পরীক্ষা করিবে। ১০২ কি ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর নামিলে, তাড়াতাড়ি ভিজা চাদর ও কম্বল খুলিয়া লইয়া, চার পাঁচজনে মিলিয়া শুক্‌না তোয়ালে দিয়া, বেশ করিয়া ধরিয়া সমস্ত গা মুছাইয়া শুকাইয়া দিবে। যদি তেমন জোরে হাওয়া না বহিতে থাকে, তবে আইস-প্যাকিং করিবার সময়ে আদৌ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না।

"স্পঞ্জ করা।"—এই জিনিষগুলি প্রথমেই হাতের কাছে আনিয়া রাখিবে।—থার্ম্মো-

মিটার, ২।৩ খানা শুক্‌না তোয়ালে, গামছা বা নেকড়া ; ২।৩ খানা, ভিজা গামছা ; এক প্রস্থ জামা কাপড় ; লেপ-কাঁথা ; এক ঘটি গরম জল ও এক ঘটি ঠাণ্ডা জল ; টয়লেট ভিনিগার ; একটা আলো ; বরফ পূর্ণ থলি ; ব্রাণ্ডি ১ মাত্রা। সমস্ত যোগাড় হইয়া গেলে সেদিন বাহিরে হাওয়ায় জোর থাকুক আর না থাকুক ঘরের জানালা দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিবে ও বাতি জালিবে। রোগীর মাথায় বরফের থলি বসাইয়া দিবে এবং এক-মাত্রা ব্রাণ্ডিও খাওয়াইয়া দিবে। শীঘ্র শীঘ্র তাহার সমস্ত জামা কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া একজন একটা হাত, অপর জন অপর হাত কেহ একটা পা, অপর আর একজন অপর পা —এই রকমে রোগীরসর্ব্বাঙ্গ ভাগ করিয়া লইয়া, অল্প গরম জলে গামছা নিংড়াইয়া ঐ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বারম্বার ঘষিবে যতক্ষণ না সেগুলি কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইয়া আসে। বুক, পিঠ, পাঁজর ও পেট অতি অল্প সময়ের জন্ম ঘষা উচিত— রোগীর গায়ের উত্তাপ যদি ১০৪ হয় তবে প্রথমে ১০২ ডিগ্রী উত্তাপের জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিতে আরম্ভ করিতে হয় এবং বার বার ঐ ক্রমশঃ ঠাণ্ডা করা জলে গামছা-টিকে এমন ভাবে নিংড়াইতে হয়, যেন তাহা হইতে টস্‌টস্ করিয়া জল পড়ে না, অথচ রোগীর গা কিছু কিছু ভিজিয়া যায়। এই ভাবে ৫।৭।১০ মিনিট গা মোছার পরে, রোগীর জর কত কমিল, তাহা দেখা উচিত। জর ২।৩।৪ ডিগ্রী কমিয়াছে বুঝিলে, সকলে মিলিয়া শুক্‌না তোয়ালে দিয়া তাড়াতাড়ি বেশ করিয়া ঘসিয়া গা শুকাইয়া, গরম করিয়া নিবে ; এবং তৎক্ষণাৎ গলা পর্য্যন্ত র‍্যাপার প্রভৃতি ঘায়া ঢাকিয়া ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দিবে।

জর হইলেই সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া রোগীর গায়ে জামা জোড়ার বাহুল্য করা ভুল—বরং তাহার উল্টা করিয়াই সুফল পাওয়া যায়। যথাক্রমে যেমন শুধু জল, অডিকলোন মিশ্রিত জল, বরফ জল ও বরফ —শীতল হইতে শীতলতর ; তেমনি জর রোগীকে অল্প হাওয়া খাইতে দেওয়া (অবশ্য আবশ্যমত জামা জোড়া পরাইয়া— —বেশী বেশী পরাইয়া নয়), স্পঞ্জ করা, ও আইস প্যাকিং করা, সামান্য হইতে গুরুতর শীতলতা আনয়নের উপায়। এই সহজ কথা গুলি স্মরণ যোগ্য।

জরে ষষ্ঠ কর্ত্তব্য—রোগীর দেহ পরিষ্কার রাখিবে। রীতিমত ধোয়ান, চুল আঁচড়ান নখ কাটা, চুল দাড়ি কাটা বা কামান, দাঁত মাজা, হাত-পা পরিষ্কার রাখা চাই। নাপিত-সাবান দিয়া হাত ধোয়াইয়া, কামাইতে প্রত্যবায় নাই। প্রত্যহ বিছানা শেষ ও কাপড়-চোপড় বদলান উচিত। আমাদের দেশে একটা প্রথা আছে যে, ব্যারামে ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে নাই ও ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে নাই। নাপিত ও ধোপা নানা রকম লোকের বাড়ী নিত্য যাতায়াত করে বলিয়া, ছোঁয়াচে কোনও রোগ হইলে, ঐ নিয়ম পালন করা উচিত। কিন্তু যদি নিজের রোগটি ছোঁয়াচে না হয়, যদি নাপিত বেশ পরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া থাকে, যদি নিজ নিজ ক্ষুর, কাঁচি, সাবান, বুরুষ, নরুণ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায় এবং যদি নাপিতকে বেশ করিয়া সাবান দিয়া হাত

ধোয়াইয়া লওয়া হয়, তবে ক্ষৌর কর্ম্মে কোনও স্বাস্থ্য বাধা থাকিতে পারে না। ঐ রকমে ছোঁয়াচে ব্যারাম না হইলে, ধোপার বাড়ী কাপড় দিতেও বাধা নাই। এই সংক্রান্ত দুইটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; প্রথমটি এই যে, একটি রোগী হইতে অপর বাড়ীতে ব্যারাম সংক্রামিত যাহাতে না হয়, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য। এবং দ্বিতীয় কথাটি এই যে,—সুস্থ শরীরে, অনেক সময় ছোঁয়াচে ব্যারাম ঘটিলেও রোগ ধরে না বটে, কিন্তু "জর গায়ে" যে কোনও অপর ব্যারাম সহজেই আক্রমণ করিতে পারে। এই দুইটি মূল কথা মনে রাখিয়া বাহিরের জন সাধারণের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়।

স্বাস্থ্য, আষাঢ়, ১৩৩০

হাঁপানির কতিপয় মুষ্টিযোগ।

(শ্রীসুরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়)

আজকাল অধিকাংশ লোকে হাঁপকাশ রোগে জর্জ্জরীত দেখিয়া কতকগুলি মুষ্টিযোগ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। যদি ইহা কেহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া ইহার ফলাফল আমাকে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন। আমি যতদূর জানি, এবং অন্যে যাহা জানেন তাহা জানাইতে সততই প্রস্তুত আছি। আমার নিকট পত্র আসিলে উত্তর দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হ'বে না। তাঁহারাও আমার প্রতি এ অনুগ্রহ রাখিবেন।

১। পুষ্করিণীতে যে কাঁকড়া জন্মায় তাহাকে তেলো কাঁকড়া বলে। ঐ কাঁকড়া ৫টা থেঁতো করিয়া যে রস নির্গত হইবে, ন্যাকড়া দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে এবং উহার সহিত গোলাপ জল কিছু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিবে, উপরিউক্ত নিয়মে তিন দিন সেবন করিবে, যদ্যপি অসুখের কিছু ছিট্ থাকে, তাহা হইলে ২।১ দিবস ঐ ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবন কালীন শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ। ইহাক পরীক্ষিত।

২। *খাঁটি* গব্য ঘৃত ✓।০ একপোয়া লইবে এবং ৫টা কালধুতুরার ফল বিচি ফেলিয়া দিয়া ঐ খোসা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইবে, পরে ঘুঁটের জালে ঘৃত চড়াইবে ঘৃতের গাঁজলা মরিয়া আসিলে উহাতে ঐ খোসাগুলি উত্তমরূপে ভাজিয়া ঘৃত জাল হইতে নামাইবে। ঐ ঘৃত প্রত্যহ একবার প্রাতে সেবন করিবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা হইতে ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত সেবন কালীন শাক অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ।

৩। কালকাসুন্দে (কাসমর্দ্দ) ইহার বীজের চূর্ণ অৰ্দ্ধ আনা ওজন মধুসহ মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইলে শ্বাস কাসে উপকার হয়।

৪। বেলপাতার, রস বাসক পাতার রস, শ্বেত ডানকুনী পাতার রস মোট ২ তোলা খাঁটি সরিষা তৈলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস রোগ ধ্বংস হয়। এক কুঁচ ডানকুনির শিকড়—পানের ভিতর ক'রে খাইলে হাঁপানি সারিয়া যায়।

৫। শুঁঠ, আকুল কাঁটান'টের মূল ও বামুন হাটী—সমপরিমাণ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ।৴০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে জ্বাল হইতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে শ্বাস দূরীভূত হয়।

৬। একটী সম্পূর্ণ কুশের শিকড় দুই ভাগ করিয়া ১ ভাগ খাঁটি সরিষা তৈলে প্রস্তর পাত্রে ঘসিয়া প্রত্যহ দুইবার বক্ষঃস্থলে মালিশ করিবে, এবং অপর অর্দ্ধাংশ জলে বাটিয়া তরল পদার্থটা প্রাতে ও সায়াহ্নে পান করিবে এই-রূপ নিয়মে দুই সপ্তাহ ব্যবহার করিলে। হাঁপ কাশ আরোগ্য হইবে। কুশের মূল গলায় ধারণ করিলে ও পীড়া আরোগ্য হয়। শাক, অম্বল, কলাইয়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ।

৭। পুরাতন ইক্ষুগুড় খাঁটি সর্ষপ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বাস বৃদ্ধির সময় চাটিয়া খাইলে হাঁপের উপশম হয়।

৮। তুলসী গাছে গুটি পোকা হয়, ঐ গুটিপোকা সংগ্রহ করিয়া তামার মাদুলিতে ঐ গুটিপোকা পুরিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে হাঁপানি নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। শাক, অম্বল, কলায়ের ডাইল খাওয়া নিষেধ।

৯। আরসোলা (তেলাপোকা) ৮।১০টা লইয়া একসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক-পোয়া জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ জল সমস্ত দিন রাত্রে অল্প অল্প সেবন করিবে। উপরিউক্ত নিয়মে প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া লইবে। এইরূপে সপ্তাহ কাল সেবন করিলে হাঁপানি আরোগ্য হয়।

১০। লাল লবণ ।৴০ আনা, আদার রস ॥৴০ আনা, মধু ১ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে শ্বাস রোগ আরোগ্য হয়।

১১। কালধুতরার পাতা শুষ্ক করিবে, পরে গুঁড়া করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া মিহি সোরার গুঁড়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে। হাঁপ বৃদ্ধি হইলে একটি পাত্রে ঐ গুঁড়া রাখিয়া অগ্নি-সংযোগ করিবে। যখন উহা হইতে ধূম নির্গত হইবে তখন নাক ও মুখ দ্বারা ঐ ধূমের শ্বাস টানিয়া লইবে, তৎক্ষণাৎ হাঁপ নিবারণ হইবে।

১২। যে কোন কলার মোচা লইয়া থেবড়াইয়া (থেঁতো) করিয়া রস বাহির করিবে, ইহার রস ১ তোলা, আকন্দর আঠা ২ ফোঁটা, বাসক পত্রের রস ১ তোলা, এই কয়টি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া হাঁপানি রোগীকে খাইতে দিলে ২০।২৫ মিনিট মধ্যে নিশ্চয় হাঁপানি বন্ধ হইবে। ইহা পরীক্ষিত।
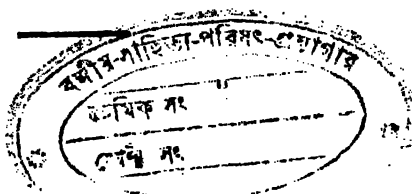
বঙ্গে লোক সংখ্যা, জন্ম ও মৃত্যু ।

(১৯২১ সালে আদমসুমারী অনুসারে)

জিলার নাম	লোকসংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	৭৩২৩৬৯	৭০৬৫৫৭
বীরভূম	৪২২৯৮৬	৪২৪৫৮৪
বাঁকুড়া	৫০৯৩৪	৫১০৬৯৭
মেদিনীপুর	১৫৩৯৬৫২	১৩২৭০০৮
হুগলী	৫৬১২৬৮	৫১৮৮৭৪
হাবড়া	৭৫৩৫১৫১	৪৬২২৫২
২৪ পরগণা	১৪৩০৭৫৮	১১৯৭৪৮৭
কলিকাতা	৬১৭৫৯০	২৯০২৬১
নদীয়া	৭৬১৩৪৫	৭২৬২২৭
মুর্শিদাবাদ	৬২৮৭৪২	৬৩১৭৭২
যশোহর	৮৯৩৫৯৩	৮২৮৬২৭
খুলনা	৭৫৭৫২৪	৬৯৫৫১০
রাজসাহী	৭৬৭৩৭০	৭২২৩০৫
দিনাজপুর	৮৯৬৪০০	৮০৮৯৫৩
জলপাইগুড়ি	৫০৫৩৯৭	৪৩২৮৭২
দার্জ্জিলিঙ্গ	১৪৯০৯৪	১৩৩৬৫৪
রঙ্গপুর	১৩১৬৮৪০	১১৯১০১৪
বগুড়া	৫৩৮৭২৭	৫০৯৮৭৯
পাবনা	৭০৬৭০২	৬৮২৭৯২
মালদহ	৪৯২৮২২	৪৯২৮৪৩
ঢাকা	১৫৭৩২২০	১৫৫৩৭৪৭
ময়মনসিংহ	২৫১০৪৫০	২৩১৭২৮০
ফরিদপুর	১১৪৭৭৪২	১১০২১১৬
বাখরগঞ্জ	১৬৪৩১৬৩	১২৮০৫৯৩
চট্টগ্রাম	৭৭৭৮৮২	৮৩৩৪৪০
নোয়াখালী	৭৩৮৭২২	৭৩৪০৬২
ত্রিপুরা	১৪০৬১৩৪	১৩৩৬৯৬৯
সমগ্রবঙ্গ	২৪০৫৭৯৩৬	২২৪৬৪৩৫৭

৩

জিলার নাম	জন্ম	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	২০৪৭৫	১৮৯৬৫
বীরভূম	১৪৬০৮	১৩৭৩৪
বাঁকুড়া	১৬৮০৫	১৫৫২৯
মেদিনীপুর	৩৪২৭৪	৩৪৫৮১
হুগলী	১৪৩৯১	১৩১৫০
হাবড়া	১৩৯৫৯	১২৫৫৯
২ পরগণা	২৮০০৫	২৫৩৮২
কলিকাতা	৯৩২৬	৭৯৮২
নদীয়া	২৪০৩৬	২২৪৯৫
মুর্শিদাবাদ	২৫৬০৫	২৩৯৪২
যশোহর	২২৭৪৬	২৬৫৯০
খুলনা	২২৪৮১	২০৮৪৩
রাজসাহী	২৫৩৭৪	২৪০৪৩
দিনাজপুর	৩২৯৯৮	৩১১২২
জলপাইগুড়ি	১৫৫৪০	১৪৫৭৫
দার্জ্জিলিঙ্গ	৪২১৩	৪১৫৫
রঙ্গপুর	৩৯৬৫২	৩৮০৯০
বগুড়া	১২৫৪৮	১১৪৪০
পাবনা	১৭৪৭৮	১৬৫৪৯
মালদহ	১৮১৬৩	১৬৭৩২
ঢাকা	৪১৪৫০	৩৮৪৫৪
ময়মনসিংহ	৬ ৮৬১	৬৩৭২৫
ফরিদপুর	৬১০৫	২৩০৭৭
বাখরগঞ্জ	৪২২৮২	৩৮৪৫৯
চট্টগ্রাম	২৬৩৮৯	২৩৯৪২
নোয়াখালী	২২৬৭৬	২০৫০৮
ত্রিপুরা	৩২৫৪৯	২৯৬৮৫
সমগ্রবঙ্গ	৬৭৪৭৯১	৬২৬১১০

জিলার নাম	হিন্দুর মৃত্যুসংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	২১০৫৯	১৯৪৫১
বীরভূম	১১৯১৩	১০৭৩০
বাঁকুড়া	১৭৫৬৪	১৬৫৩৯
মেদিনীপুর	৩৭০৫৩	৩৬১৭৯
হুগলী	১৪৫৮৯	১৫৪৬৩
হাবড়া	১২১৪৫	১০৬৬৮
২৪ পরগণা	২৩৭৩০	১৯৯৫৪
কলিকাতা	১২৬৬০	৯০৮৪
নদীয়া	১২৪৫১	১১৩৪১
মুর্শিদাবাদ	১১৭১৩	১০৫৩৩
যশোহর	১১৯২৩	১১৬৯৪
খুলনা	৯০৫৩	৮০৮৫
রাজসাহী	৫৪৩৮	৫০০৩
দিনাজপুর	১৩৫৯৩	১[illegible]৯৯৫
জলপাইগুড়ি	৭০৫৮	৫৯২৫
দার্জ্জিলিঙ	৪৮৪২	৪১৬২
রঙ্গপুর	১১২৯৩	১০৪২৭
বগুড়া	২৬২৭	২৫৭১
পাবনা	৫২৬৪	৪৮৫১
মালদহ	৬৬৯৫	৫৪০০
ঢাকা	১৬৩৩৩	১৫৩৪৯
ময়মনসিংহ	১৭৬২৫	১৬০৬৪
ফরিদপুর	১৭৮০০	১৫৯১৮
বাখরগঞ্জ	৯৯৬৮	৮৪৫৭
চট্টগ্রাম	৪১৯১	৪২২৯
নোয়াখালী	৩৭৪৮	৩৫৬৪
ত্রিপুরা	৭৩৬৬	৬৭৭৮
সমগ্রবঙ্গ	৩২৩৪৯৪	২৯১৪৫৪

জিলার নাম	মুসলমানের মৃত্যুসংখ্যা	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	৫১৭২	৪৯৫৬
বীরভূম	৩৭৪০	৩৪৪৩
বাঁকুড়া	৯০২	৮৬৬
মেদিনীপুর	২৬৫৯	২৪৬৪
হুগলী	২৮৯৯	২৭৯১
হাবড়া	৩০৪৬	১[illegible]৪
২৪ পরগণা	১৪৯২৭	১৩১৮১
কলিকাতা	৪২৮০	৩১৯১
নদীয়া	১৯৭৪৪	১৮২৪৬
মুর্শিদাবাদ	১৩৮৪৮	১২৪৯৮
যশোহর	২১৫৬৩	১৯১৮২
খুলনা	১০৬৫৯	৯৬২২
রাজসাহী	২৬২৮৭	২৫০৩১
দিনাজপুর	১৫৯৯৯	১৪৮৪২
জলপাইগুড়ি	৪৩৫৫	৪০৭৮
দার্জ্জিলিঙ	২২৪৯	১৯৫
রঙ্গপুর	২৩৩৪৬	২১৮৮১
বগুড়া	১৫০১৮	১৩৫৭১
পাবনা	১৭৫৮৯	১৫০১৩
মালদহ	৭৫৪০	৬৬০৪
ঢাকা	২৯৭৭৪	২৬৯৯৫
ময়মনসিংহ	৫৭৭৯৯	৪[illegible]০৮
ফরিদপুর	২৩৫৬৪	২২৩৪৭
বাখরগঞ্জ	২৮৭৩৩	২৫১৬১
চট্টগ্রাম	১৪৭১৬	১৪০৮০
নোয়াখালী	১৪২২৪	১৩৫২০
ত্রিপুরা	১০৮৭৯	১৫৪১৪
সমগ্রবঙ্গ	৩৯০৫৩১	৩৫৪৩৯৪

জিলার নাম	মৃত্যু পুরুষ	মৃত্যু স্ত্রীলোক
বর্দ্ধমান	২৭৪২০	২৫২১২
বীরভূম	১৭১৫৫	১৫৩৯৭
বাঁকুড়া	২০১০৬	১৮৯১৯
মেদিনীপুর	৪২০১০	৪০৪৪৯
হুগলী	১৮১১৬	১৬৮৮৩
হাওড়া	১৫২০৬	১৩৪৮৯
২৪ পরগণা	৩৯০৫২	৩৩১৬০
কলিকাতা	১৭৫৮৮	১২৮০২
নদীয়া	৩২৩৯৭	২৯৭১২
মুর্শিদাবাদ	২৫৯৭৪	২৩৪০৪
যশোহর	৩৩৫১৯০	৩০৮৯০
খুলনা	১৯৭৪৬	১৭৭২৯
রাজসাহী	৩২১৫৯	৩০৬৮১
দিনাজপুর	৩২২৫৮	২৯০৪২
জলপাইগুড়ি	১৫১৭৩	১৩৬৪৮
দার্জ্জিলিঙ্গ	৬৩৫১	৫৮৪১
রঙ্গপুর	৩৪৯১০	৩২৫৩৭
বগুড়া	১৭৯৭৩	১৬২১৭
পাবনা	২২৮৫৯	১৯৮৬৯
মালদহ	১৫৫৮৪	১৩০৮৬
ঢাকা	৪৬২৭৭	৪২৪৮২
ময়মনসিংহ	৬৬২১৩	৬০৩৭৫
ফরিদপুর	৩৫৪২২	৩৩৩৫৩
বাখরগঞ্জ	৩৮৮২৯	৩৩৭১৪
চট্টগ্রাম	১৯৬৫৬	১৮৯৯৪
নোয়াখালী	১৭৯৮৮	১৭০৯৩
ত্রিপুরা	২৫২৫৪	২২২০৩
সমগ্রবঙ্গ	৭৩৫৬৩৮	৬৬৭৩৯২

স্বর্ণবঙ্গ।

(শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ)

—:o:—

স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে কি কি উপাদানের প্রয়োজন তাহা কবিরাজ মাত্রেরই জানা থাকিলেও সর্ব্বসাধারণের এ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা অস্বাভাবিক নহে। কবিরাজেরা স্থান বিশেষে কেহ কেহ কুক্রমতা করিয়া ঔষধ নষ্ট তো করেনই, অধিকন্তু সাধারণের নিকট বিশ্বাস হীন হইয়াও পড়েন, আয়ুর্ব্বেদের মর্য্যাদা এইরূপ ভাবেই অনেকে নষ্ট করিয়া বসেন। ইহা আয়ুর্ব্বেদের দোষ নহে, ব্যবসায়ীর চাতুরী মাত্র। প্রবঞ্চক কবিরাজ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদেরই যে কেবল মর্য্যাদা নষ্ট হয় এমন নহে, সর্ব্বসাধারণে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাননা অথবা ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিপরীত ফল প্রাপ্ত হন। হাতুড়িয়াগণ এবম্বিধ কার্য্য করিতে যত সাহস না পান, শিক্ষিত বঞ্চক কবিরাজেরা এ বিষয়ে সাহসী ও সিদ্ধহস্ত হইয়া আয়ুর্ব্বেদ ও রোগীর সর্ব্বনাশ করেন।

স্বর্ণবঙ্গ নাম বলিয়া সাধারণে মনে করিতে পারেন, ইহাতে অবশ্যই স্বর্ণের পরিমাণ বেশীই পড়ে অথবা স্বর্ণ ও বঙ্গ সমপরিমাণে পড়ে বলিয়াই স্বর্ণ বঙ্গ নাম রাখা হইয়াছে। আর এই স্বর্ণবঙ্গের চেহারা দেখিলে কে ইহাকে খাঁটী কাঁচা সোণা না কহিবে? ইহার রং এত উজ্জ্বল ও হরিদ্রাভ যে, ইহাকে দেখিলেই খাটী স্বর্ণচূর্ণ বলিয়াই ধারণা হইবে। অথচ ইহাতে বিন্দু বা পরমাণু মাত্রও স্বর্ণ পড়ে না। ইহার উপকারিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইহা একটী সাধারণ ঔষধ—ইহা সুলভ মূল্যের ঔষধ। প্রমেহাধিকারে অবস্থা বিশেষে ইহার আশ্চর্য্যরূপ রোগারোগ্যকারী ক্ষমতা দেখা যায়।

একদা আমি পীড়িত হইলে কোন এক উচ্চ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষিত কবিরাজকে ডক্ত দিই, তিনি আসিয়া স্বর্ণবঙ্গের ব্যবস্থা করেন ও সঙ্গে যে স্বর্ণবঙ্গ আনিয়াছিলেন তাহা দেখাইলেন। দেখিয়া মনে করিলাম, না জানি কত স্বর্ণ দিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। সে কবিরাজ যে রাজবাটীতে যাতায়াত করেন তাঁহার জন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতেইআমাকে দেখাইতে আনিয়াছেন, আরও বলিলেন "বহুমূল্য ঔষধ বলিয়া সর্ব্বদা ইহা প্রস্তুত থাকে না। আমার কাছে একটী পুরাতন উৎকৃষ্ট মোহর বা ৩২৲ টাকা আপাততঃ দাবি করিলেন। মদীয় পিতৃব্য তৎক্ষণাৎ ৩২৲ টাকা দেওয়ার আদেশ করিলেন কিন্তু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নানা আপত্তি করিয়া পরদিন দেওয়ার কথা বলিয়া দিল। ঘটনা বশতঃ সেই সময়ই একজন বিজ্ঞ কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে কত স্বর্ণের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন "স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের মোটেই দরকার নাই। আমরা বলিলাম—"অমুক কবিরাজ ইহা প্রস্তুত করিতে এক মোহর স্বর্ণ দাবি করিয়াছেন।" তিনি শুনিয়া লজ্জায় জিহ্বা কাটিলেন ও কহিলেন—"হায় এত বড় কবিরাজের এই কর্ম্ম! এই সকল কবিরাজেরাই আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।" তখন তিনি তাঁহার গৃহ হইতে মুদ্রিত ভৈষজ্যতত্ত্ব আনাইয়া স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুতে কি কি জিনিস দরকার তাহা দেখাইয়া আমাদের বিশ্বাস জন্মাইলেন যে, স্বর্ণবঙ্গে মোটেই সোণার দরকার নাই। সে দিন তাঁহার পুস্তক খানা রাখিয়া দিলাম। পরদিন ঐ কবিরাজ মহাশয় প্রাতেই তাঁহার একজন ছাত্র পাঠাইয়া টাকা চাহিলেন। আমরা বলিয়া দিলাম—"কবিরাজ মহাশয়কে আসিতে বলিবেন, আরও প্রয়োজন আছে।" টাকার লোভে কবিরাজ মহাশয় তাড়াতাড়ি আসিলেন, আমরা কহিলাম—স্বর্ণবঙ্গে ত স্বর্ণ পড়ে না, এই দেখুন আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে কি লিখা আছে?" তিনি নানা কথায় আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, আমরা বুঝিলাম না বা টাকা দিলাম না। ইহার পর হইতে (প্রায় ত্রিশবৎসর) উক্ত কবিরাজের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের পরিচিত মত কেহ তাঁহার নিকট ঔষধার্থে যায় না। বিজ্ঞ কবিরাজ বলিয়া তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লইয়া থাকে। তিনি যে প্রকার বিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজ, তিনি যদি সৎপথে থাকিতেন তবে তিনি বহুলাভবান হইতেন। এখন তাঁহার এই ব্যবহারে তিনি ক্ষতিগ্রস্থই হইয়াছেন। ব্যবসায়ের ভিত্তি কৃত্রিমতার উপর স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, ঔষধ কাটে না, কেবল এই সকল প্রবঞ্চক কবিরাজ কখনই আয়ুর্ব্বেদের ক্ষতি করিতে বা তাহার মর্য্যাদা নষ্ট করিতে পারিবেনা কিন্তু তাঁহাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশ করিবেন, এই সকল ব্যাপারে কবিরাজদের দুর্ণাম হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী মাত্রেই এইরূপ কৃত্রিম ব্যবসায়ীকে শাসন ও একঘ'রে করিলে আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর মর্য্যাদা রক্ষা হইবে। উপযুক্ত ও শাস্ত্রোক্ত বিশুদ্ধ ঔষধ না হইলে ঔষধ ফলোপদায়ক হয় না, সুতরাং ঔষধে ফল না পাইয়া লোকে আয়ুর্ব্বেদেরই নিন্দা করিয়া থাকে।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

:o:

দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তির জন্য স্বাদের তারতম্য।

কোন জিনিসের আস্বাদন গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাধারণতঃ আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি আসলে তাহা অতি জটিল ব্যাপার। কেবলমাত্র আস্বাদনের শক্তির দ্বারা আমরা চারি প্রকার রস বুঝিতে পারি, যথা—মিষ্ট, অম্ল, তিক্ত ও লবণ। ইহা ছাড়া অন্যান্য সূক্ষ্ম রকমের স্বাদ সকল আমরা ঘ্রাণশক্তির জন্যই সেই সকল স্বাদের ব্যতিক্রম বুঝিতে পারি। কোন রকম মিষ্ট চাটনি অথবা জ্যাম খাইবার সময় আমরা নাসিকা বন্ধ করিয়া রাখিলে বুঝিতে পারি যে, চাটনির আসল স্বাদ আমরা পাইতেছি না। এই রকম অবস্থায় ফলের স্বাদেরও কোন বিশেষত্ব আমরা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, কোন জিনিসের ভাল করিয়া স্বাদ পাইতে হইলে দৃষ্টি শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। অনেক লোক আছেন যাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পান করিলে চা কি কফি খাইতেছেন—বলিতে পারেন না। ধূমপায়িগণ অন্ধকারে বসিয়া ধূমপান করিয়া সুখ পান না। যে সকল ধূমপায়ী গত যুদ্ধে অন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে যে, ধূমপান করিয়া আর তাহারা তামাকের আস্বাদন পায় না। তামাকের ধূম দেখার সহিত ধূমপায়ীর তামাকের আস্বাদনের সম্পর্ক আছে। এই সকল দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, দৃষ্টি ও ঘ্রাণশক্তির জন্য স্বাদের তারতম্য হইয়া থাকে।

মর্দ্দনের ফলে রোগ আরাম।

যাঁহারা কসরত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একটা কথা আছে যে, ব্যায়াম করিয়া যত না শক্তি বৃদ্ধি ও শরীর পুষ্টি হয়, তাহার দ্বিগুণ হয় শরীর মর্দ্দন করিয়া। ইহাও সকলে জানেন যে, শরীরের নানাস্থানের রোগ অনেক সময় কেবল মর্দ্দন করিয়া উপশম ও আরাম হয়। সম্প্রতি চিকিৎসকগণ শরীরের নানাস্থানে মর্দ্দন বা চাপ প্রদান করিয়া রোগ আরাম করিতেছেন। এই অদ্ভুত উপায় যদিও আশ্চর্য্যজনক* তথাপি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাতে স্থায়ী উপকার হইতেছে এবং সেইজন্য এইরূপ চিকিৎসা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

গোঁড়া চিকিৎসকগণ এই উপায় অবলম্বন করিতে রাজী নহেন। অনেকেই এই চিকিৎসাকে উপহাস করিয়া থাকেন কিন্তু

* এই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় মর্দ্দনের ফলে রোগ আরোগ্য হয় জানিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন কেন বুঝিলাম না। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়িলে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই বুঝিবেন। আয়ুর্ব্বেদে তৈলাদি মর্দ্দনের চিকিৎসা যথেষ্ট আছে। "ঘৃতাদষ্টগুণং তৈলং মর্দ্দনাৎ নতু ভক্ষণাৎ" ইহা আয়ুর্ব্বেদে বহুকাল পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। আঃ সং।

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,—অনেক রোগীর এই চিকিৎসায় অতি আশ্চর্য্যজনক উপকার হইয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পুরাতন রকম চিকিৎসার দ্বারা কোন কোন রোগের যখন উপকার হয় নাই তখন এই উপায়ে সেই সকল রোগ দূর হইয়াছে।

এই চিকিৎসা প্রথমে ডাক্তার ফিজ-গেরাল্ড আরম্ভ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এই চিকিৎসায় মানুষের শরীরস্থ বিদ্যুতের জন্য এই উপকার হয়। কি প্রকারে এই উপকার হইয়া থাকে তাহা ঠিক নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতে পারেন না। তবু তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে এই, বিদ্যুৎ শরীরের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে যায়, কারণ প্রত্যহই তিনি ঐ বিদ্যুতের সাহায্যে চিকিৎসা করিতেছেন, তবে ইহা স্নায়ুর কার্য্য নহে। যদিও তর্ক হিসাবে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, ইহা স্নায়ুর দ্বারা সংঘটিত হয় কিন্তু তাহা ধরিয়া লইলে ইহা কোন্ স্নায়ুর দ্বারা হয় তাহা মানুষের এখনও অজানিত। এখনও বুঝা যায় নাই কেন শরীরের এক অংশ শরীরের অপর প্রান্তের কার্য্য সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। শরীরে কতকগুলি কেন্দ্র আছে, সেই সকল কেন্দ্রে চাপ দিলে বা মর্দ্দন করিলে অপর স্থানের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

দেখা গিয়াছে যে, শরীরের কোন কোন স্থানে চাপ দিলে, ঘসিলে, মর্দ্দন করিলে কিম্বা আঘাত করিলে শরীরের অপর স্থানে কোন কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট ও স্থির নিশ্চয় ফল দেখিতে পাওয়া যায় বা অস্বস্থি ঘটে। কি জন্য এরূপ ঘটে তাহা জানা কৌতূহলপ্রদ বটে কিন্তু তাহাপেক্ষাও কৌতুহলপ্রদ কোথায় এবং কিরূপভাবে চাপ দিতে হইবে বা ঘসিতে হইবে তাহা জানা থাকা। একদিন উক্ত চিকিৎসকের কাছে একজন বালিকাকে আনা হইয়াছিল। তাহার দক্ষিণ বাহু বেঁকিয়া পৃষ্ঠের দিকে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেই বালিকা তাহার হাত খুলিতে পারিত না। তাহার পার্শ্বদেশে মেরুদণ্ডের দিকে মৃদু আঘাত করিবার ফলে তাহার শক্ত হাত ক্রমে নরম হইয়া আসিল এবং ক্রমে সে যথেচ্ছামত হাত নাড়িতে আরম্ভ করিল। এই চিকিৎসায় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার নিজের গৃহেও করা সম্ভব।

দুই হাতের আট আঙ্গুল একসঙ্গে ঘসিলে কেশ দীর্ঘ হয়, কিন্তু টাক সারে না। যে স্থান হইতে চুল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, তৎস্থানে নূতন চুল উঠান অতি কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এমন কি কখন নূতন কেশ আর হয় না।

এই নূতন উপায়ে যে রোগ আরামই হইয়া থাকে কেবল তাহাই নহে, ইহা দ্বারা রোগাক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। ফুসফুসের যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই চিকিৎসার বিধি অনুসারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, পেট সঙ্কুচন করিতে হইবে। এই অবস্থায় ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র উপরে উঠিয়া পড়ে ও পাকস্থলীস্থ ভুক্তাবশিষ্ট চাপের জন্য নিম্নগামী হয়; ইহাতে সমগ্র শরীরের রক্ত চলাচল ভাল করিয়া হয়। এই অবস্থায় থাকিলে ফুসফুসের উপর অংশ দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে রোগী বাধ্য হয়। এই উপরিভাগেই যক্ষ্মারোগ প্রায়ই আরম্ভ, কারণ ফুসফুসের এই অংশ অধিক ব্যবহৃত

হয় না। আমাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই পাকস্থলী ও ফুসফুসের মধ্যে যে পর্দা আছে, তাহার সাহায্যেই শ্বাসপ্রশ্বাস চালাই এবং তাহার ফলে আমাদিগের ফুসফুস বেশী ব্যবহৃত হয় না ও তজ্জন্য উহাতে রোগ সৃষ্টি হওয়ার সুবিধা হইয়া পড়িয়া থাকে। যে ব্যক্তি ফুসফুসের সমস্ত অংশ দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য করে, তাহার যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইবেই না একথা প্রায় নিশ্চিত করিয়া বলা যায়, কারণ সেই ব্যক্তি যখনই ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তখনই উক্ত রোগ কর্ত্তৃক ভাল করিয়া আক্রমিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ রোগের বীজ বাহির করিয়া দেয়। ইহা শুধু চিকিৎসা নহে, ইহা দ্বারা রোগাক্রমণের বাধা প্রদান করা হয়।

পায়ের শিরা ফুলিয়া উঠা ও দড়ীর মত পাকাইয়া যাওয়ার এক রোগ আছে, উহাকে vericose veins বলে, কোমরের পেশী সঙ্কুচন করিলে ঐ রোগ হয় না এবং হইলেও ঐ রোগও পদ প্রভৃতির নানারূপ রোগ দূর হয়।

সঞ্জীবনী।

সমালোচনা।

রোগ বিজ্ঞান'। -বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় এম বি (Gold meidalist Homœopath) কাব্যতীর্থ ব্যায়াকরণতীর্থ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য এক টাকা। ৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকের কিয়দংশ 'আয়ুর্ব্বেদে" প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটির বক্তব্য বিষয় রোগোৎপত্তির মূলীভূত কারণে জীবাণুতত্ত্ব। অধুনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান—জীবাণুই রোগের কারণ নির্ণয় করিলেও প্রাচীন যুগের ঋষিবৃন্দই যে ইহার প্রথম আবিষ্কারক—গ্রন্থকার তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে অনেক গবেষণামূলক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। চিকিৎসক সমাজে ইহা সমাদৃত হইলে আমরা সুখী হইব।

সরল কবিরাজী চিকিৎসা। কবিরাজ শ্রীগিরিজাভূষণ রায় প্রণীত। মূল্য ১৲টাকা ২০৩।২ মনোমোহন লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। খুব সোজা কথায় এবং বাঙ্গালায় সকল রোগের নিদান ও চিকিৎসা পদ্ধতি এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। পুস্তক খানির প্রণয়নে গ্রন্থকার খাটিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থগণও ইহা ঘরে রাখিলে উপকার পাইবেন।

মর্ম্মবাণী।— শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত শান্তিপুর - প্রেম নিকেতন হইতে শ্রীচিদানন্দ দালাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এ খানি কবিতাপুস্তক, কিন্তু মলয় বাতাস, চাঁদের কিরণ, ফুটন্ত জোছনা লইয়া লিখিত নহে, সবগুলিই ধর্ম্মমূলক, পড়িলে প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়। সোজা কথায়, সরল ভাবে প্রাণের উচ্ছ্বাস ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। এই কবিতা প্লাবিত বঙ্গে অন্য কবিতা ফেলিয়া এরূপ কবিতাই তো প্রিয়জনের হাতে তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালনে পাঠকেরাও অবুঝ, লেখকদিগের তো কথাই নাই। ঘুরান কথার অর্থ চাপিয়া ভাবের অমুক্তি বা অব্যক্তি, রাখিতে না পারিলে আজকালকার দিনে কবিতাই হইবেনা—ইহাই হইয়াছে বর্ত্তমান বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃতি। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে কালাচাঁদ বাবু যে সে রীতি অবলম্বন করেন নাই, ইহা দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। কাব্যামোদী বাঙ্গালীকে আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পরামর্শ প্রদান করিতে পারি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ।—কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। হার্ট ফেল করিয়া সংপ্রতি তাঁহার দেহান্তর ঘটিয়াছে। কবিরাজ রাজেন্দ্র নাথ প্রাতঃস্মরণীয় গঙ্গাধরের শেষ ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে, কলিকাতায় গঙ্গাধরের শিষ্য বলিতে কেহই আর রহিলনা। ইঁহার অভাবে খাঁটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক বমাজের চূড়া খসিয়া পড়িল বলা যাইতেও পারে। আমরা কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথকে হারাইয়া বিশেষ মর্ম্মব্যথা পাইয়াছি। ভগবান তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তিবারি সেচন করুন।

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র।—পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নও আর ইহ জগতেনাই। বৈদ্যবংশের অসাধারণ প্রতিভাশালী—সমগ্র বেদের পরম পণ্ডিত উমেশচন্দ্রও অমরধামে গমন করিয়াছেন। ইঁহার মত বাগ্মী এযুগে খুব কমই দেখা যাইত। ইঁহার প্রণীত "মানবের আদি জন্মভূমি" জাতিতত্ত্ব বারিধি প্রভৃতি পুস্তকে ইঁহার চিন্তাশীলতা ও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান তাঁহার আত্মার মঙ্গল সাধন করুন।

বাঙ্গালার পল্লী।—বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে কিরূপ লোকক্ষয় হইতেছে, তাহা ১৯২১ সালের সরকারি রিপোর্ট পড়িলেই অনুমিত হইতে পারে। উহাতে প্রকাশ, এই সালে বঙ্গের পল্লীগ্রাম সমূহে

কলেরায় মরিয়াছে		৭৩,৯৪৩ জন।
বসন্তে	,,	৭,৮০৫ জন।
কালাজ্বরে	,,	৯,২৬ জন।
ম্যালেরিয়ায়	,,	৭,৩৭,৩,২৩ জন।
সর্ব্ববিধজ্বরে	,,	১০,৪৬,৬,৬১ জন।
আমাশয়	,,	১৩,৭,৪৮ জন।
ইনফ্লুয়েঞ্জাজ্বরে	,,	২,৮,০৯ জন।
নিউমোনিয়ায়	,,	৫,৭,৬১ জন।
যক্ষায়	,,	১,৩,৯৫ জন।

সমগ্র পল্লী সমূহে ১৯২১ সালে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৮৭ জন। এই হিসাবে বাঙ্গালার পল্লীগুলির লোকক্ষয় একরূপ হইতেছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ফলে বাঙ্গালার পল্লীগুলীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে অচিরে ধ্বংস সাধন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়।—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের নূতন সেসন আরম্ভ হইতেছে! ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ছাত্র আসিয়া ভর্ত্তি হইতেছে। এখানো ছাত্র গ্রহণ করা হইতেছে, কিন্তু যেরূপ অবস্থা তাহাতে গতবর্ষের ন্যায় এবারও বোধ হয় অনেককে ভর্ত্তি হইতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইতে হইবে। গত বৎসর ৬০ জনকে ভর্ত্তি করার পর ১৩ জনকে স্থান দিতে পারা যায় নাই, এবারও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল, যাঁহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন আর একদিনও দেরী না করেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতাল।—ভারতের নানা স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হইতেছে দেখিয়া আমরা পরম সুখী হইয়াছি। আমাদের পাঠকগণ জানেন, ভারতের বিভিন্ন স্থানের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি আয়ুর্ব্বেদের প্রচার কামনায় অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে বৃত্তি বা স্কলারসিপ দিয়া ছাত্রগণকে পড়াইয়া থাকেন। অনেক স্থানের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটি সেই সকল স্থানে আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ও খুলিয়াছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকেই তাঁহারা চিকিৎসালয়ের ভার দিয়া থাকেন। ভারতের প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডও মিউনিসিপ্যালেটীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে যেদিন আমরা একার্য্যে অগ্রসর দেখিব, সেইদিন বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত ঋষিযুগ ভারতে ফিরিয়া আসিল।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট্, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
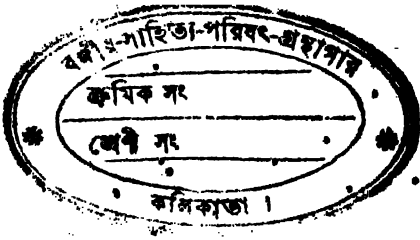
আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৩০ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

[কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ]

বৎসরের মধ্যে এমন এক একটী সময় আইসে, যখন কোন একটী বিশিষ্ট রোগ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়া অধিকাংশ নর নারীকে পীড়া দান করে। আমাদের আলোচ্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা নামক রোগটীও এই ধর্ম্মাবলম্বী। ইহা সাধারণতঃ ঠাণ্ডার সময় প্রাদুর্ভূত হয়। বিশিষ্ট কালে ইহাদের উৎপত্তি এবং কালস্বভাবেই ইহারা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'কালকৃত ব্যাধি' বলা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য মতাবলম্বী চিকিৎসকগণ এই সকল রোগের কারণ সম্বন্ধে বলেন যে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট বীজাণু এই সকল রোগের হেতু।

তাহারা শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে যদি শরীরের ভিতর যে রোগ প্রতিরোধক শক্তি (Immunity) বিদ্যমান আছে তাহা যদি রোগ বীজাণুর শক্তি অপেক্ষা দুর্ব্বল হয় অর্থাৎ শরীর যদি এইরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে যে অবস্থায় তজ্জাতীয় বীজাণু শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে তাহারা রোগ প্রতিরোধক শক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজেদের বংশ বিস্তার সাধন করিতে পারে— তাহা হইলে তাহারা রোগোৎপাদনে সমর্থ হয়। আমাদের কিন্তু এ মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার এখনও যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই এই সকল রোগ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট কালে উৎপন্ন হয়, অন্য সময় হয় না।

ইহা দ্বারা আমরা এই বুঝি যে, প্রাকৃতিক অবস্থাবিপর্য্যয়ে এমন এক একটী সময় আইসে যখন কোন একজাতীয় রোগ উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে আমরা এই বুঝিতে পারি

যে, দুষ্ট কালই ব্যাধি উৎপাদন করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই কালের দুষ্টি কি প্রকারে হয়? অযোগ, অতিযোগ ও মিথ্যা যোগযুক্ত শীতোষ্ণবর্ষ লক্ষণ কালের দুষ্টির প্রতি হেতু কাল নিরপেক্ষ হইয়া কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। সুতরাং সেই দুষ্ট কাল সংস্পর্শে আসিয়া সকল পদার্থই দুষ্ট হয়, এবং সেই সকল দুষ্ট পদার্থের অন্যায় পান ভোজনাদি জন্য মনুষ্যের শরীরও দুষ্ট হয়। তখন শরীরে তৎকাল কৃত বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হয়। অগ্নিবেশ মহর্ষি পুনর্ব্বসু আত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মানব দিগের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাত্ম্য ও বয়স ভিন্ন ভিন্ন হইলেও—একই ব্যাধি যুগপৎ জনপদে উৎপন্ন হইয়া বহুনর নারীর পীড়া দানে কি প্রকারে সমর্থ হয়?" তদুত্তরে ভগবান পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলিতেছেন, "মনুষ্যের প্রকৃত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদিগের কতকগুলি ভাবের তুল্যতা আছে। এই সকল ভাবের তুল্যতা হেতু তুল্যকালে তুল্য লক্ষণযুক্ত ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়। বায়ু, জল, দেশ ও কাল এই গুলি সকলের পক্ষেই সমতুল্য। কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিলে প্রথমতঃ কাল দুষ্ট হয়, দুষ্টকাল সংস্পর্শে বায়ু, জল ভূমি ও ওষধি সকল বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। তখন সেই বিকৃত বায়ু, সলিল ওবং ওষধির অন্যায় স্পর্শ ও পান ভোজন হেতু শরীরও দোষ দ্বারা দুষ্ট হইলে, এই প্রকার কোন বিশিষ্ট রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" বীজাণু রোগের কারণ হইলে কাল নিরপেক্ষ হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারিত, কিন্তু তাহা যখন পারে না, তখন কি করিয়া বীজাণুকে রোগ-কারণ বলা যাইতে পারে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—জীবন ধারণের অনুকূল অবস্থা না পাইলে জীবাণুগণ বাঁচিতে পারে না। কালাদি দ্বারা শরীরের যখন রোগ প্রতিরোধক শক্তি নষ্ট হয়, সেই সময় বীজাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া বংশ বিস্তার পূর্ব্বক রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু ইহা অতিস্থূল দর্শীর কথা বলিয়া মনে করি। কারণ আমরা দেখিতে পাই, এমন একএকটী সময় আইসে—যখন বাহ্য জগতে মশক, মক্ষিকা, পিপীলিকা বল্মীক কিম্বা ছারপোকা প্রভৃতি বিশিষ্ট এক জাতীয় কীটের আবির্ভাব হয়। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে যে জাতীয় জীবের বংশ বৃদ্ধির অনুকূল ব্যবস্থা জন্মে, সেই জাতীয় জীব সেই সময় বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। বাহ্য জগতে যেমন এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, আভ্যন্তর জগতেও সেই প্রকার কালাদি দ্বারা শরীরে দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। তখন যে জাতীয় জীবের (তথা কথিত রোগ-বীজাণু) বংশ বিস্তারের অনুরূপ হয়, তজ্জাতীয় জীব শরীরে প্রবেশ করিয়া বংশ বিস্তার করে মাত্র। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে কাল দুষ্ট হইলে বায়ু, জল, ভূমি ও ওষধি দুষ্ট হয়। তখন সেই সকলের অন্যায় স্পর্শে ও পান ভোজন জন্য দেহে দোষ প্রকুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। ইহাই সকল প্রকার রোগের নিদান।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম লইয়া অনেক মতভেদ বিদ্যমান আছে।

কিন্তু তাহাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ রোগের নাম না জানা থাকিলেও স্বরূপ বুঝিতে পারিলে চিকিৎসা আট্‌কাইবে না। "বিকার নামা কুশলো ন· জিহ্রীয়াৎ কদাচন। নহি সর্ব্ব বিকারাণাং নামতো ঽস্তি ধ্রুবা স্থিতি॥

রোগের স্বরূপ বুঝিয়া দোষের বলাবল নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে পারিলেই সাধ্য রোগ আরাম করিতে পারা যায়। এই জন্য ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে লক্ষণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যে সকল ক্ষেত্রেই তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট, এমত নহে। অনেক সময় ইহা বিভিন্ন রোগ বলিয়াই মনে হয়। আমরা যখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার বিবরণ বর্ণন করিতেছি, তখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝায় তাহাই বলিব।

১। সাধারণতঃ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতে বিশেষ কোন উপসর্গ থাকেনা, মাত্র সামান্য জ্বর, সর্দ্দি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং সামান্য কাসি বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় লঘু পথ্যের সহিত ২বেলা ২টী মহালক্ষী-বিলাস-আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিলেই সারিয়া যায়।

২। কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ শীত হইয়া জ্বর হয়, রোগীর নাসারন্ধ্রে অত্যধিক শুষ্কতা অনুভূত হয়, সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি ও শুষ্ক কাসি থাকে, গলা বেদনা, চোখ জ্বালা ও চোখ দিয়া অনবরত জল পড়া ইত্যাদি আনুসঙ্গিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এখানে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বায়ু শ্লেষ্মাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া স্রোতো-নিরোধ জন্য শুষ্কতা অনুভূত হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে আম পাচনার্থ ও স্রোত-বিশোধনার্থ পঞ্চকোল পাচন প্রয়োজ্য।

শ্লেষ্মাকে তরল করিয়া উঠাইয়া দিবার জন্য এবং গলা·বেদনাদির উপশম জন্য মহালক্ষী বিলাস—আদার রস ও সৈন্ধব সহযোগে প্রয়োজ্য। জ্বরের বেগাধিক্য না থাকিলে, জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বেগাধিক্যে তুলসী পাতার রস মধু সহযোগে মৃত্যুঞ্জয় রস দেওয়া যায়। যদিও নবজ্বরের প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ নিষিদ্ধ, তথাপি এ ক্ষেত্রে দুগ্ধ প্রয়োগ করিলে, শ্লেষ্মাকে বাড়াইয়া নাসারন্ধ্রের ও কাসির শুষ্কতা নষ্ট করিয়া দেয়। নিম্ন লিখিত ভাবে দুগ্ধ প্রয়োগ করিতে হয়।

দুগ্ধ— ⁄। এক পোয়া

পিঁপুল, যষ্টিমধু, তেজপত্র } প্রতিদ্রব্য ॥০ তোলা

তালমিশ্রি—২ তোলা

জল— ⁄॥০ আধসের

দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় প্রয়োজ্য। এতদ্ভিন্ন খইএর মণ্ড, মুগের যূষ ও মিশ্রি দেওয়া যায়।

রোগীর মুখে তালমিশ্রি রাখিয়া চুষিতে দেওয়া ভাল।

কাসির বেগের জন্য খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিলে, তালীশাদি চূর্ণ বা তাল মিশ্রির সহিত 'চন্দ্রামৃত রস' চুষিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ শুষ্ক কাসির শান্তির নিমিত্ত গরম জলের সহিত 'কাস ভৈরব' ব্যবস্থেয়। প্রথম হইতে এই অবস্থা

উপেক্ষা করিলে Pneumonia হইবার আশঙ্কা থাকে।

৩। সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, অসহ্য শিরঃপীড়া, অত্যধিক দুর্ব্বলতা এবং তৎসহ জ্বর দেখা যায়। অনেক সময় এই অবস্থায় রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে। কখন কখন জ্বর বেশী না থাকিলেও প্রলাপ দেখা যায়। শিশুদের এই প্রকার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইলে তড়্‌কা হইতে দেখা যায় এবং অনেক সময় Meningitis পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে,ইহাতে বায়ুর প্রকোপেরই আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জন্য ইহাতে জ্বর বেগের ও নাড়ীর বৈষম্য বিদ্যমান থাকে। এরূপ অবস্থায় মাথার যন্ত্রণার শান্তির নিমিত্ত কুড়্‌—চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিতে হয়। মাথার যন্ত্রণার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা নিরন্তর প্রয়োজ্য। আভ্যন্তরিণ প্রয়োগের নিমিত্ত দশমূল পাচন এবং নিম্ন লিখিত যোগটী প্রয়োজ্য।

(বহু পরীক্ষিত)

মকরধ্বজ	১রতি
মহালক্ষ্মীবিলাস	১ বটী
মৃত্যুঞ্জয় রস	১ বটী
কর্পূর	১ রতি।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ মাত্রা করিয়া দিবসে ৩ বার পানের রস ও মধুসহ প্রয়োজ্য।

শিরঃ এবং গাত্র বেদনার আধিক্য থাকিলে কিম্বা Meningitis এর আশঙ্কা থাকিলে পঞ্চবক্ত্র রস আদার রস ও সৈন্ধব লবণ সহযোগে ব্যবস্থেয়। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ১টী বেদানার রস ও মধু সহ প্রয়োজ্য।

এই রোগে খইএর মণ্ড, মুগের যূষ পথ্য। দুগ্ধ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নহে। রোগীর দৌর্ব্বল্য নাশের নিমিত্ত বরং মাংসরস (Broth) ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঠাণ্ডা হইতেই এ রোগের উদ্ভব। কোনও প্রকারের ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি পাচকাগ্নি ব্যাহত হয়, তাহা হইলে জ্বরের সহিত অগ্নিমান্দ্যের নানা-প্রকার উপসর্গ দেখা যায়। যেমন গা বমি বমি করা, অনেক সময় পাত্‌লা দাস্ত, প্রবাহিকা (আম আসা) উদরাধ্মান এবং তজ্জনিত শরীরের উপর বিষক্রিয়া (Toxemia) ইত্যাদি। এরূপ অবস্থা উপেক্ষিত হইলে রোগীর শ্বাসের গতি দ্রুত হয় এবং নাড়ী লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

এরূপ অবস্থায় বিবমিষা থাকিলে রোগীকে বৃহদ্বাতচিন্তামণি—বড়এলাচ চূর্ণ ২ রতি, কর্পূর ½ রতি ও মৌরী ভিজান জল সহ দিতে হয়। মলভেদ শান্তির নিমিত্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর—কর্পূর ½ রতি চালুনী জল সহ প্রয়োগ করিতে হয়। উদরাধ্মান শান্তির জন্য মকরধ্বজ ½ রতি, যবক্ষার /০ এলাচ চূর্ণ ২ রতি ও কর্পূর ½ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জল সহ প্রয়োজ্য। এরূপ অবস্থায় যাহাতে রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য জলীয় পথ্য অধিক মাত্রায় দিতে হয় মৌরী ও মিশ্রি ভিজান জল, লেবুর রস মিশ্রিত বার্লির জল এবং ছানার জল ইত্যাদি।

নাড়ী লোপ পাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইলে চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ—বেদানার রস সহ এবং অগ্নিতুণ্ডী কর্পূর ½ রতি পানের রস ও মধু সহ দিতে হইবে। উদরে অসহ্য বেদনা থাকিলে তার্পিন ও সর্ষপতৈল একত্র করিয়া পেটে মালিস এবং ভুবনেশ্বর—মরিচ চূর্ণ ২ রতি চালুনি জল সহ কাঁটানটের শিকড় ছেঁচিয়া যে রস পাওয়া যায় সেই রসের সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিজে বিশেষ মারাত্মক না হইলেও অচিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় মারাত্মক হইয়া উঠিতে পারে; সম্যক্ চিকিৎসা না করিলে ইহা হইতে Pneumonia, pluresy, Heart daisease, Kidney disease ও নানাপ্রকার শিরোরোগ হইতে পারে। এই কারণে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা একান্ত আবশ্যক। নড়াচড়া করিতে কিম্বা উঠা বসা করিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী যেরূপ তাপ বা শৈত্যের আকাঙ্ক্ষা করে, তদুপযোগী তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করা উচিত। মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক হইলে বরফ দেওয়া যাইতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে যদি তজ্জন্য রোগী অশান্তি বোধ করে, তবে আরগ্বধাদি পাচন ভিন্ন অন্য কোন বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। তীক্ষ্ণ বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিলে অনেক সময় হিতের পরিবর্তে অহিত সাধিত হইয়া থাকে। রোগীর ঘরে আলোক ও বায়ু যাহাতে সম্যক্ চলাচল করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, কিন্তু রোগী যদি তাহাতে অশান্তি বোধ করে, তবে ঘর বন্ধ করিয়া রাখাই ভাল। রোগ সারিয়া গেলেও রোগীর দুর্ব্বলতা অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য এবং কখন কখন কাসি অনুবর্ত্তন করে। এরূপ স্থলে মকরধ্বজ—বেদানার রস সহ এবং অগ্নি তুণ্ডী - জোয়ান ও মৌরী ভিজান জল সহ কিছুকাল প্রয়োজ্য। কাসি থাকিলে শৃঙ্গারাভ্র পিপ্পল চূর্ণ ও মধু সহ প্রয়োগ করিতে হয়।

মহর্ষি পুনর্ব্বসু আত্রেয় বলেন, "পঞ্চকর্ম্ম ও রসায়ন ঔষধ, সত্যাচরণ, সর্ব্বভূতে দয়া, দান, বলি, দেবার্চ্চন, সদ্বৃত্তির অনুষ্ঠান, প্রশম, আত্মগুপ্তি (মন্ত্রাদির দ্বারা আত্মরক্ষা) পুণ্যবান জনপদ সমূহের উপসেবন (স্থান পরিবর্ত্তন) ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্মচারী, জিতাত্মা, মহর্ষি, ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও সাত্বিকগণের সহিত সহবাস করিলে সর্ব্বপ্রকার "কালকৃত ব্যাধি'র হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অধুনা, এই সকল নিয়ম পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নাও হইতে পারে। তাঁহারা যদি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপালন করেন, তাহা হইলে ইনফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

১। ক্ষুধা না লাগিলে আহার করিবেন না।

২। অত্যধিক আহার করিবেন না।

৩। প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গ সেবন করিবেন।

৪। সর্ষপ তৈলে নস্য গ্রহণ করিবেন। ইহা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার একটী উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক (বহু পরীক্ষিত)।

৫। প্রাকৃতিক এবং শারীরিক অবস্থা

বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ সুখস্পর্শ জলে স্নান বা গাত্রমার্জ্জন করা উচিত।

৬। রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা পরিহার করিবেন।

৭। বদ্ধবায়ু পরিত্যজ্য।

৮। অজ্ঞাতচরিত্র বহুলোকের সহিত একত্র আহার ও উপবেশনাদি পরিহার্য্য।

৯। দন্ত ও মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ সর্ষপ তৈলের কবল ধারণ করিবেন।

১০। অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক রসায়ন ঔষধ সেবন করা উচিত।

আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই রোগের প্রতিষেধকরূপে এক প্রকার vaccine এর subcutaneous injection দিয়া থাকেন, আমাদের বিবেচনায় এরূপ injection না লওয়াই ভাল। কারণ, যে বিষকে vaccine দ্বারা নষ্ট করিতে হইবে তাহা তখন শরীরের মধ্যে উপস্থিত নাই অথচ অপর একটী বিষ শরীরে প্রবেশ করিল; তাহার বিষ ক্রিয়ায় শরীরের অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক।

কতিপয় ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

১। সর্পদষ্ট ব্যক্তির দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে উত্তমরূপে আকন্দর দুগ্ধ বা রস প্রলেপ দিবে। পরে ৩ ফোঁটা আকন্দ দুগ্ধ কিছু ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে ঐ বটীকা জল সহ ১ বার সেবন করিবে। যদি রোগীর জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে, ঐ আকন্দ দুগ্ধ ৬ ফোঁটা ও ডিষ্টিল ওয়াটার (চোয়ান জল) ৫৪ ফোটা উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া শিরার মধ্যে ইন্‌জেকসন করিবে। ইন্‌জেকসন একবারের বেশী করিবে না। উপরোক্ত নিয়মে এই ঔষধ ব্যবহারে গোখুরা সর্প প্রভৃতির বিষ নষ্ট হয়।

২। কলা গাছের এঁটে বা খোলার জল, অভাবে খোলাকে থেঁতো করিয়া উহা হইতে জল বহিষ্কৃত করিয়া ঐ জল অর্দ্ধপোয়া, তুলসী পত্রের রস এক তোলা উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন, অঞ্জন, নস্য এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে ও মস্তকে দিবে, এইরূপ করিবে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

৩। উন্মত্ত-কুকুরাদির দংশনে—পুনর্ণবার মূল।০ আনা ও ধুতুরার মূল।০ আনা উভয়

দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া কাঁচা গব্য দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত ক্ষিপ্ত-কুকুর ও শৃগালাদি কর্ত্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৪। ক্ষিপ্ত-কুকুর-দংশনে গরম জলের সহিত ৯ মাষা পরিমাণ কালজীরা গিলিয়া খাইলে কুকুর দংশনের বিষ নষ্ট হয়।

৫। নিসিন্দা বৃক্ষের মূলের কাঁচা ছাল ২ রতি ও আতপ চাউল ১ তোলা উভয় দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া কিছু দিন সেবন করিলে হাঁপানি ও কাস আরোগ্য হয়।

৬। কাটা ঘার রক্ত বন্ধ।—কচুর ডাঁটার টাটকা রসে কাটা ঘার রক্ত বন্ধ ও কাটা ঘা জোড়া লাগে।

কচুর পাতার নীচে যে সরু ডাঁটার মত দৃষ্ট হয় ঐগুলির রস নিষ্পেষণ করিয়া লাগাইলে রক্তের স্রাব আশু রুদ্ধ হয়। ইহার রস প্রয়োগ করিবার পর ক্ষত স্থানে পূযাদি কিছু না হইয়া একবারে বিচ্ছিন্ন চর্ম্ম সত্বই সংযুক্ত হইয়া যায়।

৭। কলাপাতা পোড়ান ছাই ১ তোলা, পুরাতন তেঁতুল গাছের ছাল (যে ছাল শুষ্ক হইয়া চটা উঠিয়া গাছের সহিত লাগিয়া থাকে) পোড়ান ছাই ১ তোলা, সৈন্ধব লবণ ৩ রতি, এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া বৈকালে খাইলে অম্লপীড়া আরোগ্য হয়। যাঁহারা অম্লপীড়ার জন্য বৈকালে সোডা খাইয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে এই দ্রব্য খাইতে অনুরোধ করি। ইহা ব্যবহারে প্রাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

৮। ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক।—চিরতা, কুটকী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ—সর্ব্বসমেত ২ ভরি, জল ।৷৹ সের, শেষ ৵৹ পোয়া, থাকিতে নামাইয়া উক্ত ক্বাথ প্রাতে ও বৈকালে পান করিবে। যে ম্যালেরিয়া জ্বর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে ইহা সেবনে তাহা নিবারিত হয়।

৯। পারা দোষ নাশক।—ধল আঁকড়ার মূল ৷৹ আনা, অনন্তমূল ৷৹ আনা, ছাতিম ছাল ৷৹ আনা, গুগগুল্ ৷৹ আনা, জল ।৷৹ সের শেষ ।৹ এক ছটাক। ইহা সেবনে রক্ত দোষ, পারাদোষ, বাত, শূল, বাতরক্ত এবং কুষ্ঠ পর্য্যন্ত ভাল হয়।

১০। বাতরোগ নাশক।—ধল আঁকড়ার পাতা বা ছাল বাটিবা বাতের ফোলা, বেদনা কন্‌কনানি প্রভৃতিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

১১। স্বরভঙ্গ নাশক।—অপরাজিতার শিকড়, পাতা, লতা সমস্ত একত্র সিদ্ধ করিয়া সেই জল গরম গরম আকণ্ঠ মুখমধ্যে ধারণ করিলে গলার ঘা ও স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

১২। কুলের পাতা পেষণ করিয়া ও ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব সহ সেবন করিলে স্বরভঙ্গ আরোগ্য হয়।

১৩। শিশুদিগের দুধতোলা নাশ।—টাটকা সরিষার তৈল প্রত্যহ তিন চারিবার করিয়া পেটে মালিস করিলে অথবা এক-টুক্‌রা ফ্ল্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিলে দুধতোলা নিবারিত হয়।

১৪। মুতাঘাসের বীচি, আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া ৩ তিন রতি

মাত্রায় কিঞ্চিত স্তনদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের দুধতোলা নিবারিত হয়।

১৫। আকনাদি (নিমুখী) পাতার মসৃণ পৃষ্ঠাটী গব্যঘৃত মাখাইয়া ফোড়ার ঘায়ে লাগাইলে ঐ ঘা ক্রমে শুকাইয়া যায়।

(ক) আকনাদির পাতার অপর পৃষ্ঠা অর্থাৎ শিরার দিক গব্যঘৃত মাখাইয়া ফোড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

(খ) আকনাদির পাতায় ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপ শিখায় কাজল করিয়া শিশুর চোখে দিলে তাহাদের চক্ষুঃপীড়া ভাল হয়।

(গ) আকনাদির পাতা গরম করিয়া অর্শের উপরে স্বেদ দিলে টাটানি নিবারণ হয়।

(ঘ) আকনাদির পাতা ছেঁচিয়া তাহার রস ২ দুই তোলা মিশ্রিচূর্ণ বা চিনি সহ সেবন করিলে আমাশয় ও রক্তাতিসার আরোগ্য হয়।

(ঙ) আকনাদির পাতা ও কুকসিমার পাতা একত্র সমভাগে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া তাহার রস অর্দ্ধ ছটাক করিয়া দিনে ৩।৪ বার সেবন করিলে সপূজ রক্ত বিষাক্ত মেহ অতিশীঘ্র উপশমিত হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত এবং অর্শ ও সারিয়া থাকে।

শিশুচিকিৎসা।

চোখ উঠায়।—(১) সেওড়ার আটায় কাজল পাড়িয়া সেই কাজলের অঞ্জন দিবে। (২) ছাগ দুগ্ধের সহিত দারু হরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটি পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে। (৩) ১ রত্তি পরিমিত তুঁতে একছটাক পরিষ্কার জলে গুলিয়া একটি শিশিতে রাখিবে এবং ঐ জল লইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার চক্ষুতে ছাট দিবে।

দুধ তোলায়। (১) দুধের সহিত চুণের জল মিশাইয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে উপশম না হইলে দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া অল্পে অল্পে মাংস রস পান করাইবে। (২) বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ—ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশাইয়া মধুর সহিত চাটিতে দিবে। (৩) আম্র কেশী, খই ও সৈন্ধব লবণ ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত খাইতে দিবে। (৪) টাটকা সরিষার তৈল দিবসে ৩।৪ বার পেটে মালিশ করিতে দিবে এবং একটুকরা ফ্ল্যানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া রাখিবে।

তড়কায়। হলুদ—অগ্নিতে পোড়াইয়া কপালে অল্প অল্প তাপ দিবে। হলুদের পরিবর্ত্তে লৌহ শলাকারও তাপ দেওয়া যাইতে পারে। চোখে মুখে শীতল জলের ছাট দিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় মূর্চ্ছা ভঙ্গ না হইলে নিশাদল ও চূণ একত্র মিশাইয়া শিশুর

নাকের নিকট ধরিবে। শিশুর তড়কা নানা কারণে হইয়া থাকে। অতিরিক্ত জ্বর-সন্তাপ জন্য তড়কা হইলে চোখে মুখে ও মাথায় শীতল জলের ছাট দিবে; পিঠের শির দাঁড়ায় ও মস্তকের পশ্চাৎভাগে জলের ছাট দিবে এবং জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। দুর্ব্বলতার জন্য তড়কা হইলে রাই সরিষার গুঁড়া মিশ্রিত গরম জল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে হাঁটু পর্য্যন্ত পা ডুবাইয়া রাখিবে। রাই সরিষার গুঁড়া ও ময়দা একত্র মিশাইয়া শিশুর দুই পায়ের ডিমে পটি বসাইয়া দিবে। বগলে, হাতে ও পায়ে অগ্নির সেক দিবে। ক্রিমি জন্য তড়কায় হাতে সহ্য হয় এরূপ গরম জল একটি পাত্রে রাখিয়া তাহাতে শিশুর গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইবে এবং আধ হাত উচু হইতে ধারাণী করিয়া শীতল জল তাহার মস্তকে ঢালিবে। ৫।৭ মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ করিয়া তাহার গা মোছাইয়া দিবে। সকল প্রকার তড়কাতেই এই সকল প্রক্রিয়ার পর দাস্ত করান উচিত। পরিষ্কৃত এরণ্ড তৈলের দ্বারা দাস্ত করান সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

ক্রিমিতে।—(১) পালিদা মাদারের পাতার রস ও মধু (২) বিড়ঙ্গ চূর্ণ ও মধু (৩) ভাঁট পাতার রস ও মধু সেবন করান উত্তম ব্যবস্থা।

পাশ্চাত্যমতে নাড়ীতত্ত্ব।

[ডাঃ আর, এল, সূর, এল, এম, এস, এম, ডি]*

"তদেব যুক্তং ভৈষজং যদা রোগ্যায় কল্পতে।
সচৈব ভিষজাং শ্রেষ্ঠো রোগেভ্যো
যঃ প্রমোচয়েৎ।"

যে দ্রব্য—রোগ আরোগ্য করে তাহাই প্রকৃত ঔষধ।

যিনি রোগ হইতে মুক্ত করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

That alone is the right medicine which can remove disease.

He alone is the true physician who can restore health.

যে শাস্ত্র (এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজি, হাকিমি, বাইওকেমিক প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্র) অধ্যয়ন করিলে সহজে রোগ নিরূপণ ও নিরাকরণ করা যায় তাহারই নাম রোগ নিরূপণ তত্ত্ব। রোগ নিরূপণ তত্ত্বে পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিলে পদে পদে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। যে কোন শাস্ত্র-মতের চিকিৎসকের দেখা উচিত, কোথায়

* প্রবন্ধ লেখক ডাক্তার সূর অশীতিপর বৃদ্ধ ও প্রবীণ চিকিৎসক। ইনি কলিকাতা C, H, Medical College এর প্রিন্সিপ্যাল। আঃ সং।

কোন সূত্রে, কিরূপে রোগের উৎপত্তি হয়, কি উপায়েই বা তাহা নিবারিত হইতে পারে, এ সকল বিষয়ের যিনি প্রকৃত তত্ত্ব অবগত আছেন তিনিই সমস্ত, চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন।

স্বাস্থ্যের বিপরীত অবস্থাকেই রোগ বলা যায়, সেই রোগ কোথা হইতে কি সূত্রে উৎপন্ন হইল, তাহাই চিকিৎসকের দেখা কর্ত্তব্য।

যে রোগ শারীরিক গঠনোপাদানের বিপর্য্যয়বশতঃ উৎপন্ন হয় তাহাকে যান্ত্রিক (organic) পীড়া বলে।

যে রোগ শরীরের কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন জনিত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্রিয়া সংক্রান্ত (functional) পীড়া বলে।

নাড়ী পরীক্ষায় হৃৎপিণ্ড, শোণিত এবং রক্তাবহানালী সমুদয়ের অবস্থা জানিতে পারা যায়, এই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অনেক স্থলে শরীরের সাধারণ অবস্থা এবং সময়ে সময়ে পীড়ার প্রকৃতিও অবগত হওয়া যায়। নাড়ী—হাতের কব্জীর নিকট ধমনীর উপর অঙ্গুলি ন্যস্ত করিলে সহজে অনুভব হয়, যেন কি একটী তেজ ধমনীকে বিস্ফারিত করিয়া থাকিয়া থাকিয়া আঘাত করিতেছে। ধমনীর এই বিস্ফারণকে নাড়ী (pulse) বলে।

এই বিস্ফারণ হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের সহিত প্রায় সমকালেই সংঘটিত হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে ইহার গহ্বর হইতে সতেজে রক্তনিঃসারিত হইয়া ধমনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যে তেজে ধমনীর ভিতর রক্ত প্রবেশ করিবে, সেই তেজের পরিমাণানুসারে তাহার অভ্যন্তরে একটী তরঙ্গ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

এই শোণিত তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার সময় ক্রমান্বয়ে সমগ্র ধমনী মণ্ডলের বিস্ফারণ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে যে রক্ত তরঙ্গ ধমনীর মধ্যে চালিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত (pulse) নাড়ী।

ধমনীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলে—

ভূমিষ্ঠের পর নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১৪০ বার দপ দপ করে।

প্রথম বৎসরে নাড়ী ১১৫ হইতে ১৩০ বার দপ্ দপ করে।

দ্বিতীয় বৎসরে নাড়ী এক মিনিটে ১০০ হইতে ১০৫ বার দপ্ দপ করে।

তৃতীয় বৎসরে নাড়ী এক মিনিটে ৯০ হইতে ১০০ বার দপ্ দপ করে।

৭ম বৎসর পর্য্যন্ত নাড়ী এক মিনিটে ৮৫ হইতে ৯০ বার দপ্ দপ্ করে।

চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত নাড়ী এক মিনিটে ৮০ হইতে ৮৫ বার দপ্ দপ্ করে।

যুবা পুরুষদিগের নাড়ী এক মিনিটে ৭০ হইতে ৭৫ দপ্ দপ্ করে।

বৃদ্ধদিগের নাড়ী এক মিনিটে ৫০ হইতে ৬৫ বার দপ্ দপ্ করে।

শায়িত অবস্থায় নাড়ীর দপ্ দপ্ সংখ্যা যত থাকে, বসিলে তদপেক্ষা অধিক এবং দাঁড়াইলে আরও অধিক হইয়া থাকে।

নাড়ীর এই গতির কোনরূপে ব্যতিক্রম ঘটিলে রোগের লক্ষণ বুঝিতে হইবে। দুর্ব্বল অবস্থায় সময়ে সময়ে অঙ্গুলিতে আর একটী

ঘাত অনুভূত হইয়া থাকে, ইহাকে, দ্বিঘাত (dicrotic) নাড়ী বলে।

দ্বিঘাত নাড়ীর উৎপত্তি যথা ধমনী সকল সতত রক্তপূর্ণ থাকে ; এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের প্রতি সঙ্কোচনে ধমনী মধ্যে আবার শোণিত প্রবিষ্ট হয়, এই রক্ত এককালে সমগ্র ধমনীতে যাইতে পারে না, এওর্টা (aorta) ও ইহার যে সকল বড় বড় শাখা হৃৎপিণ্ডের নিকট আছে, রক্ত বেগে তৎসমুদায়কে বিস্ফারিত করিয়া প্রবেশ করে, পরে হৃৎপিণ্ডের বিস্ফারণ কালে এই সকল বিস্ফারিত ধমনী সঙ্কুচিত হইয়া শোণিতের উপর চাপিয়া আসে, সেই সেই চাপে সম্মুখে ও পশ্চাতে উভয়দিকেই রক্ত ধাবিত হয়, কিন্তু তখন রক্ত পশ্চাদ্ভাগে ভেণ্টিকেলে (venticle) পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে না, সঙ্কোচন বলে সম্মুখ ভাগেই কার্য্য করে, ইহাতে রক্ত প্রবাহে আর একটী তরঙ্গ উৎপাদিত হয়, সেই রক্ত তরঙ্গ সমস্ত ধমনীতে আবার ক্রমান্বয়ে বিস্ফারিত হইয়া যায়। এই বিস্ফারণকেই দ্বিঘাত নাড়ী বলা হইয়া থাকে, যে তরঙ্গে দ্বিঘাত নাড়ী উৎপাদিত হয়, তাহা নাড়ী উৎপাদক তরঙ্গের পশ্চাতে থাকে, সুস্থ অবস্থায় ইহা সাধারণ পরীক্ষায় অনুভূত হয় না।

দুর্ব্বল অবস্থায় কোন কোন স্থলে ইহা অঙ্গুলি স্পর্শে ও অনুভূত হয়, নাড়ীর স্বভাব বুঝিতে না পারিলে বিকৃত নাড়ীকে প্রকৃত নাড়ী বুলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনের ঘনতা পরীক্ষা করিলে ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না।

হৃৎপিণ্ড কোন কারণে উত্তেজিত হইলে ইহার সঙ্কোচনের ঘনতায় নাড়ীর গতি সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, এই সঙ্কোচনের ঘনতার বৃদ্ধির সহিত ইহার দ্রুততাও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এজন্য ঘন নাড়ীর গতি প্রায়ই দ্রুত হয়। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনায় নাড়ীর গতি সংখ্যা বাড়িয়া উঠে।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচনে যে রক্ত-তরঙ্গ ধমনী মধ্যে চালিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত নাড়ী, এই নাড়ীর সাহায্যে সকল প্রকার পীড়া নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন রোগের আক্রমণে নাড়ীও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে ; যথা—সূক্ষ্মা, বলবতী, পুষ্টা, দ্রুতা ও মন্দগতি ইত্যাদি। জ্বরের সময় নাড়ী দ্রুত চলে, অথচ পুষ্ট থাকে, দুর্ব্বলে নাড়ী সূক্ষ্ম, বিকারে নাড়ী সূক্ষ্ম, পুষ্ট, কখন বলবতী আবার কখন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। দুর্ব্বল অবস্থায় নাড়ী বলবতী হইলে মৃত্যুর পুর্ব্বলক্ষণ বুঝায়।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা ১০০বার অতিক্রম করিয়া যত বাড়িতে থাকে তত আশঙ্কার কারণ ও রোগের অবস্থা সাতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে।

নাড়ীর স্পন্দন স্বাভাবিক অপেক্ষা ৮।১০ সংখ্যার কম হইলে বুঝিতে হইবে যে জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

নাড়ীর গতি সর্পের গতির ন্যায় বক্র হইলে —বাত রোগের লক্ষণ বুঝায়।

নাড়ীর গতি পারাবত ও রাজহংস প্রভৃতির গতির ন্যায় হইলে কফের লক্ষণ জানা যায়।

নাড়ীর গতি কাক ও ভেকের ন্যায় ধারণ করিলে পিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নাড়ীর গতি দ্রুত বলিলে—হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন কার্য্য অল্পক্ষণে সম্পন্ন হওয়াতে রক্ত

সঞ্চালন দ্রুত ভাবে হইতেছে বুঝিতে হইবে।

নাড়ীর গতি ঘন বলিলে—অঙ্গুলিতে নাড়ীর গতি ঘন ঘন অনুভূত হইতেছে জানিবে।

নাড়ীর গতি ঘন ঘন ও দ্রুততার বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইলে—মৃদু মন্দগতি বলিয়া জানা যায়।

জ্বরে দেহের সাধারণ উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ড ও উত্তেজিত হইয়া থাকে। তাহাতে নাড়ীর গতি সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। রক্ত সঞ্চালনের ঘনতা বৃদ্ধিতে শ্বাস প্রশ্বাসের ঘনতা স্বাভাবিক অনুপাতে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাপমান যন্ত্রের এক এক ডিগ্রী পারদ উঠিলে প্রত্যেক ডিগ্রীর জন্য দশবার করিয়া নাড়ীর স্পন্দন বৃদ্ধি হয়।

নিশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রত্যেক মিনিটে ১৬ হইতে ২০ বার, কিন্তু প্রত্যেকবার নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত ৪ বার করিয়া নাড়ীর স্পন্দন হয়।

আরক্ত (scarlet) জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা যত বর্দ্ধিত হয়, অতিসারিক typhoid জ্বরে তত হয় না।

অপস্মার, মূর্চ্ছা (Hystirieal) প্রভৃতি স্নায়বিক পীড়ায় নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়।

জ্বরে (fever) পীড়ার ঘনতার বৃদ্ধি হয়। যে পরিমাণে রক্তের দূষিত স্রাব ও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে নাড়ীর গতি সংখ্যা বাড়িয়া থাকে।

নাড়ীর গতি সংখ্যা ১০০ বার অতিক্রম করিলে ভয়ের কারণ দেখা যায়, নাড়ীর গতি সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ১৬০ বার পর্য্যন্ত উঠিলে রোগীর অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্বল্প বিরাম (remittent) জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, বাত (rheumatism) জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় না।

অতিসারিক বিকার ও বাত জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে অধিক ভয়ের আশঙ্কা হয়, কিন্তু আরক্ত (scarlet) ও স্বল্প বিরাম জ্বরে নাড়ীর গতি সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

মূত্রগ্রন্থির পুরাতন পীড়ায় ধমনীর স্পন্দন প্রধান বৃদ্ধি এবং নাড়ীর কাঠিন্য দৃষ্ট হয়।

সন্ধিবাত (gout), পাণ্ডু (jaundice) রোগে এবং স্নায়ুমণ্ডলের (nervous system) যে কোন পীড়ায় নাড়ীর কঠিনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

রোগীর পথ্য।

(কবিরাজ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি.)

আজকাল আমাদের দেশে পুরাতন প্রথার আহার ও আচার ত্যাগ করায় ঘরে ঘরে রোগী। কাজে কাজেই ঔষধ ও পথ্যের দরকার। ঔষধের কথা "আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকায়" অনেক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আজ পথ্য সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। রোগাবস্থায় ঔষধের অপেক্ষা পথ্যের প্রয়োজনীয়তা অধিক।

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব
নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং
শতৈরপি।"

সকল পীড়ার যে ঔষধ খাইতে হয়, এমন নহে। তবে সুপথ্যে থাকা সকল রোগেই উচিত। পীড়তাবস্থায় কুপথ্য করিয়া কত হতভাগ্য সামান্য পীড়া হইতে অসাধ্য পীড়ার আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-কবলে নিপতিত হইয়াছে।

একটা কথা অনেকেই মনে করিতে পারেন, যে সাগু, বার্লি, এরারুট, সকল প্রকার ফুড (মেলিন্সফুড, কলিফ্লস্ ফুড, ইত্যাদি) প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং রোগীরাও খাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা পথ্য সম্বন্ধে আর কি জানিবার আছে? কিন্তু তা নয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সাগু, এরোরুট প্রভৃতির নাম ও নাই। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কি আছে তাই বলিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

সুস্থাবস্থায় আমরা অন্ন খাই, উহা ধান্য হইতেই উৎপন্ন, সেই জন্যই পীড়িতাবস্থায় সেই ধান্য হইতে উৎপন্ন বস্তু জাত পথ্যই প্রশস্ত। কারণ যে ব্যক্তি, যে বস্তুতে অভ্যস্ত, তাহার শরীরে সেই জাতীয় বস্তুই অধিকতর ফলদায়ক হয়। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ নব জ্বরাবস্থায় (যে সময় খাদ্য সম্যক পরিপাক হয় না) খৈ এর মণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীমচ্চক্রপাণি দত্ত সাধারণ জ্বরে প্রথম অবস্থায় ঔষধাদির ব্যবস্থা না করিয়া, পিঁপুল ও শুঁঠ দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই জলে খৈ এর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইরূপ অতিসারের প্রথম অবস্থার বেলশুঁঠ দিয়া জল সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া খৈএর মণ্ড করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। জ্বর না থাকিলে উদরাময়ে চিঁড়ার মণ্ড একটী উৎকৃষ্ট পথ্য, ইহা একাধারে ঔষধ ও পথ্য। বেলশুঁঠ দিয়া ছাগ দুগ্ধ অভাবে গোদুগ্ধ জ্বাল দিয়া খাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে ধান্যই প্রধান উপজীবী, রোগের অবস্থার সেই ধান হইতে প্রস্তুত খৈ, খৈ এর মণ্ড, চিড়া এবং চিড়ার মণ্ড পথ্য হইয়াছে। যে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার হইতেছে না, তাঁহার খৈ খাইলে দাস্ত পরিষ্কারের সহায়তা করিবে।

যাহাদিগের খৈ (আস্ত খৈ) খাইলে পেট

কামড়ায়. তাঁহারা খৈ এর মণ্ড করিয়া খাইলে, খৈ এর কণা (বা কণিকা) বাদ দেওয়ার দরুণ পেট ব্যথা করিবে না। যাঁহারা বিলাতী ফুডের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে বলি, অধিক দামে পুরাতন খাদ্য জিনিষ খাওয়া অপেক্ষা টাটকা খৈএর মণ্ড একটু কষ্ট করিয়া লইতে আপত্তি কি? দামও সস্তা, উপকারিতাও অধিক এবং টাট্‌কা। যাঁহাদের বিশ্বাস, সাহেবরা এমন ভাবে প্যাক্ করিয়াছেন, যে, ৬ মাসেও টাট্‌কা থাকিবে, তাঁহারা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, প্রথম দিন কৌটার ঢাক্‌নী খুলিলেই এখানকার জল মিশ্রিত বায়ু প্রবেশ করিয়াই পচাইয়া দিবে। খৈএর মণ্ড তৈয়ারী করিতেও কষ্টকর নহে। পরিষ্কার বস্ত্র খণ্ডে খৈ বাঁধিয়া গরম জলে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিলে খুব নরম হইবে, তাহার পর চট্‌কাইয়া উক্ত গরম জল মিছরি মিশাইয়া উক্ত বস্ত্র খণ্ডে ঘর্ষণ করিলেই মণ্ড নির্গত হইবে।

জল গরম করিবার সময় উহাতে শুঁঠ, পিপুল, বা বেলশুঁঠ যে রোগে যাহা প্রয়োজ্য তাহা দিলে, ঔষধ পথ্য একত্রেই হইল। সামান্য সামান্য পীড়ায় তাহার উপর নির্ভর করিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে রোগমুক্ত হইতে পারিবেন। কি কি রোগে কোন দ্রব্য দিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম,—

(১) নবজ্বরে অগ্নিমান্দ্য বা কফাধিক্য থাকিলে এবং সামান্য ক্ষুধা থাকিলে শুঁঠ ও পিপুল দিয়া সিদ্ধ জলে খৈএর মণ্ড করিয়া খাইবেন। মাত্রা—শুঁঠ ও পিপুল প্রত্যেক ॥০ তোলা জল ⁄২ সের শেষ ⁄১ সের। ছাঁকিয়া লইয়া, উক্ত এক সের জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিয়া খাইবেন। নবজ্বরে—পিত্তাধিক্য বা গা বমি বমি থাকিলে ক্ষেৎ-পাঁপড়া—এক তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের ছাঁকিয়া লইয়া উক্ত জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন। নবজ্বরে কোষ্ঠ কাঠিন্যে মনেক্কা বা কিসমিস্ ২ তোলা জলে ⁄২ সের শেষ ⁄১ সের উক্ত জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

(২) অতিসার বা জ্বরাতীসারে ধনে ও শুঁঠ প্রত্যেক ॥০ তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের, উক্ত জলে খৈএর মণ্ড প্রস্তুত করিবেন। জ্বর না থাকিলে চিড়ার মণ্ডও দিতে পারেন। পেটে আমের জন্য যন্ত্রণা থাকিলে বেল শুঁঠ—১ তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের; উক্ত জলে খৈএর মণ্ড করিবেন। জ্বর না থাকিলে চিড়ার মণ্ডও দিতে পারেন। রক্তাতিসারে (অবশ্য প্রথম অবস্থায় নহে) কুড়চির ছাল—এক তোলা জল ⁄২ সের, শেষ ⁄১ সের, উক্ত জলে মণ্ড প্রস্তুত করিবেন।

প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতির আশঙ্কায় অন্যান্য রোগের যে যে দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লিখিলাম না। তবে এ প্রবন্ধ পাঠক মহাশয়গণের অনুমত হইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় অধিকতর বিস্তৃত ভাবে লিখিব এবং প্রত্যেক রোগের পথ্যাপথ্য লিখিব।

খৈএর মণ্ড এবং চিড়ার মণ্ড ভিন্ন আরও একটী পথ্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহুল রূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। উহার নাম "যবাগূ"। আজ কাল আর উহার বড় প্রচলন নাই। সেজন্য বিস্তারিত ভাবে লিখিলাম না।

জ্বর ত্যাগ হইলে এবং শরীর হাল্‌কা হইলে

খৈএর মণ্ড বন্ধ করিয়া আস্ত খৈ, পলতার ঝোল বা মুগের যুষ দেওয়া যায়। জ্বর ত্যাগের পর দুগ্ধ দিতে ইচ্ছা করিলে দুগ্ধ /।৹ সের এক খানি আস্ত পিপ্পল দিয়া সিদ্ধ করিয়া, দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইতে হয়, সেই দুগ্ধই খৈএর সঙ্গে দিতে হয়। জ্বরের প্রথম অবস্থায় দুগ্ধ দেওয়া অনুচিত। অনেকস্থলে দেখা যায় জ্বর হওয়ার দিনেই বা তৎপর দিবসে ডাক্তার বাবু দুগ্ধ খাইতে বলেন। তাঁহারা কেন এরূপ ব্যবস্থা করেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে হয়, তাঁহারা বিলাতী পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। সেখানকার লোকেরা সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে মাংস খাইতে অভ্যস্ত। তাঁহাদের জ্বর হইলে দুগ্ধ ও রুটী লঘু পথ্য। তাই বলিয়া যে দেশের লোকেরা ধান্যকে ২।৩ বার সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া, সেই চাউল প্রচুর জলে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, তাহার ফেন বা মাড় (যাহাতে অনেক পুষ্টিকর পদার্থ থাকে) ফেলিয়া নিত্য আহার করে; তাহাদিগকে জ্বর হইলে কি দুগ্ধ ও রুটী দেওয়া যায়?

অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রোগীর জ্বর ত্যাগের পর অন্ন পথ্য দিবার পূর্ব্বে রুটি পথ্য দেওয়া হয়। ইহাও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ গম গুঁড়া করিয়া জলে মাখাইয়া এক মিনিট বা দুই মিনিট কাল অগ্নি সংযুক্ত করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়, তাহা কখনও ভাত অপেক্ষা লঘু হইতে পারে? এদেশীয় শাস্ত্রকারগণ রুটীর বিষয় যে জানিতেন না, তাহা নহে। কারণ 'ভাব প্রকাশে' আছে।

শুষ্ক গোধূম চূর্ণেন কিঞ্চিৎ পুষ্টাং
'চ পেলিকাং।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্য-গারে
২পিতাং পচেৎ॥
সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা, গুর্ণান্
তস্যাঃ প্রচক্ষহে।
রোটিকা বলকৃৎ বৃষ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধন॥
বাতঘ্নী, কফকৃৎ, গুর্ব্বী, দীপ্তাগ্নিনাং
প্রপূজিতা॥

অর্থাৎ শুষ্ক গম চূর্ণ করিয়া জল দিয়া মাখিয়া লেচী পাকাইয়া চাটুতে গরম করিয়া অগ্নিতে দিয়া সেঁকিয়া লইবে। রুটী—কফ জনক এবং গুরুপাক, এজন্য প্রবলঅগ্নি ব্যক্তি দিগেরই ইহা সুখাদ্য। যাঁহারা রুটি খাইয়া হজম করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে রুটী শুক্র, বৃদ্ধি ও ধাতুপুষ্টি করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং বায়ু নষ্ট করে। সেই জন্যই পশ্চিম দেশীয় দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিরাই রুটীই খান। তাঁহারা বলেন যে,কেবল লঘুপাচ্য ভাত খাইলে,তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। এ হেন রুটী, রোগীকে ভাত দিবার পূর্ব্বে যে দিতে দেখা যায় তাহার কারণ কি? সাহেবী কেতাবের জ্বরের পথ্যের দুগ্ধ ও রুটীর অনুকরণ অজ্ঞাতসারে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ব্বে এরূপ ছিলনা, খৈ, বেগুন পোড়া, তারপর মুগের যূষ দিয়া খৈ তারপর "ওগরা" দেওয়া হইত। দুইভাগ সোনামুগের ডাল, এক ভাগ খুব পুরাতন চাউল, হলুদবাটা, আদা বাটা, মৌরি বাটা' দুই একটা পটোল দিয়া সিদ্ধ করিয়া, রোগীর শরীরের অবস্থা বুঝিয়া সিদ্ধ করিবার সময় সামান্য পরিমাণ গব্য ঘৃত দেওয়া হইত। এবং উহাই গরম খাইতে দেওয়া হইত, এই 'ওগরা' সহ্য হইলে তৎপর দিবস ভাত দেওয়া হইত।

পথ্য সেবনের পর রোগী দিব নিদ্রা না সেবন করেন, তদ্বিষয়ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হইত। জ্বরের প্রথম দিন হইতেই জল অর্দ্ধেক সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিতে দেওয়া উচিত। উক্ত সিদ্ধ জল যেন পর্য্যুষিত বা বাসী না হয়।

আমরা যদি প্রাচীন প্রথায় পথ্য ব্যবহার করি, তাহা হইলে রোগ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে দূর হইবে।

অত্র প্রবন্ধে জ্বর সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ লেখা হইল। অন্যান্য রোগের পথ্য বিধান পরে লিখিব।

বাঙ্গালী ছেলেদের স্বাস্থ্য।

(কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন)

—:+:—

বাঙ্গালী ছেলেরাই বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধর। এই বংশধরদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য—বিদ্যালয়ের বি এ, এম এ পাশ করাইবার জন্য বাঙ্গালী অভিভাবকেরা যেরূপ মনোযোগী, তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁহারা যে সেরূপ মনোযোগী নহেন, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিয়োজিত স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির রিপোর্ট হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ গত তিন বৎসর হইতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার ফলে ছয় হাজার ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোনো কোনো কলেজে শত করা দশ জন ছাত্র প্লীহা বৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছে, কোনো কোনো কলেজে শতকরা একান্ন জন ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি কম হইয়াছে। অনেক ছাত্রের দাঁতের পীড়া প্রভৃতি আছে। তদ্ভিন্ন বহু সংখ্যক ছাত্রকে প্রকৃত প্রস্তাবে রোগগ্রস্থ বলিয়া তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহারা যে কি ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে, তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। মোটের উপর তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্কটিশ চার্চ্চ, ইউনিসিভার সিটি, সিটি, প্রেসিডেন্সী, সি, এম, এস, এবং বঙ্গবাসী—এই কলেজ গুলির মধ্যে শতকরা ৭১ জন ছাত্র নীরোগী নহে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির রিপোর্ট হইতে আরও জানিতে পারা যায়, কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৭৭ জন সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সক্ষম নহে। একুশ বৎসর বয়সের পর হইতেই অধিকাংশ ছাত্রেরই স্বাস্থ্য হানি ঘটিয়া থাকে কিন্তু ১৬ বৎসর হইতেই চক্ষুরোগ, কর্ণ রোগ ও দন্ত রোগের সূচনা হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক ছাত্রের অজীর্ণ রোগের মূল কারণ দন্তরোগ, কারণ তাহার জন্য তাহারা ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে

পারে না। ফলকথা স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অনুসন্ধানের ফল অতীব শোচনীয়, বাঙ্গালী বালকের এই শোচনীয় স্বাস্থ্য হানির ফলে বাঙ্গালী জাতি যে ধ্বংসের পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এখন ইহার কারণ কি তাহা স্থির করা যাউক। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতি বহুসংখ্যক ছাত্রকে যে রোগগ্রস্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অথচ তাহারা কি রোগে ভুগিতেছে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, সে সম্বন্ধে তাহাদের কি রোগ—তাহা আমরা বলিয়া দিতে পারি। সে রোগের মূল কারণ বাঙ্গালী ছাত্রের ব্রহ্মচর্য্য হানি। আগে পঠদ্দশায় আমাদের দেশের ছাত্রদিগকে যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইত, আধুনিক শিক্ষা-সমিতির নিয়মে তাহা আর করিতে হয় না। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অর্থকরী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। শিক্ষকের সহিত ছাত্রগণের সম্বন্ধ স্কুল কলেজে যতটুকু আবশ্যক—তাহার অধিক হইবার উপায় নাই। আমরা বাল্যকালে পণ্ডিত মহাশয়কে পথিমধ্যে দেখিলে ভয়ে কাঁপিতাম—বিশ হাত দূরে পলায়ন করিতাম। এখন ছাত্র সমাজে সে ভীতি উৎপাদনের কোনো কারণই নাই। শিক্ষক বেতন ভোগী, ছাত্র নিয়মিত বেতন যোগাইয়া তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেয়, সুতরাং বর্ত্তমান সভ্য যুগের ছাত্রগণ শিক্ষকের শাসনগণ্ডীর মধ্যে থাকিতে একান্তই নারাজ। মেসে এবং হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে, তাহাদের অভিভাবকগণ প্রতিমাসে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন মাত্র, ছাত্র কলিকাতায় কি ভাবে কাটাইতেছে, তাহার চিন্তা করিবার অনেকেরই অবসর নাই। ফলে, মেসে এবং হোষ্টেলে রাখিয়া ছাত্রদিগকে যে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, তাহা হইতেই যে সকল ছাত্রের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতির অনুমিত অজ্ঞাত রোগের কারণ তদ্দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতিও কতকগুলি ছাত্রকে অজীর্ণ রোগগ্রস্থ বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন এবং ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত ছাত্র ভিন্নও দেশের বহু সংখ্যক ছাত্রই এখন অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে। ইহার মুখ্য কারণ—বাঙ্গালী ছাত্রের একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের অভাব। যে সকল কারণে অজীর্ণ রোগ জন্মিয়া থাকে, বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে তাহার কারণ যে যথেষ্ট বিদ্যমান তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে অজীর্ণ রোগের কারণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অত্যম্বু পানাদ্বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্ন বিপর্য্যয়াচ্চ।
কালে হপি সাত্ম্যং লঘু চাপি
ভুক্তমন্নং ন পাকংভজতে নরস্য ॥

অর্থাৎ অধিক জল পান, বিষম ভোজন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এই সকল কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগ উপস্থিত হইলে তখন উপযুক্ত সময়ে দেহানুকুল লঘু আহারও পরিপাক প্রাপ্ত হয় না।

ইহা ভিন্ন ছাত্র সমাজে বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণের প্রকোপ যাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রথমটির কারণ হইল

অত্যাচারের ফলে পিত্ত প্রকোপের কারণ সংঘটন এবং দ্বিতীয়টির কারণ হইল অত্যাচারের ফলে বায়ু প্রকোপের কারণ সংঘটন। অজীর্ণ উৎপত্তির কারণে যে সকল কথা আর্য্যঋষি বলিয়া গিয়াছেন, যদি চিন্তা করিয়া দেখা যায়,তাহা হইলে প্রত্যেক-টির কারণ যে মিলান যাইতে পারে তাহাও প্রমাণ করা যায়। আমরাই সে প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

অধিক জল পান—কলিকাতা সহরে চা, সোডা, লেমোনেড, বরফ, সরবতের বিক্রয়াধিক্য দেখিলে এবং এগুলি কাহারা অধিক ব্যবহার করে তাহার হিসাব করিলে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যেই ইহা যে অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহা অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী ছাত্রদিগের মধ্যে অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্য জন্মিবার সর্ব্বপ্রথম কারণ হইল এইটিই। দ্বিতীয় কারণ বিষম ভোজন। ইহাও বাঙ্গালী ছাত্র জীবনে যথেষ্ট ঘটিতেছে। কলিকাতার রেষ্টরেণ্ট গুলির প্রধান ক্রেতা কাহারা—যাঁহারা তাহার খোঁজ রাখেন, তাঁহারা যে এ বিষয়ে আমাদের সহিত একমত হইবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি। তৃতীয় কারণ—মলমূত্রাদির বেগ ধারণ। ইহাও ছাত্র-জীবনে অনেক সময় অনেক কারণে অনিবার্য্য হইয়া থাকে। ৪র্থ কারণ—দিবা নিদ্রা না থাকুক, রাত্রি জাগরণ যে কারণেই হউক বাঙ্গালী ছাত্রের মধ্যে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। পরীক্ষার প্রতিযোগিতার জন্য বাঙ্গালী ছাত্র রাত্রি জাগিয়া চক্ষু রোগেরও কারণ ঘটাইতেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ এবং অগ্নিমান্দ্যকেও সাদরে ডাকিয়া আনিতেছে।

শুধু লেখাপড়ার খাতিরেই নহে, কলি-কাতায় থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখিবার জন্যও বাঙ্গালী ছাত্রের ভিড় শনি রবিবারে বড় কম দেখা যায় না। ইহার ফলে রাত্রিজাগরণে স্বাস্থ্যের অপচয় তো করা হয়ই, তা' ছাড়া হাবভাবশালিনী বারবনিতা দিগের কুটিল কটাক্ষ এবং অঙ্গ বিন্যাসেও যে অনেকে অধঃ-পতনের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন তাহাও বলা যাইতে পারে। প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নবিকার প্রভৃতি ব্যাধি সকল কুসুম সুকুমার ছাত্র জীবনে এমনই করিয়াই তো প্রবেশ করিয়া থাকে। হায়, সুদূর মফঃস্বল-বাসী বাঙ্গালী অভিভাবক এ সকল কথা একবারও চিন্তা করেন কি না তাহা আমরা জানি না।

মেসে এবং হোষ্টেলে যে সকল ছাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকে, নিশ্চয়ই তাহারা মফঃস্বল হইতে সমাগত হইয়াছে। এখানে ইলেকট্রিকের পাখার হাওয়াই সেবন করুক, আর অর্দ্ধপোয়া পথ পর্য্যটনে ট্রাম কোম্পানীকে সাতটি পয়সা না দিলে পথ চলিতেই কষ্ট বোধই করুক, তাহারা জন্মিয়াছে এবং লালিত পালিত হইয়াছে কিন্তু সেই শ্যামল-শস্য—পরিপুষ্টিত আম্র জম্বুর স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতলিত ষড়ঋতু প্রবাহিত পল্লীগ্রামে। সেই পল্লীগ্রামে তাহারা জন্মিয়াছে, দুঃখকষ্টের ভিতর তাহারা প্রতিপালিত হইয়াছে। তখন তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে ডাল-মাছ-ব্যঞ্জন দিয়া এক থালা ভাত খাইতে পারিত, মুড়ি চাল-ভাজা-চিঁড়া, ছোলাভাজা—তেল নুন মাখিয়া

দু'বেলা দু'কোঁচড় খাইয়া হজম করিত। আম কাঁটালের সময় একসঙ্গে ৫।৬ গণ্ডা আম, একটা আস্ত কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইয়া জীর্ণ করিবার শক্তি রাখিত। কিন্তু যেই তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের জন্য সহরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল, সেই তাহাদের হজম শক্তি কমিয়া আসিল, মেসে হোষ্টেলে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়িত হইলেও অর্দ্ধ ছটাক চাউলের অন্নও তাহার হজম করিবার শক্তি থাকিল না, কোনো দিন কোনো কারণে একটু বেশী আহার করিলেই বটকৃষ্ণ পালের দু'বোতল সোডা পান না করিলে তাহার ভক্ষিত অন্ন জীর্ণ হইবার উপায় থাকিল না,—এই দাঁড়াইয়াছে বাঙ্গালী প্রবাসী ছাত্রদিগের অবস্থা। এই অবস্থার জন্যই তো স্বাস্থ্য পরীক্ষক সমিতি বহু সংখ্যক ছাত্রকে অজ্ঞাত রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

এখন ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থা কি? বহুকালাবধি চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী থাকিয়া আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সত্যই বাঙ্গালী ছাত্র দিগের অধিকাংশই নানারূপ ব্যাধিগ্রস্থ। সর্ব্বাপেক্ষা এই সমাজের প্রবল ব্যাধি শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া। শুক্র সম্বন্ধীয় পীড়া বলিলেই যে তাহারা গণোরিয়াগ্রস্থ বুঝিতে হইবে—তাহার কোনো কারণ নাই। যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, আয়ুর্ব্বেদে প্রমেহ বিংশতি প্রকার। ছাত্রজীবনে যে অজীর্ণের কথা বলিয়াছি, বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে—সেই অজীর্ণ নিজে একটি স্বতন্ত্র রোগ না হইয়া এই প্রমেহেরই অন্তর্গত হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে কফজ মেহে—আহারের অপরিপাক, অরুচি, বমি এ কয়টি বিশেষ উপসর্গ। বাতজ মেহে উদাবর্ত্ত একটি বিশেষ উপসর্গ। কাজেই ছাত্রজীবনে কাহারও অজীর্ণ হইয়াছে শুনিলে তাহার মূল কারণ প্রমেহ কিনা তাহা চিন্তার বিষয়। তাহার পর স্বপ্নবিকার—যৌবন স্বভাবসুলভ ব্যাধি হইলেও স্ত্রীজাতির চিন্তনে এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে শতকরা অর্দ্ধেকের উপর ছাত্র এই রোগে আক্রান্ত; ফলকথা সহরের বিলাস সম্ভারের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা বড়ই সমস্যার কথা। তাহার পরে অভিভাবক শূন্যাবস্থায় ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিহত করিবার কেহই নাই। এইজন্য বাঙ্গালী বালককে বাঁচাইতে হইলে বাঙ্গালী অভিভাবককে শুধু অর্থ পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না, যে পর্য্যন্ত কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ না রাখিয়া ছাত্রের কার্য্য কলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করা না হইবে—সে পর্য্যন্ত যে সুফলের আশা করা যাইবে না তাহা সুনিশ্চিত।

বাঙ্গালী ছাত্র সমাজে স্বাস্থ্যহানির আর একটি কারণ, এখনকার উপন্যাস বা নভেল পাঠ। এই নভেলে শুধু ছাত্র সমাজ নহে, বাঙ্গালী মহিলা সমাজেরও বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে। বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যহানির যতগুলি কারণ অধুনা বিদ্যমান, তন্মধ্যে এই নভেল পাঠে নভেলিয়ানা ভাবে অভ্যস্ত হওয়া তাহার অন্যতম। এই নভেলের কথা কহিয়া বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্য হীনতার কথা বুঝাইতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়, সুতরাং সে কথা আপাততঃ আর অধিক না বলিয়া

আমরা এ সম্বন্ধে একটু ইঙ্গীত করিয়া রাখিলাম মাত্র, সে বিষয়ের সমালোচনা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিব। ফলকথা বাঙ্গালী ছাত্র দিগের অভিভাবক দিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদের বংশধর দিগকে স্বাস্থ্য সুখ প্রদানের অভিলাষ রাখিলে, তাহাদিগকে নীরোগী ও দীর্ঘায়ু দেখিয়া আনন্দ বর্দ্ধনের কামনা রাখিলে তাহাদিগের দুর্ব্বল চিত্ত যাহাতে বিলাসিতার মুহ্যমান হইয়া না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা আগে করিতে হইবে? কলেজি শিক্ষা দিতে হইলে সহরে না রাখিলে উপায় নাই—ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাহার ফলে যাহাতে তাহার স্বাস্থ্যের অপচয় না ঘটে তাহা তো সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য পালনের জন্য বাঙ্গালী অভিভাবক চিন্তা করুন ইহাই আমাদের বক্তব্য।

কলের জিনিস—নমস্কার।

শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, বি, এ,

পল্লী হ'তে পাঠাই মোরা
ধোয়া, বাছা, ঝাড়া গম—
সোণার বরণ, পরিপাটী,
কাঁকরশূন্য, মনোরম।
কিন্তু যখন কলে পিষে
ময়দারূপে দেন গো দেখা,—
বস্তাবন্দী সে যে কি চীজ,
বল্‌তে নারি, না যায় লেখা।
এক, দুই, তিন মার্কা আবার—
যার যা খুসী লওরে ভাই;
(কিন্তু) সবার ভিতর অল্প অধিক
আছে ভেজাল—ভস্ম ছাই।
'ডাল রুটিখাও' বলেন যাঁরা
বাঙ্গালীকে ক'র্‌তে বীর;
একটিবার কি ভাবেন তাঁরা
হ'য়ে সুস্থ, ঠাণ্ডা, ধীর।
ডাল খাবে কি গরীব লোকে—
ভাত জুটেনা পেটভরা;
মলিন মিশ্র পচা ময়দা
যৌবনেতে আনে জরা।
বুকজ্বালা যে কেন এত,
পাথুরি, অর্শ, আমাশয়,—
দেশটা হ'ল হাঁসপাতাল গো,
ভাব্‌ছেন কি কেউ মহাশয়?
এর প্রতিকার ক'র্‌লে তবে
বাঙ্গালী হবে সুস্থ—সবল;
(নহিলে) বুদ্ধিজীবী বায়স চতুর
চিররোগী রইবে কেবল।
দেহশূন্য আত্মরাম,
পায় কি কেহ বীরের মান?
আজিকার এই কলের যুগে
মিছরী বাবুর নাহি স্থান।
লুচি ভাজার গন্ধ পেলে
উঠ্‌ত প্রাণটা লাফিয়ে নেচে;
গব্যঘৃতে, ময়দা খাঁটি—
আহা! পেলে যাই গো বেঁচে।

এখন কিন্তু পচা ঘি-তেলে,
ভেজাল ময়দা সহযোগে,
মড়াপোড়া গন্ধ ছাড়ে
লুচি, কচুরি, মোহন ভোগে !!
কেমন খাসা কাজলি আকের
গুড়—আহা কি মধুর তার !
মধু ফেলে খাই যে শুধু
সন্দেশও গো মানে হার !!
এ গুড় যখন 'শুদ্ধ' হ'য়ে
কলের করাল কবল থেকে
বাহির হন গো চিনিরূপে
শাদা ফরসা রঙে ঢেকে ;
সে স্বতার আর নাই ত তখন,
কেমন যেন বেরসিক ;—
শাদার ভিতর এত গলদ !
ধবল শুভ্রে শত ধিক্ !!
এ সভ্যতার মাকাল শোভা,
চোখভুলান ফকিকার ;
অন্তরেতে গরল রাশি—
বাহ্যচটক খুশ বাহার।
যমদূত ওগো ভেজাল দুধ,
অগণিত ব্যাধির মূল ;—
শিশুমৃত্যুর প্রধান কারণ
যকৃৎরোগের হেতুর স্থূল।
কলের আটার রূপে মজে'
কি ঝকমারি করেছি ভাই !
(এখন) বল্‌ গো কোথা যাঁতা ভাঙ্গা
মোটা মিঠা ময়দা পাই ?
ভেজাল নোংরা পচা খাবার —
রোগের আকর খাবনা আর ;

প্রাণের দায়ে সন্ধ ছেড়ে গো
শাক চর্চ্চরী করেছি সার !
কল কারখানার দেশে রে ভাই
নৈতিক হাওয়া পচে গেছে ;—
স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন
শাস্ত্রে নিষেধ ক'রে দেছে।
সভ্যযুগের আলোর মাঝে
লুকিয়ে আছে অন্ধকার ;—
স্বার্থ ল'য়ে কাটাকাটি,
কামড়াকামড়ি অনিবার।
ফিরে আসুক প্রাচীন যুগের
মোটা কাপড় মোটা ভাত ;
প্রেমে করব গলাগলি
ঘুচে যাবে রক্তপাত।
হাল চালাব নিজ হাতে—
বুন্‌ব কাপড় আপনার ;
পূতপল্লী-তপোবনে
লুট'ব কত স্বখের ধার।
স্বাবলম্ব হারিয়ে ফেলে
কলের অধীন হইছি ভাই ;—
উঠ্‌তে বস্‌তে হাঁচ্‌তে সদা
কলের অনুগ্রহ চাই।
কলে হাসি, কলে কাঁদি
কলে রাঁধি, কলে খাই ;
জীবন মরণ কাঠি যে কল—
এই আছি আর এই গো নাই !
সভ্যযুগের সাদা, মিহি,
ফরসা, সরু, পরিষ্কার,
বিষ খেয়ে যে জ্বলে মরি—
কলের জিনিস—নমস্কার !
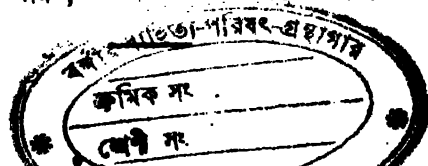
পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা।

(শ্রীআশুতোষ রায় এল-এম-এস,)

এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়ার শিক্ষা মন্দির (Alexandrian School.)

খ্রীষ্টীয় জন্মিবার ৩৩১ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট এ্যালেক্‌জাণ্ডার (Alexander) নিজ নামে এসিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গম স্থানে মিশর প্রদেশে এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়া নামক নূতন নগর স্থাপন করেন। গ্রীক্‌ সভ্যতার অবনতির (declive Greek culture) পর এই নূতন নগরে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের চর্চ্চা ও উন্নতিসাধন হয়। কস্‌ (cos) হইতে হিরোফিলাস্‌ (Herophilus) এবং সিনিডস্‌ (cnidos) হইতে ইরেসিস্‌ট্রেটাস্‌ (Erasistratus) মিশর দেশের নূতন নগরে আগমন করতঃ চিকিৎসা-শাস্ত্রাগার স্থাপন করেন। এইরূপে চিকিৎসার দুই মতই মিশর দেশে প্রচারিত হয়।

এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়ার শিক্ষা মন্দিরে (Alexanderian school) শব ব্যবচ্ছেদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হয় ও ক্রমে অনেক উন্নতি হয়। শল্য চিকিৎসা (Surgery) এবং ধাত্রী বিদ্যার (obsлitries) এত উন্নতি হয় যে তাহা আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের ঐ সব বিষয়ের প্রায় সমকক্ষ।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদে বৃদ্ধ সুশ্রুত ইহার বহু পূর্ব্বে শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা, শরীরের অবয়বের বর্ণনা শল্য চিকিৎসা ধাত্রী কৌমার বিদ্যা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এ্যালেক্‌জেন্দ্রিয়েন্‌ স্কুলের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে।

ডাক্তার হরন্‌লি (Dr. Hournle) তাঁহার হিন্দু অষ্টিয়লজি (ostriology) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হিন্দুরা শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া কিরূপে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। (Probably it will come as a surprise to many, as it did to myself, to discover the amount of anat omical knowledge which is disclosed in the earlier medical works of India. Its extent accuracy and are surprising, when we allow for their early age.

ডাক্তার ওয়াইস্‌ (Dr. wise) তাঁহার Commenetary on the Hindu system of medicine এ লিখিয়া গিয়াছেন যে হিন্দু চিকিৎসকগণ শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যকতা সম্যক্‌ উপলব্ধি করেন ও তজ্জন্য শরীরের সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করেন। (Hindu Philosophers deserve the credit of having entertanied sound and philosophical views respecting the uses of the dead to the lioing were the first scientific & successful cultivators of the most important and essential of all department of medical knowledge viz Practical Anatomy).

এক্ষণে আমরা হিরোফিলাস্‌ এবং ইরেসিস্‌ট্রেটাস সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব।

হিরোফিলাস্‌ (Herophilus —B: 335 to 280) পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে ইনি এ্যানাটমি (Anatomy) শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন জন্য বিখ্যাত।

ইঁহার বিশ্বাস চন্দ্রমণ্ডলে (4th venticle of the brain) আত্মার (Soul) স্থান সম্বন্ধে যাহা বিবরণ লিখিত আছে নিম্নে সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল।

"সহস্রদল কমলের" (Brain with its innumerable folds) "মূলদেশে" (medulla ablongata) যেখান হইতে "সুষুম্না নাড়ীর (Spihal cord) আরম্ভ তাহার উপরে একটী ত্রিকোণ বিশিষ্ট "যোনি মণ্ডল" (Pons varolli) অবস্থিত। এই যোনি মণ্ডলের ভিতরে "চন্দ্র-কলা" (choroid Plexus) হইতে "অমৃতধারা" (coetbro spinal fluid) সদা সর্ব্বদা নির্গত হইয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিতেছে। এই চন্দ্র কলা যেস্থানে অবস্থিত তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানের নাম "চন্দ্র-মণ্ডল" (4th ventricle covered by optric Ihalamus, corpus striatum and other basal ganglia of the Brain). ঐ চন্দ্রমণ্ডলের (optic thalamus) ভিতর "নির্ব্বাণ-কলা" অবস্থিত, যাহাতে "নির্ব্বাণশক্তি" অন্তর্নিহিত আছে। যোগিগণ যোগ সাধন পূর্ব্বক ঐ শক্তি লাভ করেন। তখন উহার ভিতর "শিবস্থান" নামক শক্তি স্থান (centre) সাধকের মস্তিষ্কের ভিতর উদিত হয়। সাধক তখন মুক্তিলাভ করেন। সাধকের আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়।

২। ইরেসিসট্রেটাস (Erasistratus Bc. 280) হিপোক্রেটাসের সম সাময়িক ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন না। ইনি দোষ (Humour) রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। ইনি এম্ পিরিক মতাবলম্বীর অগ্রণী। ইঁহার মতে রোগোৎপত্তির কারণ শরীরের পরমাণুগণ (atoms) শাস্ত্রে এক প্রকারে মিলিত ও রোগে অন্যরূপে মিলিত হয় (the particular way in which the ultimately indivisible mol ues come together) ইংরাজিতে ইহাকে Atomistie or mechanical Theory of the causation of disease

Roman Medicine.

এ্যালেকজিন্দ্রিয়ার অবনতির পর রোমক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি আরম্ভ হয়। রোম যখন গ্রীসকে পরাজয় করিল, গ্রীক জ্ঞানালোক ধীরে ধীরে রোমকের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রীক পণ্ডিতগণ রোমে আসিয়া জ্ঞানালোক প্রকাশ করিলেন।

এসক্লিপিয়েডাস (Asclepiadus of Prusa Bc. ১২4) রোমের প্রথম গ্রীক ডাক্তার। ইনি হিপোক্রেটাসের "হিউমারাল" প্যাথলজি বিশ্বাস করিতেন না। ইনি "এমপিরিক" মতাবলম্বী ছিলেন ও তাঁহাদের "এ্যাটমিষ্টিক" (Atomistic theory) থিওরি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ইঁহার মতে শরীরের পরমাণু (atones indivisible moleculers) সংখ্যাতে (number) অবয়বে (size) ব্যবস্থায় (arrange ment) গতিতে (movement) পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া রোগোৎপাদন করে। ইঁহার মতে স্বাভাবিক ক্রিয়া (Nature) অপেক্ষা চিকিৎসা রোগ নিবারণের অধিক সক্ষম।

আমরা এ পর্য্যন্ত দুইটী ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকের দলের কথা উল্লেখ করিয়াছি।

১। ডগমেটিষ্ট, লজিকেল বা র‍্যাসন্যাল্ Dog matists Logical or Rational).

২। এমপিরিক্স (Empirics).

রোমে আরও তিনটী ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়।

৩। মেথিডিষ্ট (methodist.)

৪। নিউম্যাটিক (numatict)

৫। একলেকটিক্স (Eclectics)

৩। মেথডিষ্ট Methodist.

এসক্লিপিয়েডাসের শিষ্য থেমিসন্ (The misor of Loadicea B. C. 150) মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রথম। ইনি এমপিরিক্সদের আ্যাটমিষ্টিক থিয়রির আরও বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ইহার মতে ইহার গুরুর ন্যায় রোগোৎপত্তির কারণ শরীরের পরমাণুর পরিবর্ত্তন। ইনি বলেন পরমাণু সংযোগে দৈহিক উপাদান (Tissue) গঠিত হয়, কিন্তু দৈহিক উপাদান গুলি ছিদ্র বিশিষ্ট (full of pores) এই ছিদ্র গুলির ভিন্নরূপে পরিবর্ত্তন হইয়া রোগোৎপাদন করে।

১। ছিদ্রগুলি শিথিল হইয়া (Relaxation or Flex)

২ ,, সঙ্কীর্ণ হইয়া (Contraction or Stasis)

৩। ,, মধ্যবস্থা) Mixed state, some contracted, some relaxed)

ইহার ফলে ছিদ্র হইতে যে রস (secreteion) নির্গত হয় তাহা রোগোৎপাদনের করেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ এই মত একেবারে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা কতকগুলি রোগের অবস্থার কারণ রক্তবাহিনী শিরার প্রসারণ ও সঙ্কুচন (vaso-dialatation and vaso constsiction) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেদনা ও দাহ সংযুক্ত স্ফীতিজনিত রোগ (ih inclamator disease) বলা যাইতে পারে।

দৈহিক উপাদান গুলি পরমাণুর দ্বারা গঠিত বলিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করেন। থেমিসন্ সে গুলিকে পরমাণু (indivisible molcecules or atoms) বলিয়াছেন, আজকাল উহাকে প্রোটোপ্ল্যাজেমিক সেল্ (Protoplasmic cell) কহে।

৪। নিউম্যাটিষ্ট (Pneummatist)

এথিনিয়াস (Athenius of celicea A. D 69) সম্প্রদায়ের প্রথম। ইহার মতে নিউমা (বায়ু—Pneuma) সকল রোগের কারণ। ইহাঁদের মতে রক্ত চলাচলের শিরার (artery) প্রসারণ ও সঙ্কুচনে বায়ু বিভিন্ন দিকে যাইয়া রোগোৎপাদন করে।

ইহাঁদের শাস্ত্রে তিন প্রকারের "নিউমার" বর্ণনা আছে :—

১। vital spirit—যাহা শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত করে (Inspired air)। যাহা আধুনিক শাস্ত্রে অক্সিজেন (oxygen) নামে খ্যাত। ইহাঁরা বলেন ইহা আরটারির (artery) ভিতর দিয়া গমন করে।

Natural Spirit—ইহা "ভেনের (vein) ভিতর দিয়া সুষুপ্ত অবস্থার (Subconscious state) ক্রিয়ার কর্ত্তা।"

৩। Animal Spirit—ইহা নার্ভের (Nerve) ভিতর দিয়া গমনাগমন করে এবং জাগ্রত অবস্থার (concious states) ক্রিয়ার কারক।

Natural Spirit আধুনিক পাশ্চাত্য সিম্প্যাথেটিক্ নার্ভের (Sympathetic Nerve) ক্রিয়ার সহিত এবং vital Spirit সেরিব্রো স্পাইন্যাল নার্ভের (ceretro Spinal Nerve) ক্রিয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত ইহাঁদের মতে প্রত্যেক অণু (Element) ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট। চারি প্রকার গুণের উল্লেখে আছে—উষ্ণ (Hot) শীতল (cold) দ্রব (moist) ও শুষ্ক (dry)। অণুগুলি বিভিন্ন বা বিরোধী গুণ বিশিষ্ট হইলে শরীরকে অস্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করে অর্থাৎ রোগের উৎপাদন করে। যথা :—

১। উষ্ণ ও শুষ্ক গুণ অণুতে মিলিত হইয়া তরুণ রোগ (acute disease) উৎপাদন করে।

২। শীতল ও দ্রব যাপ্য রোগ (chronic disease) উৎপাদন করে।

৩। শীতল ও শুষ্ক মানসিক দৌর্ব্বল্য, মৃত্যু পর্য্যন্ত আনয়ন করে।

৫। এক্লেক্টিক্স্ (Eclectics)

এই সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ পূর্ব্বলিখিত ৪টী বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া যাহার যেটী সত্য মনে করিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করতঃ এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ইহাঁদের মধ্যে গ্যালেন বা ক্লাদিয়াস (clandias Galenus) শীর্ষস্থানীয়। গ্যালেনের সময় পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম অবস্থায় পরিণত হয়। গ্যালেনের পুস্তক গুলি পাঠে পুরাতন চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া যায়। (crytilisation of Greek and Roman medicine.)

আয়ুর্ব্বেদ

৭ম বর্ষ } ভাদ্র ১৩৩০ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

স্বাস্থ্যদর্পণ।

(বৈদ্যরত্ন কবিরাজ ৺কালিদাস বিদ্যাভূষণ)

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অভিজ্ঞতা লাভ না করিতে পারিলে শরীরকে ভাল রাখা বড়ই কঠিন। পীড়িত হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকার না করিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে প্লেগ, ওলাউঠা, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বহু রোগের প্রাদুর্ভাব দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। কখন্ কোন্ রোগ কাহাকে আক্রমণ করে, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু পূর্ব্ব হইতে দেশ, কাল ও দেহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া হিত বস্তু সেবন ও অহিত বস্তুকে পরিবর্জ্জন করিলে রোগজন্য বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। শীত প্রধান দেশে যাহা হিতকর, উষ্ণ প্রধান দেশে তাহাই অহিতকর। সুতরাং দেশভেদে আহার ও আচারের পার্থক্য হইয়া থাকে। ঋতুভেদেও আবার ঐ আচারের তারতম্য করিতে হয়। আমাদের দেশে ছয় ঋতুর যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ ছয় প্রকার ঋতু কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য শীতোষ্ণ বর্ষা ভেদে আহার বিহারেরও পার্থক্য করা উচিত। আবার দেহও সকলের একরূপ নহে, একজনের দেহে বিলক্ষণ শৈত্য (শীতল ক্রিয়া) সহ্য হয়, অন্য দেহে ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য হয় না। সুতরাং কোন দেহ কি ভাবে উৎপন্ন, তাহাও নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং দেশ, কাল ও দেহ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বাস্থ্যোপযোগী করিয়া সরলভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিব। ধন, মান, খ্যাতি লাভ করিয়া স্বাস্থ্যসুখে

বঞ্চিত হইলে জীবন অশান্তিময় হয়,আর অব্যাহত স্বাস্থ্যলাভের পর ধনমানাদি লাভ বিপুল শান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ এই শান্তির চিরপক্ষপাতী। আমরা আয়ুর্ব্বেদ হইতে সেই শান্তিপ্রদ উপদেশগুলি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই যাহাতে সেই শান্তিলাভ করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান হইয়াছি। মহাজন বাক্য যথা—

প্রেমানন্দে পুলকিত সুশীতল মন,
নিজানন্দ দিতে পরে ব্যাকুল এখন।
মিটেছে বুভুক্ষা যার, প্রফুল্ল আনন তার,
পর ক্ষুধা মিটাইতে সে পারে তখন,
ভিক্ষুকের ঘরে কোথা ধন বিতরণ ?

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কর্ত্তব্য।

প্রত্যহ প্রত্যুষে অর্থাৎ (সূর্য্যোদয়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে) শয্যাত্যাগ করা উচিত। কারণ ঐ সময়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আমাদের মানসিক বৃত্তির সম্যক বিকাশ হয়, সে সময় নিদ্রাভিভূত হইলে সে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে বাধা জন্মে, এজন্য প্রাতে নিদ্রা যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ, এবং শরীরের জড়তা সম্পাদক। ইহা বোধ করি অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে প্রত্যুষে অধ্যয়নে যেরূপ মনঃসন্নিবেশ হয়, অধিক বেলা হইলে সেরূপ হয় না। তবে অনেকে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাতঃকালে নিদ্রা সেবন করেন। ইহা স্বাস্থ্যবিধি বিরুদ্ধ হইলেও চিরাভ্যাস বশতঃ আপাততঃ ক্ষতিকর না হইলেও পরিণামে অনিষ্টদায়ক হইয়া থাকে।

শয্যাত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল শারীরিক ভাবের পর্য্যালোচনা করা উচিত। অদ্য আমার শরীর কিরূপ অর্থাৎ কোনরূপ ভার বোধ, অজীর্ণ বা সর্দ্দি প্রভৃতি হইয়াছে কিনা পর্য্যালোচনা করিলে বহু সময় নষ্টকর ও ক্লেশকর রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এজন্য মনে করুন—কোন ব্যক্তি মধ্যাহ্নে অন্নাহারের পর জ্বরাক্রান্ত হইলেন; কিন্তু যদি তিনি প্রাতে শারীরিক ভাব পর্য্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতেন যে, অদ্য আমার শরীর ভারি হইয়াছে, অদ্য স্নান ও আহারাদি করা উচিত নহে।

নিত্য শরীরের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মে যে, তাহার ফলে অনেকে পীড়া হইবার পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়া তৎপ্রতিকারে যত্নবান হইতে পারেন। কোন ব্যক্তি যদি নিত্য মেঘের বিষয় পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে এক বৎসরের পর তাঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিবে যে, তিনি মেঘ দেখিয়া জল হইবে কিনা—ইহা নিরূপণে প্রায়শঃ কৃতকার্য্য হইবেন—ইহা দেখা গিয়াছে। শারীরিক পর্য্যালোচনার পর দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দন্তকাষ্ঠ অর্থাৎ দাঁতন দ্বারা নিম্ব, আম, সেওড়া, ভেরাণ্ডা প্রভৃতি গাছের দাঁতন লইবেন। মুখধাবন করা প্রশস্ত। কারণ দন্তকাষ্ঠের সাহায্যে দন্তমার্জ্জন করিলে দণ্ড কাষ্ঠ চর্ব্বণ জন্য দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না। পূর্ব্বকালে সকলে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার ও চালভাজা প্রভৃতি চর্ব্বণ করিতেন, এজন্য বৃদ্ধ বয়সেও দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতে পারিতেন। অধুনা প্রায় সকলেই অতি ব্যস্ততাসহ ভোজন করেন,ভালরূপে খাদ্য চর্ব্বণ করেন না, এজন্য দন্ত দৃঢ় হয় না এবং বৃদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই দন্তহীন হইয়া থাকেন।

তবে যাঁহাদের দন্ত বেষ্টনী অর্থাৎ দাঁতের মাড়ীতে কোন ক্ষত আছে বা রক্ত পড়ে, তাঁহারা মঞ্জন দ্বারা মুখ ধাবন করিবেন। রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল নির্ম্মিত জিহ্বা-নিলেখনী দ্বারা জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত।

তদনন্তর মল মূত্রাদি ত্যাগ করা উচিত। শৌচাদির পর ব্যায়াম করা উচিত। নিত্য ব্যায়াম করিলে শরীরের পেশী সকল দৃঢ় হয়, কর্ম্ম-সামর্থ্য জন্মে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির পরিপাক বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ জীব মাত্রেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এজন্য অতি-মৃদু ব্যায়াম অথবা ব্যায়াম না করা উচিত।

ব্যায়ামের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তৈল মর্দ্দন প্রশস্ত। নিত্য তৈল মর্দ্দন করিলে ত্বকের চিক্কণতা ও শরীরে দৃঢ়তা জন্মে। তদনন্তর স্নান করিবেন। মধ্যাহ্নে স্নান অপেক্ষা প্রাতে স্নানই শরীরের পক্ষে হিতকর। কারণ মধ্যাহ্নে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই জীব মাত্রেরই শরীর উষ্ণ হয়; সে সময় স্নান করিলে উষ্ণের পর শীত সেবন করা হয়। উহা স্বাস্থ্য বিধি বিরুদ্ধ।

অত্যন্ত রৌদ্রের উত্তাপ হইতে আসিয়াই স্নান করিলে রক্ত দূষিত হয়। কারণ রক্ত—উষ্ণ প্রাকৃতিক, উত্তাপে উহার উষ্ণতা আরও বাড়িয়া যায় এবং সেই সময় সহসা শীতল জল দ্বারা স্নান করিলে রক্তের গতির বাধা জন্মে। সেই আবদ্ধ রক্ত শীতল হওয়াতে উহা দূষিত হইয়া পড়ে।

সেইরূপ মধ্যাহ্নে শরীরে রক্তের উষ্ণতা বাড়ে, এজন্য স্নান হিতকর নহে। দিবাকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া প্রথমাংশকে পূর্ব্বাহ্ন, দ্বিতীয়াংশকে মধ্যাহ্ন এবং শেষ অংশকে সায়াহ্ন বলা হয়। ভোজন—মধ্যাহ্নেই প্রশস্ত। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মধ্যাহ্নে মানব-দেহের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, এজন্য এ সময় পরিপাক শক্তির বৃদ্ধিভাব ঘটে, সেই সময় ভোজন করিলে খাদ্য শীঘ্র জীর্ণ হয়। পূর্ব্বাহ্নে আহার করা উচিত নয়।

অধুনা কিন্তু কার্য্যানুরোধে অনেককেই ৯টা বা তাহার পূর্ব্বেও আহার করিতে হয়। তাঁহারা অভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বাহ্নে ভোজন করেন, তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না, কারণ যে বিষয়ে বহুদিন অভ্যস্ত, তাহা অভ্যাস বশতঃ সহ্য হইয়া যায়। মধ্যাহ্ন আহারের অন্যূন ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে জলযোগ করা উচিত নহে। একটী খাদ্য ভোজনান্তর জীর্ণ না হইলে ভোজন করা অনুচিত। ২ ঘণ্টায় একটী খাদ্য সম্পূর্ণ জীর্ণ হইতে পারে না। পূর্ব্বাহ্ন ও সায়াহ্ন—ভোজন কাল নহে। তবে যাঁহারা প্রাতে ও বৈকালে জলযোগ করেন, উহা চির অভ্যাসের ফল। আজন্ম ঐ সময় ভোজন করেন বলিয়া ক্ষুধার্ত্ত হন এবং ভোজনান্তে বিশেষ অজীর্ণও হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ, এখানে ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। এখানে মধ্যাহ্নে ১ বার ও রাত্রে ১ বার প্রত্যহ ২ বার ভোজনই প্রশস্ত।

পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীগণ উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য ভোগ করিতেন। তাঁহাদের ভোজনবিধি দিবা-রাত্রির মধ্যে একবার কেবল মধ্যাহ্নকালে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা একাহারী ছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ মতে আহারই দেহের স্বাচ্ছন্দ্য দায়ক।

বারংবার অল্প মাত্রায় ভোজন করা উচিত—

এ শিক্ষা পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণের নিকট হইতে এদেশে আসিয়াছে। তাঁহারা বহু পরীক্ষান্তে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা আয়ুর্ব্বেদ সম্মত নহে কেন?

ভারতবর্ষ উষ্ণ প্রধান দেশ এবং প্রাকৃতিক বিভিন্নতা হেতু ইউরোপীয়গণের পক্ষে যাহা হিতকর আমাদের সম্বন্ধে তাহাই হিতকর হইতে পারে না। মত্ত উষ্ণকর বলিয়া ইউরোপীয়গণের নিত্য সেব্য, কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে তদ্বিপরীত অর্থাৎ শৈত্যকর ভাব হিতকর।

আয়ুর্ব্বেদেও আছে যে, শীতকালে সাধারণতঃ সকলেই অধিক পরিমাণে বস্ত্রাদির দ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া শরীরের তাপ রক্ষা করিবেন। গাত্রাবরণাদির দ্বারা তাপ নিরুদ্ধ হওয়ায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শবশতঃ শারীরিক তাপ বহির্গত না হইয়া শরীরেই অবস্থান করে বলিয়া পরিপাক শক্তি সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভুক্ত দ্রব্য শীঘ্রই জীর্ণ হয়। জীর্ণান্তে যদি পুনর্ব্বার খাদ্য না পায়, তাহা হইলে দৈহিক অপরাপর ধাতুকে ক্ষয় করে, এজন্য শীতকালে গুরুদ্রব্য ভোজন ও অধিক বার ভোজন হিতকর। ইউরোপে অধিক সময়ই প্রবল শীত থাকে। এজন্য সেখানে অধিকবার ভোজন স্বাস্থ্যকর।

এখানে বৎসরের মধ্যে প্রায় ৯।১০ মাস কাল উষ্ণতা অনুভূত হয়, এখানে বারংবার ভোজন কিরূপে হিতকর হইবে? আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে, শিশু ও বালক গণের পক্ষে ও মল্লধারীদিগের পক্ষে বারংবার ভোজন হিতকর।

আমাদের দেশে শীতকালে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে গুরুপাক দ্রব্য সকল সেই সময়েই উৎপন্ন হয়। যথা, নূতনচাউল, কপি, পিষ্টক, পুলি, প্রভৃতি। গুরুপাক দ্রব্য এই সময়ই আমাদের দেশে খাইবারও ব্যবস্থা আছে।

খাদ্যকালে ঈষদুষ্ণ খাদ্য খাওয়া উচিত। ঈষদুষ্ণ খাদ্য পাকস্থলী গত হইয়া শীঘ্রই অগ্নিকে উদ্দীপিত করে, এজন্য উহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। অথচ খাদ্য ঈষদুষ্ণ হইলে খাইতেও ভাল লাগে, দ্রব্যও রসনার তৃপ্তি সাধক হয়।

স্নিগ্ধ ভোজ্য আহার করা উচিত। স্নিগ্ধ দ্রব্য শরীরের পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহা শীঘ্র জীর্ণ হয়। স্নেহ বিশিষ্ট দ্রব্য এবং তৈল ঘৃতাদি সম্পর্ক বিশিষ্ট ভোগ্যকে স্নিগ্ধ বলা যায়।

দেশী চাউল স্বভাবতই স্নিগ্ধ এবং বালাম চাউল রুক্ষ, মৎস্যাদি স্নিগ্ধ, আবার রুক্ষ। দ্রব্যকে স্নেহাদিযুক্ত করিলে উহাকে স্নিগ্ধ বলা যায়, যথা—ঘৃতাদি পক্বব্যঞ্জন। মাষকলাই স্বভাবতই স্নিগ্ধ,এজন্য উহাতে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। অরহর, মুগ প্রভৃতি রুক্ষ, এজন্য উহাদিগকে পরিমিত ঘৃতাদির সহ পাক করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

খাদ্যকালে আহারের মাত্রা বিষয়ে বিশেষ পর্য্যালোচনা করা উচিত, কারণ খাদ্যেরই মাত্রাধিক্য ও কাল বিপর্য্যয়ই অগ্নিমান্দ্যের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে পরিগণিত হয়। আহারের মাত্রার নিয়ম পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দেশ হয় না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতির বিভিন্নতা বশতঃ একই পরিমাণের খাদ্য ভিন্ন ভিন্ন লোকের শরীরে পৃথক

পৃথক ফল দান করে। যেরূপ আহার করিলে, উদরের গুরুতা বশতঃ বসিতে উঠিতে বা চলিতে ক্লেশ অনুভব হয় না, ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, নির্দ্দিষ্ট সময়েই অর্থাৎ বৈকালের মধ্যেই সম্যক জীর্ণ হয়, দাস্ত পরিষ্কার হয়, নিত্য শরীরের পুষ্টি সঞ্চিত হয়, তাহাই আহার করা উচিত। খাদ্যকালে পূর্ব্ব খাদ্য জীর্ণ হইয়াছে কি না লক্ষ্য করিতে হয়। যদি পূর্ব্ব খাদ্য পরিপাক না হইয়া থাকে, তাহার উপর পুনরায় খাদ্য খাইলে, পূর্ব্ব ভুক্ত খাদ্যের সহ নূতন খাদ্য মিশ্রিত হইয়া আরও দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণ জন্য নানা রোগ জন্মায়। এজন্য খাদ্য কালে দেখিতে হয় যে, উদ্গারের সহ পূর্ব্ব ভুক্ত খাদ্যের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে কিনা? বেশ ক্ষুধা হইয়াছে কি না? মল মূত্রাদি নিঃসারিত হইয়া শরীর বেশ হাল্কা হইতেছে কি না?

বিরুদ্ধ বীর্য্য দ্রব্য একত্র ভোজনই নানা রোগের হেতু।

মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র করিয়া আহার করিলে নানা রোগ—এমন কি কুষ্ঠ রোগও হয়। আমরা যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাই—সে সমস্ত দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। কতকগুলি শীতবীর্য্য ও কতকগুলি উষ্ণ বীর্য্য। সাধারণতঃ শীতবীর্য্য বিশিষ্ট দ্রব্য সকল শরীরের পুষ্টি সাধক, মল মূত্রাদি পরিষ্কারক, বল বর্দ্ধক এবং গুরুপাক অর্থাৎ পরিপাক হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। ইহা অজীর্ণ ও জ্বরাদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রায়শঃ হিতকর নহে; যথা কদলী, আতা, পেয়ারা, পেঁপে, নূতন চাউল, কচ্ছপ প্রভৃতি জল জন্তুর মাংস, দুগ্ধ।

উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য সকল শীঘ্র পরিপাক হয় এবং মল মূত্রাদির কথঞ্চিৎ অবরোধ জন্মায়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও শরীরের লঘুতা সম্পাদক। যথা লশুন, মাষকলাই, তিল, বেগুণ, তেঁতুল, লবণ, আমড়া, মৎস্য প্রভৃতি।

মৎস্য উষ্ণবীর্য্য এবং দুগ্ধ শীতবীর্য্য। এজন্য মৎস্য ও দুগ্ধ একত্র ভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু দধি উষ্ণবীর্য্য বলিয়া আমাদের দেশে দধি ও মৎস্য একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

যেখানে ঘৃণা উপস্থিত হয় অথবা অন্য কোন প্রকারে খাদ্যকালে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে—এরূপ স্থানে আহার করা উচিত নহে। যেরূপ তাড়াতাড়ি খাওয়া বিধি বিরুদ্ধ, সেইরূপ অত্যন্ত আস্তে আস্তে খাওয়াও ঠিক নহে। অত্যন্ত আস্তে আস্তে খাইলে অধিক খাওয়া হয় এবং খাদ্য জুড়াইয়া যায়, তজ্জন্য খাদ্য জীর্ণ হইতে অত্যন্ত সময় লাগে, কখনও বা অজীর্ণ হয়।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি খাইলে খাদ্য সকল উপযুক্তরূপ চর্ব্বিত হয় না, খাদ্যগুলি উপর দিকে উঠিতে থাকে। শরীরের অবসন্নতা হয়, এবং রীতিমত ভাবে পাকস্থলীতে গমন করেনা। অপিচ খাদ্যের দোষগুণ সকল সময় উপলব্ধি হয় না। খাদ্যকালে হাস্য করা বা গল্প করা উচিত নহে। খাদ্য কালে হাস্য বা গল্প করিলে খাদ্যগুলি রীতিমত ভাবে পাকস্থলী গত হয় না, যেন উপরে উঠিতে থাকে। গল্পে বা হাস্যে চিত্ত রত থাকার দরুণ অনেক সময় যদি খাদ্য কোন প্রকারে দূষিত হয়, তাহা অনুভব করা যায় না। এজন্য পরিণামদর্শী ব্যক্তিগণ খাদ্যকালে হাস্য বা গল্পে বিরত হয়েন।

যদি খাদ্যকালে ভোজন বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে কোন্ খাদ্য স্বীয় শরীরের উপযোগী এবং কোন্ খাদ্য অনুপযোগী তাহা বুঝিতে পারা যায়।

যদিও পাশ্চাত্য-রীতি খাদ্যকালে গল্প করা, কিন্তু তাহাতে অন্নাদি হৃদয়ের কোন অংশে প্রবেশ করিলে বিষম ভাবে অবস্থিত করিতে দেখা যায়, ইহাকে চলিত ভাষায় 'বেশম' খাওয়া বলে। ইহা কখনও কখনও জীবন নাশকও হইতে দেখা গিয়াছে। ভোজনান্তে মুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাম্বুল চর্ব্বন কর্ত্তব্য। পরিমিত তাম্বুল সেবন রুচিকর, মুখের দৌর্গন্ধ নাশক, অগ্নির উদ্দীপক।

কিন্তু অধিক তাম্বুল চর্ব্বন করিলে অগ্নিমান্দ্য ও দন্তসম্বন্ধীয় পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

ভোজনের পর শতপদ গমনান্তর সুখোপবেশন কর্ত্তব্য। ভোজনের অব্যবহিত পরেই উপবেশন বা শয়ন করিলে অন্ন সকল কোষ্ঠে সম্যক রূপে নীত না হইয়া একত্র অবস্থিতি করে এবং জীর্ণ হইতে বিলম্ব হয়।

দিবানিদ্রা কফ বর্দ্ধক, অজীর্ণকর ও শরীরের জড়তা সম্পাদক। দিবাভাগে শরীরের প্রত্যেক হৃদয় সম্যক বিকশিত হয়, আবার উহা রাত্রে সঙ্কুচিত হয়।

নিদ্রাতে শরীরের জড়তা আসে এবং জড়তা প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করিয়া রাখে, এজন্ত দিবা নিদ্রাতে শরীরের যন্ত্র ও তাবৎ ইন্দ্রিয় সকল অলস ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

সূর্য্যাস্তের তিন চারি ঘণ্টা পরে রাত্রিকালীন ভোজন করা কর্ত্তব্য। রাত্রি ভোজনের পর আধঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া শয়ন করা কর্ত্তব্য। রাত্রি ভোজনের পর অধিককাল জাগরণ করিলে ভুক্ত খাদ্য সুজীর্ণ হয় না।

বায়ুপিত্ত কফ।*

(কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ)

—:•:—

যখন সমস্ত চিকিৎসা-জগত গাঢ় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষীণতম রশ্মিও পৃথিবীর কোন প্রদেশে পতিত হয় নাই, তখন এই বৃদ্ধ আয়ুর্ব্বেদই রোগ তাপদগ্ধ দেশবাসীর ভীষণ রোগযন্ত্রণা নিবারণ করিয়াছিল, এই আয়ুর্ব্বেদই যে সমস্ত আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, আমরা বর্ত্তমানে যে সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞান দেখিতে পাই, তাহারা কেহই আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্ব উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই—এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই

* কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ সভা"য় পঠিত।

স্বীকার করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ—অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত, অতএব ইহা যে নিত্যসত্য—তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এই আয়ুর্ব্বেদ যে দেশে কবে প্রচারিত হইয়াছিল—তাহা কেহই বলিতে পারে না, তবে ইহা যে অতি প্রাচীন, তাহা সুনিশ্চিত।

অনাদি প্রবহমান নিত্য সত্য এই আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি বায়ু পিত্ত ও কফ—এই দ্রব্যত্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বায়ুপিত্ত কফের স্থান-গুণ কর্ম্ম প্রকোপ-প্রশমন তত্ত্ব লইয়াই আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্ব বা স্বরূপত্ব।

সত্ত্বরজঃতম—এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া যেমন জগতে কোন পদার্থের অবস্থিতি নাই; তেমন বায়ুপিত্ত ও কফ ব্যতিরিক্ত আয়ুর্ব্বেদ মতে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। এই বিশাল জগতে যত প্রকার রোগ দেখা যাইতেছে বা দেখা যাইবে, তৎসমস্তই বায়ুপিত্ত কফের প্রকোপসম্ভূত। তাই সুশ্রুত সূত্রস্থানে "আতুরোপক্রমণীয়" অধ্যায়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"নাস্তিরোগো বিনা দোষৈ র্যস্মাৎ তস্মাদ্ বিচক্ষণঃ। "অনুক্তমপি দোষানাং লিঙ্গৈ র্ব্যাধিমুপাচরেৎ"।

ভবিষ্যদ্ ব্যাধিও যে বায়ুপিত্ত কফের ভিত্তি লঙ্ঘন করিবে না, সুশ্রুত তাহারও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে বিস্মৃত হন নাই। আধুনিক জীবাণুবাদী চিকিৎসকগণ রোগ ভেদে জীবাণু ভেদ কল্পনা করিয়া অনন্ত জীবাণু রোগের মুখ্য কারণ বলিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ঈক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মতে ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগের পরীক্ষা করিলে বিভিন্ন মূর্ত্তি জীবাণু দেখা যায়, টাইফয়েড্ রোগীর ও কলেরা রোগীর পুরীষ এবং যক্ষ্মা ও হাঁপানী প্রভৃতি রোগীর কফ পরীক্ষা করিলে বিবিধ প্রকার জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রচলিত রোগের ও জীবাণু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই।

অপরিসমাপ্ত কার্য্যের সমীচীনতা হিন্দুশাস্ত্রের বহির্ভূত, জীবাণুবাদের আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; তথাপি কারণতা সাধর্ম্ম্যে জীবাণুবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণের মতে আপ্ত বচন ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না, যে কোন দিন 'চন্দ্র' সম্বন্ধে উপদেশ পায় নাই, সে সহস্রবার চন্দ্র দর্শন করিলেও চন্দ্র প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। "ভ্রম প্রমাদ রাহিত্যং আপ্তত্বং" ইহাই আপ্ত শব্দের দার্শনিক লক্ষণ, জীবাণুবাদী বৈজ্ঞানিকগণ যে পর্য্যন্ত সমস্ত রোগের জীবাণু দর্শন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত—এ কথা বলা যায় না। তারপর জীবাণুবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দূষিত বাষ্পাদি হইতে এক প্রকার বিষ-মশক শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই বিষাক্ত মশক যদি মানব শরীরে দংশন করে—তাহা হইলে মানবের রক্তে সেই বিষ সংক্রামিত হইয়া ম্যালেরিয়া জ্বর জন্মাইয়া থাকে, এ তথ্য শুনিলে আমাদের মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ যে মশক মনুষ্য শরীরে ম্যালেরিয়া বিষ বপন করে, সে মশক কি মনুষ্য হইতে ক্ষীণতর প্রাণীদিগকে দংশন করে না? কিন্তু ইন্দুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবের ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা যায় না। তবে যদি মানব-রক্তে কোন বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই শক্তি কি? ইহার উত্তর কি জীবাণু

বাদীর আছে? আয়ুর্ব্বেদেও জীবাণু তত্ত্ব আছে—যদি কেহ একথা প্রচার করিতে চাহেন; তদুত্তরে আমরা বলিব—পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান জীবাণুকে সাক্ষাৎ রোগজনক বলিয়া যে ভাবে ঘোষণা করিতেছে, আয়ুর্ব্বেদ—বায়ুপিত্ত কফ ভিন্ন অন্য কাহাকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগ জনক বলিয়া কোথায়ও সেভাবে নির্দ্দেশ করে নাই, বস্তুতঃ যদি আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক জীবাণুবাদী হইত, তাহা হইলে নবীন জীবাণুবাদীর জীবাণু ধ্বংসের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও জীবাণুর সমূলোচ্ছেদের উপায় বিহিত থাকিত। আয়ুর্ব্বেদ কিন্তু স্বপনেও বায়ুপিত্ত কফ ভিন্ন অন্য কাহারও চিকিৎসার উল্লেখ করে নাই। আয়ুর্ব্বেদেও জীবাণুবাদ আছে—ইহা স্বীকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে কেহ কেহ কুষ্ঠৈককর্ম্মা রক্তজ ক্রিমির প্রমাণ উল্লেখ করেন, আমরা কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে তত্ত্বে একমত হইতে পারি নাই, কারণ রক্তজ ক্রিমি জনিত কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদৃশ কোন বিবরণ দেখিতে পাই না, তবে সুশ্রুতের কুষ্ঠ নিদানে দেখিতে পাই যে, পিত্তজ কুষ্ঠরোগে ক্রিমি উৎপন্ন হয়। আবার দেখি, মেদ আশ্রিত কুষ্ঠে ক্রিমির সম্ভব হয়, অথচ রক্তজ ক্রিমি জনিত কুষ্ঠের কোন পৃথক লক্ষণ দেখিতে পাই না, অতএব আমাদের মনে হয়, দোষ-বিকৃতিই রক্তজ ক্রিমির কারণ, কুষ্ঠজনক দোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া দূষ্য সমূহ আশ্রয় করতঃ যথা কুষ্ঠ রোগ উৎপাদন করে,তথা রক্তেও ক্রিমি জন্মাইয়া থাকে,যেমন ত্রিদোষজনিত হৃদ্ রোগে তিল-গুড় ক্ষীরাদি সেবিত হইলে ক্রিমিজ হৃদরোগ জন্মিয়া থাকে, তথাচ চরক বলিয়াছেন—"ত্রিদোষজেতু হৃদ্ রোগে দো. দুরাত্মা নিষেবতে। তিলক্ষীর গুড়াদীংশ্চ. গ্রন্থিস্তস্তোপ জায়তে॥ মর্ম্মৈক দেশে সংক্লেদো রসশ্চাপ্যুপ গচ্ছতি। সংক্লেদাৎ ক্রিময়শ্চাস্য ভবন্ত্যুপ হতাত্মনঃ। রক্ত ক্রিমিজ কুষ্ঠ রোগ ও তেমনি দোষ বিকৃতি জন্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কুষ্ঠ রোগের ন্যায় ক্রিমিজ হৃদরোগ সংক্রামক বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেহই স্বীকার করে নাই। অতএব সংক্রামক ব্যাধি সমূহের সংক্রমন উপায় যে জীবাণু—একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক আয়ুর্ব্বেদ যখন বায়ুপিত্ত কফকে রোগের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং তাহাদেরই উপশম বা সামান্য উপায়কে চিকিৎসা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, তখন আমরা সেই বায়ুপিত্ত কফকেই রোগের মুখ্য কারণ বলিব, এবং জীবাণু প্রভৃতি অন্যান্য কারণ কুটকে দোষপ্রকোপ কারণ বলিয়া স্বীকার করিব।

আয়ুর্ব্বেদ মতে বিকৃত দোষই সমস্ত রোগের অব্যভিচারী কারণ;—তাই বাগভট বলিয়াছেন, "বিকারো দোষ বৈষম্যং"। বিকৃত বায়ু পিত্তকফকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দোষ বলে। কারণ দোষ শব্দের অম্বর্থ ব্যুৎপত্তি—"শরীরং দূষয়তীতি দোষঃ"। অর্থাৎ শরীরকে যে দূষিত করে তাহাকে দোষ কহে, আবার দূষিত বায়ুপিত্ত কফকে "মল"ও বলে, যে হেতুক দূষিত বা বিকৃত বায়ুপিত্ত কফ দেহের মলিনতা উৎপাদন করে, কিন্তু অবিকৃত বায়ুপিত্ত কফ "ধাতু" নামে অভিহিত হয়, কারণ তখন উহারা দেহকে রক্ষা করে, তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "শরীর ধারণাদ্ধাতবঃ" রসরক্তাদি ধাতু

ও ধাতু পিত্ত কফ শরীরকে ধারণ করে বলিয়া ধাতু নামে অভিহিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে রোগ তত্ত্ব ও চিকিৎসাদি বর্ণিতস্থানে বায়ুপিত্ত কফকে সর্ব্বত্রই "দোষ ও মল নামে অভিহিত করিয়াছে।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রাণ স্বরূপ বায়ুপিত্ত কফের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্মতম ও যোগজ জ্ঞান গম্য, তদ্বিষয়ে আমার ন্যায় নগণ্য ক্ষুদ্র মানবের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই ধৃষ্টতা মাত্র; তথাপি গুরু পরম্পরায় ও সামান্য জ্ঞানদ্বারা শাস্ত্রার্থ যাহা বুঝিয়াছি তাহাই বিবৃত করিব।

বায়ু।

বায়ুপিত্ত কফ ত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান; বায়ু ভিন্ন দৃশ্যমান জাগতিক কোন ক্রিয়াই যেমন সম্পন্ন হয় না, তেমনি শারীরিক কোন কার্য্যই বায়ু ব্যতিরেকে নিষ্প হইতে পারে না, তাই ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—স্বয়ম্ভুরেষ ভগবান্ বায়ুরিত্যভিশালিতঃ॥ ইত্যাদি। এই বায়ুর মৌলিকতা অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারি যে, পঞ্চভূতান্তর্গত বায়ু আর এই শারীর বায়ু একই পদার্থ, তবে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদ বায়ু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—যথা পরমাণুরূপ বায়ু ও পরমাণু সমূহ রূপ বায়ু, পরমাণুরূপ বায়ু সূক্ষ্ম বায়ু এবং পরমাণু সমূহরূপ বায়ু স্থূল বায়ু, ইহাই বৈশেষিক দর্শনের কথা। উক্ত সূক্ষ্ম বায়ু নিত্য এবং পরমাণু সমূহরূপ স্থূল বায়ু অনিত্য. এইপ্রকার ক্ষিতি-অপ্ তেজঃ-ব্যোমকেও বায়ুর ন্যায় স্থূলও সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত করিয়াছে। সুতরাং আমাদের স্থূল দেহের আরম্ভক পঞ্চ মহাভূত ও পরমাণু সমূহরূপ স্থূল, অতএব বায়ুও যে স্থূলবায়ু তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সোমগুণ দ্বারা চন্দ্র, শোষণ গুণ দ্বারা সূর্য্য এবং বিক্ষেপন দ্বারা বায়ু যেমন জগৎ ধারণ করিয়া আছে, তেমনি কফ আমাদের দেহে সৌম্যগুণ দান, পিত্ত প্রবৃদ্ধ জলীয় ধাতু শোষন এবং বায়ু শরীরের অনুপযোগী মলাদি পদার্থে বহির্গমন দ্বারা দেহকে রক্ষা করিতেছে, তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন "বিসর্গাদান বিক্ষেপৈঃ সোম সূর্য্যানিলা যথা, ধারয়ন্তি জগদ্দেহং কফ পিত্তানিলা তথা"। চন্দ্রসূর্য্যের বিসর্গ ও আদান কার্য্যের প্রবর্ত্তক বায়ু, কারণ রজোগুণই সমস্ত কার্য্যের প্রবর্ত্তক, যথাহ সুশ্রুতঃ "সহি রজোভূয়িষ্ঠঃ রজশ্চ প্রবর্ত্তকং সর্ব্বভাবানাং"। অর্থাৎ সেই বায়ু রজোগুণ বহুল, কারণ রজোগুণই সমস্ত দ্রব্যের চালক, সেই রজোগুণ ভূয়িষ্ঠ বায়ুই যে আমাদের রোগারাম্ভক বায়ু তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আয়ুর্ব্বেদ মতে যত প্রকার রোগ আছে তাহাদের উৎপত্তির প্রতি বায়ুরই প্রধান কর্ত্তৃত্ব; পিত্ত-কফ সহস্র দূষিত হইলে ও বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আমাশয়াদি স্থানে আশ্রয় না করিলে কোন রোগেরই উৎপত্তি হইতে পারে না, তাই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবোমল ধাতবো, বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ"॥

আবার চরক বলিয়াছেন "যোগবাহঃ পরং বায়ুঃ সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ। তেজঃ কৃত পিত্তসংযুক্তঃ শীত কৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ"॥ অর্থাৎ বায়ু যোগবাহী যখন পিত্ত সংসর্গে থাকে তখন পিত্তের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং যখন কফের সহিত সংযুক্ত থাকে তখন কফের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিয়া থাকে। চরকোক্ত এই শ্লোক দ্বারা আমরা বুঝিতে

পারি যে, বল ও কফজ ব্যাধি মাত্রেই বায়ুর সংসর্গ থাকে। তাই বলিয়া সর্ব্বত্র দ্বন্দ্বজ ব্যাধির আশঙ্কা, করিবার কারণ নাই। দ্বন্দ্বজ ব্যাধির চিকিৎসায় দোষদ্বয়েরই চিকিৎসা হইয়া থাকে, কিন্তু এস্থলে পিত্তকফের চিকিৎসা করিলেই বায়ু স্বয়ং প্রশমিত হয়, সুতরাং সেস্থলে বায়ুর যোগ অনুবন্ধ স্বীকার না করিয়া দোষ চালকত্ব স্বীকার করাই যথেষ্ট মনে হয়।

ক্রমশঃ

বসন্ত রোগে নিম্বের প্রভাব।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরত্ন।

মাধবীর মনে স্থান না পাইলেও গুড়ুচীর রুচি চিরদিনই সমান চিরকালই গুড়ুচীরাণী তাহার হৃদয় রাজাকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ রাখিয়া পতিব্রত্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে--শত্রু সংহারে স্বামীর সহায়তা করিয়া সহধর্ম্মিনীর গুরু গৌরব রক্ষা করে, এহেন গুড়ুচীবল্লভ নিম্ব বৃক্ষই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য, নবাভিনয়ের ধীরোদা নায়ক। এমন একটী পরম তিক্তপদার্থের পর্য্যালোচনা অদ্যকার সুধী শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিতে পারিবে না ইহা আমি জানিয়াও কেবল গুড়ুচীর গুণের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই আজ তাহাকে এখানে উপস্থিত করিয়া ফেলিয়াছি।

এই অসাধারণ শক্তিশালী বৃক্ষ কতকগুলি রোগের উপর স্বতন্ত্রভাবে এবং কতকগুলি রোগের উপর পরতন্ত্রতঃ আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, ইহা একাই যাহাদিগকে শাসন করে, একমাত্র এই নিম্ববৃক্ষেরই শক্তি যেসকল রোগকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দেয় সে সকল রোগকে আমি পৃথক করিয়া ক্রমশঃ আলোচনার ইচ্ছা করিয়াছি আজ কেবল কলিকাতার কৃতান্ততুল্য বসন্ত রোগকে নিম্ব কতখানি আয়ত্তে রাখিতে পারে তাহাই দেখাইতেছি।

আলোচ্য বসন্ত রোগের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম মসূরিকা, মসূরীর ডালের মত চ্যাপ্টা অথচ গোলাকৃতি এবং দেখিতে প্রায় সেই পরিমাণ বলিয়াই ইহার মসূরিকা নামকরণ হইয়াছে। অন্যদিকে বসন্ত ঋতুতেই তাহার প্রকোপ অধিক বলিয়া ব্যবহারিক বাঙ্গালা ভাষায় তাহাকে বসন্ত রোগে অভিহিত করা হয়। আয়ুর্ব্বেদমতে উৎপাদক কারণ বর্ত্তমান থাকিলে উহা যে কোন ঋতুতেই হইতে পারে, বাস্তবিক আমরা শরৎ গ্রীষ্ম ঋতুতেও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাইতেছি তবে বসন্ত ঋতুতে যে ইহার প্রকোপ অত্যধিক এ কথা অবিসংবাদিত সত্য সুতরাং আমিও আজ মসূরিকাকে বসন্ত রোগ বলিয়া উল্লেখ করিতেছি।

বসন্ত রোগের উৎপাদক কারণগুলি সাধারণতঃ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি রোগিগত এবং কতকগুলি প্রকৃতগত। রোগিগত কারণগুলি রোগীর আহার বৈষম্য জাত আর প্রকৃতিগত কারণগুলি জলবায়ুর বৈগুণ্য বশতঃ প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের দ্বারা ঘটিয়া থাকে, সাধারণতঃ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন না হইলে কেবল খাদ্য বৈষম্যে এই রোগের উৎপত্তি দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদেও "প্রদুষ্ট পবনোদকৈঃ" বলিয়া বায়ু ও জলের পরিবর্ত্তনকে বিশেষ কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃতি বৈষম্যই বসন্ত রোগোৎপত্তির প্রকৃত কাল ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ু ও জলের পরিবর্ত্তনের হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আয়ুর্ব্বেদের টীকাকার বলিতেছেন "বিষকুসুমাদি সংস্পর্শাৎ প্রদুষ্টঃ পবনঃ তথা উদকঞ্চ তৈঃ"। অর্থাৎ সেই সময়ে এমন কোন বিষাক্ত পুষ্পাদি প্রস্ফুটিত হয় যাহার সংস্পর্শে বায়ু এবং বায়ু প্রবাহের ফলে জল দুষিত হইয়া প্রকৃতিতে রোগপ্রবণ পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়, বাস্তবিক যাহার গুণাগুণ জানা নাই এমন কুসুমগুচ্ছ হাতে করিয়া অনেক সময় আমরা হস্তকণ্ডুয়নে বিব্রত হইয়া থাকি, রূপের মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া সুবাসের আশায় অনেক ফুলকেই আদরে আমরা নাসিকার নিকট ধরিয়া বমনবেগ ও শিরোঘূর্ণনে প্রতারিত হইয়াছি। ঋতুবিশেষে যেসকল ফুল ফোটে এবং তাহারাই পূর্ব্বোক্ত বিষকুসুমের অন্তর্গত। সুশ্রুত সংহিতার কল্পস্থানে করম্ব মহাকরম্ব বল্লীজ প্রভৃতি বিষ পুষ্পের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহাদের গন্ধগ্রহণে "ক্লিশ্যতশ্চ শিরো-দুঃখং বারিপূর্ণেচ লোচনে" এই বলিয়া বিষম অনিষ্টের উল্লেখ সুশ্রুত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে বসন্তরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, গাত্র বেদনা, অস্থির চিত্ততা, ত্বকের বিবর্ণতা ও ঈষৎ স্ফীতি কখনো বা কণ্ডুয়ণ এবং নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ গুলি সাধারণতঃ দেখা যায়। এখন আমরা নিম্বের সাধারণ গুণ কি এবং এই রোগের উপর কতখানি প্রভাব বিচার করিয়া দেখি, আয়ুর্ব্বেদে নিম্বকে নিম্ব মহানিম্ব ও কৈডর্য্য ভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্ব বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত বৃক্ষ, গ্রামে গ্রামে অযত্ন সম্ভূত ও স্বয়ং বর্দ্ধিত হইয়া মানবমণ্ডলীর অশেষ উপকার করিবার জন্য যেন ঋতু বিশেষে পত্র পুষ্প ফল লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার নিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে মহানিম্ব অর্থাৎ ঘোড়া নিম বলে, কৈডর্য্য নিম্ব এই ঘোড়া নিমের প্রকার ভেদ মাত্র। মহানিম্বের পত্র নিম্বের পত্র অপেক্ষা অপেক্ষা একটু ছোট, অনেকটা নিমের পত্রাবলীর অগ্রভাগে যে পাতাটী থাকে তাহারই মত, আলোচ্য বিষয় পূর্ব্বোক্ত বৃহৎপত্র নিম্বকে লইয়াই সুতরাং ঘোড়া নিম্বের বিশেষ বর্ণন অনভিপ্রেত।

নিম্বের স্বাদ তিক্ত কিন্তু তাহা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটু অর্থাৎ ঝাল রসে পরিণত হয় এবং ইহা আভ্যন্তরীণ শীতল ক্রিয়া সম্পাদক ইহার পত্র, পুষ্প, ফল, কাণ্ডত্বক ও মূলত্বক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ভাব—প্রকাশের মতে বাতনাশক, শ্রম নাশক ও জ্বর নিবারক, সুশ্রুতের মতে দাহ জ্বর নাশক,

রাজ নিঘণ্টু ও ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু গ্রন্থকার দ্বয়ের মতে শোথ নাশক এবং কণ্ডূ প্রভৃতি পিত্তজনিত বিবিধ বিকৃতি নাশক, ইহার রস বীর্য্যের শক্তি পিত্ত ও কফ নাশ করিলেও রাজবল্লভ ও ভাব প্রকাশ ইহাকে "বাত-কুষ্ঠনুৎ" অগ্নিবাতনুৎ" প্রভৃতি বাক্যে বাতপ্রশমক বলায় ইহার প্রভাব শক্তি বাত নাশ করে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক বসন্ত রোগের সূচনায় জ্বর গাত্র-বেদনা প্রভৃতি যেকয়টী লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সে সকলকে নিম্বের স্বাধীন শক্তি নাশ করে ইহা উপরি উদ্ধৃত গ্রন্থ সকলের অভিমত লইয়া অসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

নিম্ব বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদক, দূষিত ও বিষাক্ত বায়ুকে সংশোধন করিতে ইহার শক্তি অপরিসীম, গ্রন্থকার হারীত কেবল ইহার ফলকে বিষক্রিয়া প্রশমক বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন কিন্তু ভাবমিশ্র "নিম্বপত্রং পরং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্ত বিষপ্রনুৎ" এই বাক্য দ্বারা ইহার পত্রে প্রভূত বিষনাশক শক্তি রহিয়াছে বলিতেছেন। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ দাহজনক জ্বর, বিসর্প, বিস্ফোট প্রভৃতিতে পত্রযুক্ত নিমের ডালের বাতাস দেওয়ার এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি দুঃসাধ্য ব্রণ রোগীকে নিমের ছায়ায় উপবেশন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে বসন্ত রোগোৎপাদক দুষ্ট বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

বসন্ত রোগ অধিকাংশ স্থলে ৩য় দিন হইতে প্রকাশ পাইয়া ৫ম হইতে ৭ম দিনের মধ্যে সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, তৎপর ১ম সপ্তাহের শেষ হইতে ৮ম ৯ম দিন পর্য্যন্ত পাকিয়া পূয়-পুষ্ট হইতে দেখা যায়, উক্ত উভয় অবস্থায় নিম্বের প্রভাব সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের অভিমত দেখা যাইতেছে। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার বলেন—"অপক্কং শোষয়েৎ, শোফং ব্রণং পক্কং বিশোধয়েৎ" ইহার তাৎপর্য্য এই—যেকোন ফোস্কাযুক্ত অপক্ক ব্রণকে নিম্ব পাকাইয়া দেয় এবং পক্কাবস্থায় তাহাকে শোধিত অর্থাৎ ক্লেদাদি রহিত করিয়া শুষ্কাভিমুখ করিয়া থাকে, মহামতি বাগ্‌ভট চিকিৎসা স্থানে বলিতেছেন—"নিম্ব-পত্রাণি সংলিপ্য মধুনা ব্রণ শোধনং।" (চিঃ ৩৫ অঃ) অর্থাৎ মধুর সহিত নিম্বপত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে ক্ষতের পূয়াদি দূরীভূত হইয়া ক্ষত শোধিত হইয়া থাকে, আরও বলিতেছেন কাঞ্জিকেন চ সংলিপ্য পিচুমর্দ্দ-দলানিচ লেপনং শস্যতে তস্য ব্রণ পূয় প্রশান্তয়ে" (চিঃ ২৫ অঃ) এবার তিনি ধান্যাম্লে পেষিত নিম্ব পত্রের প্রলেপের কথা বলিতেছেন, খুব সম্ভব তাঁহার এই দ্বিতীয় উক্তি জ্বালাকর তীব্র যাতনা দায়ক ক্ষতে ব্যবহারের জন্যই কারণ ধান্যাম্লে ব্রণের রোপণ শক্তি মাক্ষিকের অপেক্ষা অনেক কম। ব্রণবিশারদ সুশ্রুত বসন্ত চিকিৎসায় কেবল এইমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে "মসূরিকায়াং কুষ্ঠঘ্ন লেপনাদি ক্রিয়াহিতা" অর্থাৎ কুষ্ঠনাশ প্রলেপ ও কষায়পানাদিই বসন্তরোগের শ্রেষ্ঠ ভেষজ, এই একটী কথায় নিম্বের প্রতি তাহার কতখানি ইঙ্গিত তাহা কুষ্ঠ চিকিৎসায় নিম্বের প্রয়োগবাহুল্য পাঠ করিয়া চিকিৎসক মাত্রেই অবগত হইতে পারিয়াছেন। নিম্বের একটি নাম পিচুমর্দ্দ, পিচু শব্দের অর্থ কুষ্ঠ, তাহাকে মর্দ্দিত অর্থাৎ ধ্বংস করে বলিয়াই এই নাম, শাঙ্গর্ধর বলেন "লেপান্নিম্বদলৈঃ কল্কঃ

ব্রণ শোধন রোপণঃ (মধ্যঃ খঃ ৫ম অঃ) ইহার মতে নিম্ব ব্রণের রোপণ ক্রিয়া পর্য্যন্ত সম্পন্ন করে।

এই সময়েরই মধ্যে চক্ষুতে এবং মুখাভ্যন্তরে ও অনেকস্থলে বসন্ত গুটিকা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রভাবশালী নিম্বের আয়ুর্ব্বেদোক্ত শক্তি তাহাতেও ব্যাহত নয় ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি—রাজবল্লভোক্ত নিম্বের সাধারণ গুণ বর্ণনায় আছে বটে "নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং" কিন্তু বঙ্গসেন নেত্র রোগাধিকারেই সৈন্ধব ও শুঠের সহিত পেষিত নিম্বপত্র উষ্ণাবস্থায় বস্ত্র খণ্ডে জড়াইয়া পুলটিসের মত চক্ষুতে সেক দিলে নেত্রাভ্যন্তরোত্থিত ব্রণজনিত স্ফীতি ও ব্যথা নিবারিত হয় বলিয়া বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নিজেরই উক্তি—"শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণঃ স্বল্পসৈন্ধবঃ ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্ষেপাৎ শোথ কণ্ডুব্যথাপহঃ"। এই স্থানে শুণ্ঠী সৈন্ধবের উল্লেখ থাকিলেও উহা গৌণ, নিম্ব-ত্রই নেত্র রোগনাশনে মুখ্য-দ্রব্য। মহামতি বাগ্‌ভট দন্ত বেষ্টগত ও তালু-গত মুখ রোগে নিম্বমূল ত্বকের কাথে কবল ধারণের কথা বলিতেছেন, চিকিৎসা স্থানে তাঁহার নিজের উক্তি 'কাথশ্চ নিম্বমূলস্য দন্তাদি ব্রণ ধারণঃ" এ স্থলে দন্ত ব্রণের উল্লেখ থাকিলেও তালুকণ্ঠ গণ্ড ব্রণ নাশনেও নিম্ব মূলের শক্তি অসীম বলিয়া অভিপ্রেত ইহা আদি শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে, বলা বাহুল্য যে আয়ুর্ব্বেদ মতে ত্বকের যাবতীয় উৎসেধ অর্থাৎ স্ফীতি এবং বিবিধ ক্ষত ব্রণশব্দবোধক সুতরাং মসূরিকাও ব্রণেরই অন্তর্ভুক্ত। সুশ্রুত ব্রণের নিরুক্তি বলিতেছেন। বৃণোতি আচ্ছাদয়তি স্বচমিতি ব্রণঃ। অতএব শাস্ত্র বাক্য পর্য্যালোচনা করিয়া বেশ প্রতীতি হইতেছে যে বসন্ত রোগের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে বসন্ত গুটিকার পাকাবস্থা পর্য্যন্ত রোগের সকল অবস্থাতেই সহজ লভ্য নিম্ব একটী প্রধান প্রশমক পরম শক্তিশালী ভেষজ। একমাত্র ইহার স্বতন্ত্র শক্তিতেই যে বসন্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে ইহা শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা একরূপ সমর্থিত হইল।

ইহার অনাগতপ্রতিষেধক শক্তি (Priventive power) বসন্তরোগ বিষয়ে কিরূপ অপরিমেয় তাহা পরে দেখাইব, সম্প্রতি বসন্তরোগের কোন্ অবস্থায় ইহা কিরূপভাবে প্রয়োগ করিয়া রোগ আরোগ্য করা গিয়াছে সংক্ষেপে তাহাই বলিতেছি। আয়ুর্ব্বেদে মসূরিকা চিকিৎসায় নিম্বকে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিবার কথা অধিক কিন্তু ইহাকে স্বতন্ত্র ভাবে প্রয়োগ করিয়া রস বীর্য্যের শক্তির অতীত যে ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে এ স্থলে সেই অচিন্তনীয় প্রভাবের কথাই বলা হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নিমের ছাল, পাতা, ফুল, ফল ও মূল অর্থাৎ মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত পারিভাষায় "নিম্বাদীনাঞ্চ বল্কলম্" নিয়ম অনুসারে নিমের ছাল মাত্র গ্রহনীয় হইলেও রক্তশোধনাদি কার্য্যে নিম্বের পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী অঙ্গেরই ব্যবহারের বিশেষ বিধান আছে।

বসন্ত রোগে পঞ্চনিম্ববটীই প্রশস্ত (পত্র পুষ্পাদি প্রত্যেক সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করতঃ কুলের আঠির মত বটী করিয়া

রাখিতে হয় উহাই পঞ্চনিম্ব বটী,) রোগোৎপত্তির পূর্ব্বে পঞ্চনিম্ব বটী সেবনে রোগ কখনই দারাত্মক হইতে পারে না। অধিকন্তু বসন্ত-বিষ ভিতরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া জ্বর গাত্র বেদনা প্রভৃতি অচিরে দূরীভূত হয়। ২য় ৩য় অবস্থায় পঞ্চ নিম্বের কাথ পান অমোঘ ফলপ্রদ ইহাতে বসন্তের বিষ কমিয়া গিয়া দানা গুলি সংখ্যায় অল্প হয় এবং খুব শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে এবং কাস কণ্ঠধ্বংস প্রভৃতি দারুণ উপসর্গ সকল উপস্থিত হইতে পারে না। এই অবস্থায় পঞ্চনিম্ব বটী তেমন ফল দায়ক নহে। শরীরের অংশবিশেষে দানা বহির্গত না হইলে এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণা হইলে পঞ্চ নিম্বের পাচন সেবনের সঙ্গে ঐ সকল স্থানে কাথ জলের সিঞ্চন পরম উপকারী, অথবা নিম্বপত্র মেথি কিম্বা আতপ তণ্ডুল ভিজান জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া এবং ঐ জলে গুলিয়া সেই জল সিক্ত বস্ত্র খণ্ডের দ্বারা পীড়িত স্থান বারংবার আবৃত করিয়া দিলে সত্বর বসন্তের গুটি বাহির হইয়া যায়, কিন্তু এইরূপ আর্দ্রবস্ত্র প্রয়োগ বক্ষঃস্থলে বিশেষ করা সঙ্গত নহে, তাহাতে শৈত্যাতিশয্য নিবন্ধন উৎকট কাস, জ্বরবেগ বৃদ্ধি, ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। চক্ষুতে ও মুখাভ্যন্তরে দানা উঠিলে পূর্ব্বলিখিত প্রয়োক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিতে হয়, মলমূত্র ত্যাগের পর পঞ্চনিম্বের কাথে শৌচাদির ব্যবস্থা করিলে সেই সকল স্থানজাত পীড়কাগুলি পীড়া দায়ক হইতে পারে না। এই তৃতীয় অবস্থা পর্য্যন্ত আসিয়া অধিক সংখ্যক রোগী আরোগ্য হইয়া উঠে, অল্প সংখ্যক রোগীই সাংঘাতিক ৪র্থ অবস্থায় গিয়া পড়ে।

বসন্ত রোগের চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ যখন বেশী পরিমাণে বহির্গত সমস্ত পক দানাগুলি গলিয়া এক হইয়া যায় সেই সময়টী বড়ই ভয়াবহ, কোন রোগী ঘোর বিকার কিম্বা তন্দ্রা গ্রস্ত থাকে, অথবা কোন রোগী অসহ্য যাতনায় ছট্‌ফট করে এবং কেবলই বাহ্যিক শীতলতার জন্য করুণ আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, পূর্ব্ব হইতেই পঞ্চনিম্বের কাথ রীতিমত সেবিত হইলে প্রায়ই বিকারাদি উপস্থিত হইতে দেখা যায় না। রোগীর বাহ্যসন্তাপাদি দারুণ যাতনা উপস্থিত হইলে পেষিত নিম্বপত্র সদ্যঃ উদ্ধৃত নবনীতের সহিত আলোড়িত করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মাখাইতে হয় এবং ডাল ছাড়া রাশি রাশি কাঁচা নিম্ব পত্র একত্র করিয়া অন্যূন অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত উচু করতঃ ঐ নিম্ব পত্রের শয্যায় রোগীকে শয়ন করাইয়া রাখিতে হয়, প্রত্যহ দুই বেলা পাতা পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন করিয়া দিতে হইবে, এই ব্যবস্থা যে কিরূপ অমোঘ প্রশমক ও রোগীর আরাম দায়ক তাহা প্রত্যক্ষ না হইলে ভাষায় বুঝান যাইবে না। নিম্বপত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহা আগুনে পোড়াইয়া রোগীর গৃহেদিনে ৩।৪ বার ধুম করিতে হইবে, ঐরূপ নিম্বপত্রের শয্যায় শয়নের পর হইতে রোগীর শরীরের সমস্ত ক্লেদাদি, পত্র সমূহে সংলগ্ন হইয়া যায় এবং ক্ষতে নূতন পুয়াদি সঞ্চিত হয় না, কাজেই দেহের দুর্গন্ধ ও ভয়াবহ স্ফীতি এই উপায়ে অচিরে দূরীভূত হইয়া যায়, এই সময়ে কাহারো কাহারো দেহের কোন কোন অংশের ক্ষত বেশ পরিষ্কার শুষ্কোন্মুখ এবং কোথাও বা পূয়যুক্ত ক্ষতের উপরে চামড়া আচ্ছাদিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই অবস্থায়

যে অংশের ক্ষত অপেক্ষাকৃত শুষ্কোন্মুখ তথায় দাহ ও আকর্ষণবৎ বেদনা হয় এবং পূয়যুক্ত স্থানে ব্যথা ও ভার বোধ হয়, বিধাতার মূর্ত্তিমান আশীর্ব্বাদ মহোপকারী নিম্বের এই উভয় ক্ষেত্রেই আশ্চর্য্য প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, পূয়াদি রহিত ক্ষত নিম্বফলের তৈল কিম্বা নিম্বপত্র ভাজা ঘৃতের দ্বারা সিক্ত করিয়া রাখিলে রোগীর শরীরে টানের মত যাতনার শান্তি হয় এবং সত্বরই ক্ষত শুকাইয়া যায় আর ক্লেদযুক্ত চর্ম্মাচ্ছাদিত ক্ষতে শুষ্ক নিম্বপত্রের চূর্ণ উত্তমরূপে বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেগুলি একটী সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে কিম্বা রেশমী বস্ত্রে বাঁটিয়া পুটুলী করতঃ তৎপর উহা আস্তে আস্তে টিপিয়া কিম্বা ঝাঁকিয়া তন্মধ্যস্থ নিম্ব পত্র চূর্ণ ক্ষতে প্রক্ষেপ করিলে খুব শীঘ্র ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়, কেহ কেহ উপরি উক্ত নিম্বপত্র চূর্ণের সহিত সম পরিমাণ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া থাকেন কিন্তু কেবল নিম্বপত্রের সূক্ষ্ম চূর্ণও পূয়যুক্ত বসন্ত শুষ্ক করিয়া থাকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এইরূপে শুষ্ক হইয়া ক্রমে বসন্ত ক্ষতের শুষ্ক চর্ম্মগুলি সমস্তই স্বয়ং খসিয়া পড়ে, তখন সর্ব্বাঙ্গে পেষিত নিম্বপত্র মাখাইয়া নিম্বপত্র সিদ্ধ জলে রোগীর গাত্র ধুইয়া ফেলিতে হয়। তৎপর পক্ষ কাল পর্য্যন্ত নিম্ব ফলের তৈল কিম্বা নিম্বপত্র ভর্জ্জিত ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিলে বিগত-বসন্ত ব্যক্তির দেহ ক্রমে ক্রমে বৈবর্ণ্য বিযুক্ত হইয়া লাবণ্য যুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপে বসন্ত রোগের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রে নিম্বের যে সকল প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

বিচারের চক্ষে দেখিতে গেলে বসন্ত রোগ বিকৃত বায়ুপিত্ত কফের একটী দুইটী কিম্বা সকলের সহিত মিশ্রিত দূষিত রক্ত জনিত চর্ম্মের বিকৃতি মাত্র, সুতরাং পিত্ত ও রক্ত দোষ নাশক এবং কিঞ্চিৎ কফাদি প্রশমক নিম্বের কার্য্যকারী শক্তি তাহার উপর সামান্য প্রভুত্ব করিতে পারে বটে, কিন্তু গুলঞ্চ চিরতা প্রভৃতি ঐ শ্রেণীর দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং বসন্ত রোগের উপর নিম্বের অনন্ত সাধারণ প্রভাব প্রত্যক্ষ করিলে এই অযত্ন জাত উপেক্ষিত গ্রাম্য গাছটীকে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ বসন্ত চিকিৎসায় "নিম্বাদি কষায়" প্রভৃতিতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইহার প্রয়োগ প্রণালী বর্ণিত হওয়ায় প্রায়শঃ গৌণ ভাবেই ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। স্বতন্ত্রভাবে ইহার কার্য্যকারী শক্তি দেখাইবার জন্য আজ আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম সম্প্রতি ইহার রোগ প্রতিষেধকতার সংক্ষিপ্ত কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছি, পূর্ব্বেই বলিয়াছি দূষিত বায়ু বসন্ত রোগোৎপত্তির অন্যতম কারণ, নতুবা একই সময়ে বহুস্থান ব্যাপী রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না, বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন ও বায়ু প্রবাহ গত রোগ বিষনাশনে নিম্বের নাত্যল্প প্রভাব বাতরক্ত, কুষ্ঠ রোগীর নিম্বচ্ছায়ায় অবস্থিতি ও বিসর্পাদিতে বৃদ্ধবৈদ্যের নিম্বপত্র ব্যজনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, বহুবার ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে নিম্বপত্র বহুল ক্ষুদ্র শাখা সমূহের দ্বারা গৃহের বা প্রকোষ্ঠের যত গুলি দ্বার ও গবাক্ষ আছে সবগুলির শীর্ষদেশ ঘন ভাবে সজ্জিত করিলে সেই গৃহে কিম্বা প্রকোষ্ঠে বসন্ত রোগের আবির্ভাব হয় নাই, বসন্ত রোগের সময় প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি ৩টী নিম্বপত্র ও ১টী

গোলমরিচ জলে পিষিয়া উপর্য্যুপরি ৩।৪ দিন কিম্বা ১ দিন অন্তর সপ্তাহ কাল সেবন করিলে বসন্ত রোগ হয় না। ২।৩টী বড় নিম্ববৃক্ষ যে বাড়ীতে আছে সেই বাড়ীর নিত্য অধিবাসিদিগের কেহই বহু বর্ষ যাবৎ বসন্ত পীড়িত হয় নাই এইরূপ দৃষ্টান্ত বহু সংগ্রহ করিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে বসন্ত উৎসবে নিম্ব পত্রের দ্বারা সমস্ত গৃহদ্বার সজ্জিত করা ও নিম্বপত্রের ধূম প্রদক্ষিণ করা প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকরণীয় প্রথার প্রচলন আছে, অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি এই রীতি বসন্ত রোগে প্রতিষেধক বলিয়াই অভিজ্ঞ প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া এখন গৃহস্থদিগের অবশ্য পালনীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সকল স্থানের এই প্রথা বেশ ফলবতী বলিয়াই মনে হয় কারণ, এতদঞ্চলের মত বসন্ত-রোগ-বিকৃত মানব-মুখমণ্ডল তথায় বড় একটা দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এ হেন উপকারী বৃক্ষকে আমরা গ্রামান্তে বিদায় করিয়া দিয়াছি, যাহার সর্ব্বাঙ্গ মানব কল্যাণে ব্যয়িত হয়, মাধবীর প্রতি রোষেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক যে নিম্ব বসন্তের চিরশত্রু, বসন্ত আসিবার পূর্ব্ব হইতেই যে পত্র পুষ্প লইয়া মরণের পথ হইতে মানুষকে টানিয়া আনিবার জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকে তাহাকে গৃহপার্শ্বে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হইয়াই আজ আমরা এই রোগের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছি না উপকারীর প্রতি উপেক্ষাতেই আজ আমাদের এই শোচনীয় পরিণাম বৎসর বৎসর এই কালব্যাধির কবলে কলিকাতার কত লোক যে অকালে কবলিত হইতেছে তাহা স্মরণ করিলেও হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এই জন্য কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষকে আমি নিম্বের অনাগত প্রতিষেধক শক্তি (Priventive Power) পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি, নগরীর প্রশস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে রোপিত ক্ষীণচ্ছায় বৃক্ষগুলির পরিবর্ত্তে তাঁহারা যদি সেই সেই স্থানে সুন্দর ছায়া বিতরণকারী নিম্ববৃক্ষ রোপণ করেন তাহা হইলে কালে বসন্ত রোগের তাণ্ডব লীলা সংযত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস, আপাততঃ তাঁহারা কোন একটী রাস্তায় কেবল নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া ৭।৮ বৎসর পরে সেই বসতিতে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব পরীক্ষা করিতে পারেন, ইহাতে ক্ষতি মোটেই নাই কিন্তু লাভের আশা যথেষ্ট।

আজ এই পর্য্যন্ত বলিয়া এবং ১টি তিক্ত পদার্থের পর্য্যালোচনায় ধৈর্য্যশীল পাঠকবৃন্দকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বিরত হইলাম।*

---

* আয়ুর্ব্বেদ সভার বিগত অধিবেশনে পঠিত ও সমাদৃত, এতদ্ব্যতীত নিম্বযন্ত্রের পাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জল পান ও নিমছালের রস পান বসন্ত প্রতিষেধক ও প্রশমক বলিয়া সভাস্থলে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে। আঃ সং।

ডেঙ্গু-জ্বর

(কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ)

—:•:—

বর্ত্তমানে কলিকাতা সহরে এবং তন্নিকট-বর্ত্তী পল্লীসমূহে ডেঙ্গুজ্বরের বিশেষ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। ইহা একটী কালকৃত ব্যাধি।

গাত্রে প্রবল বেদনা, শিরোবেদনা এবং সন্তাপাধিক্য এই জ্বরের অব্যভিচারী লক্ষণ। এ রোগে গাত্র বেদনা এত অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার হাড়ের ভিতর হইতে বেদনা আসিতেছে।

এই রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা :—

(১) পীড়কা যুক্ত (erruptic)

(২) পীড়কা বিহীন

ডেঙ্গুজ্বরের আয়ুর্ব্বেদীয় নাম লইয়া অনেক মত ভেদ থাকিলেও আমাদের মনে হয়, ভাবপ্রকাশোক্ত শীতলাধিকারের 'ষষ্ঠী শীতলা' ও 'পীড়কাযুক্ত ডেঙ্গু' একই ব্যাধি। এই ষষ্ঠীশীতলার লক্ষণে—ভাবমিশ্র বলেন,—

"কোঠবজ্জায়তে ষষ্ঠী লোহিতোন্নত মণ্ডলা।"

জ্বর পূর্ব্ব ব্যথা যুক্তা জ্বরস্তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ম্ ॥

অর্থাৎ বোল্‌তায় কামড়াইলে গায়ের চামড়ার উপর যে প্রকার স্ফীতির উপলব্ধি হয়, তদ্রূপ পীড়কা সকলকে কোঠ বলে। এই ষষ্ঠী শীতলা রোগে গাত্রে রক্তাভ মণ্ডলাকার কোঠ উৎপন্ন হয়।

কোঠ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, গাত্রে গুরুতর বেদনা ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়। এই জ্বর মাত্র ৩ দিন অবস্থান করে।

ডেঙ্গু জ্বরে যে পীড়কা (Eruption) দেখা যায়—তাহাও কোঠ সদৃশ মাত্র। সুতরাং পীড়কা যুক্ত ডেঙ্গুকে আমরা ষষ্ঠীশীতলা নামে অভিহিত করিতে পারি।

শীতলা রোগ (মসূরিকার ন্যায়) সংক্রামক ব্যাধি। ডেঙ্গু ও তাই। কিন্তু যেখানে পীড়কা দেখা যায় না, সেখানে 'শীতলা' বলা চলে না। কারণ পীড়কাকেই শীতলা বলা হইয়াছে। এখানে আমরা এই প্রকার মীমাংসা করিতে পারি—

"ইহ খলু নিদান দোষদূষ্য বিশেষেভ্যো বিকারাণাং বিঘাত ভাবাভাব প্রতি বিশেষা ভবন্তি। যদা হ্যেতে ত্রয়ো নিদানাদি বিশেষাঃ পরস্পরং নানুবধ্নন্ত্যথবা বা কাল প্রকর্ষাদ-বলীয়াংসোঽথবানুবধ্নন্তি ন তদা বিকারাভি নির্ব্বৃত্তিঃ।" চরক

অর্থাৎ "নিদান দোষ ও দূষ্য ভেদে রোগ দিগের বিঘাত (উৎপত্তির ব্যাঘাত) ভাব ও অভাবের ভিন্নতা হইয়া থাকে। নিদান, দোষ ও দূষ্য—ইহারা পরস্পর অনুবন্ধী হইলে অথবা দুর্ব্বল ভাবে পরস্পরের অনুবন্ধী

হইলে রোগ উৎপন্ন হয় না অথবা রোগ হইলেও বিলম্বে হইয়া থাকে বা স্বল্পাকারে হইয়া থাকে, অথবা যথোক্ত সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন হয় না।"

এইরূপ সকল রোগের—বিঘাত ও ভাবাভাবের ভিন্নতার হেতু কথিত হইল।

ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে 'ষষ্ঠী-শীতলা' জ্বর-পূর্ব্বা। প্রকুপিত দোষ পূর্ব্বে জ্বর উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন ত্বগাশ্রয় করিয়া পীড়কা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

এখানে কেহ এইরূপ আপত্তি তুলিতে পারেন যে, "ব্যথা যুক্তা—এই কথাটী ষষ্ঠী-শীতলাখ্য পীড়কার বিশেষণ। কিন্তু ডেঙ্গু-জ্বরে পূর্ব্বেই গাত্রে ব্যথা উপলব্ধি হয়, সুতরাং ইহা ডেঙ্গুজ্বর নহে, ডেঙ্গুজ্বর স্বতন্ত্র ব্যাধি।" তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, ডেঙ্গুকে 'শীতলা' আখ্যা প্রদান করিবার কয়েকটী হেতু আছে। ডেঙ্গুজ্বর হইলে অনেক সময় ডেঙ্গুজ্বর হইবে কি হাম হইবে তাহা লক্ষণ দেখিয়া ততটা বুঝা যায় না। মুখ, চোখ এবং শরীরের অবস্থা উভয় রোগের কতকটা একই প্রকার। রোমান্ত্যাখ্যা (হাম) মসূরিকা যে প্রকার ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয়, ডেঙ্গুও সেই প্রকার ব্যাপক ভাবে উৎপন্ন হয়। রোগ উৎপন্ন হইলেও অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য সহজে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ভাবমিশ্র বলেন, "দেব্যা শীতলয়া, ক্রান্তা মসূর্য্যেব হি শীতলা।" সুতরাং শীতলা ও মসূরিকা একই জাতীয় ব্যাধি। আরও এখানে 'ব্যথাযুক্তা'—গাত্র ব্যথাযুক্তা এই লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে ডেঙ্গু ও ষষ্ঠী শীতলা যে একই ব্যাধি, তাহাতে আর কোনই সংশয় থাকে না। বিশেষতঃ লোহিতোন্নত-মণ্ডলা / কোঠবৎ পীড়কা' এবং 'জ্বরস্তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ম্' এইরূপ নির্দ্দেশের দ্বারাই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হইতেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রেও দেখা যায়,—রোমান্তবিধানোক্ত চিকিৎসায় "ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হয়।"

এই জ্বরে সকল স্থানে যে এক প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, তাহা নহে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই।

কিন্তু গাত্র বেদনা করিয়া জ্বর আসাই ইহার অব্যভিচারী লক্ষণ।

১। গাত্র বেদনা পুরঃসর জ্বর আইসে, মাথায় যন্ত্রণা বিদ্যমান থাকে, জ্বরের তাপ ১০৩-১০৪° পর্য্যন্ত উঠে। প্রথম দিন প্রবল-বেগে জ্বর হয়, দ্বিতীয় দিন কমিতে থাকে এবং তৃতীয় দিন জ্বর ছাড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কোনও প্রকার ঔষধ না দিলেও চলে। তবে যদি রোগী একান্তই ঔষধ খাইতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলেই প্রথম দিন পানের রস ও মধু সহ এবং দ্বিতীয় তৃতীয় দ্বিতীয় দিন পটোলের রস মধুযোগে মকরধ্বজ দেওয়া চলে।

২। উক্ত প্রকার জ্বর সারিয়া যাইবার দুই একদিন পরে রোগীর গাত্রে পীড়োকোদ্গম, শরীরের গ্রন্থি বেদনা এবং স্থল বিশেষে পুনরায় জ্বর পরিলক্ষিত হয়। এরূপ অবস্থায় রক্তচন্দন, বাসকছাল, মুথা, গুলঞ্চ এবং দ্রাক্ষা মিলিত ২ তোলা, ইহাদের শীত-কষায় এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটী মহালক্ষ্মী

বিলাস—পানের রস ও মধু সহযোগে প্রয়োজ্য।

৩। মস্তাপাধিক্য জন্য—শিশুগণের অনেক সময় রসতড়কা (Convulsion) উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে মাথায় বরফ কিম্বা ঠাণ্ডা জল দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। মকরধ্বজ ½ রতি ও বঙ্গক্ষার ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জলসহ এবং বৃহদ্বাতচিন্তামণি ½ বটী মৌরীর জল সহ দিতে হইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পানের বোঁটায় ঘৃত মাখাইয়া অথবা "Glycerine Suppository" মলদ্বারে ঢুকাইয়া বাহ্যে করান কর্ত্তব্য।

(৪) (ক) গাত্রবেদনা,— প্রবলজ্বর। ইহাতে রোগী অভিভূতাবস্থায় পড়িয়া থাকে। এরূপাবস্থায় মকরধ্বজ ১ রতি, মহালক্ষ্মীবিলাস ১ বটী ও মৃত্যুঞ্জয় ২ বটী একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩ বার পানের রস ও মধু সংযোগে প্রয়োজ্য। পরদিন যদি রোগীর গাত্রদাহ ও অস্থিরতা দেখা যায়, তবে "সৌভাগ্য বটী" পটোলের রস ও মধু সহ দিবসে ২ বার দিতে হয় এবং রোগীর মাথা ঠাণ্ডাজল দিয়া ধুইতে হয়।

(খ) রোগীর বমন বা বিবমিষা থাকিলে শসার রস সহ ১ মাত্রা মকরধ্বজ দিলে উপকার হয়।

(গ) রক্তবমন থাকিলে ছাগদুগ্ধের সহিত আলতা গুলিয়া সেই দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে একবটী পিত্তান্তকরস এবং পূর্ব্বোল্লিখিত রক্তচন্দনাদির শীতকষায় প্রয়োজ্য।

(ঘ) অত্যধিক পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে ½ আধরতি মকরধ্বজও ১ আনা বঙ্গক্ষার একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীরজল সহ দেয়। ১ পোয়া গরমজল, সর্জ্জীক্ষার (Sodibicard) ২ আনা, লেবুর রস ½ ছটাক ও মিশ্রি ½ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল হইলে, রোগী যে পরিমাণ জল খাইতে চাহিবে তাহাকে সেই পরিমাণ এই জল দিতে হয়।

(ঙ) উদরাধ্মান থাকিলে মকরধ্বজ ½ রতি, বঙ্গক্ষার ২ আনা এবং বড়এলাচ চূর্ণ ২ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া মৌরীর জলসহ প্রয়োজ্য, এই ভাগে ১ মাত্রা করিয়া দিবসে ২ বার দিতে হয়।

(চ) কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আরগ্বধাদি পাচন দেওয়া যাইতে পারে।

(ছ) আমাশা (প্রবাহিকা) থাকিলে মরিচ চূর্ণ ৩ রতি. কাঁটানটের শিকড় ছেঁচিয়া সেই রস ও চালুনীজলের সহিত ভুবনেশ্বর দিবসে ২ বার দিতে হইবে।

(জ) উদরাময় থাকিলে ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা মহাগন্ধক অবস্থানুযায়ী অনুপান ভেদে দিবসে ২ বার প্রয়োগ করিতে হইবে।

(ঝ) রক্তভেদ থাকিলে হ্রীবেরাদি কষায় এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বা মহাগন্ধক ইন্দ্রযব ভিজান জলসহ প্রয়োজ্য।

এই রোগে অনেক সময় রোগীর ক্ষুধা সম্যক বর্ত্তমান থাকে দেখা যায়। সেইরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে খাইতে দেখা উচিত। যদি কোন উপসর্গ না থাকে, তাহা হইলে টাট্‌কা মুড়ি দেওয়া যায়। বমন উপসর্গ থাকিলে, জলবার্লি, চিড়ার মণ্ড, ঘোল প্রভৃতি দেওয়া যায়, রক্তবমন ও রক্তাতীসার থাকিলে ছাগ-দুগ্ধ ও বার্লি প্রযোজ্য।

সংক্ষেপে ডেঙ্গুজ্বরের সকল লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসা ও পথ্য বলা হইল। রোগাবস্থায় রোগীর যত না ক্লেশ অনুভূত হয়, সারিয়া যাওয়ার পর তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ হয়। এই সময় সাধারণতঃ দুর্ব্বলতা, অরুচি এবং গাত্র বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং রোগী নানাপ্রকার অশান্তি বোধ করে। এই সময় রোগীর অরুচি শান্তির নিমিত্ত রোগীকে পলতার ঝোল এবং পলতার বড়া খাইতে দেওয়া উচিত। ½ বটী মহালক্ষ্মীবিলাস, ৩ রতি সৈন্ধবচূর্ণ ও আদার রস সহ প্রাতঃকালে এবং ½ রতি মকরধ্বজ ও ½ বটী গুড়ুচ্যাদিলৌহ সন্ধ্যাকালে ডালিম অথবা বেদানার রস সহ প্রয়োজ্য। এই ভাবে কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিলে রোগীর দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ বিদূরিত হয়।

বিশেষতঃ অনেক ক্ষেত্রে এই রোগের পুনরাবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। সেইজন্য এই ব্যবস্থানুসারে কয়েকদিন ঔষধ সেবন করিলে আর পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রসঙ্গে যে সকল প্রতিষেধের উল্লেখ করা গিয়াছে, ডেঙ্গুরও সেইগুলি প্রতিষেধক।
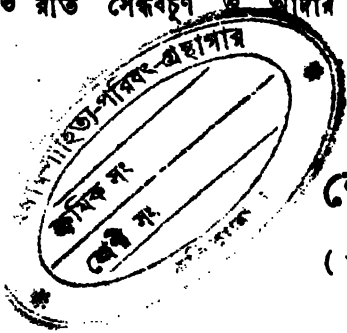
শোথ চিকিৎসা।

(মহিলাদিগের জন্য লিখিত)

বাতজ শোথ হয় যা'র,
দশমূলের কাথ প্রশস্ত তা'র
কোষ্ঠবদ্ধ থাকে যদি
এরণ্ড তৈল খাও—দুধে বিধি। ১
চো না কিম্বা পুরাণমান
মণ্ড ক'রে খেতে দাও বিধান। ২
বাসকছাল, গুলঞ্চ, কন্টকারি
চৌষট্টিকুঁচে ওজন করি
আধসের জল শেষ আধপোয়া
ব্যবস্থা কর মধু দিয়া।
জ্বর বমি শোথ,শ্বাস, কাস
সবগুলির হ'বে নাশ। ৩
শ্বেত পুনর্ণবা নিমেরছাল
পলতা, কটকী, শুঁঠ—ঝাল,
গুলঞ্চ—গাঁট বাদ দিয়ে
দারু হরিদ্রা, হরুকি নিয়ে
এক একটি সিকিভরি
আধসের জলে কাথ করি
আধপোয়া থাক্‌তে খাওগো ঢেলে
সর্ব্বাঙ্গ শোথে সুফল মেলে।
পার্শ্বশূল শ্বাস পাণ্ডুরোগে
ব্যবস্থা দিও এই যোগে। ৪
বেলপাতার রস মরিচ চূর্ণ
ত্রিদোষ যুক্ত শোথ করে দূর।
কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, কামল,
এ সবে ও বড় সুফল। ৫

চিরতা, শুঁঠ বেটে জলে
খেলে শোথে সুফল ফলে
এটি খেয়ে পুনর্ণবার কাথ
খেলে শোথের সব নিপাত।
কুলেখাড়ার রস ঔষধ বড়
শোথে সদাই ব্যবস্থা কর।

কফজ শোথে চোমার সহ
জল দিয়া পৈত্তিকে দেহ। ৭
মানকন্দ করি পেষণ
দুধের সহ কর সেবন
প্লীহা ও শোথ সব রকমের
সেরে যাবে উক্তি শিবের। ৮

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ ও টোট্কা।

(কবিরাজ শ্রীহরিচরণ গুপ্ত)

—:০:—

গ্রহণী রোগে।—

মরিচ, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব—সমানভাগে লইয়া (॥০ আধতোলা) ⁄॥০ সের জলদিয়া ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডাকরিয়া প্রত্যহ ২।৩ দিন দুবেলা সেবনে গ্রহণী রোগ আশু নিবারিত হয়।

মেহজ্বরে:—*

দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, হরীতকী, শুঁঠ, গোক্ষুর, কণ্টিকারী, ধনে, মুথা, জীরা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, সোনামুখী, ছাতিমছাল, নিমের ছাল, পালিদা মাদারের ছাল, আকনাদি, প্রত্যেক ৵০ আনা পরিমাণে লইয়া ⁄॥০ সের জল দিয়া জ্বালদিয়া ⁄৵০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া ঠাণ্ডা হইলে সপ্তাহ কাল দুবেলা পান করিলে যে কোন প্রকারের মেহজ্বর নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে, এইটী বিশেষ পরীক্ষিত।

রক্তআমাশয়ে:— (ক)

ডালিমের কচিপাতা ১ তোলা, তেঁতুলের কচিপাতা ১ তোলা, জামের কচিপাতা ১ তোলা, ডালিমের কুঁড়ি ১ তোলা, জীরা ।০ সিকিতোলা একত্রে বাটিয়া ⁄৵০ পোয়া জল দিয়া গুলিয়া পর পর ২।৩ দিবস খাইলে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক রক্ত আমাশা সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়।

পাকা বেল বা পোড়া বেলের শাঁস ৵০ পোয়া, ইসব্গুল ১ তোলা, দধি ৵০ পোয়া, চিনি ⁄০ একছটাক ও গব্যঘৃত ৵০ পোয়া

---

*মেহজ্বরে এই পাঁচনটী বজরাপুর নিবাসী স্বনামখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় নফরচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন, ঠাকুর দাদা মহাশয় প্রথমে যে সময়ে আমাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র শিক্ষা দেন, সেইসময় আমি এই পাঁচনটীর গুণ বহুল রোগীকে দিতে দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।—লেখক।

একত্রে মিশাইয়া ক্রমাগত ২।৩ দিন প্রত্যহ দুইবেলা দুইবার ১ তোলা পরিমাণ খাইলে রক্ত আমাশয়ে আশুফল হয়।

শিরঃপীড়ায়ঃ—

কুলের পাতার উল্টাদিকে কলিচুণ মাখাইয়া রগে বসাইয়া দিলে ২।১ ঘণ্টার মধ্যে শিরঃ পীড়ার শান্তি হয়।

প্রদরেঃ—

গব্যদুগ্ধ ✓।॰ পোয়া, আম্রকেশী বাটা ১ তোলা ও একটী পাকা চাঁপাকলা একত্রে চট্‌কাইয়া প্রত্যহ ২।৩ দিবস সেবন করিলে যে কোনপ্রকারের প্রদর আশু নিবারিত হয়।

কর্ণশোথে প্রলেপঃ—

রসমাণিক ✓॰ আনা, রসসিন্দুর ✓॰ আনা শ্বেত অপরাজিতার ফুল (টাট্‌কা) ২টী ও মনসাসিজের পাতা আগুণে তাতাইয়া তাহার রস ✓॰ একছটাক; সমস্তগুলি একত্রে বাটিয়া কর্ণশোথে প্রলেপ দিলে যেরূপ কষ্টদায়কই হউক না ২ দিনের মধ্যে উপশম হইবে।

মস্তকের উকুন মারিবার ঔষধঃ—(ক)

মস্তকের চুলে উকুন হইলে রাত্রিতে শয়ন করিবার সময় পানের রস পায়ের তলায় ভালরূপ মর্দ্দন করিতে হইবে এবং চাঁপাফুলের পাতার রস চুলে মাখাইয়া শুকাইয়া ধৌত করিলে উকুন মরিয়া যায়। এইরূপে ৭ দিবস করিতে হইবে।

(খ) কাঁজির সহিত নালিতা শাকের বীজ বাটিয়া চুলে মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া ধৌত করিলে উকুন মরিয়া যায়—এইরূপে ২।৩ দিবস করিতে হইবে।

ব্রণ শোথেঃ—

ছোট ঈশেরমূল ১ ভাগ, কেলেকড়ার মূলছাল ১ ভাগ, সাদা ১ ভাগ কোকালতার পাতা ১ ভাগ, কটু হুঁকার জলে মাড়িয়া ব্রণশোথে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণাদি আশু নিবারিত হয় এবং ক্রমশঃ ঘা কমিয়া আসে। এইরূপ ৭।৮ দিবস ব্যবহার করিলে ঘা শুখাইয়া যায়।

দন্তরোগেঃ—

চাল্‌তা ফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সচ্ছিদ্র লৌহ পাত্রে রাখিবে পরে ঐ পাত্র রৌদ্রে রাখিলে উহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া পড়িবে তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে ও দন্তরোগ নষ্ট হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আয়ুর্ব্বেদ সভা।—গত ২৪শে ভাদ্র সন্ধ্যা ৬॥টার সময় কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেন্স্ হলে কলিকাতা "আয়ুর্ব্বেদ সভা"র একটি বিশেষ সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক কবিরাজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ "বসন্ত রোগে নিম্বের প্রস্তাব"শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ছিলেন।

হরনাথ সাধন সঙ্ঘ। গত ১৫ই ভাদ্র শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথের উপস্থিতিতে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ভবনে "হরনাথ সাধন সঙ্ঘের ১ম সাধারণ অধিবেশন মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, ডি, লিট মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কার করিয়াছিলেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন সভাপতির উদ্দেশ্য বিবৃতি করণোদ্দেশে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। কটক মেডিকেল স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, বি, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র বি, এল, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন।

হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে সসম্মানে চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতবিদ্য ছাত্র শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ সেন গুপ্ত ভিষগরত্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, ঠাকুর শ্রীশ্রীহরনাথের আদেশ পাইয়া এবং তাঁহাকে উপস্থিত রাখিয়া গত ১৬ই ভাদ্র ৫৪ নং বড়তলা ষ্ট্রীট বড় বাজারে—"হরনাথ আয়ুর্ব্বেদ ভবনে"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ২৩শে ভাদ্র এই আয়ুর্ব্বেদ ভবনের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৺সত্যনারায়ণের সিরণি বিতরণ ও ঠাকুর হরনাথ সম্বন্ধে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম, এ, এম, বি, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী এম, এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভাগবত শাস্ত্রী এম, এ, অমৃতবাজার পত্রিকার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মৃণাল কান্তি ঘোষ, বড়বাজারের প্রসিদ্ধ ধনী, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ শেঠ, মিলিটারি অফিসের অ্যাকাউটেন্ট পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ২০০ শত গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হরনাথের পত্র। ঠাকুর হরনাথের নিকট হইতে কবিরাজ শ্রীমান্ ইন্দুভূষণ ঐ দিন যে উপদেশ পূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি, সে পত্র খানি এই—"স্নেহের ভাই ইন্দু, তোমার পত্র ও স্নেহের বাবার পত্র পেয়ে পরম আনন্দিত হইলাম। ভাই, তোমার

নব উত্তম, প্রভু সফল করুন। তোমার হাতে অমৃত সিঞ্চিত হ'ক। তোমার স্পর্শে যেন রোগীর রোগ-যাতনা দূর হয়। ভাই, রোগের নিবারণ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদা প্রাণে জাগাইয়া রাখিবে। অর্থের দিকেই কেবল দৃষ্টি করিওনা, তা'তে কবিরাজ না হ'য়ে নৃশংস কষায়ের মত হৃদয় হ'য়ে পড়ে। জীবন রক্ষার জন্য অর্থ লইবে, তবে অর্থ নিয়ে সর্ব্বদা রোগীর বিষয় চিন্তা করিবে। সকল কর্ম্মের প্রথমে প্রভুর নাম স্মরণ করিবে। প্রভু কর্ত্তা, মানুষ নিমিত্ত মাত্র মনে ক'রে সকল কাজ করিবে। সকল রকমে উন্নত হও। † † † তোমরা সকলে চির সুখে থাক, প্রভু তোমাকে কর্ম্মক্ষেত্রে হাতে ধ'রে নিয়ে চলুন।" আমরাও আমাদের পরম স্নেহ ভাজন নবীন কবিরাজ শ্রীমান ইন্দুভূষণকে ঠাকুর চরনাদের এই অমূল্য উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন করিবার জন্য আদেশ করিতেছি। এই উপদেশ শুধু শ্রীমান ইন্দুভূষণের প্রতি ব্যক্তিগত নহে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক চিকিৎসকেরই ইহা পালন করা উচিত।

আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন,—

কপিলা কোটী দানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্তিতম্।
ফলং তৎ কোটী গুণীতমেকাতুরা চিকিৎসয়া।

অর্থাৎ কোটী কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ হয়, একটি মাত্র আতুরকে নির্ব্যাধি করিলে তাহাপেক্ষাও কোটী গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে—আমাদের সকল ছাত্রই ইহা মনে রাখিলে আয়ুর্ব্বেদ-জগতে সত্যই যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্থ কর্ত্তৃক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, গোবর্দ্ধন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ১৭।১৯নং শ্যামবাজার ব্রিজ্ রোড্ হইতে মুদ্রাকর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।